2 YEARS B.Ed New Syllabus

Uniform Curriculum Structure for 2 Year B.Ed. Programme in West Bengal

SEMESTER-II
COURSE-EPC-2

শিক্ষায় নাটক ও চারুকলা

ebook.dascoaching.in

DRAMA AND ARTS IN EDUCATION

ড. সুজাতা রায় মান্না
ড. সুমনা দত্ত
তমাল পাল

সম্পাদনা
ড. কমলকৃষ্ণ দে

ARHELI PUBLISHERS KOLKATA
আহেলি পাবলিশার্স

Scanned with CamScanner

'The West Bengal University of Teachers' Training, Education Planning and Administration' অধীনস্ত পশ্চিমবঙ্গের সমগ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়, West Bengal State University, গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, উত্তর বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, সিধু কানু বিশ্ববিদ্যালয়) সুনির্দিষ্ট, অভিন্ন (Uniform) পাঠ্যক্রম অনুসারে রচিত একটি আদর্শ মানের বিষয়ভিত্তিক গ্রন্থ।

শিক্ষায় নাটক ও চারুকলা

Drama and Arts in Education

Course EPC-2 (1.2 EPC 2)

ড. সুজাতা রায় মান্না

সহকারী অধ্যাপক (সংগীত বিভাগ)

রাজা এন. এল. খান ওমেনস্ কলেজ (গভ. স্পনসর্ড), পশ্চিম মেদিনীপুর

ড. সুমনা দত্ত

অতিথি অধ্যাপক, (ফাইন আর্ট অ্যান্ড ক্রাফ্ট বিভাগ) রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়

তমাল পাল

সহকারী অধ্যাপক, (ফাইন আর্ট অ্যান্ড ক্রাফ্ট বিভাগ) চাপড়া পিটিটিআই, নদিয়া,

অতিথি অধ্যাপক, ডিআইইটি, বাণীপুর, উত্তর ২৪ পরগণা

সম্পাদনা

ড. কমলকৃষ্ণ দে

অতিথি অধ্যাপক, রামকৃষ্ণ মিশন শিক্ষামন্দির, বেলুড়মঠ, হাওড়া

প্রাক্তন অধ্যক্ষ, ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজ, কলকাতা

Library Dinajpur B. Ed. College • D/Dinajpur • ESTD. 2009

আহেলি পাবলিশার্স

৫/১ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা—৭০০ ০০৯

Ph : (033) 2241 0308 Mb : 9007428045-9874378128

E-mail : aahelipublisherscal@gmail.com

Website : www.aahelipublishers.com

Scanned with CamScanner

Dakshin Dinajpur B. Ed. College
Call No.....
Acc No. 2950

Follow Our B.Ed Related Website>>

www.dascoaching.in

প্রথম প্রকাশ : মার্চ, ২০১৬

প্রকাশক : অসীমকুমার মহান্তি ও দেবব্রত সরকার

আহেলি পাবলিশার্স

৫/১ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা-৯

অক্ষরবিন্যাস : আহেলি পাবলিশার্স

মুদ্রণ : অনিতা এন্টারপ্রাইজ

ISBN : 81-89169-30-0

গ্রন্থস্বত্ব : লেখক ও প্রকাশক

প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনো অংশের কোনো ধরনের প্রতিলিপি অথবা পুনরুৎপাদন করা যাবে না। অন্য কোনোরকম বাঁধাই বা প্রচ্ছদে এই বইটি কোনো ব্যক্তি অন্য কোনো ব্যক্তিকে দিতে পারবেন না এবং বইটির কোনো গ্রহীতার ক্ষেত্রেও তাকে এই একই শর্ত আরোপ করতে হবে। এই শর্ত অমান্য করা হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

মূল্য : ১৬৫.০০ টাকা (INR 165/-)

ভারতীয় সংবিধান

প্রস্তাবনা

"আমরা, ভারতের জনগণ, ভারতকে একটি সার্বভৌম, সমাজতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক, সাধারণতন্ত্র রূপে গড়ে তুলতে এবং এর সকল নাগরিক যাতে :

সামাজিক, অর্থনীতিক এবং রাজনীতিক ন্যায়বিচার; চিন্তার, অভিব্যক্তির, বিশ্বাসের, ধর্মের ও উপাসনার স্বাধীনতা; প্রতিষ্ঠা ও সুযোগের সমতা নিশ্চিতভাবে লাভ করেন; এবং তাদের সকলের মধ্যে ব্যক্তি-মর্যাদা এবং জাতীয় ঐক্য ও সংহতি সুনিশ্চিত করার জন্য যাতে সৌভ্রাতৃত্বের ভাব গড়ে ওঠে;

তার জন্য সত্যনিষ্ঠার সঙ্গে সংকল্প করে আমাদের সংবিধান সভায় আজ, ২৬শে নভেম্বর, ১৯৪৯ তারিখে, এতদ্দ্বারা এই সংবিধান গ্রহণ করছি, বিধিবদ্ধ করছি এবং নিজেদের অর্পণ করছি।

Scanned with CamScanner

THE CONSTITUTION OF INDIA

Preamble

WE, THE PEOPLE OF INDIA, having solemnly resolved to constitute India into a SOVEREIGN SOCIALIST SECULAR, DEMOCRATIC REPUBLIC and to secure to all its citizens:

JUSTICE, social, economic and political;

LIBERTY of thought, expression, belief, faith and worship;

EQUALITY of status and of opportunity; and to promote among them all—

FRATERNITY assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the Nation;

IN OUR CONSTITUENT ASSEMBLY this twenty-sixth day of November 1949, do hereby Adopt, enact and give to ourselves this constitution.

ভূমিকা

NCTE 2014-র নতুন Regulation অনুসারে, West Bengal Government থেকে বর্তমান শিক্ষাবর্ষে "The West Bengal University of Teachers Training, Education Planning and Administration" অধীনে একটি Uniform B.Ed. Syllabus দেওয়া হয়েছে। এটি পশ্চিমবঙ্গে সমগ্র বিএড কলেজের শিক্ষার্থীদের জন্য দ্বিবার্ষিক সুনির্দিষ্ট পাঠক্রম। এই পাঠক্রমের দ্বিতীয় অর্ধের একটি জেনারেল পেপার হল Course-EPC-2 (1.2 EPC2) "Drama and Arts in Education"। এই বিষয়ের উপর ভিত্তি করে বর্তমান **'শিক্ষায় নাটক ও চারুকলা'** বইটি প্রকাশিত হল।

এই গ্রন্থ পাঠক্রম অনুযায়ী ৫টি এককে বিভক্ত। এই এককগুলি হল—নাটক ও তার মৌলিক ধারণাসমূহ, সংগীত (গায়ন এবং বাদন), নৃত্যকলা, চিত্রশিল্প কলা ও অঙ্কন, সৃজনশীল শিল্প। বস্তুতপক্ষে বিএড পাঠক্রমে এই বিষয়গুলি একেবারেই নতুন। শিক্ষার্থীদের এই নতুন বিষয়াবলির প্রকাশভঙ্গি, পরিবেশন রীতি, যুক্তি প্রয়োগের পদ্ধতি, বিশ্লেষণ ক্ষমতা প্রয়োগ করে উচ্চ মার্গের শিল্পশৈলী তৈরি করতে নানান সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। এই দৃষ্টিকোণ থেকে সহজ-সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় এই নব সংযোজিত বিষয়গুলিকে শিক্ষার্থীদের কাছে প্রাসঙ্গিক করে তুলতে এই বইতে যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়েছে।

প্রতিটি অধ্যায় সহজ ও সাবলীল ভাষায়, পল্লবিত কল্পনা, বিস্তারিত গভীর পর্যবেক্ষণের দ্বারা বইটিকে স্বতন্ত্র ও সমৃদ্ধ করার চেষ্টা করেছি। আশাকরি, নবপাঠক্রম অনুযায়ী লিখিত এই বইটি শিক্ষার্থীদের কাছে সমাদৃত হবে। ছাত্রছাত্রীদের সুবিধার জন্য প্রতিটি অধ্যায়ের শেষে পরীক্ষার সম্ভাব্য প্রশ্ন সংকলিত করা হয়েছে।

আশাতীত স্বল্পসময়ের মধ্যে আদর্শ ও গুণগত মানে সমৃদ্ধ প্রকাশনার জন্য অকুণ্ঠ ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই আহেলি পাবলিশার্স-এর দুই কর্ণধার অসীমকুমার মহান্তি ও দেবব্রত সরকার-কে। এই সংস্থার সঙ্গে সংযুক্ত অন্যান্য কর্মীদের আন্তরিক সাধুবাদ জানাই। বিশেষ করে এই সংস্থার ফটোটাইপ সেটিং বিভাগের কর্মী তন্ময় ভট্টাচার্য, সমীর নস্কর ও বিদ্যুৎ ঘোষ অশেষ ধৈর্য ও মমতার সঙ্গে ফটো কম্পোজিং করে আমাকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন।

পরিশেষে যাঁদের জন্য এই গ্রন্থ রচনা তাঁদের কিছুমাত্র উপকার আমাদের হলে আমাদের সকল প্রয়াস সার্থক হয়েছে জেনে পরিতৃপ্ত হব। গ্রন্থের উৎকর্ষ সাধনে সংশ্লিষ্ট সকলের মতামত সাদরে গ্রহণযোগ্য।

৫ মার্চ, ২০১৬
কলকাতা-৭০০০০৯

ড. সুজাতা রায় মান্না
ড. সুমনা দত্ত
তমাল পাল

Scanned with CamScanner

The West Bengal University of Teachers Training, Education Planning and Administration

SEMESTER-II

CourseEPC-2 (1.2EPC2)	Drama and Arts in Education	Theory	Engagement With the Field	Credit	1+1
		25	25	Class Hours	16+32

Objectives	**The student teachers will be able to :-** ● Understand the use of 'Drama' as Pedagogy. ● Use 'Role play' technique in the teaching learning process. ● Understand the importance of dramatic way of presentation. ● Integrate singing method in teaching learning process. ● Understand various 'Dance forms' and their integration in educational practices. ● Use art of drawing and painting in teaching learning process. ● Develop creativity through different creative art forms. ● Understand the efficacy of different art forms in education.	
	COURSE CONTENT/SYLLABUS	
Unit-I	**Drama and its Fundamentals :** ● Drama as a tool of learning ● Different Forms of Drama ● Role play and Simulation ● Use of Drama for Educational and social change (Street play, Dramatization of a lesson) ● Use of Drama Techniques in the Classroom: voice and speech, mime and movements, improvisation, skills of observation, imitation and presentation	3 hrs.
Unit-II	**Music *(Gayan and Vadan):*** ● *Sur, Taal and Laya (Sargam)* ● Vocal– Folk songs, Poems, Prayers ● Singing along with "Karaoke" ● Composition of Songs, Poems, Prayers ● Integration of *Gayan* and *Vadan* in Educational practices	3 hrs.

Scanned with CamScanner

Unit-III	**The Art of Dance:** ● Various Dance Forms-Bharat Natyam, Kathakali, Folk dance: Garba, Bhavai, Bhangada, Bihu and various other dances. ● Integration of Dance in educational practices *(Action songs, Nritya Natika)*	3 hrs.
Unit-IV	**Drawing and Painting:** ● Colours, Strokes and Sketching– understanding of various means and perspectives ● Different forms of painting– Worli art, Madhubani art, Glass painting, Fabric painting and various forms of painting ● Use of Drawing and Painting in Education–Chart making, Poster making, match-stick drawing and other forms	3 hrs.
Unit-V	**Creative Art:** ● Creative writing– Story writing, Poetry writing ● Model making– Clay modeling, Origami, Puppet making ● Decorative Art– Rangoli, Ikebana, Wall painting (Mural) ● Designing– Computer graphics, CD Cover, Book cover, Collage work ● The use of different art forms in Education	4 hrs.
Engagement with the Field/ Practicum	**Any one of the following :-** ● Develop a script of any lesson in any subject of your choice to perform a Play / Drama. ● Develop a script for the street play focusing on "Girl's education and Women empowerment". ● Prepare a script of Bhavai based on some Socio-political issues. ● Prepare a pictorial monograph on "Various folk dance of Gujarat". ● Prepare a pictorial monograph on "Various Dance forms in India". ● Prepare a calendar chart on "Various Musical Instruments in India". ● Develop an Audio CD based on newly composed Poems of Gujarati/Hindi language. ● Prepare some useful, productive and decorative models out of the west materials. ● Visit the Faculty of Performing Arts in your city and prepare a detailed report on its multifarious functioning.	32 hrs.

	● Organize a competition on some Decorative / Performing Art forms in the school during your School Internship programme and prepare a report on it. ● Organize a workshop on some selected Creative Art forms in the school during your School Internship programme and prepare a report on it. ● Develop a creative design based on your choice for CD Cover or Book cover. ● Develop a design or picture based on collage work.	
Mode of Transaction	Lecture, Lecture cum discussion, Workshop schedule, Slide/Film show, Project work, Demonstration, Visit, Group work and its Presentation	

This E-Book Download From>>

www.ebook.dascoaching.in

Scanned with CamScanner

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়

নাটক ও তার মৌলিক ধারণাসমূহ (Drama and its Fundamentals) ১৭-৫৪

১.১ নাটক একটি শিক্ষা সহায়ক উপকরণ (Drama as a Tool of Learning)

১.১.১ ভূমিকা (Introduction)

১.১.২ নাটকের উৎস (Origin of drama)

১.১.৩ শিখনের মাধ্যম হিসেবে নাটক (Drama as a tool of learning)

১.২ বিভিন্ন আঙ্গিকের নাটক (Different Forms of Drama)

১.২.১ বিভিন্ন আঙ্গিকে নাটকের বিস্তারিত আলোচনা (Discussion about diferent forms of drama)

১.৩ চরিত্রাভিনয় ও নকল পরিবেশে শিক্ষানবিশী (অনুকৃতি পাঠ) (Role Play and Simulation)

১.৩.১ চরিত্রাভিনয়

১.৩.২ নকল পরিবেশে শিক্ষানবিশী বা অনুকৃতি পাঠ (Simulation)

১.৩.২.১ চরিত্রাভিনয় ও অনুকৃতি পাঠের পার্থক্য (Diffferenc between role play & simulation)

১.৪ শিক্ষায় ও সামাজিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে নাটকের ব্যবহার (পথ নাটিকা ও নাট্য রূপায়ণের পঠন পাঠনকালে) [Use of Drama for Educational and Social Change (Street play, Dramatization of a lesson)]

১.৪.১ পথনাটিকা (Street Play)

১.৪.২ পাঠ-এককে নাট্য রূপান্তর (Dramatization of Lesson unit) :

১.৪.৩ অভিনয়ের মাধ্যমে শিক্ষা (Dramatised Experience)

১.৪.৪ এই ধরনের নাটক অভিনয়ের উদ্দেশ্য

Scanned with CamScanner

১.৫ শ্রেণিকক্ষে নাটক প্রকরণের ব্যবহার : সংলাপ, কণ্ঠস্বর , মূকাভিনয় ও চলন, তাৎক্ষণিক উদ্ভাবন ক্ষমতা বা ইম্প্রোভাজেশন, পর্যবেক্ষণ শক্তির দক্ষতা, অনুকরণ উপস্থাপন করা (Use of Drama Techniques in the Classroom : voice and speech, mime and movements, improvisation, skills of observation, imitation and presentation)

১.৫.১ সংলাপ ও কণ্ঠস্বর (Voice and Speech)

১.৫.২ মূকাভিনয় ও চলাফেরা (Mime and Movements)

১.৫.৩ ইম্প্রোভাইজেশন (Improvisation)

১.৫.৪ পর্যবেক্ষণের দক্ষতা (Skills of Observation)

১.৫.৫ অনুকরণ ও উপস্থাপন (Imitation and Presentation)

দ্বিতীয় অধ্যায়

সংগীত (গায়ন এবং বাদন) MUSIC (Gayan and Vadan)

৫৫-১৩৬

২.১ সুর, তাল ও লয়—স্বরগম (Sur, Taal and Laya (Sargam)

২.১.১ সুর তাল ও লয়-এর বৈশিষ্ট্য

২.১.২ তাল প্রসঙ্গ এবং সংগীতে তাল-তত্ত্ব (Context about Taal and Philosophical Knowledge of taal in music)

২.১.৩ লয়, মাত্রা, তাল ও ছন্দের মধ্যে পার্থক্য (Difference between laya, Matra, Taal, Chhanda)

২.১.৪ সংগীতে লয় তথা তালের মহত্ত্ব (Nabicity of Taal in Music)

২.১.৫ বিভাগ এবং তালে এর প্রয়োজনীয়তা (Division and necessity of Taal)

২.২ গলার স্বর সংক্রান্ত—লোকসংগীত (Vocal–Folk songs, Poems, Prayers)

২.৩ 'কারাওকে'-এর সঙ্গে গান (Singing along with "Karaoke")

২.৪ গান, কবিতা ও প্রার্থনা সংগীতের কৌশল (Composition of Songs, Poems, Prayers)

২.৪.১ গানের কৌশল (Composition of Songs)

২.৪.২ কবিতার কৌশল (Composition of Poems)

২.৪.২.১ কবিতার প্রকাশভঙ্গি (Expresion style of Poems)

২.৪.৩ প্রার্থনা সংগীতের কৌশল (Composition of Prayers)

২.৫ শিক্ষায় গান ও বাজনার সমন্বয় (Integration of Gayan and Vadan in Educational practices)

তৃতীয় অধ্যায়

নৃত্যকলা (The Art of Dance)

১৩৭-১৬৪

৩.১ বিভিন্ন নৃত্যকলা—ভরতনাট্যম, কথাকলি, লোকনৃত্য : গরবা, ভাভাই, ভাঙ্গরা, বিহু, এবং অন্যান্য লোকনৃত্য (Various Dance Forms– Bharat Natyam, Kathakali, Folk dance: Garba, Bhavai, Bhangada, Bihu and various other dances)

৩.১.১ ভূমিকা (Introduction)

৩.১.২ ভরতনাট্যম (Bharat Natyam)

৩.১.৩ কথাকলি (Kathakali)

৩.১.৪ লোকনৃত্য (Folk dance)

৩.১.৪.১ ভূমিকা (Introduction)

৩.১.৪.২ গরবা নৃত্য (Garba Dance)

৩.১.৪.৩ ভাভাই নৃত্য (Bhavai Dance)

৩.১.৪.৪ ভাঙ্গড়া নৃত্য (Bhangada Dance)

৩.১.৪.৫ বিহু (Bihu Dance)

৩.১.৪.৬ অন্যান্য লোকনৃত্য (Various other dances)

৩.২ শিক্ষার সঙ্গে নৃত্যের একীকরণ (কার্যকরী সংগীত, নৃত্যনাটিকা) [Integration of Dance in educational practices *(Action songs, Nritya Natika)*]

৩.২.১ শিক্ষাক্ষেত্রে নাটকের একীকরণ (Integration of Dance in educational practices)

৩.২.২ নৃত্যনাটিকা (Nritya Natika)

চতুর্থ অধ্যায়

চিত্রশিল্প কলা ও অঙ্কন (Drawing & Painting)

১৬৫-২৪২

৪.১ রং, স্ট্রোক ও স্কেচিং— বিভিন্ন কাজের পদ্ধতি ও পরিপ্রেক্ষিত (Colours, Strokes and Sketching– understanding of various means and perspectives)

৪.১.১ রং (Colour)

৪.১.২ স্ট্রোক এবং স্কেচিং (Strokes & Sketching)

৪.১.৩ কার্যাদি সাধনের উপায় ও পরিপ্রেক্ষিত (Understanding of Various means and Perspectives)

Scanned with CamScanner

৪.২ **বিভিন্ন শৈলীর চিত্র—ওয়ারলি চিত্র, মধুবনি চিত্র, গ্লাস চিত্র, ফেব্রিক চিত্র ও অন্যান্য শৈলীর চিত্র** (Different forms of painting– Worli art, Madhubani art, Glass painting, Fabric painting and various forms of painting)
৪.২.১ ওয়ারলি লেখচিত্র (Worli art)
৪.২.২ মধুবনী চিত্রকলা (Madhubani art)
৪.২.৩ গ্লাস পেন্টিং (Glass painting)
৪.২.৪ ফেব্রিক (Fabric painting)
৪.২.৫ অন্যান্য শৈলীর চিত্র (Various forms of painting)
৪.৩ **শিক্ষায় ড্রইং ও পেন্টিং-এর ব্যবহার—চার্ট তৈরি, পোস্টার তৈরি, ম্যাচস্টিক ড্রইং ও অন্যান্য শিক্ষোপকরণ** (Use of Drawing and Painting in Education–Chart making, Poster making, match-stick drawing and other forms)
৪.৩.১ চার্ট তৈরি (Chart making)
৪.৩.২ পোস্টার তৈরি (Postar making)
৪.৩.৩ ম্যাচস্টিক ড্রইং (Match-stick drawing)

পঞ্চম অধ্যায়

সৃজনশীল শিল্প (Creative Art)

২৪৩-৩০৬

৫.১ সৃজনশীল লেখা— গল্প লেখা, কবিতা লেখা (Creative writing– Story writing, Poetry writing)
৫.২ মডেল তৈরি— মাটির কাজ, অরিগামি, পাপেট তৈরি (Model making–Clay modeling, Origami, Puppet making)
৫.২.১ মাটির কাজ (Clay Modeling)
৫.২.২ ওরিগামি (Origami)
৫.২.৩ পুতুল নাচ (Puppet)
৫.৩ অলঙ্করণ শিল্প— রঙ্গোলি, ইকেবানা, ভিত্তি চিত্র (মুরাল) [Decorative Art–Rangoli, Ikebana, Wall painting (Mural)]
৫.৩.১ রঙ্গোলি বা আলপনা (Rangoli or Alpana)
৫.৩.২ ইকেবানা (Ikebana)
৫.৩.৩ ম্যুরাল বা ভিত্তিচিত্র (Wall painting)
৫.৪ ডিজাইন--- কম্পিউটার গ্রাফিক্স, সিডি কভার, বইয়ের প্রচ্ছদ, কোলাজের কাজ (Designing– Computer graphics, CD Cover, Book cover, Collage work)
৫.৪.১ কম্পিউটার গ্রাফিক্স (Computer graphics)

৫.৪.২ সিডি কভার (CD Cover)
৫.৪.৩ বইয়ের প্রচ্ছদ (Book Cover)
৫.৪.৪ কোলাজের কাজ (Collage work)
৫.৫ শিক্ষায় বিভিন্ন ধরনের শিল্প মাধ্যমে ব্যবহার (The use of different art forms in Education)

ব্যবহারিক অংশ
Practicum [Engagement with Field]

৩০৭-৩৬০

This E-Book Download From>>

www.ebook.dascoaching.in

Scanned with CamScanner

অধ্যায় ১

নাটক ও তার মৌলিক ধারণাসমূহ

(Drama and its Fundamentals)

❑ বিষয়বস্তুর রূপরেখা :

১.১ নাটক একটি শিক্ষা সহায়ক উপকরণ **(Drama as a Tool of Learning)**

১.১.১ ভূমিকা (Introduction)

১.১.২ নাটকের উৎস (Origin of drama)

১.১.৩ শিখনের মাধ্যম হিসেবে নাটক (Drama as a tool of learning)

১.২ **বিভিন্ন আঙ্গিকের নাটক (Different Forms of Drama)**

১.২.১ বিভিন্ন আঙ্গিকে নাটকের বিস্তারিত আলোচনা (Discussion about diferent forms of drama)

১.৩ **চরিত্রাভিনয় ও নকল পরিবেশে শিক্ষানবিশী (অনুকৃতি পাঠ)** (Role Play and Simulation)

১.৩.১ চরিত্রাভিনয়

১.৩.২ নকল পরিবেশে শিক্ষানবিশী বা অনুকৃতি পাঠ (Simulation)

১.৩.২.১ চরিত্রাভিনয় ও অনুকৃতি পাঠের পার্থক্য (Diffferenc between role play & simulation)

১.৪ **শিক্ষায় ও সামাজিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে নাটকের ব্যবহার (পথ নাটিকা ও নাট্য রূপায়ণের পঠনপাঠনকালে) [Use of Drama for Educational and Social Change (Street play, Dramatization of a lesson)]**

১.৪.১ পথনাটিকা (Street Play)

১.৪.২ পাঠ-এককে নাট্য রূপান্তর (Dramatization of Lesson unit) :

১.৪.৩ অভিনয়ের মাধ্যমে শিক্ষা (Dramatised Experience)

১.৪.৪ এই ধরনের নাটক অভিনয়ের উদ্দেশ্য

১.৫ **শ্রেণিকক্ষে নাটকপ্রকরণের ব্যবহার : সংলাপ, কণ্ঠস্বর, মূকাভিনয় ও চলন, তাৎক্ষণিক উদ্ভাবন ক্ষমতা বা ইম্প্রোভাজেশন, পর্যবেক্ষণ শক্তির দক্ষতা, অনুকরণ উপস্থাপন করা (Use of Drama Techniques in the Classroom : voice and speech,**

Scanned with CamScanner

mime and movements, improvisation, skills of observation, imitation and presentation)

১.৫.১ সংলাপ ও কণ্ঠস্বর (Voice and Speech)
১.৫.২ মূকাভিনয় ও চলাফেরা (Mime and Movements)
১.৫.৩ ইম্প্রোভাইজেশন (Improvisation)
১.৫.৪ পর্যবেক্ষণের দক্ষতা (Skills of Observation)
১.৫.৫ অনুকরণ ও উপস্থাপন (Imitation and Presentation)

Scanning Copyright By DASCoaching.in

Thank You

Visit Our Educational Website

Regularly For More Update:

https://www.dascoaching.in/

Contact Us On:

Facebook: fb/dascoaching.in

YouTube: DAS Coaching

mailto:contact.dascoaching@gmail.com

Follow on Dailyhunt Apps: DAS Coaching

Telegram: DAS Coaching

Whatsapp: 9339697099

✪ ১.১ নাটক একটি শিক্ষা সহায়ক উপকরণ (Drama as a Tool of Learning) :

❑ ১.১.১ ভূমিকা (Introduction) :

আদিম যুগে মানুষ ভাবপ্রকাশের জন্য বিভিন্ন শব্দের আদানপ্রদান করত। কখনও আনন্দ প্রকাশ করে চিৎকার করে নাচত, আবার কখনও দুঃখে বিভিন্ন শব্দ করত। যখন এরকম প্রকাশভঙ্গি শারীরিক অঙ্গভঙ্গির মধ্য দিয়ে মানুষের বিনোদনের অঙ্গ হিসেবে উঠে আসল, তা লোক নাটক হিসেবে পরিচিত হল। এই লোকনাটক ধর্মীয় অনুষ্ঠান, বিবাহ, আনন্দ উৎসবে ব্যবহৃত হতে থাকল। পরবর্তী সময়ে শহুরে সংস্কৃতির মধ্য দিয়ে এই নাটকের আঙ্গিক আরও পরিশীলিত হল। গ্রিক সভ্যতায় নাটক খুবই উন্নতি লাভ করেছিল। গ্রিক শব্দ 'Drama' থেকে Drama বা নাটকের উৎপত্তি। গ্রিসে সফোক্লিস, ইউরোপিডিস প্রভৃতি নাট্যকারের বিখ্যাত নাটক আজও অবিস্মরণীয়। গ্রিসদেশে Dionysus দেবতার পূজায় যে সঙ্গীতের প্রচলন ছিল, তা থেকে ট্রাজেডির উৎপত্তি এবং ওই দেবতার উৎসবের হাস্য পরিহাসযুক্ত শোভাযাত্রাও সঙ্গীত থেকে কমেডির সৃষ্টি।

ভারতবর্ষে 'নৃৎ' ধাতু থেকে 'নাটক' এই কথাটির সৃষ্টি হয়েছে। এর ফলে অনুমান করা যায়, নৃত্য থেকে ভারতীয় নাটকের জন্ম। ভারতীয় নাটকের মূল প্রাচীন ধর্মের মধ্যে নিহিত। কথিত আছে, ব্রহ্মা নাট্যবেদ নামে পঞ্চবেদ প্রণয়ন করেন। চর্তুবেদ থেকে নানা উপাদান সংগ্রহ করে তিনি এই নূতন বেদ সৃষ্টি করেন। ব্রহ্মা এই বেদ তাঁর শিষ্য ভরত মুনিকে শিক্ষা দেন। ভরত মুনি তা প্রচার করেন।

সংস্কৃত নাটক কবে শুরু হয়েছিল তা নিয়ে নানা মতভেদ আছে। **ভাসের** নাটকগুলি আবিষ্কার হওয়ার পরে অনেকে বলেন খৃ:পূ: তৃতীয় অথবা চতুর্থ শতাব্দীর নাট্যকার বলে মত দিয়েছেন। কেউ কেউ **অশ্বঘোষকে ভাসের**ও আগের নাট্যকার বলে অভিহিত করেছেন। তবে নাটক তখনকার মুষ্টিমেয় অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু গ্রিসদেশে খোলা আকাশের নীচে ত্রিশ হাজার দর্শক সমবেত হয়ে নাটক দেখতেন, তা ছিল সর্বসাধারণের জন্য। সংস্কৃত নাটক এত বেশি অলংকারপূর্ণ ও কবিতা সমৃদ্ধ ছিল—যা দেশের অধিকাংশ সাধারণ লোকেদের কাছে বোধগম্য হত না। যদিও সংস্কৃত নাট্যকারের মধ্যে **কালিদাস, ভাসের** নাম উল্লেখযোগ্য। 'কুমারসম্ভব', 'শকুন্তলা', 'মৃচ্ছকটিক' প্রভৃতি নাটক সংস্কৃত সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে।

❑ ১.১.২ নাটকের উৎস (Origin of drama) :

গঙ্গার উৎস যেমন গোমুখ, নাটকের উৎসও তেমনি নৃত্য, নৃত্যই মানুষের আদিমতম কলা—আদিম সমাজের হৃদয়ের ভাব প্রকাশের মাধ্যম।

Scanned with CamScanner

সংস্কৃত 'নৃৎ' ধাতু থেকে নৃত্য কথাটি উৎপন্ন হয়েছে। এর অপর নাম নাট, যা হতে নাটক শব্দটির সৃষ্টি। **ওল্ডেনবার্গ** ও **কিথ** উভয়েই মনে করেন যে ধর্ম সাধনা ও কলা চর্চা উভয় বস্তুই অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত হয়ে ভারতীয় নাটকের সৃষ্টি করে।

"Hence the doctroine which has the approval of Oldenberg and which finds the origin of the drama is the sacred dance, of course, accompanied by gesture of pantomic charater, combined with song, and later enriched by dialogue, this would give rise to the drama (Sanskrit Drama).

নৃত্য ক্রমশই সঙ্গীতের তাল সমৃদ্ধ হয়ে প্রতিটি ধর্মীয় ও ক্রিয়ানুষ্ঠানের অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে ওঠে। চরিত্রের সৃজন মাধ্যমে ও সংলাপের আরোপের পর নৃত্যই হয়ে ওঠে নাটক।

ইউরোপের গ্রিক নাট্য সাহিত্য ভারতীয় সংস্কৃত নাট্য সাহিত্য হতেও প্রাচীন। ইউরোপীয় নাট্যসাহিত্যের জন্মস্থানই প্রাচীন গ্রিস, যে দেশ সভ্যতা, সংস্কৃতি ও বৈদগ্ধের প্রাচীন পীঠস্থান। গ্রিসে নাট্যচেতনার মূলে ছিল জীবন জিজ্ঞাসা—জীবনের বহুমুখী বিশৃঙ্খলায় মানসিক শক্তির বিনাশকে পর্যবেক্ষণ করে একটি নির্দিষ্ট তত্ত্বের মধ্যে আনয়ন করা, যার নাম অবশ্যই নিয়তিবাদ। গ্রিক নাট্য সাহিত্যের ত্রয়ী অর্থাৎ **অ্যাস্‌কাইলাস** (Aeschylus), **সোফোক্লিস** (sophocles) ও **ইউরোপিডিস** (Euripides) যে বিয়োগান্ত নাটক রচনা করেছিলেন, অ্যারিস্টটল-এর নাট্যতত্ত্ব আলোচনা সে সবেরই গৌরবোজ্জ্বল নিদর্শন। ধর্ম ও ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে যেমন সংস্কৃত নাটকের বিকাশ ঘটেছিল, প্রাচীন গ্রিসের নাটকও সেই অর্থেই ধর্মকেন্দ্রিক।

❑ ১.১.৩ শিখনের মাধ্যম হিসেবে নাটক (Drama as a tool of learning) :

সভ্যতার অভিযোজনে একসময় শেষ হয়েছিল মানুষের বন্যজীবন। তার পর শুরু হল সমাজজীবন, যদিও তা আক্ষরিক অর্থে সমাজবদ্ধ নয়। সামাজিক বন্ধন দৃঢ় হতে আরও একটু সময় লেগেছিল। সমাজজীবনে উত্থান-পতন মানুষের জীবন ধারায় আনল দ্রুত পরিবর্তন, জীবন তরণী তীব্র বেগে চঞ্চল হয়ে উঠল, জীবনের প্রকাশরূপ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে নাটকীয় অভিব্যক্তি পেল। পশু শিকারের পর যুথবদ্ধ আদিম নরনারী নৃত্যের মাধ্যমে তাদের আনন্দের অভিব্যক্তি প্রকাশ করত। নৃত্যই ছিল তাদের হৃদয় ভাবের প্রকাশমাধ্যম এবং যদিও তা একধরনের নাট্যক্রিয়া, কিন্তু তাকে কোনোমতেই নাটক বলা যায় না। শান্ত সমাহিত, একঘেয়ে জীবনে কোনো নাটকীয়তা নেই। জীবনের পথ যেখানে আবর্তসঙ্কুল, যেখানে জীবন স্রোত আকস্মিক আঘাতে বল্গাহারা, যেখানে বহুল প্রচেষ্টার ব্যর্থ পরিণাম পাহাড় সাদৃশ মাথা উচু করে দাঁড়ায় আর নিস্ফল আক্রোশে মানুষ নির্মম ভাবে মাথা ঠোকে, যেখানে পরিবেশ ও প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রতিবন্ধকতা এবং আপনজনের নির্মমতা বিশ্বাসঘাতকতা মহা দুর্যোগময়ী অমানিশার স্রষ্টা এবং যেখানে প্রবৃত্তির রূপ ধরে নিয়তির আবির্ভাবকে প্রতিহত করার অন্তহীন সংগ্রাম চলে—সে সবই নাটকের উপাদান প্রাচুর্যের সমৃদ্ধভূমি। সুদক্ষ নাট্যকার এই প্রাচুর্যময়ী ভূমি

হতে উপাদান সংগ্রহ করে তা শিল্পরূপ প্রদানের মাধ্যমে নাটকে প্রয়োগ করেন। তাই মানবজীবন ব্যতীত নাটক সৃষ্টি হয় না। মানবজীবনের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, আশা-নিরাশা, জয়-পরাজয়, সার্থকতার উল্লাস ও ব্যর্থতার গ্লানি—এইসব উপাদানের উপর নির্ভর করেই নাটক রচিত হয়।

তেমনই **শিক্ষার্থীদের শিক্ষা ও বিষয়বস্তুর মধ্যে** সংযুক্তিকরণের ক্ষেত্রে নাটক একটি শক্তিশালী মাধ্যম। আমরা জানি যে শিখন একটি সক্রিয় নির্মাণ ভিত্তিক পদ্ধতি, যখন আমরা কোনো কিছুকে জানতে চাই। শ্রেণি শিখনে শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে যখন সংযোগ স্থাপিত হয়, আমরা তখন দেখতে পাই শ্রেণি শিখনে নাটক বিভিন্ন অভিজ্ঞতালব্ধ ঘটনাবলিকে উপস্থাপিত করে। কোনো কিছুর সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে নাটক প্রকৃতিগত ভাবেই ছাত্র-ছাত্রীদের সামাজিক ঘটনাবলি ব্যাখ্যাকরণ, চিন্তা ভাবনার আদানপ্রদান ও বিভিন্ন দক্ষতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে অসাধারণ ভূমিকা পালন করে। এইভাবে নাটক শিক্ষার্থীদের অর্জিত তথ্য, সত্য ঘটনার উপর প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন সামাজিক অভিজ্ঞতাগুলিকে জ্ঞান-উপলব্ধির বিকাশ সাধন করে। নাটকীয় উপস্থাপনার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মনে সমাজের বিভিন্ন বিষয় সমূহকে বুঝে নিতে ও আত্ম-উপলব্ধিতে বিশেষভাবে সাহায্য করে।

শিক্ষাবিদ **এডগার ডেল** বাস্তবতার ক্রম অনুযায়ী উপকরণগুলিকে একটি শঙ্কুর (Cone) মধ্যে সাজিয়েছেন। শঙ্কুর শীর্ষে তিনি স্থান দিয়েছেন সবচেয়ে বিমূর্ত (abstract) উপকরণটিকে, সেটি হল—মৌখিক প্রতীক (Verbal Symbol) এবং শঙ্কুর ভূমিতে স্থান দিয়েছেন সবচেয়ে বাস্তব ও মূর্ত (Concrete) উপকরণটিতে। সেটি হল—প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্যমূলক অভিজ্ঞতা (Direct Purposeful Experience)। ডেলের মত অনুযায়ী বাস্তবতার ঊর্ধ্বক্রমে উপকরণগুলি হল—

1. মৌখিক প্রতীক
2. লিখিত প্রতীক
3. রেকর্ডিং, রেডিয়ো এবং স্থিরচিত্র
4. চলচ্চিত্র
5. দূরদর্শন
6. প্রদর্শনীয় সামগ্রী (Exhibits)
7. বহির্ভ্রমণ
8. ডেমন্‌স্ট্রেশন
9. **শিক্ষামূলক নাটক (Dramatised Experience)**
10. পরোক্ষ মূর্ত অভিজ্ঞতা (Contrived Experience)
11. প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্যমূলক অভিজ্ঞতা।

Library Dakshin Dinajpur B. Ed. College • D/Dinajpur • ESTD-2009

Scanned with CamScanner

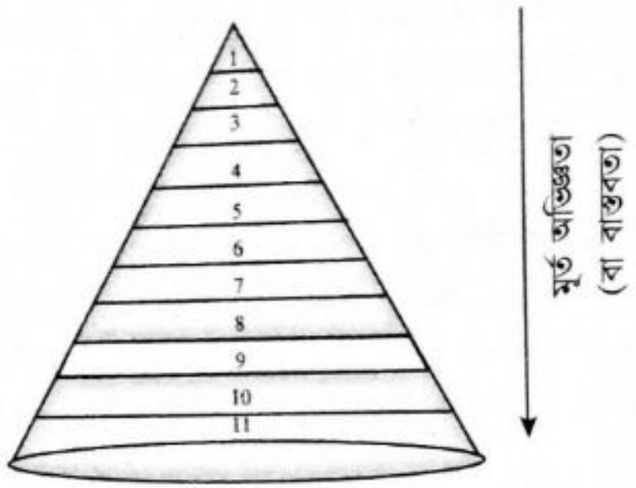

এডগার ডেলের অভিজ্ঞতা শঙ্কু

অর্থাৎ নাটক উপকরণটিকে তিনি ভূমি সংলগ্ন ৯ নং স্থান দিয়েছেন। এর দ্বারা বোঝা যায় নাটক শিক্ষাক্ষেত্রে শিখনের একটি শক্তিশালী মাধ্যম। যা শিক্ষার্থীকে শিখনে বিশেষভাবে সাহায্য করে।

শিক্ষার্থীদের শিখনে নাটকের প্রভাব :

- ❖ নিজেদের জীবনের প্রতিরূপকে প্রত্যক্ষ করে।
- ❖ অলৌকিক আনন্দ উপভোগ করে।
- ❖ চরিত্র সমূহের মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণে নিজেদের মনস্তাত্ত্বিক বিকাশ সম্ভব হয়।
- ❖ ভাবগত বা আদর্শগত মূল্যবোধের বিকাশ ঘটে।
- ❖ বৃহত্তর সমাজ পরিবেশের প্রেক্ষাপটে ঘনিষ্ট হতে সাহায্য করে।
- ❖ আধুনিক নাটকে পরিবেশের সামগ্রিক রূপ পরিবেশনের ফলে শিল্পীরা যুগ সমস্যা সম্বন্ধে সচেতন হয়।
- ❖ অন্তরের বস্তু রসকে সাহিত্যের সৌন্দর্য রসে সহজে আস্বাদন করে।
- ❖ কুশীলবদের অভিনয় নৈপুণ্যে শিল্পীদের পর্যবেক্ষণ দক্ষতা বৃদ্ধি পায়।
- ❖ সংলাপের দ্বন্দময়তা ও ভঙ্গিমা আঙ্গিকে বাচনিক ও অবাচনিক সংযোগের উন্নতি ঘটে।
- ❖ বিষয়োপযোগী নাটক নতুন নতুন ধারণা তৈরি করতে সক্ষম হয়।
- ❖ ব্যাখ্যাকরণের দক্ষতা বৃদ্ধি পায়।
- ❖ আত্ম-উপলব্ধিতে বিশেষভাবে সাহায্য করে।
- ❖ চিন্তা ভাবনার আদানপ্রদান ও বিভিন্ন দক্ষতা বৃদ্ধিতে অসাধারণ ভূমিকা পালন করে।

❍ ১.২ বিভিন্ন আঙ্গিকের নাটক (Different forms of drama) :

পাশ্চাত্যের নিকল, এবং ভারতীয় আলঙ্কারিকদের ব্যবস্থাপত্র অনুসারে সাধন কুমার ভট্টাচার্য নাটকের বিস্তৃত শ্রেণিবিভাগ করেছেন এবং তা নিম্নরূপ—

(ক) ভাব ও ঘটনার ভিত্তিতে—ট্রাজেডি, কমেডি, ট্র্যাজি-কমেডি, ফার্স, মেলোড্রামা।
(খ) আয়তন ও অঙ্কের ভিত্তিতে—মহানাটক, নাটক, নাটিকা, একাঙ্ক।
(গ) রচনা রীতির ভিত্তিতে—ক্লাসিক, নিওক্লাসিক, রোম্যান্টিক।
(ঘ) ভাষার ভিত্তিতে—পদ্যনাটক, গদ্যনাটক, পদ্য-গদ্য মিশ্রিত নাটক, কাব্যনাট্য।
(ঙ) উপাদান বাহুল্যের ভিত্তিতে—গীতিনাট্য বা অপেরা, নৃত্যনাট্য যাত্রা।
(চ) নাট্যবিষয়ের উপস্থাপন ভিত্তিতে—বাস্তবধর্মী, রূপধর্মী, সাংকেতিক, অভিব্যক্তিবাদমূলক, এপিক থিয়েটার, অ্যাবসার্ড।
(ছ) বিষয়বস্তুর ভিত্তিতে—ঐতিহাসিক, পৌরাণিক, সামাজিক, পারিবারিক, জীবনী, কাল্পনিক, লোকনাট্য।
(জ) বিষয়বস্তুর প্রকৃতির ভিত্তিতে—ধর্মমূলক, নীতিমূলক, আধ্যাত্মিক, রাজনৈতিক, দেশপ্রেমমূলক, অপরাধমূলক, রোমাঞ্চকর।

❑ ১.২.১ বিভিন্ন আঙ্গিকে নাটকের বিস্তারিত আলোচনা (Discussion about diferent forms of drama) :

(i) ক্ল্যাসিক্যাল নাটক : ইংরেজি ক্ল্যাসিক্যাল শব্দটি ল্যাটিন 'Classicus' শব্দ হতে উদ্ভব হয়েছে। **দুই শতকে ল্যাটিন** লেখক **এওলাস জেলিয়াস** (Aulus Gellius) **'Scripter Prolctarius'** শব্দের প্রতিশব্দরূপে Scripter Classicus শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন অভিজাত এক শ্রেণির লেখকদের বিশেষণ রূপে যারা মুষ্টিমেয় সুখী শ্রেণির জন্য সাহিত্য রচনা করতেন। কয়েক শতাব্দী পরে ভুলক্রমে এর অর্থ দাঁড়াল যে, যে সব লেখকদের রচনা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নের বিষয় বলে গণ্য হবে, তাঁরাই ক্লাসিক্যাল লেখক বলে পরিচিত হবেন। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পাঠ্য নয়, এমন অনেক মহৎ রচনা নিয়ে গোলযোগ সৃষ্টি হতেই ক্লাসিক অভিধাটির গুণগত মান নির্ধারিত হল এবং বলা হল যে রচনা প্রাচীন বা আধুনিক যাই হোক না কেন—যদি তা সৌন্দর্যের চূড়ান্ত আদর্শকে, সত্যের শাশ্বত রূপকে, পূর্ণতার চিরন্তন মানকে রক্ষা করে এবং প্রকাশ করে, তবে তা ক্লাসিক।

অ্যারিস্টটল তাঁর Poetics গ্রন্থে প্রাচীন গ্রিক নাট্যকার **এস্কাইলাস, সফোক্লিস** প্রমুখের নাটক আলোচনা প্রসঙ্গে আদি-মধ্য-অন্ত যুক্ত এবং ত্রিসাম্য নির্ভর বৃত্ত রচনা, কার্যকারণ সূত্রে ঘটনাংশগুলির মূল ঘটনার সঙ্গে সংযুক্তি এবং উপবৃত্ত, হাস্যরস ও করুণরস বর্জন করে মূল ঘটনার একমুখিনতা রক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে যা বলেছেন, তাই গ্রিক নাটক তথা ক্লাসিক নাটকের বৈশিষ্ট্যরূপে গণ্য হয়েছে।

Scanned with CamScanner

গ্রিক আদর্শই ক্লাসিক আদর্শ, তাই গ্রিক আদর্শ অনুসরণের নামই ক্ল্যাসিক্যাল আদর্শের চর্চা। প্রাচীন গ্রিসে ট্রাজেডি লেখক **এস্কাইলাস, সফোক্লিস** ও **ইউরিপিডিসে**র মতই ক্লাসিক কমেডি লিখেছেন **অ্যারিস্টোফেনিস** ও **মীনান্ডার**।

(ii) রোমান্টিক নাটক : রোমান্টিক ক্লাসিকের বিপরীতার্থক শব্দ। সুতরাং ক্লাসিকে যা আছে, রোমান্টিকে তা না থাকারই কথা। রোমান্টিক নাটকে ক্লাসিকের মতো নিয়মনীতির বন্ধন নেই। প্রচলিত প্রথার প্রতি আনুগত্য নেই, কোনো নির্ধারিত মানদণ্ড নেই। আছে ক্লাসিক বিরোধী করুণ ও হাস্যরসের সহাবস্থান, উপকাহিনির সংযোগ, জটিল বৃত্তের অবতারণা, অভিজ্ঞতার অনুসরণ ও বৈচিত্র্য সৃজন। তাই প্রকাশের স্বতঃস্ফূর্ততায়, অবচেতন মনের ক্রিয়া-কলাপের ব্যাখ্যায় ও প্রাণশক্তির অপূর্ব বিন্যাসে রোমান্টিকতা অনবদ্য ভূমিকায় উপস্থিত হয় কল্পনার সাহচর্যে।

রেনেসাঁর পরেই ইংল্যান্ডে সবচেয়ে বেশি রোমান্টিক নাটকের লক্ষণ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এলিজাবেথীয় যুগে রোম্যান্টিক নাটকের যে উৎকর্ষ সাধিত হয়, তার প্রধান রূপকার ছিলেন **উইলিয়াম শেক্সপিয়র**। শেক্সপিয়রের পদাঙ্ক অনুসরণ করে জার্মানিতে **লেসিঙ, গ্যেটে** ও **শিপার**, ফ্রান্সে **আলেকজান্ডার ডুমা, ভিক্টর হিউগো** ও অন্যান্য সমসাময়িকেরা, এবং স্পেনে **লোপ ডি ভেগা** ও **ক্যালডেরণ** প্রমুখ নাট্যকারেরা রোম্যান্টিক নাটককে সমৃদ্ধ করে তোলেন।

বাংলা সাহিত্যে রোম্যান্টিক নাটক লিখেছেন—**মধুসূদন** (কৃষ্ণকুমারী), **দীনবন্ধু**, (নীলাবতী, নবীন তপস্বিনী ও কমলে কামিনী), **জ্যোতিরিন্দ্রনাথ** (অশ্রুমতী), **গিরিশচন্দ্র** (বাসর) **ক্ষীরোদপ্রসাদ** (কিন্নর) এবং রবীন্দ্রনাথ (রাজা ও রানী, চিরকুমার সভা ও বিসর্জন)।

(iii) সাংস্কৃতিক নাটক, প্রতীকী নাটক ও সাংকেতিক নাটক : রূপক Allegory এবং প্রতীকী বা সাংকেতিক (Symbolic)-এ দুই-এর মধ্যে অর্থগত যে পার্থক্য আছে তা সূক্ষ্মভাবে বিবেচনা না করার ফলে নাটকের শ্রেণি বিভাগে মতের বিভিন্নতা দেখা যায়। তাই একটি বিশেষ শ্রেণির নাটককে কোন পর্যায়ভুক্ত বলে চিহ্নিতকরণের পূর্বে শব্দগুলির বিশেষ অর্থ ও এগুলির মধ্যে পারস্পরিক পার্থক্য সম্বন্ধে ধারণা থাকা প্রয়োজন।

রূপক নাটক বা Allegorical drama—সংস্কৃত 'কাব্যচন্দ্রিকা'তে বলা হয়েছে উপমান ও উপমেয়ের মধ্যে অভেদ কল্পনাকরণে রূপক হয়। **ধনঞ্জয়** ও **বিশ্বনাথ** উভয়েই নাট্যকে বলেছেন রূপক নাট্যের পাত্র-পাত্রীর রূপ যেহেতু নট-নটীতে আরোপিত হয়, সেজন্যই নাটককে বলা হয় রূপক। কিন্তু এ ব্যাখ্যা সকল প্রকার নাটকের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। তাই রূপক নাটকের আলোচনায় এ ব্যাখ্যা প্রযুক্ত হয় না।

রূপক (Allegory) সম্বন্ধে যে তথ্য পাওয়া যায় তা হল : (১) Allegory হল এক ধরনের আলঙ্কারিক আখ্যান বা বর্ণনা, যার নিজস্ব একটি অর্থ বিদ্যমান। (২) আখ্যানের পাত্র-পাত্রী বা ঘটনা নিজস্ব অর্থের অন্তরালে একটি দ্বিতীয় অর্থকে নির্দেশ করে। (৩) আখ্যানের বাইরের অর্থটি গৌণ হয়ে অন্তরালস্থিত অর্থকে প্রাধান্য দেয়। (৪) নাটকে একটি কাহিনির দুই অর্থে সমান্তরাল ভাবে প্রবাহিত হয়। (৫) অধিকাংশ রূপক রচনাতেই সমান্তরাল ভাবে প্রবাহিত দুই অর্থের মধ্যে কোনো যোগসূত্র থাকে না।

Aesop's Fables, Everman, মধ্যযুগের morality Play, বেনিয়ানের Pilgrim's Progress, স্পেনসারের Faerie queenc, বাংলা সাহিত্যে জাতকের গল্প, বিদ্যাসাগরের কথামালার গল্প এই ধরনের রূপকের নিদর্শন।

এতক্ষণ যে রূপক বা Allegory-র কথা বলা হল তাতে অন্তর্নিহিত অর্থটি প্রধান এবং প্রধান ও অপ্রধান এই দুই অর্থের মধ্যে কোনো যোগসূত্র নেই। এ ধরনের রূপককে বলা হয় বিশুদ্ধ রূপক বা Pure Allegory।

দ্বিতীয় শ্রেণির রূপকেও দুটি অর্থ সমান্তরাল ভাবে বর্তমান থাকে, কিন্তু অন্তর্নিহিত অর্থটিকে সম্যকভাবে উপলব্ধি করার জন্য বাইরের অর্থের সঙ্গে সংকেতসূত্র যুক্ত করা হয়। এই সংকেত বা কোনো চরিত্র বা বস্তু বা ধ্বনিকে আশ্রয় করে আভাষিত হয়। এই ধরনের দ্বিতীয় শ্রেণির রূপককে বলা হয় মিশ্ররূপক বা Mixed Allegory.

তৃতীয় শ্রেণির রূপকে আখ্যানের দ্বিতীয় অন্তর্নিহিত অর্থটি গভীর, অস্পষ্ট, অনির্দিষ্ট এবং রূপহীন তত্ত্বনির্ভর হওয়ার জন্য সাধারণের পক্ষে দ্বিতীয় অর্থটিকে উপলব্ধি করা শক্ত হয়ে পড়ে। সেক্ষেত্রে প্রচুর সংকেতের প্রয়োজন হয় এবং সংকেতের প্রাচুর্য যেহেতু তা মুখ্য অংশে উপনীত হওয়ায়—এই শ্রেণির রূপককে বলা হয় সংকেত মুখ্য রূপক বা Symbolic Allegory।

(iv) অভিব্যক্তিবাদী নাটক (Expressionistic drama) : বাস্তবধর্মী ও অতিবাস্তবধর্মী সাহিত্যের প্রবল প্রতিক্রিয়া রূপে বিংশ শতাব্দীর প্রথমের দিকে জার্মানিতে অভিব্যক্তিবাদী নাটকের উদ্ভব হয়। প্রথমের দিকে Impressionism নামে একটি মতবাদ ফ্রান্সে বস্তুবাদী দর্শনের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ চিত্র ও সঙ্গীতের ক্ষেত্রে উদ্ভূত হয়েছিল। এটি একটি অতি আত্মকেন্দ্রিক মতবাদ।

বিষণ্ণতা, বিচ্ছেদ, বেদনা, তিক্ততা, যুদ্ধবিরোধী মনোভাব, মনের অভ্যন্তরে আলোকপাত ইত্যাদি উপস্থাপন করার জন্য নাটকে যেমন আকস্মিকতা, উৎকাল্পনিকতা থাকে, তেমনি থাকে উচ্ছ্বাসময় কবিত্ব, শব্দের ও সংলাপের ব্যঞ্জনা ও অসংলগ্নতা, বিশেষ রূপসজ্জা, আলোক ও শব্দ সংকেত, ঘূর্ণায়মান মঞ্চ, খণ্ড দৃশ্য ইত্যাদি। এ নাটক কিছুটা বিদ্রোহাত্মক, ভাবহীন বুদ্ধিনির্ভর এবং চরিত্র টাইপধর্মী।

(v) থিয়েটার অব অ্যাবসার্ড বা কিমেতি নাটক : **Albert Camus** অ্যাবসার্ড নাটকের যে সংজ্ঞা দিয়েছেন তা Existentialist philosophy-র প্রভাবজাত। তিনি এবং **জাঁ পল সার্ত্র** (Jean Paul-Santre) উভয়েই মানুষের বিচ্ছিন্নতাবোধ হতে উপজাত 'nothingness' কেই অ্যাসার্ডবাদের মূল কারণ বলে মনে করেন। তাঁদের মতে মানুষ এক

Scanned with CamScanner

বিচ্ছিন্ন জীব, অর্থহীন ভাবে তারা এই বিশ্বে এসে পড়েছে এবং তাদের গতিও শূন্যতার দিকে। এই শূন্যতাই অ্যাবসার্ড।

অ্যাবসার্ড নাটকে কোনো চরিত্রের বিকাশ নেই—চরিত্র প্রকাশগত কোনো সংলাপ নেই, পঞ্চসন্ধি, আঙ্গিক প্রকরণ বা কাহিনির ক্রম বিবর্তন নেই এবং উপসংহারও পরিণাম বর্জ্জিত। এর সূচনা আকস্মিক এবং গতি উদ্দেশ্যহীন।

(vi) পৌরাণিক নাটক : গ্রিক ট্রাজেডি নাটকের বিষয়বস্তু গ্রিক পুরাণ হতে গৃহীত হলেও সেগুলিকে পৌরাণিক নাটক বলা যায় না, কারণ পৌরাণিক উপাদানকে নাটকের উপযোগী বা যুগের উপযোগী করে নাট্যকারগণ নিজেদের ধর্মীয় ও দার্শনিক মতামতকে প্রতিস্থাপন করেছেন। তাঁদের নাটকে নিয়তির স্বেচ্ছাচারিতা, বিশ্ববিধান, স্বভাবজাত প্রবৃত্তি, লঘুপাপে গুরুদণ্ড ইত্যাদি পৌরাণিক উপাদানে সমৃদ্ধ হলেও তাঁরা মানব মহিমার জয় ঘোষণা করেছেন দেব মহিমার নয়।

নাটক ধর্মমূলক হলেই যে পৌরাণিক হবে—এমন কথাও বলা চলে না। বাইবেলের কাহিনি কেন্দ্রিক নাটক বা বাইবেলের কোনো কাহিনিকে যুগের পটভূমিকায় রেখে রচিত হওয়া নাটক, অথবা খ্রিস্টের জীবন বিষয়ক বা ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ ভিত্তিক কোনো বাস্তব ঘটনার নাটককে ইংরেজি নাট্যধারায় মিস্ট্রি প্লে বা মিরাকেলপ্লে বা মর‍্যালিটিপ্লে নামে অভিহিত করা হয়। ধর্মভিত্তিক হলেও তা পৌরাণিক নয় এবং সেই অর্থে **এলিয়টের** 'Murder in the Cathedral' কেও পৌরাণিক বলা যায় না। আসলে পাশ্চাত্যে কোনো পৌরাণিক নাটক রচিত হয়নি।

পৌরাণিক নাটক হল পুরাণ ও নাটকের সহাবস্থান যেখানে পুরাণের লক্ষণ নাটকের লক্ষণগুলির সমন্বয় ঘটে। এ নাটকে পুরাণ পরিবেশকে তুলে ধরা হয়। এ এক অলৌকিক ক্রিয়া কলাপে পূর্ণ এক অতিপ্রকৃতের জগৎ—যেখানে স্বর্গের দেবদেবীরা মর্ত্য মানুষের ভাগ্যনিয়ন্তা, যেখানে দেবতারা সশরীরে আত্মপ্রকাশ করে বা অবতারে প্রেরণ করে সাধুসজ্জনের পরিত্রাণ ও দুষ্কৃতিকারীদের বিনাশ করেন। যুক্তিবাদীদের কাছে অবিশ্বাস্য, ভক্তিবাদীদের কাছে অতিমানবীয়, রূপকথা সমধর্মী এই জগতের একদিকে যেমন থাকবে ঐশ্বর্যের আড়ম্বর অলৌকিক ক্রিয়াকাণ্ড এবং অতিমানবীয় চরিত্রের প্রকাশ, অন্যদিকে তেমনই থাকবে বাস্তবসম্মত নাটীদ্বন্দ্ব, ঘাত-প্রতিঘাত, নাট্য শ্লেষ ও উৎকণ্ঠা বা Suspense এবং পরিণামে দেবশক্তির কাছে আত্মসমর্পণ জনিত ভক্তিরস। অন্যান্য সঞ্চারী রস থাকতে পারে, তবে ভক্তিই মূল অঙ্গীরস।

পাশ্চাত্যের মতই ভারতীয় সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্রেও কোনো পৌরাণিক নাটক নেই। কালিদাস বা ভবভূতির কোনো নাটকই পৌরাণিক নয়—যদিও তা পুরাণের বিবরভিত্তিক, কিন্তু পৌরাণিক পরিবেশের অভাবহেতু পৌরাণিক পর্যায় নয়। পৌরাণিক নাটক বাঙালির নিজস্ব সম্পদ। একেবারে অল্পবয়সে পৌরাণিক বিষয় নিয়ে নাটক লেখার চেষ্টা করেছেন **রাম নারায়ণ,**

কালীপ্রসন্ন সিংহ, হরচন্দ্র ঘোষ এবং **জ্যোতিরিন্দ্রনাথ**। কিন্তু এগুলি ঠিক পৌরাণিক নাটক হয়নি বলেই এঁদের এই সব নাট্যকীর্তিকে ছদ্মবেশী পৌরাণিক নাটক আখ্যা দেওয়া হয়েছে। দ্বিজেন্দ্রলাল ও মন্মথ রায়-এই নাটকে পৌরাণিক কাহিনিই নয়, চরিত্রও গৃহীত হয়েছে। মধুসূদন, হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র যেমন পুরাণের কাহিনি যুগোচিত রূপ দিয়ে নব্য পুরাণ সৃষ্টি করেছিলেন, তেমনই এঁদের নাটকেও পুরাণ নতুন রূপে প্রতিভাত হওয়ায় তা নব পৌরাণিক নাটক আখ্যা পেয়েছে।

(vii) সামাজিক নাটক : সমাজ ব্যতীত সাহিত্য হয় না, কারণ মানুষ সমাজ নিরপেক্ষ নয়। সামাজিক উপেক্ষা করতে পারে না। পৌরাণিক নাটকে আছে পুরাণের অবাস্তব অলৌকিকতা এবং ভক্তি রসের বন্যা, ঐতিহাসিক নাটকে আছে ইতিহাস বিধৃত ব্যক্তিদের ক্রিয়াকলাপ যা ইতিহাসের ঘেরাটোপকে অস্বীকার করতে পারে না, কাল্পনিক নাটকে কল্পনার লীলাই প্রাধান্য পায়—কোথাও তা বাস্তবানুগ, কোথাও বা উদ্ভট, কোথাও বা উন্মাদ গতি সমন্বিত হয়ে উন্মার্গে বিচরণশীল। যাদের ঘিরে এসব নাটক—তারা কেউই সামাজিক সাধারণ মানুষ নয়। সামাজিক সাধারণ মানুষের যে জীবন, তাদের সুখ দুঃখ, আশা নিরাশা, প্রাপ্তি ব্যর্থতা, সমাজজীবন ও ব্যক্তিজীবনের পারস্পরিক সমস্যা এবং পারিবারিক সমস্যাকে কেন্দ্র করে যে নাটক রচিত হয়, তাকেই সাধারণ ভাবে বলা হয় সামাজিক নাটক।

সামাজিক নাটকের অর্থ সামাজিক মানুষের নাটক নয়, এখানে সমাজ শব্দটির অর্থ ব্যাপক। মানুষের জন্যেই সমাজ এবং সমাজের নিয়ম-কানুন, বিধিনিষেধ কোনো একটি নির্দিষ্ট সময়ে মানুষের কল্যাণের জন্যই রচিত হয়েছিল। যুগের পরিবর্তনে মানুষের জীবনচর্যায় পরিবর্তন এল, কিন্তু সামাজিক বিধিনিয়ম রইল পূর্বের মতই স্থানু হয়ে। ফলে উদ্দেশ্যটা ঘুরে গেল, হল সমাজের জন্যই মানুষ। এ অবস্থায় ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের দ্বন্দ্ব অবশ্যম্ভাবী। কোথাও বা এ দ্বন্দ্ব বাহ্যিক, কোথাও বা মানসিক। এ ধরনের নাটককে বলা হয় পারিবারিক নাটক। এ নাটকের নায়ক, প্রতিনায়ক উভয়েই একই পরিবারের এবং সমস্যা বা দ্বন্দ্বের উৎপত্তি হয় যখন পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে পরিবারের কোনো সদস্য প্রচলিত সামাজিক নিয়মকানুনের বিরোধিতা করে এবং পরিবারের কর্তাকে সে বিষয়ে একটা বোঝা-পড়ার আসতে হয়।

সভ্যতার ক্রমোন্নতির সঙ্গে তাল রেখে সামাজিক মানুষের জীবন সমস্যা ও জীবনের জটিলতা ক্রমাগতই বেড়ে চলেছে। জীবনের পটভূমিকা ক্রম পরিবর্তনীল, অথচ প্রতিষ্ঠানিক নিয়ম-কানুনের অপরিবর্তনশীলতা নানাবিধ সমস্যার সৃষ্টি করেছে। সমস্যার পর সমস্যার পাহাড়, সেইসব সমস্যাকে উপজীব্য করে রচিত হচ্ছে সমস্যাপ্রধান সামাজিক নাটক।

(viii) ঐতিহাসিক নাটক : ইতিহাসের ঘটনাকে কেন্দ্র করে যে নাটক রচিত হয় সাধারণ ভাবে তাকেই আমরা ঐতিহাসিক নাটক আখ্যা দিয়ে থাকি। ইতিহাস অতীত—তা একজায়গায় থেমে গেছে। কিন্তু নাটকের যাত্রা শুরু ইতিহাসের রাখা স্থান থেকে। সৃজনশীল

Scanned with CamScanner

কল্পনাই নাট্যকারের মূলধন। ইতিহাসের অনুর্বর ভূমিকে কল্পনার ঐশ্বর্যে রসসিক্ত করে নাট্যকার সেই যুগ ও সময়, সেই যুগের সমাজ ও সমাজবন্ধ মানুষদের জীবন্ত ও প্রাণময় করে তোলেন। তাই ঐতিহাসিক নাটককে ইতিহাসের ঘটনাশ্রয়ী নাটক হতে হবে। সাধারণ ভাবে ইতিহাস বলতে আমরা একটি বিশেষ যুগের রাজবংশের ক্রিয়াকাণ্ডকেই বুঝে থাকি। **ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়** ইতিহাসের একটি ব্যাপক অর্থ দিয়েছেন। তাঁর মতে ইতিহাস হল অতীতকালের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ধর্মনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের সামগ্রিক পরিচয়। কিন্তু সাহিত্যে ইতিহাসের এই ব্যাপক অর্থ কার্যকরী নয়, সেখানে রাষ্ট্রনৈতিক ইতিবৃত্তই উপাদান রূপে গৃহীত হয়। সেদিক থেকে বিচার করলে ঐতিহাসিক নাটক হল ইতিহাসের ঘটনা ও চরিত্রকে সৃজনশীল শিল্পমহিমায় রসোত্তীর্ণ করার এবং চরিত্র সমূহকে মানবিক গুণে মণ্ডিত করার সাহিত্যকর্ম।

ঐতিহাসিক নাটক রচনায় নাট্যকারের কয়েকটি বিষয়ে স্বাধীনতা থাকে। তিনি ইতিহাসের ঘটনাবলির গ্রহণ ও বর্জন করতে পারেন, প্রয়োজনবোধে কল্পিত কোনো ঘটনা মূলের সঙ্গে যুক্ত করতে পারেন এবং অর্থনৈতিক চরিত্রও প্রয়োজন বোধে সংযুক্ত করতে পারেন। তবে ইতিহাসের সঙ্গে মানবজীবনের সম্পর্কটিকে অবশ্যই সজীব ও অন্তরঙ্গ করে তুলতে হবে। সমালোচক **হাডসনও** সেই কথাই বলেছেন। তাঁর মতে ঐতিহাসিক নাটক হল—''a work should not adhere to the literal truth of history in such a sort as to hinder proper dramatic life, that is the laws of drama are here Paramount to the facts of history.''

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্ববর্তী সময় বাংলা ঐতিহাসিক নাটক রচনার সুবর্ণময় যুগ। এই নাটক রচনার মূল উদ্দেশ্য হল জাতীয় ভাবাবেগ ও দেশপ্রেমকে উদ্দীপ্ত করা। মুসলমান ও রাজপুত সংঘর্ষ, মুসলমান ও ইংরাজ সংঘর্ষ এইসব নাটকের উপজীব্য বিষয়। রোমান্স রসের আধিক্য ও আবেগের প্রাবল্যে ইতিহাসের তথ্য অনেকটাই ম্লান। ঐক্যধারায় উদাসীনতা, ও শিল্প ঔচিত্যবোধকে অগ্রাহ্য করার কারণে নাটকের সার্থকতার পথে অনেক ক্ষেত্রেই বাধা সঞ্চারিত হয়েছে। বাংলা নাট্যধারায় প্রথম ঐতিহাসিক নাটক মধুসূদনের কৃষ্ণকুমারী। এরপরেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন পুরুবিক্রম ও সরোজিনী। গিরিশচন্দ্রের সিরাজউদ্দৌলা, মীরকাশিম ও ছত্রপতি শিবাজী রচনার পরেই বাংলা নাট্য সাহিত্যে ঐতিহাসিক নাটকের সুবর্ণময় যুগ উপস্থিত হয়। দ্বিজেন্দ্রলালের তারাবাই, প্রতাপ সিংহ, দুর্গাদাস, নুরজাহান, মেবার পতন, সাজাহান, চন্দ্রগুপ্ত এবং ক্ষীরোদপ্রসাদের অশোক, প্রতাপাদিত্য ও অলমগীর—এ যুগের শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক নাটক। রবীন্দ্রোত্তর কালে ঐতিহাসিক নাটক রচনা করেছেন শচীন্দ্রনাথ (গৈরিক পতাকা, সিরাজ-উদ্দৌলা ও ধাত্রীপান্না), মন্মথ রায় (অশোক, সাঁওতাল বিদ্রোহ), মহেন্দ্রগুপ্ত (টিপুসুলতান, রণজিৎ সিংহ), নিশিকান্ত বসু রায় (বঙ্গেবর্গী), রমেশ গোস্বামী (কেদার রায়) এবং যোগেশ চৌধুরী (দিগ্বীজয়ী)।

(ix) একাঙ্ক নাটক : আধুনিক যুগে যেমন ছোটো গল্প, তেমনি একাঙ্ক নাটকের চাহিদা। ছোটোগল্প যেমন উপন্যাসের সংক্ষিপ্ত রূপ নয় এক স্বতন্ত্র সৃষ্টি বা শিল্পরূপ, একাঙ্ক নাটকও তেমনি কোনো পঞ্চাঙ্ক নাটকের সংক্ষিপ্ত রূপ নয়, এ এক তীব্র গতিসম্পন্ন, তীক্ষ্ণ, ঋজু ও ইঙ্গিতপূর্ণ, স্বপ্নচরিত্রের ক্ষুদ্র দৃশ্যপট বা শ্রাব্যকাব্য। অবসর বর্জিত ব্যস্ত জীবনের তাই ছোটো গল্পের মতই একাঙ্কের চাহিদা। ছোটো গল্পে যেমন জীবনের সামগ্রিক রূপকে বৃহদায়তন পরিসরকে উপস্থাপন করা যায় না, একাঙ্ক নাটকেও তেমনই জীবনের এক বিশেষ দিক চিহ্নিত হয়ে, জীবন অভিজ্ঞতার খণ্ড রূপের মাধ্যমে জীবন সমগ্রতার ইঙ্গিত দেওয়া হয়, জীবনের রূপ প্রতিবিম্বিত হলেও তা বহু শাখায়িত সামগ্রিক রূপ নয়।

একাঙ্ক নাটক একটি অঙ্কে বা একটি দৃশ্যে সম্পূর্ণ নাটক। ছোটো গল্পের মতই চরিত্রসংখ্যা স্বল্প এবং সংলাপের চরিত্রও তীক্ষ্ণ ও ইঙ্গিতপূর্ণ। এটাই একাঙ্ক নাটকের বাহ্য লক্ষণ। অনেক ক্ষেত্রে একাধিক দৃশ্য থাকতে পারে, তবে দৃশ্যবিভাগকে নাটকের ভাব ও সংহতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হয়।

(x) কাব্যনাট্য : সুপ্রাচীন কালের গ্রিক নাটক হতে ষোড়শ শতাব্দীর ইংল্যান্ডে এলিজাবেথীয়ান যুগ পর্যন্ত সব নাটকই লেখা হয়েছে কবিতায়। কাব্য নাট্য যেন নাটক ও কবিতার যুগলবন্দী। সংলাপের কাব্যিক রূপে হৃদয় সংবেদনার যে উচ্চ সুরতঙ্গ ধ্বনিত হয়, গদ্যভাষায় তা সম্ভব নয় বলেই নাট্যকাররা মনে করতেন। এলিজাবেথীয়ান যুগে মার্লো, শেক্সপিয়ার, ওয়েবস্টার প্রমুখ নাট্যকারেরা যে সব ট্র্যাজেডি লিখেছেন—তা সবই কাব্য ট্রাজেডি। ইয়েটস বা এলিয়ট যে ধরনের কাব্যনাট্য রচনা করেছিলেন তা এই শ্রেণির নাটকের শিল্পিত নিদর্শন এবং শেক্সপিয়র ও মার্লোর verse tragedy সেদিক হতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তবু মার্লোর ডঃ ফস্টারেস আত্মিক যন্ত্রণা, শেক্সপিয়রের হ্যামলেট ও ম্যাকবেথের বা ওয়েবস্টারের ডাচেস অফ মালফি'র হৃদয় বিদারক ট্রাজিক বেদনা, হ্যামলেটের বিশ্ববিখ্যাত স্বগতোক্তি 'to be or not to be' কাব্যিক সংলাপের এক অপূর্ব নিদর্শন রূপেই যুগান্তরেও বন্দিত।

(xi) গণনাট্য ও নবনাট্য : গণনাট্য মানুষের জীবন সংগ্রামের সহচর। সংগ্রামী মানুষের বস্তুতান্ত্রিক জীবনের কাহিনি নিয়ে রচিত নাটকই গণনাট্য। ফ্রান্সের **রম্যাঁ রোঁলার** 'The people's Theater', চিন ও সোভিয়েট রাশিয়ার 'People's Theatre'-এর প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে ১৯৪৩-এ প্রতিষ্ঠিত হয় Indian People's Theatre Association বা I.P.T.A যার বাংলা নাম ভারতীয় গণনাট্য সংঘ। ১৯৩৫-এ গঠিত হয়েছিল ভারতীয় প্রগতি লেখক সংঘ এবং ১৯৪২-এ ফ্যাসি বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ। প্রথমে এটি ছিল ইউরোপের International Association of writers for the Defence of Culture Against Fascism-এর শাখা সংগঠন। পূর্বোক্ত সংঘ ও সাম্প্রতিক গঠিত গণনাট্য সংঘ উদ্দেশ্য সাধনের দিক হতে অভিন্নার্থক।

Scanned with CamScanner

গণানাট্য সংঘ যখন বাংলা দেশে কাজ আরম্ভ করে তখন সমগ্র ভারতে চলছে ব্রিটিশ দমননীতির মারাত্মক রূপ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের রণাঙ্গণে হিটলারের অগ্রগতি, জাপানের সাম্রাজ্যবাদী মনোভাব, দেশের অভ্যন্তরে নৌবিদ্রোহ, সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ, আজাদহিন্দ বাহিনীর মুক্তির দাবী ইত্যাদি আগুন ঝরানো পরিস্থিতির পটভূমিকায় গণনাট্যের শিল্পী ও লেখকরা ছোটো ছোটো নাটিকার ও গণসংগীতের মাধ্যমে জনমন জাগ্রত করা বিষয়ে ব্রতী হয়। প্রথম দিকের বিখ্যাত নাটকগুলি হল **বিপিন বন্দ্যোপাধ্যায়**-এর 'অভিযান', **বিনয় রায়ের** 'ম্যায় বুখা হুঁ স্কোয়ার্ড', **বিজন ভট্টাচার্যের** 'আগুন', ইত্যাদি।

নবনাট্য : শ্রীযুক্ত রমেন লাহিড়ীর মতে নাট্যকার কোনো মতবাদের দাস নন। তাঁর নিজস্ব দার্শনিক মতামত বা মতবাদগত বিশ্বাস থাকতেই পারে। **কিরণ মৈত্র** বললেন যে এক নাটকের সঙ্গে অন্য নাটকের বিষয়বস্তু ভিন্ন গোত্রীয় হতে পারে। বিচার বিশ্লেষণও ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে, চরিত্র সৃষ্টিতে একটি নাটক হবে সম্পূর্ণ একক, আনন্দ পরিবেশন ও অনুভূতি পর্যায়ে তা হবে সর্বজনীন। নবনাট্যের অন্যতম স্রষ্টা **গঙ্গাপদ বসু** বলেছেন—

"সৎ মানুষের নতুন জীবনবোধের এবং নতুন সমাজ ও বলিষ্ঠ জীবন গঠনের মহৎ প্রয়াস যে সুলিখিত নাটকে শিল্প সুষমায় প্রতিফলিত, তাকেই বলতে পারি নবনাট্যের নাটক, এবং এই রকম নাটক নিয়ে মঞ্চে সমাজ সচেতন শিল্পীর সত্য ও বাস্তবের যে অন্বেষা তাকেই বলতে পারি নাট্য আন্দোলন।"

গণ নাট্যের রাজনীতিবাদের দাসত্ব হতে যারা বেরিয়ে এলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন **শম্ভুমিত্র**, যাঁর সম্পর্কে **উৎপল দত্ত** বলেছেন, "আসলে শম্ভু বাবুর সূক্ষ্ম রসবোধ ও প্রয়োগ কৌশলের অভিনবত্ব এমন এক নাটক সৃষ্টি করেছে যা বাংলা রঙ্গমঞ্চের প্রকৃত ঐতিহ্যকে কয়েক ধাপ এগিয়ে দিয়েছে... শম্ভু মিত্র এক প্রচণ্ড ব্যতিক্রম।" শম্ভু বাবুর 'বহুরূপী' 'রক্ত করবী'র অভিনয়ের মধ্য দিয়ে ১৯৫৪ সালে যাত্রা শুরু করেন।

নবনাট্য আন্দোলনের মধ্যে শ্রমিক-মালিক, জমিদার-প্রজা, সবল-দুর্বলের সংগ্রামকে বর্জন করা হল না, তবে তার উত্তরণ ঘটল উদার, গভীর ও গণতন্ত্রসম্মত ভাবে। নাট্যকাব্যের মতে জীবন কোনো রাজনৈতিক মতবাদের স্থির করা পথে চলে না—তা অত্যন্ত ব্যাপক, গভীর ও জটিল।

(xii) গীতিনাট্য ও নৃত্য নাট্য :

গীতিনাট্যকে বলা হয় Opera, "Opera is a musical play in which most of the words are sung". অর্থাৎ এহল নৃত্যগীত সম্পন্ন এক ধরনের নাটক যেখানে মৌখিক সংলাপ প্রায় নিষিদ্ধ। ষোড়শ শতকে ইতালিতে গ্রিক নাটকের কোরাস বা সমবেত সঙ্গীতকে উজ্জীবিত করার জন্য **গিওভান্নি বার্ড** নামে জনৈক ব্যক্তির প্রেরণায় অপেরা গীতাভিনয়ের চালচিত্র রূপায়িত হয়। ১৬৩৭ এ ইতালিতে Opera House তৈরি হয়। ইতালির অপেরার প্রভাব ফ্রান্স ও অস্ট্রিয়াতে ছড়িয়ে পড়ে। Boomsbury's Guide to

Eng. literature-এ ইতালির অপেরা সম্বন্ধে বলেছেন, "Opera, is in the sense drama in which the words and music are of equal importance, began in Italy at the end of the 16th Century. It is integral Part of Renaissance, arising out of the attempt to revive what were thought to be the Performance Practices in Greek Drama."। অপেরার প্রাণভোমরা হল সঙ্গীত, বিষয়বস্তু লঘু রসাত্মক।

নৃত্যনাট্য : 'নৃত্য' শব্দের অর্থ তালমানাদি যুক্ত সবিরাম গাত্র বিক্ষেপ। ইংরেজিতে নৃত্য হল dance। এর আভিধানিক অর্থ হল "to move the body and fect to the music"। শব্দার্থ চিন্তামনিতে নৃত্যকে দু-ভাগে ভাগ করা হয়েছে যথা—পুরুষের নৃত্য 'তাণ্ডব' এবং স্ত্রীনৃত্যকে 'লাস্য' বলা হয়েছে। "পুংনৃত্যং তাণ্ডবং লাস্য মুচ্যতে"।

প্রাচীন ধর্মীয় তথা লোক উৎসব হতে যে নাট্য শিল্পের উদ্ভব হয়, প্রথমের দিকে তা ছিল নৃত্য, গীতের প্রাধান্য হ্রাস পেয়েছে বটে, কিন্তু তা বর্জিত হয়নি। তবে নৃত্যনাট্য বা Dance Drama বলতে আমরা বুঝি যে নৃত্যনাট্যে চরিত্রের বৈশিষ্ট্যগুলি নৃত্যের সাহায্যে অভিব্যক্ত হয়। এখানে চরিত্রের সংলাপ কাব্যাত্মক ও সঙ্গীতধর্মী। নৃত্যনাট্যে চারটি বৈশিষ্ট্য বর্তমান—কাব্য, সঙ্গীত, নৃত্য ও চরিত্র। প্রমথ নাথ বিশী একেই বলেছেন 'নাটকীয় টেকনিকের চতুরনীতি।"

(xiii) শ্রুতি নাটক : নাটক মূলত দৃশ্য কাব্য। শ্রুতিনাটক কিন্তু দৃশ্য নয়, তবু শ্রুতিনাটককে নাটকের একটি বিশেষ শাখার মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। শ্রুতি নাটকের আয়তন আভিধানিক অর্থে ছোটো হওয়া দরকার, যাতে মাইক্রোফনের সামনে বসে দু তিনটি লোক নির্ধারিত দু-তিনটি চরিত্রের সংলাপ অল্প সময়ের মধ্যে শেষ করতে পারে।

শ্রুতি নাটক কিন্তু Reading drama নয়, কারণ Reading drama খানিকটা Dramatic monologue-এর মতো এবং তা একজনেরই পাঠ। শ্রুতিনাটকে নাটক পাঠকেরা শ্রোতাদের সামনে এবং সম্পূর্ণ অভিব্যক্তিটাই বাচিক। কণ্ঠস্বরের নানা ভঙ্গিমায় একটি চরিত্রের ভাব প্রকাশ করা হয়। এর যেটুকু নাটকীয়তা, তা সবই কণ্ঠস্বরের বৈশিষ্ট্য উক্তি প্রত্যুক্তির সীমাবদ্ধতায়।

শুদ্ধ নাটক হতে নাট্য পাঠ আমাদের দেশে যেমন, বিদেশেও তেমনি প্রচলিত ছিল। সেখানকার ট্রাজেডি অনেকটাই পাঠ্যনির্ভর। অভিনেতা **চার্লসলটন** জীবনের শেষ দিকে অভিনয় অপেক্ষা নাট্য পাঠেই বেশি ঝুঁকেছিলেন। বাংলা সিনেমার একদা হিরো সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ও নাট্য পাঠে বিশেষ সিদ্ধ। নাট্যকার ও কবি Dylan Thomas কবিতা, নাটক প্রবন্ধ ইত্যাদি পাঠকদের শোনাতেন। ডিকেন্সও তাঁর উপন্যাস পাঠের জন্য শেষ জীবন পর্যন্ত আমেরিকায় যাতায়াত করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের 'কর্ণ কুন্তি সংবাদ', 'গান্ধারীর আবেদন', 'কচ ও দেবযানী' শ্রুতি নাটিকা রূপে উচ্চপ্রশংসিত হয়েছে—যদিও এগুলি তাঁর নাট্যকাব্য। তিনি নিজেও তাঁর রচনা বৈঠকী

Scanned with CamScanner

আড্ডায় পাঠ করে শোনাতেন, আর কবি কণ্ঠে পাঠ মানেই যেন অভিনয়। প্রতুল গুপ্ত রবীন্দ্রনাথের নাট্যপাঠ সম্পর্কে বহু তথ্য জ্ঞাপন করেছেন।

রেডিয়ো নাটক : রেডিয়োতে যে নাটক অভিনীত হয়, তা শ্রুতি নাটক। তবে সাধারণ শ্রুতি নাটকের সঙ্গে রেডিয়ো নাটকের কিছু পার্থক্য বর্তমান। প্রথমত, রেডিয়ো নাটকের সময়সীমা শ্রুতি নাটক অপেক্ষা অনেক বেশি। দ্বিতীয়ত শ্রুতিনাটকে নাট্যপাঠক শ্রোতার সামনে হাজির থাকেন, কিন্তু রেডিয়ো নাটকে তারা সবাই অদৃশ্য। বেতার নাটকে কণ্ঠস্বরের মডিউলেশন এবং ধ্বনি প্রক্ষেপণ ইত্যাদির দ্বারা শ্রোতাদের মানস জগতের পর্দায় দৃশ্যের এবং চরিত্রের আভাসের প্রতিফলন ঘটায়। তৃতীয়ত শ্রুতি নাটকে প্রয়োগগত কোনো কারুকার্যই কাজে আসে না, কিন্তু রেডিয়ো নাটকে বারংবার রেকর্ড করা, ডাবিং করা এবং শব্দ প্রযোজনার সুযোগ বর্তমান। চতুর্থত রেডিয়ো নাটক পূর্ণ মাপের নাটক বলে ঘটনার বিবর্তন, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার দ্বন্দ্ব, নাট্য উৎকণ্ঠা শ্লেষ, সঙ্গীত ইত্যাদি নাট্য লক্ষণ বজায় থাকে যা শ্রুতিনাটকে একান্তভাবেই অসম্ভব।

পঞ্চমত রবীন্দ্রনাথের বা অন্য যে-কোনো লেখকের মননধর্মী গল্পের উপস্থাপনা বেতার নাটকেও সম্ভব নয়। 'জীবিত মৃত' বা 'পোস্টমাস্টার'-এর মনন শিল্পের শিল্প বাসনাকে কীভাবে রূপায়িত করা সম্ভব?

বীরেন্দ্র ভদ্র যাঁর ধারাবাহিক ভাষ্য প্রায় প্রবাদে পরিণত, এবং পঙ্কজ কুমার সরযুবালা ও সন্তোষ সিংহ প্রমুখেরা বেতার নাটক সম্প্রচারের প্রথম উদ্যোগী হন। বাণীকুমার ও শ্রীধর ভট্টাচার্য বীরেন্দ্র ভদ্রের উদ্যোগকে রূপ দেন। বেতার নাটকের একজন সফল নাট্যকার ছিলেন বিধায়ক ভট্টাচার্য।

(xiv) লোকনাট্য বা Folk Drama :

ইংরেজি 'Folk' শব্দটির বাংলা প্রতিশব্দ 'লোক'। এই 'লোক' শব্দটির একটি নির্দিষ্ট অর্থ আছে। কোনো একটি সুনির্দিষ্ট অঞ্চলে বসবাসকারী কোনো নির্দিষ্ট মানব গোষ্ঠী দীর্ঘকাল ধরে যে জাতিগত প্রাচীন ঐতিহ্যকে বহন করে, এমন মানব গোষ্ঠীকেই বলা হয় লোকগোষ্ঠী। এই লোক সম্প্রদায় যে অঞ্চলে বাস করে, সেখানকার জলবায়ু, প্রাকৃতিক পরিবেশ ইত্যাদি তাদের চিন্তাভাবনার সংস্কার ও বিশ্বাসে, ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানে, ভাষা ও শিল্পকর্মে প্রভাব বিস্তার করে। এটাই হল সে অঞ্চলে গ্রামীণ লোক সংস্কৃতি যা বর্তমানের উন্নততর সভ্যতা ও সংস্কৃতির পাশে ক্ষীণকায়া নদীর মতই প্রবহমান। এই গ্রামীণ লোক সংস্কৃতি বারংবার আঘাত প্রাপ্ত হয়েও তার স্বকীয় বৈশিষ্ট্যটুকু নিয়ে আজও বিরাজিত।

লোকনাট্য এই লোক সংস্কৃতির নাট্যরূপ। ''Folk drama originated in primitive rites of song and dance, especially in Connection with agricultural activities at the various seasons that centered on vegitational deities and goddesses of fertility.'' কৃষি উৎপাদন ও উর্বরতা শক্তির বৃদ্ধি কল্পে গ্রামীণ লোক সমাজের কৃষি

দেবতার সন্তুষ্টি বিধানের জন্য মুখে মুখে রচিত সঙ্গীত যখন নাট্য লক্ষণাক্রান্ত হয়ে নৃত্য ও সঙ্গীতের মাধ্যমে অভিনীত হয়—তাকেই বলে লোক নাট্য। সাঁওতাল গোষ্ঠীভুক্ত আদিম লোক সমাজের রমণীরা যে নৃত্য করে, তার মধ্যে আকাশ হতে বৃষ্টিপড়া এবং বাতাসে আন্দোলিত ধানের শীষের চিত্রণ অভিব্যক্তি পায়। লোকনৃত্যই লোকনাট্যের আদিমতম রূপ। কালক্রমে এই লোকনৃত্যে কোনো একটি বিশেষ ঘটনার অনুবর্তনে সৃষ্টি হয়। একাধিক চরিত্র এবং উক্তি প্রত্যুক্তির মাধ্যমে নাটকীয় লক্ষণ পরিস্ফুট হয়ে ওঠে।

লোকনাট্য কাল পরম্পরাগত কোনো একটি অঞ্চলের অধিবাসীদের বীরত্ব, কীর্তি, চিন্তাভাবনা, বিশ্বাস ও সংস্কার নিয়ে গড়ে উঠলেও উন্নততর সভ্যতার প্রভাব তার উপরে পতিত হওয়া অসম্ভব নয়। তবে সে ক্ষেত্রেও সেখানকার আদিমতম জীবনধারার রূপটি অবিকৃত থেকে যায়। গাজনের নাচে এবং ছৌ নাচে লোক নৃত্যের আদিমরূপটির সন্ধান মেলে।

(xv) "এপিক থিয়েটার বা Non-Aristotelian Theatre" : প্রাচীন গ্রিসের ত্রয়ী ট্রাজেডিকার এবং কমেডি রচয়িতা অ্যারিস্টোফেনিসের রচনার উপর ভিত্তি করে গ্রিক দার্শনিক অ্যারিস্টোটল যে নাট্যতত্ত্ব বিষয়ক প্রধান সূত্রগুলি তাঁর Poetries এবং The Art of Poetry-তে উল্লেখ করেছিলেন, দেশবিদেশের নাট্যশাস্ত্র প্রণেতারা তাকেই নাট্য শাস্ত্রের বেদরূপে গণ্য করেছেন। নাট্যসূত্রে অ্যারিস্টোটল যা যা বলেছিলেন, হুবহু আক্ষরিক অর্থে তার অনুশীলন সর্বক্ষেত্রে হয়নি। এমনকি শেক্সপিয়রও অ্যারিস্টটলের কিছু সূত্রকে অগ্রাহ্য করেছেন। তবে পুরোপুরি অ্যারিস্টোটলের নাট্যসূত্রকে অস্বীকার করার অবস্থায় কোনো নাট্যকারই উপস্থিত হননি।

অ্যারিস্টটলের নাট্যতত্ত্ব বিষয়ক সূত্রাবলির বিরুদ্ধে প্রথম বিদ্রোহ ঘোষণা করেন যিনি, তাঁর নাম **বেরটোল্ট ব্রেখট** (Bertolt Brecht)। জার্মানির এই নাট্যকার বিংশ শতাব্দীর একজন নাট্য তাত্ত্বিক ও নাট্যকার। প্রথম মহাযুদ্ধের অব্যবহিত কাল পরেই তিনি যেসব নাটক লিখেছিলেন তা অধিকাংশই এক্সপ্রেশ্নেনিস্ট আন্দোলনের প্রভাব জাত।

''From the mid 1920's he become interested in applying marxist ideas to plays and performances and developed the Concept of Epic Theatre''. তাঁর নাটক কার্লমার্কস-এর বস্তুবাদী চিন্তা ও দর্শনে উদ্বুদ্ধ। তিনি এপিক থিয়েটারের জনক এবং তাঁর বিচ্ছিন্নতাবাদ (Alienation) তত্ত্ব মূলত মার্কসীয় এবং সে কারণেই Non-Aristotelion। অ্যারিস্টটলের Mimesis বা অনুকরণ তত্ত্বের মূল বক্তব্য হল ট্রাজেডিতে চরিত্রাভিনেতার অভিনয়ে দর্শক অভিনীত চরিত্রের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যায়। চরিত্রের ভাগ্যবিপর্যয়ে দর্শক চিত্তে করুণা ও ভীতি জাগ্রত হয় এবং শেষ পর্যন্ত ভাব মোক্ষণের পথে চিত্তশুদ্ধি ঘটে।

ebook.dascoaching.in

Scanned with CamScanner

❂ ১.৩ চরিত্রাভিনয় ও নকল পরিবেশে শিক্ষানবিশী (অনুকৃতি পাঠ) (Role Play and Simulation) :

সাহিত্য, ইতিহাস বা সামাজিক পাঠ গ্রহণ করবার সময় শ্রেণিকক্ষের বক্তৃতার পরিবর্তে যদি অভিনয় পদ্ধতি গ্রহণ করা যায়, তাহলে শিক্ষার্থীর ধারণাগত উৎকর্ষ ও কর্মদক্ষতার উৎকর্ষ আরও বেশি হতে পারে। বর্তমান বিদ্যালয়ে অভিনয় পদ্ধতি শিখনের একটি বিশেষ মাধ্যম হিসেবে ধরা হচ্ছে। মঞ্চ, মেকআপ, পোশাক, আলো ইত্যাদি ছাড়া বিষয় উপকরণ সাজিয়ে ভাবনা, চরিত্র নির্মাণ, সংলাপ ও উপস্থাপনের মাধ্যমে শ্রেণিকক্ষে চিত্তাকর্ষক শিক্ষালাভ করা সম্ভব হয়ে ওঠে। শ্রেণিকক্ষের প্রেক্ষিতে এই অভিনয় পদ্ধতিকে দুভাগে ভাগ করা যেতে পারে—(ক) **চরিত্রাভিনয় (Role play)** (খ) **নকল পরিবেশে শিক্ষানবিশী (Simulation)**।

❑ ১.৩.১ চরিত্রাভিনয় :

চরিত্রাভিনয় নাটকের ক্ষেত্রে একটি প্রচলিত প্রথা রীতি যা ব্যাপক ভাবে ব্যবহৃত হয়; এর মাধ্যমে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ ও সরলতার সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। কোনো শিক্ষার্থী একটি চরিত্র গঠন করার মাধ্যমে অথবা কোনো শিক্ষার্থীকে একটি চরিত্র প্রদানের মাধ্যমে এটিকে প্রতিষ্ঠিত করা যায়। বিকল্পস্বরূপ চরিত্রগুলির অভিনয় অতিরিক্ত তথ্যবলি, অভিমত, শুভেচ্ছা অথবা কিছু সূত্রাবলির মাধ্যমে কোনো বিশেষ অবস্থায় কীরূপ আচরণ করবে তা বুঝে নিতে হয়, এই কার্যাবলি দেখতে যতই সাধারণ সহজ সরল হোক না কেন এটি একটি খুবই কার্যকরী মাধ্যম—এর দ্বারা শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য ও তাদের বিভিন্ন চরিত্রের মাধ্যমে ভাষাগত ও চলনগত বিষয়ে ধাতস্থ হয়।

এখানে সমাজের কোনো ব্যক্তি বিশেষের চরিত্র ও কার্যাবলিকে পরিস্ফুট করবার জন্য শ্রেণির শিক্ষার্থী বা শিক্ষার্থীরা অভিনয় করতে পারে যেমন—কোনো বিজ্ঞানীর চরিত্র ও কার্যবলি (জগদীশ বোস), মাদার টেরেসার সেবা-ধর্ম, ১৯৪৭ সালের ১৫ই অগাস্ট মধ্যরাতে প্রধানমন্ত্রী নেহরুর জাতির প্রতি ভাষণ, খাদ্য গবেষক সমীনাথনের কর্মপদ্ধতি, জমিদারের অত্যাচার ইত্যাদি স্বল্প অভিনয়ের মাধ্যমে দেখানো হয়। এই অভিনয় হল চরিত্রাভিনয়।

(১) ব্যক্তি বা কোনো বিশেষ শ্রেণির কর্মপদ্ধতি (পরিকল্পনা, কাজের উদ্দেশ্য, দক্ষতা, অত্যাচারের বহিঃপ্রকাশ, জাতিগঠন) ইত্যাদি চরিত্র অভিনয়ের মাধ্যমে প্রকাশ করা যায় এবং তা সহজেই অন্যান্য শিক্ষার্থীর হৃদয়ঙ্গম হয়।

(২) ব্যক্তি চরিত্রের বিভিন্ন দিক অভিনয়ের মাধ্যমে দেখানো যায় (যেমন—সততা, নিয়মানুবর্তিতা, ত্যাগ, অধ্যাবসায়, উদ্দেশ্যের প্রতি নিষ্ঠা)। চরিত্রের অভিনয়ে একজন অভিনেতাকে মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করতে হয়। চরিত্র অভিনয়কে সফল করবার জন্য বা

স্পষ্ট করবার জন্য সহঅভিনেতা, অভিনেত্রী থাকতে পারে। নিম্নে চরিত্রাভিনয় বিষয়টি একটি উদাহরণের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা হল—

❍ হাতুড়ে ডাক্তার

[ডাক্তারবাবু দিবা নিদ্রা দিচ্ছেন। এমন সময় রোগীর আত্মীয় হিসেবে ডাক্তারবাবুর চেম্বারে অনুপের প্রবেশ।]

অ : ডাক্তারবাবু, ডাক্তারবাবু!

ডা. : কে? দিলে তো আমার ঘুমের বারোটা বাজিয়ে।

অ : ডা. বাবু, আমার ছোটো ভাইটা স্কুল থেকে বাড়িতে এসে ছটফট করছে।

ডা. : তা আমি কী করব?

অ : বাঁচান ডাক্তারবাবু।

ডা. : নিয়ে যা—এই তিন রকমের ওষুধ। খাইয়ে দিবি জল দিয়ে। রাত্রেই সেরে যাবে।

অ : [আবার আগমন পরের দিন সকালে] ডাক্তারবাবু ভাইয়ের "পটি" কিছুতেই বন্ধ হচ্ছে না।

ডা. : আরে, ওই ওষুধে সবার সব রোগ সেরে যায়। তোর ভাইকে নিশ্চয় "পেঁচোয়" পেয়েছে।

উপরি উক্ত নাটক অভিনয়ের মাধ্যমে একটি হাতুড়ে ডাক্তারের হৃদয়হীন, অবৈজ্ঞানিক ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন মনের প্রকাশ ঘটছে। রোগীর ভাইয়ের ভূমিকায় অভিনয় করা ছাত্রটি এবং অন্যান্য দর্শক-শিক্ষার্থী সমবেদনাহীন এবং হৃদয়হীন এক ডাক্তারকে অনুভব করবে। এইভাবে অভিনয়ের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীরা শিক্ষণীয় বিষয়ে আরও গভীরে ঢুকে সেটিকে গ্রহণ করবার চেষ্টা করবে। স্পষ্টতই এই অভিনয় একটি চরিত্রাভিনয় (Role Play) এবং চরিত্রটি হচ্ছে হাতুড়ে ডাক্তার। হাতুড়ে ডাক্তার এবং অনুপের ভূমিকায় শিক্ষার্থীরাই অভিনয় করবে।

❖ চরিত্রাভিনয়ের প্রয়োজনীয়তা :

(১) কোনো ব্যক্তি সম্পর্কে বা কোনো বিশেষ সামাজিক শ্রেণি সম্পর্কে শ্রদ্ধার মনোভাব জাগাবার জন্য (বা প্রয়োজনে সচেতনতা সৃষ্টির জন্য) চরিত্র অভিনয় বিশেষ জরুরি অন্তত বিদ্যালয় স্তরে।

(২) ব্যক্তির কর্মদক্ষতা (প্রয়োজনে অক্ষমতা, অসহিষ্ণুতা), ভাষাজ্ঞান ইত্যাদি বোঝাবার জন্য চরিত্র অভিনয়ের প্রয়োজন আছে।

(৩) বিজ্ঞানের প্রতি, সমাজের প্রতি শ্রদ্ধার মনোভাব জাগাবার জন্য কোনো বিশেষ ব্যক্তির ভূমিকায় অভিনয় করে, ব্যক্তির চরিত্র বিশ্লেষণ করে শিক্ষার্থীর আচরণের পরিবর্তন ঘটানো যেতে পারে।

Scanned with CamScanner

(৪) শিক্ষক যখন তাঁর মতো করে শ্রেণিতে উপরোক্ত বিষয়ে আলোচনা করেন তখন শিক্ষার্থীরা আবেগের দিক থেকে বাইরে থেকে যায়। কিন্তু তারাই যখন অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করে আবেগগত দিক থেকে চরিত্রের ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে (চরিত্রের ভিতরে চলে যায়)

❑ ১.৩.২ নকল পরিবেশে শিক্ষানবিশী বা অনুকৃতি পাঠ (Simulation) :

এই অভিনয় শিক্ষার্থীরা দলগতভাবে বাস্তব জীবনের একটি সমস্যামূলক পরিস্থিতির সৃষ্টি করে যার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা ও কোনো কিছুর সমাধান করা সম্ভব হয়। অনুকৃতির পাঠের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থী কোনো সমস্যাকে সহজে চিহ্নিত করতে পারে এবং তার সমাধানে সমর্থ হয়। একটি দল এমন হতে পারে, উদাহরণ হিসেবে বলা যায়—একটি নতুন শহরের সুযোগসুবিধাগুলি একটি নির্দিষ্ট বাজেটের (Budget) মধ্যে কেমন ভাবে বিন্যাস করা যায় সে বিষয়ে বিভিন্ন সংলাপ হতে পারে। অনুকৃতি পাঠের ক্ষেত্রে প্রায়শই শিক্ষার্থীদের কিছু নিয়মাবলি দিয়ে দেওয়া হয়, যেমন—একটি নির্দিষ্ট বিষয়ের জন্য পরিকল্পিত অর্থ সংক্রান্ত কোনো ঘোষণা, প্রতিযোগীতার বিভিন্ন বিভাগ অথবা অন্যান্য নিয়ম।

❑ ১.৩.২.১ চরিত্রাভিনয় ও অনুকৃতি পাঠের পার্থক্য (Diffferenc between role play & simulation) :

(১) **চরিত্রাভিনয়** হল কোনো শিক্ষার্থী বিভিন্ন চরিত্রের চরিত্রায়ণ করে। চরিত্রাভিনয়ের ক্ষেত্রে একটি উদাহরণ এমন হতে পারে—কোনো এক শিক্ষার্থী "একটি বিশাল জমির মালিক" চরিত্রাভিনয়ে তার পাশ্ববর্তী অভিনেতাকে জিজ্ঞেস করতে পারে—কীভাবে একটি নতুন রাস্তা নির্মাণ করা সম্ভব? **সহঅভিনেতা**—আপনার "ডাঙ্গা জমি থেকে এক বিঘে দিলে।

অভিনেতা—"আমার গ্রামের স্বার্থে তা দিতে আমি এখুনি রাজি।..." এই সংলাপের মাধ্যমে চরিত্রাভিনেতা এবং সহঅভিনেতা তাদের অভিনীত চরিত্রের মধ্যে ঢুকে যেতে পারে খুব সহজেই।

চরিত্রাভিনয়ের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের বাস্তব সম্মত ভাষাজ্ঞান শিক্ষণে ব্যবহার করা হয়। শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক বিভিন্ন কার্যাবলি ও আকস্মিক ভয় ত্রাসের বাস্তব দুনিয়া সম্পর্কে শ্রেণিকক্ষের শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে দেবেন। কোন কোন ক্ষেত্রে শিক্ষক নাটকীয় ভাব-ভঙ্গীমা কী হবে এবং অভিনয়ের পূর্ববর্তী কাজকর্মগুলিও বুঝিয়ে দেবেন। কৃত-কর্মের আদানপ্রদান শ্রেণি কক্ষে একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করে। অভিনয় অথবা অনুকরণীয় পাঠটিকে ভিডিয়ো অথবা রেকর্ডিং করা হতে পারে, যার দ্বারা পুঙ্ক্ষানুপুঙ্খ ভালো খারাপ দিক বিচার-বিশ্লেষণ করতে সক্ষম হয়ে ওঠে। যদি কোনো শিক্ষার্থী তার উপযুক্ত দুর্বলতা নির্ণয় করতে পারে, পরবর্তী ক্ষেত্রে তা অভিনয় সাহায্য করবে।

প্রকৃতপক্ষে চরিত্রাভিনয় ও অনুকরণীয়তা একটি বিশেষ পদ্ধতি, যার দ্বারা শিক্ষার্থীর মানসিক গঠন, ভাব-ভঙ্গীমা, ভাষা শিক্ষা, ব্যক্তিত্বের বিকাশ ইত্যাদি গড়ে ওঠে। শিক্ষক শ্রেণিকক্ষের পরিবেশের সাপেক্ষে শিক্ষার্থীদের অনুসরণিয় ভঙ্গিতে কিছু ধারণা দেবেন যা শিক্ষার্থীর বাস্তব জীবনের প্রেক্ষিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে।

● **নকল পরিবেশে শিক্ষানবিশী (নপশি)** : শিক্ষার্থীদের একটি দল কৃত্রিম পরিবেশে কাজের মাধ্যমে অভিনয় করে কোনো বিষয়কে শেখার চেষ্টা করে। যেমন—প্রোজেক্ট কাজে শিক্ষার্থীরা নিজেদের মধ্যে কীভাবে যোগাযোগ রাখবে—অভিনয় করে সবাইকে বুঝিয়ে দিতে পারে:

১ম অভিনেতা : বাইরে যাবার জন্য সঙ্গে কী কী রাখতে হবে?

২য় অভিনেতা : এই তালিকা অনুযায়ী নিজেকে প্রস্তুত রাখবে।

৩য় অভিনেতা : পশ্চিম মেদিনীপুরে খুব গরম। তালিকার খাতা কোথায়?

এইভাবে অভিনয়ের মাধ্যমে প্রোজেক্টের প্রস্তুতি বিষয়ে শিক্ষার্থীরা সব শিখে নিতে পারবে। অভিনয়ের মাধ্যমে শিখছে বলে আরও মনোযোগ ও সচেতনতা নিয়ে শিখবে।

(২) **চরিত্রাভিনয়** – মূল্যবোধ, আচরণ, বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষার্থীরা অভিনয়ের মাধ্যমে শিখতে পারে।

নকল পরিবেশে শিক্ষানবিশি – কোনো করণীয় বিষয় সম্পর্কে জানতে পারে, প্রাথমিক দক্ষতা অর্জন করতে পারে।

চরিত্রাভিনয়ে ও অনুকৃতি পাঠের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর বিভিন্ন আচরণের যে অভিযোজন করে, তা নিম্নরূপ—

- ❖ সৃজনশীল দক্ষতা বৃদ্ধি পায়।
- ❖ বাচনভঙ্গির জড়তা কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হয়।
- ❖ উচ্চারণের স্পষ্টতা পরিলক্ষিত হয়।
- ❖ মানসিকতায় পরিবর্তন ও মনোযোগ বৃদ্ধি পায়।
- ❖ অনুকরণ ক্ষমতার বিকাশ ঘটে।
- ❖ পর্যবেক্ষণ শক্তির বিকাশ ঘটে।
- ❖ ঐক্যবদ্ধতার ভাব সঞ্চারিত হয়।
- ❖ পুঙ্খানুপুঙ্খ ভালো-খারাপ দিকগুলি বিচার-বিশ্লেষণ করতে সক্ষম হয়ে ওঠে।
- ❖ মানসিক সংগঠন দৃঢ় হয়।

Scanned with CamScanner

✪ ১.৪ শিক্ষায় ও সামাজিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে নাটকের ব্যবহার (পথ নাটিকা ও নাট্য রূপায়ণের পঠনপাঠনকালে) {Use of Drama for Educational and Social Channge (Street play, Dramatization of a lesson)} :

সামাজিক পরিবর্তনের জন্য নাটক একটি উৎকৃষ্ট মাধ্যম। থিয়েটারে মঞ্চের নাটকে সামাজিক রীতি, নীতি, সাম্য নিয়ে অনেক সময় পরোক্ষভাবে বার্তা দেওয়া হয়। কিন্তু পথ নাটিকায় আবৃত্তি, গান ও নৃত্যের মাধ্যমে অনেক সরাসরি ও প্রত্যক্ষভাবে সেই বার্তা দেওয়া যায়। পথ নাটকের বিষয়বস্তু ছোটো হলেও চিন্তনের ক্ষেত্রে তার প্রভাব অপরিসীম। পরিবার পরিকল্পনা, মহাজনের অত্যাচার, চাষিকে শোষণ, দুর্নীতি, ভ্রূণহত্যা, HIV/AIDS নিয়ে অনেক সময় পথ নাটক হয়ে থাকে। যারা এই নাটকের কুশীলব, তারা অনেক সময়েই সমাজের নীচু তলার লোক, দরিদ্র এবং দৃশ্যময় মঞ্চে যাঁদের অবাধ প্রবেশ অধিকার নেই। সবাইকে হাসিয়ে কখনও কাঁদিয়ে তারা নাটকের বার্তা জনসাধারণকে দিয়ে থাকে। জনসাধারণ পরিবর্তে খুশী হয়ে তাদের সাধ্যমতো আর্থিক সাহায্য করে, আবার কখনও বা করতে পারে না। নাটকের এই বার্তা যদি তরুণ হৃদয়কে স্পর্শ করতে পারে তা হলে দ্বিগুণ উৎসাহ নিয়ে তরুণরা সামাজিক পরিবর্তনের চেষ্টা করবে।

❑ ১.৪.১ পথনাটিকা (Street Play) :

সফদার হাসমী সাহেব বলেছিলেন— ভারতে **পথ নাটক** বলতে বোঝায় সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী নাটক। পৃথিবীর অন্যত্র এই নাটককে ব্যবহার করা হয়েছে সামাজিক ন্যায় বিচার, সামাজিক ও অর্থনৈতিক আন্দোলনের হাতিয়ার হিসেবে।

আমেরিকার স্বাধীনতার জন্য ইংল্যান্ডের পার্লামেন্টে এডমান্ড বার্ক যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন, সেটাই স্বাধীনতার গতিকে ত্বরান্বিত করেছিল। কার্যত পথ নাটিকা সেই ধরনের গতিসৃষ্টির ক্ষমতা রাখে। পথ নাটিকার একটি সংলাপ থেকে বোঝা যাবে তা কত জ্বালাময়ী। উদাহরণ—

প্রথম ছাত্র : এই দেবেন, তোদের বাড়িতে চোরে সোনা পাইল কেমনে?
দ্বিতীয় ছাত্র (দেবেন) : কেন আমার ছেলেটার বিয়া দিয়া ঘরে সোনা পাইলাম?
প্রথম ছাত্র : তা হলে তুই হলি চোরের সরদার, ছেলের বিয়া দিয়া পন নিস! ছিঃ ছিঃ থু, থু।

কোনো জনপ্রতিনিধির জ্বালাময়ী বক্তৃতা থেকে এর আবেদন কী কোনো অংশে কম? অভিনয়ের জন্য ছাত্রছাত্রীদের বিশেষভাবে সাহায্য করলেও শিক্ষক অযথা হস্তক্ষেপ এড়িয়ে চলবেন। চরিত্র এবং অনুকরণমূলক অভিনয়ে অভিনেতা ছাত্রছাত্রী এবং দর্শক ছাত্রছাত্রীদের কেমন লেগেছে— সেটা অবশ্যই জনা দরকার। অভিনয়টি যাতে প্রয়োজনমতো ছাত্রছাত্রীদের

বিষয়-শিক্ষায় ব্যবহার করা যায় তার জন্য অভিনয়ের ভিডিয়ো চিত্র সংরক্ষণ করা যেতে পারে।

শিক্ষা ও সমাজ-পরিবর্তনে **পথনাটিকা** একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। শিক্ষা ও সমাজের সচেতনতা বৃদ্ধিতে পথনাটিকা বিশেষভাবে সাহায্য করে। অন্যান্য আঙ্গিকের নাটক-এর সাথে পথনাটিকার কয়েকটি বিশেষ পার্থক্য বিদ্যমান।

পথনাটিকা সেই অনন্য বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নরূপ—

- ❖ পথনাটকের জন্য কোনো মঞ্চ নির্মাণের প্রয়োজন হয় না। যে-কোনো খোলা জায়গায় পথনাট্য করা সম্ভব।
- ❖ পথনাটক খরচাসাপেক্ষ নয়।
- ❖ এই নাটকের সাহায্যে তাৎক্ষণিক সংযোগ নির্মাণে সমাজের সমস্যাগুলি সহজেই সর্বসাধারণের সামনে তুলে ধরা যায়।
- ❖ সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধিতে এই নাটক দুর্দান্ত ভূমিকা পালন করে।
- ❖ কোনো পূর্ব প্রস্তুতি ছাড়াই এই নাটক কেবলমাত্র অভিনয় গুণে উপস্থাপন করা সম্ভব।
- ❖ অভিনেতা ও দর্শকের মধ্যে একাত্মতা তৈরি হয়।

❑ ১.৪.২ পাঠ-এককের নাট্য রূপান্তর (Dramatization of Lesson unit) :

ভূমিকা : যে-কোনো বিষয়ই নাট্য-রূপান্তরের বস্তু। সাধারণত সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়গুলি এই বিষয়বস্তুতে প্রাধান্য পায়। বিভিন্ন সামাজিক অবক্ষয়, কিংবা রাজনৈতিক শাসন অথবা কোনো কোনো ক্ষেত্রে পারিবারিক ও সাংসারিক টানাপোড়েনকে কেন্দ্র করে যে সকল পাঠ একক থাকে সেই বিষয়গুলিকেই নাট্য রূপান্তর করা হয়। শ্রেণি শিক্ষকই শ্রেষ্ঠ বিচারক, তিনি কোনো বিষয়কে নাটকে রূপান্তরের মাধ্যমে শিখনে শিল্পীদের উৎসাহিত করবেন। পাঠ এককে নাট্য রূপান্তরের জন্য যে বিষয়গুলিকে অতি গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন, সেগুলি নিম্নরূপ—

(i) বিষয় নির্বাচন
(ii) চরিত্র নির্মাণ
(iii) নাটকের দৃশ্য নির্মাণ
(iv) সংলাপ
(v) নির্দেশনা

(i) **বিষয় নির্বাচন :** বার্তা বা সন্দেশবহ কোনো প্রাসঙ্গিক বিষয়কে নাটকের উপাদান হিসেবে গ্রহণ করা।

Scanned with CamScanner

(ii) **চরিত্র নির্মাণ** : নাটকের প্রাণবিন্দু হল চরিত্র, চরিত্রই নাটকের চালিকাশক্তি। তাই জীবন্ত ও প্রাণবন্ত করে বিষয়ানুগ ভাবে চরিত্র নির্মাণ অনন্য নাটক সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ উপাদান।

(iii) **দৃশ্য নির্মাণ** : গল্পের বিন্যাস অনুযায়ী দৃশ্য নির্মাণ করতে হবে। সময়ানুযায়ী নাটকের দৃশ্য পরিবর্তন করা, দৃশ্যের ভাগ করা, ইত্যাদি এর অংশ।

(iv) **সংলাপ** : সাহিত্য শাখার মধ্যে একমাত্র নাটকই হল সংলাপ-নির্ভর রচনা। কিন্তু সাধারণ সংলাপের সঙ্গে নাটকীয় সংলাপের পার্থক্য আছে। চরিত্র-সৃষ্টি নাটকের প্রধান লক্ষ্য। চরিত্রের ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে নাট্যদ্বন্দ্ব পরিণামমুখী হয়। সংলাপের সাহায্যেই নাটকের চরিত্রগুলি সজীব ও সক্রিয় হয়ে ওঠে। সেকারণে নাট্যসংলাপকে হতে হয় চরিত্রানুগ। চরিত্রের উপযোগী মুখের ভাষা চরিত্রকে প্রাণবন্ত করে তোলে। দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটকের তোরাপ এবং রাইয়তদের চরিত্র জীবন্ত হয়ে উঠেছে স্বাভাবিক সংলাপের গুণে। আবার এই নাটকেই কৃত্রিম সংলাপের দোষে নবীনমাধব, বিন্দুমাধবের মতো শিক্ষিত চরিত্রগুলি সজীব হয়ে উঠতে পারেনি।

নাট্য-সংলাপের আর একটি বৈশিষ্ট্য হল—অবস্থা বা situation-এর উপযোগী করে তা রচনা করতে হয়। নাটকের সংলাপ কখনও আবেগের স্পর্শে, কখনও বেদনায় বিষণ্ণ, কখনও বা প্রাণাবেগে চঞ্চল। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় তাঁর নাটকের সংলাপে এই রীতিকে ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করেছেন। নাটকীয় ঘটনার ধারা নাটকে নাট্যকৌতূহল (suspense) সৃষ্টি করে এক সময় চরম অবস্থা (climax) প্রাপ্ত হয়। নাট্য-সংলাপের মধ্যে ঘটনাধারার মুহূর্তগুলির প্রতিভাত হওয়া প্রয়োজন।

এক্ষেত্রে সংলাপ হবে বিষয়ানুগ, চরিত্রানুগ নয়। দু'জন ব্যক্তির কথোপকথনের মধ্যে বিষয়টিকে পরিস্ফুট করাই এর উদ্দেশ্য। তবে চরিত্রের কথাও অবশ্য স্মরণ রাখতে হবে। যেমন—দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি নিয়ে ক্রেতা ও মজুতদারের সংলাপ যে রকম হবে, দু'জন শিক্ষিত প্রৌঢ় ব্যক্তির তেমন হবে না, আবার একই বিষয় নিয়ে দু'জন ছাত্রের সংলাপ হবে অন্যরকম। বিষয় প্রধান হলেও সংলাপকে চরিত্রানুগ করে তুলতে পারলে তা আরও আকর্ষণীয় হবে।

স্মরণ রাখতে হবে সংলাপ যেন বক্তৃতাধর্মী হয়ে না পড়ে। দীর্ঘভাষণ সংলাপের পক্ষে অনভিপ্রেত। সংলাপের মধ্যে যাতে একঘেয়েমি সৃষ্টি না হয় সে বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বনের প্রয়োজন।

(v) **নির্দেশনা** : নাটকের মূল কাঠামোকে বিষয়াস্তরে নিয়ে যেতে ও ক্রিয়াকে গতিশীল ও পরিণামমুখী করবার জন্য যিনি অদ্বিতীয় ভূমিকা নেবেন তিনি হলেন নির্দেশক। তাঁর যোগ্য পরিচালনায় নাটকের ভাব-ভঙ্গিমা প্রকাশিত হবে। তিনি অবিকল্প ধারণার মাধ্যমে দর্শকের সামনে নাটকের পুঙ্খানুপুঙ্খ দিক উন্মোচিত করবেন।

❑ ১.৪.৩ অভিনয়ের মাধ্যমে শিক্ষা (Dramatised Experience) :

শিক্ষণীয় বিষয়কে শিক্ষক আবৃত্তি, শিক্ষণ সহায়ক উপকরণ যেভাবেই উপস্থাপিত করুন না কেন, ছাত্রছাত্রীরা সেটা আবেগ মথিত হৃদয়ে গ্রহণ করবে না। আর যদি তা না করে তবে শিক্ষাকে বাস্তবের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে পারবে না। কিন্তু নাটকের মাধ্যমে বিষয়বস্তুকে শিক্ষার্থীরা অভিনয় করে দেখায় এবং সেজন্য সবাই সহমর্মীতার (Empathy) মাধ্যমে বিষয়টিকে গ্রহণ করে। অনেক সময় প্রত্যক্ষ মূর্ত অভিজ্ঞতা দেওয়া বিপজ্জনক। তার পরিবর্তে নাটকের মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া যায়। শক্তিশালী বোম ফাটলে কী ক্ষয়ক্ষতি হয় তা বোম ফাটিয়ে দেখানো যায় না। অভিনয়ের মাধ্যমে তা দেখানো যেতে পারে। **এডগার ডেল** তাই নাটকলব্ধ জ্ঞান (Dramatised Experience)-কে খুব উঁচুতে স্থান দিয়েছেন।

একটি উদাহরণ : শিক্ষণ অনুশীলনের সময় প্রশিক্ষণার্থীদের অষ্টম শ্রেণিতে বাংলায় **লুই পাস্তুরের** উপর একটি পাঠ দিতে হত (সময়কাল ১৯৮২ সাল)। একটি শ্রেণিতে একজন শিক্ষক একটি বাচ্চা কুকুর ধরে এনেছেন এবং শিক্ষকের টেবিলের গায়ে বেঁধে রেখেছেন। তাঁর উদ্দেশ্য হল—কুকুরটিকে ছেড়ে দিয়ে দেখাবেন, কুকুর কীভাবে কামড়ায় এবং তার ভিত্তিতেই **লুই পাস্তুরের** উপর পাঠটি ঘোষণা করবেন। পথের কুকুর দেখে শিক্ষার্থীরা ভয়ে অজ্ঞান। এই পদ্ধতিতে প্রত্যক্ষ মূর্ত অভিজ্ঞতা লাভ সম্ভব হলেও তা পরিত্যাজ্য।

অন্য বিদ্যালয়ে একই বিষয়ে শিক্ষণের জন্য তিনজন ছাত্রকে বেছে নেওয়া হয়েছে। একজন বাচ্চা কুকুর সেজেছে, একজন আহত বিদ্যালয় শিক্ষার্থী সেজেছে। আর একটি বড়োমতো ছেলে সেজেছে **লুই পাস্তুর**। এই শ্রেণিতে অত্যন্ত আনন্দের সাথে শিক্ষার্থীরা পাঠগ্রহণ করেছে। অভিনয়ের মাধ্যমে বা অভিনয় দর্শনে সবাই বিষয়ের গভীরে যেতে পেরেছিল। এখানে শিক্ষক তাঁর পরিকল্পনা অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের সামান্য সাহায্য করেছিলেন মাত্র। অভিনয়ের মাধ্যমে শিক্ষার তিন রকম ধরন আছে—

(১) **ব্যাখ্যাধর্মী** (Exploratory) : কোনো ঘটনার ব্যাখ্যা, "কীভাবে" "কেন" ইত্যাদি বোঝাতে ব্যাখ্যাধর্মী নাটকের অবতারণা করা হয়। শিক্ষার্থীরা এর ফলে নতুন অভিজ্ঞতা অর্জন করে।

(২) **উদাহরণধর্মী** (Illustrative) : কোনো সম্পর্ক বোঝাতে, কোনো বিশেষ অর্থ (meaning) বোঝাতে এই নাটক ব্যবহার করা হয়। এখানে অভিনেতার বাচনভঙ্গি, কণ্ঠস্বর, আবেগ, অঙ্গসঞ্চালন থেকে অনেক কিছু বুঝে নেওয়া যায়।

(৩) **ভাবের আদানপ্রদানধর্মী** (Expressive) : এই ধরনের নাটকের মাধ্যমে সামাজিক ভাবের আদানপ্রদান সম্ভব। (যেমন- "দ্বীপের মানুষের দুঃখ কষ্ট", "বসন্তের কোকিল")

Scanned with CamScanner

❑ ১.৪.৪ নাটক অভিনয়ের উদ্দেশ্য :

- অভিনয় করা বা দেখার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর চিন্তা-ভাবনা ও অভিজ্ঞতার দিগন্ত প্রসারিত হয়।
- অভিনয় শিক্ষার্থীদের মধ্যে সহযোগিতার মনোভাব বৃদ্ধি করে।
- শ্রেণি এবং শ্রেণির বাইরে কোনো সামাজিক বিষয়ে বিতর্কিত মতামতগুলি শিক্ষার্থীরা জানতে পারে।
- নাটক অভিনয়ের মাধ্যমে শিশুর ভাষার বিকাশ ঘটে।
- শিক্ষার্থীরা কোনো ঘটনাকে নাটকে রূপান্তরিত করতে শিখবে (লিখিতভাবে বা মুখে মুখে)
- নাটকের মাধ্যমে নিজের এবং অপরের কার্যাবলির বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন করতে পারবে।
- যে কথা সরাসরি কেউ কাউকে বলতে পারে না, কিন্তু বলা উচিত, সেক্ষেত্রে নাটকের মাধ্যমে কথাগুলি অনায়াসে বলা যায়।
- শিক্ষার্থীদের সামাজিকীকরণের একটি উল্লেখযোগ্য উপায় হল নাটক।
- শ্রুতি নাটক— সংখ্যায় অনেক বেশি বার অনুষ্ঠিত করা যায়। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীর ভাষাশৈলী বৃদ্ধি পায়।

❍ ১.৫ শ্রেণিকক্ষে নাটকের প্রকরণের ব্যবহার : সংলাপ ও কণ্ঠস্বর, মূকাভিনয় ও চলন, ইম্প্রোভাইজেশন, পর্যবেক্ষণ দক্ষতা, অনুকরণ ও উপস্থাপন (Use of Drama Techniques in the Classroom : Voice and Speech, Mime and Movements, Improvisation, Skills of Observation, limitation and presentation) :

ভূমিকা : অভিনয়ের দুটি দিক। একটি দিক একক, আর একটি দিক হল দলগত। অভিনেতাকে স্বরবৈচিত্র্য ও ভাবপ্রকাশক অঙ্গভঙ্গির দ্বারা তাঁর বক্তব্য দর্শকদের সম্মুখে উপস্থাপিত করতে হবে। কিন্তু তাই যথেষ্ট নয়। তাকে পার্শ্ববর্তী অভিনেতার হৃদয়ে ভাব উদ্রেক করতে হবে এবং তাকে নিজের সঙ্গে এক সুরে বাঁধতে হবে। আবার পার্শ্ববর্তী অভিনেতার কথা শুনে তাকে যথাযোগ্য প্রতিক্রিয়া দেখাতে হবে। তাকে নিজের অভিনয়ের মধ্যে তন্ময় হয়ে যেতে হবে, আবার পাশ্ববর্তী অভিনেতা ও দর্শকদের সম্বন্ধে সদা-সচেতন থাকতে হবে। এই এককত্ব ও দলীয়তা, তন্ময়তা ও সচেতনতা নিয়েই হল অভিনয়। তাকে আবেগ দিতে হবে আবার অতি-আবেগ সংযত করতে হবে। হাত, চোখ ও ভ্রূদ্বয়ের সঞ্চালনের মধ্য দিয়ে বিশেষ বিশেষ ভাব প্রকাশ করতে হবে, আবার সেই সঞ্চালন যদি মাত্রাতিরিক্ত হয়ে পড়ে তবে তা কৃত্রিম ও হাস্যকর হয়ে পড়বে। কণ্ঠস্বর প্রয়োজনবোধে চড়া করতে হবে

কিন্তু এমন চড়া করলে চলবে না যাতে কণ্ঠস্বর বিভক্ত ও বিকৃত হয়ে পড়ে, আবার তাকে করুণ ও গম্ভীর করবার জন্য খাদে নামাতে হবে, কিন্তু এমন স্তরে নামালে চলবে না যাতে দর্শকদের শ্রুতির অগম্য হয়ে পড়ে।

নাটকে গতিবেগ আনবার জন্য দ্রুত উচ্চারণ ও অঙ্গ-সঞ্চালন হয়তো প্রয়োজন হয়, কিন্তু এমন দ্রুত উচ্চারণ হবে না যাতে শব্দগুলি অস্পষ্ট ও জড়িত ধ্বনিসমষ্টিতে পরিণত হয়, এবং এমনি ত্বরিত অঙ্গ-সঞ্চালনও হবে না যাতে তা অবোধ্য ও অর্থহীন হয়ে পড়ে। এই সুপরিপাটি সংযম ও সুনিয়ন্ত্রিত সামঞ্জস্যই হল অভিনয়ের মূল কথা। অভিনয়ে আত্মময়তা ও সর্বময়তার কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। এই দুয়ের সামঞ্জস্যেই অভিনয়ের সার্থকতা, তবে কোনো কোনো অভিনয়ের মধ্যে এই দুটির মধ্যে বিশেষ একটি প্রাধান্য লাভ করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে রোমান্টিক অভিনয়ে অভিনেতার আত্মময়তাই প্রাধান্য পায়, সেখানে উক্তিগুলি অনেকস্থলেই দীর্ঘ ও কবিত্বপূর্ণ, কোনো কোনো স্থলে আবার অভিনেতা একাই রঙ্গমঞ্চে অবস্থিত আর কোনো সহঅভিনেতাই তার পাশে নেই। এ-সব স্থলে অভিনেতার নিজস্ব ভাবের আবেগময় অভিব্যক্তিই প্রধান। কিন্তু বাস্তবধর্মী অভিনয়ে অভিনেতার নিজস্ব বক্তব্য অপেক্ষা দলগত বক্তব্যই বড়ো। এখানে অভিনয়ের রস ব্যক্তিকে আশ্রয় না করে সমষ্টিকেই আশ্রয় করে থাকে।

অর্থাৎ অভিনেতাকে কঠোর অনুশীলনের মাধ্যমে অভিনয় শিখতে হয়। এই অভিনয় প্রকরণের মুখ্য বিষয়গুলি হল—অভিনেতার কণ্ঠস্বর, মূকাভিনয়, সংলাপ প্রক্ষেপণ, সহ-অভিনেতা ও দৃশ্যাবলির প্রতি পর্যবেক্ষণ, তাৎক্ষণিক অভিনয়, অনুকরণ ইত্যাদি।

❑ ১.৫.১ সংলাপ ও কণ্ঠস্বর (Voice and Speech) :

শ্রেণিকক্ষে সংলাপ প্রক্ষেপন কেমন হওয়া উচিত সে সম্বন্ধে বলার পূর্বে আমরা মঞ্চে কেমন করে এর প্রয়োগ হয় সে বিষয়ে দৃষ্টি নিক্ষেপ করব।

গ্রিক অভিনয়ে অভিনেতারা হাজার হাজার লোকের সামনে অভিনয় করতেন, সেজন্য তাঁরা বুকে স্ফীত পোশাক ও কাষ্ঠ-পাদুকা ব্যবহার করতেন। দূরবর্তী দর্শকদের শ্রুতিগোচর করবার জন্যই তাঁদের অভিনয়কে তাঁরা সু-উচ্চ ও আবৃত্তিময় করে তুলতেন। গ্রিক অভিনয়ের মতই আমাদের যাত্রার অভিনয়ও বহু লোকের সামনে উন্মুক্ত স্থানে অনুষ্ঠিত হত। সেজন্য এই অভিনয়কেও সঙ্গীতের উপর নির্ভরশীল এবং সুরময় হতে হত। দর্শকরা বহু দূরে বিস্তৃত হয়ে থাকত, সেজন্য তাদের সকলের কাছে চরিত্রের ভাব ফুটিয়ে তোলবার জন্য অভিনেতাকে চড়া সুরে অভিনয় করতে হত এবং অঙ্গ-সঞ্চালনও একটু অতিশয়িত পরিমাণে করা প্রয়োজন হত। যাত্রায় যখন বীররস ফুটিয়ে তোলার দরকার হত তখন কণ্ঠস্বরকে গগনবিদারী এবং চোখের ঘূর্ণন ও হাতের সঞ্চালন খুব প্রবলভাবে করতে হত। আবার যখন কান্নার দৃশ্য থাকত তখন বিলাপ ও কারুণ্যও আর থামতে চাইত না। এই ধরনের বীরত্ব ও

Scanned with CamScanner

কান্না বন্ধ ও সংকীর্ণ প্রেক্ষাগৃহে বেমানান ও হাস্যকর মনে হতে পারে, কিন্তু উন্মুক্ত ও অতি-বিস্তৃত স্থানে কখনও সে রকম মনে হবে না। বন্ধ প্রেক্ষাগৃহে যখন অভিনয় আরম্ভ হল তখন কৃত্রিম আলো, দৃশ্য ও শব্দ অভিনয়ের সহযোগিতা করতে এল এবং দর্শকদের সঙ্গে অভিনেতাদের দূরত্বও অনেক কমে গেল। সেজন্য অভিনয়কে অনেকখানি সংযত ও স্বাভাবিক হতে হল। কিন্তু মঞ্চাভিনয় আতিশয্যমুক্ত হলেও একেবারে সাধারণ কথাবার্তার স্তরে নামতে পারল না। তার কারণ, প্রথমত, কোনো শিল্পই একেবারে স্বভাবের অবিকল অনুকৃতি হতে পারে না। দ্বিতীয়ত, মঞ্চাভিনয়ের মধ্যেও দর্শকদের সঙ্গে বিশেষত পিছনের দর্শকদের সঙ্গে অভিনেতার বেশ খানিকটা দূরত্ব বজায় রইল। সেজন্য দূরবর্তী দর্শকদের কাছে অভিনয়ের ভাবটি ফুটিয়ে তোলবার জন্য অভিনেতাকে কণ্ঠস্বর লীলায়িত করে এবং শরীরের বিভিন্ন স্থানের চর্ম ও মাংসপেশীর কুঞ্চন ও প্রসারণের মধ্য দিয়ে আবেগকে স্পষ্ট ও প্রবল করে তুলতে হল। এই বর্ধন ও সম্প্রসারণের ফলে কণ্ঠস্বরের সামান্য উচ্চতা এবং মুখের স্বল্প পরিমিত ভাবাভিব্যক্তি ও কৃত্রিম অতিশয্যদুষ্ট হতে পারে।

শ্রেণিকক্ষে পাঠক শিখনে শিক্ষক তাঁর কণ্ঠ সম্বন্ধে ভাবভিবক্তি ও শব্দ উচ্চারণের সুষ্ঠতায় শিক্ষার্থীদের সংলাপ প্রক্ষেপণ শেখাবেন। কারণ অভিনয়ের তাৎক্ষণিক কার্যকারিতার দিকে খেয়াল রেখে পরিষ্কার সংলাপ উচ্চারণ ও সংলাপকে তার গতিময়তা ও ছন্দমাধুর্যের শৈলীতে প্রকাশ করলে পাঠকের মাধ্যমে যথোপযুক্ত শিক্ষালাভ সম্ভব হবে। কীভাবে নিয়ন্ত্রিত শব্দ প্রক্ষেপণ করা উচিত এবং দৃশ্যাবলির সাপেক্ষে তার গতিময়তা কেমন হওয়া উচিত, সেই সম্বন্ধে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের জ্ঞাত করবেন। সংলাপ উচ্চারণে নিম্নলিখিত বিষয়ে খেয়াল রাখবেন।

- ❖ সংলাপ মুখস্থ করা
- ❖ সংলাপের ভাবব্যঞ্জনা বুঝে উচ্চারণ করা
- ❖ সংলাপের গতিশীলতা
- ❖ চড়া সুর ও নমনীয় সুরের মান্যতা দান
- ❖ উচ্চারণে সঙ্গে সঙ্গে যথোপযুক্ত স্থানে বিরতি
- ❖ রসসৃষ্টি প্রেক্ষাপটে কণ্ঠস্বরের স্বাভাবকিতা
- ❖ সজীব ও প্রাণবন্ত উচ্চারণ
- ❖ উচ্চারণে সাবলীলতা ইত্যাদি।

ebook.dascoaching.in

❑ ১.৫.২ মূকাভিনয় ও চলাফেরা (Mime and Movements) :

মূকাভিনয় ও নির্বাক চিত্রাভিনয় শুধুমাত্র দৃশ্য বলে, কেবল আঙ্গিক অভিনয়ের মধ্য দিয়ে সব ভাব প্রকাশ করতে হয়। সেজন্য অঙ্গসঞ্চালন এখানে স্পষ্ট ও একটু প্রবল হওয়া

দরকার। দর্শকদেরও একটু সচেতন ও মনোযোগী থাকা প্রয়োজন, যাতে করে শুধুমাত্র আঙ্গিক অভিনয় থেকেই তারা সমগ্র ভাবটি বুঝে নিতে পারে। আবার বেতার-অভিনয়ও শুধুমাত্র শ্রাব্য বলে সেই অভিনয় থেকে রস গ্রহণ করতে গেলে শ্রোতাদের পরিবেশ-চিত্র এবং চরিত্রের রূপ এঁকে তুলতে হবে। মূকাভিনয় এক ধরনের সংলাপবিহীন অভিনয়। গুরুত্বের নিরিখে কখনও কখনও নাটকে এই অভিনয়ের প্রয়োজন পরে। বর্তমানে মূকাভিনয় অভিনয়ের এক নবতম শিল্পমাধ্যম। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়—গ্রামের আটপৌঢ়ের বউয়ের তুলনায় শহুরে আধুনিক বউয়ের হাঁটাচলা ও অঙ্গভঙ্গি অনেক স্মার্ট ও কেতাদস্তুর হয়।

মূকাভিনয়ের ক্ষেত্রে চলাফেরার ধরনও একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। অন্যান্য অভিনয় অপেক্ষা মূকাভিনয় অভিনেতার অঙ্গভঙ্গি ও চলাফেরা অপেক্ষাকৃত ধীরস্থির ও শান্তপূর্ণ হয়। তাৎক্ষণিক সঞ্চালনও পরিমিত ভাবে করতে হয়। এই মূকাভিনয়ের ক্ষেত্রে কিছু চলাফেরার সাংকেতিক ভঙ্গিমা আছে। যেমন—

(১) পায়ের পাতা পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন রাখলে সেটি অহংকারের প্রকাশ হিসেবে বিবেচিত হয়। (২) গোড়ালি সংযুক্ত থাকলে সেটি সম্ভ্রমের প্রদর্শন হিসেবে চিহ্নিত হয়।

❑ ১.৫.৩ ইম্প্রোভাইজেশন (Improvisation) :

তাৎক্ষণিক কোনো বিষয়কে কেবলমাত্র সংলাপের মাধ্যমে কাহিনি, নির্দেশক, দৃশ্যসজ্জা, সংগীত ছাড়াই যা অভিনীত হয় তাকে ইম্প্রোভাইজেশন বা তাৎক্ষণিক কল্পনা শক্তির সাহায্যে অভিনয় বলা হয়। এই ক্ষেত্রে সংলাপ নির্বাচনে ও ভাবভঙ্গিমায় কোনো রূপ নিয়মশৃঙ্খলায় আবদ্ধ থাকে না। কোনো প্রস্তুতি ছাড়া কেবলমাত্র ভাবনাটিকে মাথায় রেখে অভিনেতা অঙ্গভঙ্গি, বাচনভঙ্গি ও অভিব্যক্তি প্রকাশ করে। ইম্প্রোভাইজেশনাল থিয়েটারকে সাধারণত ইমপ্রোভ (Improv) বা ইম্প্রো (Impro) বলা হয়। কোনো কিছু কাহিনি ও প্রস্তুতি ছাড়া নিখুঁত তাত্ত্বিক ভাবে এই ইম্প্রো উপস্থাপিত করতে হয়। শ্রেণিকক্ষে অভিনয়ের সময় শিক্ষার্থীদের তাৎক্ষণিক উপস্থাপনে নীচে কয়েকটি ইম্প্রোর উদাহরণ দেওয়া হল—

ইম্প্রো-১

শিক্ষার্থীদের কাছে একটি ঘটনার পর্যায়ক্রম দেওয়া হল। মূল ভাব দেওয়া হল—মিলন মেলা

সূত্র : বই মেলায় বই কিনছে। বিভিন্ন মানুষজন নিজস্ব কাজকর্ম নিয়ে ব্যস্ত। বই কেনাবেচা বাদেও কেউ মেলায় গান করছে, কেউ খাওয়া-দাওয়া করছে কিংবা পরিচিতদের সঙ্গে গল্প-আড্ডায় মত্ত, কেউ হকারি করছে, গিটার হাতে দলবদ্ধভাবে গান করছে।

এরপর ইচ্ছেমতো সংলাপ নির্মাণ করে মূল ভাবটিকে তাৎক্ষণিকভাবে ফুটিয়ে তুলতে হবে।

Scanned with CamScanner

ইম্প্রো-২

শিক্ষার্থীদের সামনে একটি মোবাইল দেওয়া হল। মোবাইলটি একটি টেবিলে রাখা হল, তার পিছনে একটি চেয়ার দেওয়া হল সঙ্গে একটি সংলাপ দেওয়া হল এবং মোবাইল ফোনটি নিয়ে একটি অ্যাকশন দৃশ্য করা হবে।

(১) অ্যাকশন—মোবাইল ফোনটি কানের কাছে নিয়ে
(২) সংলাপ—কী বলছো কিছু শুনতে পারছি না। ঠিক করে বল
(৩) অ্যাকশন—হাঁটাচলা করতে করতে অস্থিরতার ভঙ্গি
(৪) সংলাপ—এবার শোনা যাচ্ছে।

উপরিউক্ত পর্যায়ক্রমটি আর একজন শিক্ষার্থী উপস্থাপন করল।

(১) অ্যাকশন—মোবাইল ফোনটি হাতে নিয়ে কী বোর্ডে টাইপ করতে লাগল
(২) সংলাপ—আমি একটি টেক্সট ম্যাসেজ পাঠাচ্ছি।
(৩) অ্যাকশন—চেয়ারে বসে
(৪) সংলাপ—মোবাইলের ব্যবহার সম্বন্ধে যা পাঠালি তা জানতে পারলাম।

❑ ১.৫.৪ পর্যবেক্ষণের দক্ষতা (Skills of Observation) :

নাটক করতে গেলে বিশেষভাবে প্রয়োজন পর্যবেক্ষণ দক্ষতা। সঠিক পর্যবেক্ষণ ছাড়া কোনো চরিত্রই বাস্তবিক ভাবে ফুটিয়ে তোলা যায় না। এই দক্ষতার মাধ্যমে চরিত্রগুলির পৃথকীকরণ করা সম্ভব হয়। প্রতিনিয়ত ও গভীর মনোযোগ দান একজন অভিনেতাকে সৎ ও নিষ্ঠাবান অভিনেতা হতে শেখাবে। সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের জীবনযাত্রা, তাদের কথাবার্তা, চালচলন, ভাবভঙ্গি ও গতিবিধি মনোযোগের সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। কোনো একজন অভিনেতা কুস্তিগীর চরিত্রে কিংবা অন্নাহারেক্লিস্ট কোনো দরিদ্র মানুষের চরিত্রে অভিনয় করতে গেলে তাঁকে এই দুই চরিত্র সম্বন্ধে নিখুঁত ভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। তা নাহলে উপযুক্ত ভাবভঙ্গি বাস্তব রূপায়ণ সম্ভব হয়ে উঠবে না। অনেক সময় বাস্তবধর্মীতার দিকে তাকিয়ে অভিনেতাকে সুনির্দিষ্ট কোনো চরিত্রকে ফুটিয়ে তুলতে সেই ব্যক্তির শারীরিক গঠন অনুযায়ী তাঁকেও সেই দেহরূপ প্রস্তুত করতে হয়। এগুলি তখনই সম্ভব হয় তার বিশুদ্ধ ইন্দ্রিয়ানুভূতি ও আবগে অনুভূতির প্রক্ষেপণের অবস্থা দ্বারা। স্মৃতি সঞ্চারিত হয়ে অভিনেতার পর্যবেক্ষণ দক্ষতাকে বৃদ্ধি করে, যা মঞ্চস্থ চরিত্রকে ফুটিয়ে তুলতে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে।

❑ ১.৫.৫ অনুকরণ ও উপস্থাপন (Imitation and Presentation) :

অভিনয়ের ক্ষেত্রে অনুকরণ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। নাটকের প্রয়োজনে একজন অভিনেতা

অনুকরণ করেন। পর্যবেক্ষণ ও অনুকরণ অভিনয়ের সঙ্গে ওতোপ্রোতভাবে জড়িত। সঠিক অনুকরণ চরিত্রের বাস্তবতা ফুটিয়ে তুলতে বিশেষভাবে সাহায্য করে। একজন পাগল রাস্তা দিয়ে হেঁটে চলেছে, তার হাঁটাচলা, ভাবভঙ্গি, শরীরিক অবয়ব ইত্যাদি ঠিকভাবে অনুকরণ করলেই বাস্তবে সেই অভিনয় নিখুঁত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এক্ষেত্রে অভিনেতাকে অনুকরণের মাধ্যমে বিশেষ প্রস্তুতির প্রয়োজন হয়। অনেকে মনে করেন অনুকরণ অভিনেতার মৌলিকতাকে বিনষ্ট করে। কারণ হুবহু নকল করতে গিয়ে অভিনেতা তার নিজস্ব ম্যানারিজম হারিয়ে ফেলে। এসব ক্ষেত্রে অভিনেতাকে অনুকরণের সঙ্গে সঙ্গে তার শিল্প সত্ত্বার নিজস্ব অভিব্যক্তি চরিত্রে সংযোজন করা প্রয়োজন। তখনই তা দর্শককুলে সমাদর লাভ করে অনুকরণের অভিন্নতায়।

○ উপস্থাপন (Presentation) :

অভিনয়ের মাধ্যমে নানা লীলায়িত রূপ ও উচ্চারিত বাক্য দ্বারা বিভিন্ন উপায়ে মানুষের মনের উপর প্রভাব বিস্তার করা যায়। যথা—বক্তৃতা, কথোপকথন, শিক্ষকতা, অভিনয় ইত্যাদি। এদের মধ্যে সবচেয়ে গভীর ও স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করতে পারেন অভিনেতা। মানুষের মনকে তীব্রভাবে আলোড়িত করে নানা প্রকার রসাবেগের আঘাতে তাকে অভিভূত করতে পারেন শুধু অভিনেতা। বিদেশের কত অসাধারণ অভিনয়-নৈপুণ্যের কথা আমরা শুনেছি। চরিত্র নির্মাণে সঙ্গে নির্দেশকের কল্পনা মিশে কোনো নাটক মঞ্চে উপস্থাপিত হয়। কোনো একটি বিশেষ সংলাপ বা চরিত্রের প্রকাশে প্রতিটি অভিনেতার মধ্যে স্টাইল অব অ্যাক্টিং অনেকখানি ভিন্ন হয়। চরিত্র রূপায়ণে বাচনভঙ্গি ও দেহভঙ্গি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। দৃশ্য রূপায়ণে বিভিন্ন বস্তুর ব্যবহার, চরিত্র রূপায়ণে পোশাক-আশাক, মঞ্চের আলো নির্মাণ, সংগীত পরিচালনা ইত্যাদি সমস্ত কিছুই নাটকের উপস্থাপনীয় বিষয়। পরিচালকের দক্ষ পরিচালনায় যা সুষ্ঠু ভাবে উপস্থাপন করা সম্ভব। সংলাপের বাস্তবতা, মেকআপ, মঞ্চসজ্জা, চরিত্রের বাস্তবতা ইত্যাদি মিলিয়ে নাটক উপস্থাপিত হলে দর্শকের কাছে তা গ্রহণযোগ্য ও শ্রুতিগ্রাহ্য হয়ে ওঠে। উপস্থাপনার প্রাণোজ্জ্বলতায় এবং সজীবতায় নাটকের সামাজিক বার্তা দর্শককুলের মনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করতে পারে। তাই সঙ্গতিপূর্ণ বিষয়ানুগ উপস্থাপন নাটককে দৃশ্য-শ্রাব্য করে তোলে।

Follow Our B.Ed Related Website>>

www.dascoaching.in

Scanned with CamScanner

একটি ছকের মাধ্যমে নাটক প্রকরণের নিয়মগুলি নিম্নে সংক্ষেপে আলোচিত হল—

কণ্ঠ/স্বর (VOICE)

মাত্রা (Pitch)	:	উচ্চস্বর অথবা নিম্নস্বরে শব্দের প্রক্ষেপ।
গতি (Pace)	:	যে শব্দগুলি ব্যক্ত হবে তার গতিময়তা।
থামা (Pause)	:	কোথায় শব্দ ব্যবহার বন্ধ হবে মাঝে মাঝে এবং কতক্ষণ পর্যন্ত।
প্রক্ষেপ/অভিক্ষেপ (Projection)	:	দর্শকবৃন্দের শব্দ শোনার অক্ষমতা।
ধ্বনির মাত্রা (Volume)	:	কতটা উচ্চস্বরে/নিম্নস্বরে শব্দগুলি বলা হবে।
স্পষ্ট অভিব্যক্তি (Articulation)	:	কণ্ঠস্বরে স্পষ্টতা।
কণ্ঠশৈলী (Tone)	:	কণ্ঠস্বরে অনুভব আবেগ-এর প্রয়োগ।
সংলাপ সূত্র (Culing)	:	কখন বলা হবে।
শব্দরূপের পরিবর্তন (Inflection)	:	কথা বলার সময় গলার স্বরের উঠানামা।
উচ্চারণ পদ্ধতি (Accent)	:	কোনো বিশেষ দেশের/সমাজের/পরিবেশের উচ্চারণ পদ্ধতি।
শ্বাস প্রশ্বাস (Breathing)	:	নিয়ন্ত্রিত কণ্ঠস্বরের ব্যবহার, আবেগের অভিব্যক্তি যেমন— নিঃশ্বাস গ্রহণ ও নিঃশ্বাস ত্যাগ।
পুনরাবৃত্তি (Repetition)	:	কোনো শব্দ বা ধ্বনি জোরপূর্বক পুনরাবৃত্তি করা।
জোরপূর্বক শব্দ প্রয়োগ (Emphasis)	:	কোনো শব্দ ও তার অর্থকে জোর পূর্বক বোঝানোর চেষ্টা।

শরীর (BODY)

ভঙ্গিমা (Posture)	:	কোনো কিছু সম্বন্ধে প্রকাশ্যে ব্যক্ত মনোভাব/দাঁড়ানোর ভঙ্গিমা।
ঈশারা/সংকেত (Gesture)	:	চিন্তাভাবনা, অনুভূতি, মনোভাব ব্যক্ত করার যে শারীরিক ভঙ্গিমা।
শরীর সচেতনতা (Body Awakness)	:	মঞ্চে সঠিক শরীরের ব্যবহার, সম্পূর্ণ শরীরের কাজসমূহ বেছে নেওয়া, অথবা শরীর কোনো অংশ বিচ্ছিন্ন করে ব্যক্ত করা।

মুখ ভঙ্গিমা (Facial expression)	:	মুখের মাধ্যমে মানসিকতা, আবেগ, অনুভূতি ব্যক্ত করা।
চক্ষু সংসর্গ (Eye Contact)	:	কোনো অভিনেতা অথবা দর্শকের চোখের সাথে সংসর্গ স্থাপন।

শরীর (MOVEMENT)

সময় (Timing)	:	ধীরভাবে চলা, যখন তুমি চলমান, চলনের সময় স্থিতিকাল (দৈর্ঘ্য)
নির্দেশনা (Direction)	:	কোথায় তুমি যাচ্ছ, এগোচ্ছ, পিছোচ্ছ, কৌণিক ভাবে, পাশাপাশি ভাবে।
কর্মশক্তি (Energy)	:	কীভাবে তুমি চলবে, ক্ষমতার পরিমাণ, চলমানতার মাধ্যমে মানসিকতা ব্যক্ত করা।
দলগত চেতনা (Ensemble awakness)	:	দলগতভাবে চলা। অন্যান্য অভিনেতাদের সাথে সমানুবর্তিতা,অন্যান্য অভিনেতাদের অভিনয়ের পরিবেষ্টিতে সাড়া দেওয়া।
গতিপথ (Pathways)	:	ফাঁকা স্থানে তুমি কীভাবে চলবে তার নকশা, যেমন—বাঁকা, সোজা, এলোমেলো।
পুনরাবৃত্তি (Repetition)	:	বারংবার চলনের পুনরাবৃত্তি অথবা গুণ ব্যবহার যোগ্য চলমান্যতার ওপর জোর দেওয়া।

স্থান/জায়গা (SPACE)

তল/উচ্চতা (Level)	:	নীচু, মাঝামাঝি, উঁচু স্থান প্রস্তুত করা।
স্ব-অবস্থান (Personal Space)	:	তোমার নিজের জায়গা, কীভাবে জায়গা ব্যবহার করবে তা বুঝে নেওয়া।
সাধারণ জায়গা (General Space)	:	ঘরের অন্যান্য জায়গা কীভাবে তুমি ব্যবহার করবে।
নির্মাণ রীতি (Architecture)	:	জায়গার বাহ্যিক গঠন, তুমি যেখানে আছ অথবা অবস্থান করছ সেটাকে তুমি কীভাবে ব্যবহার করছ, এবং নির্মাণের সাথে সম্পর্ক রেখেছ।
নিকটবর্তীতা (Proximity)	:	দূরত্বের ব্যবধান অথবা দুই অভিনেতার মধ্যে ব্যবধান এবং অভিনেতা ও দর্শকের মধ্যে ব্যবধান।

Scanned with CamScanner

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ও উত্তর
(Short Questions & Answers)

❑ **অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ও উত্তর (Objective type questions & answers) :**

Marks – 2

প্রশ্ন : শিক্ষার্থীদের শিখনে নাটকের দুটি প্রভাব উল্লেখ করুন।

উত্তর : শিক্ষার্থীদের শিখনে নাটকের দুটি প্রভাব হল—

(i) নিজেদের জীবনের প্রতিরূপকে প্রত্যক্ষ করে।

(ii) অলৌকিক আনন্দ উপভোগ করে।

প্রশ্ন : ক্ল্যাসিক্যাল নাটক কাকে বলে? দুজন ক্ল্যাসিক্যাল নাট্যকারের নাম লিখুন।

উত্তর : শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পাঠ্য নয়, এমন অনেক মহৎ রচনা নিয়ে গোলযোগ সৃষ্টি হতেই ক্লাসিক অভিধাটির গুণগত মান নির্ধারিত হল এবং বলা হল যে রচনা প্রাচীন বা আধুনিক যাই হোক না কেন—যদি তা সৌন্দর্যের চূড়ান্ত আদর্শকে, সত্যের শাশ্বত রূপকে, পূর্ণতার চিরন্তন মানকে রক্ষা করে এবং প্রকাশ করে, তবে তা ক্লাসিক।

দুজন ক্ল্যাসিক্যাল নাট্যকারের নাম হল—অ্যারিস্টটল ও সফোক্লিস।

প্রশ্ন : পৌরাণিক নাটক কাকে বলে? বাংলা ভাষায় দুজন পৌরাণিক নাট্যকারের নাম লেখ?

উত্তর : পৌরাণিক নাটক হল পুরাণ ও নাটকের সহাবস্থান যেখানে পুরাণের লক্ষণ নাটকের লক্ষণগুলির সমন্বয় ঘটে। এ নাটকে পুরাণ পরিবেশকে তুলে ধরা হয়। এ এক অলৌকিক ক্রিয়া কলাপে পূর্ণ এক অতিপ্রকৃতের জগৎ—যেখানে বর্গের দেবদেবীরা মর্ত্য মানুষের ভাগ্যনিয়ন্তা, যেখানে দেবতারা সশরীরে আত্মপ্রকাশ করে বা অবতারে প্রেরণ করে সাধুসজ্জনদের পরিত্রাণ ও দুষ্কৃতিকারীদের বিনাশ করেন। যুক্তিবাদীদের কাছে অবিশ্বাস্য, ভক্তিবাদীদের কাছে অতিমানবীয়, রূপকথা সমধর্মী এই জগতের একদিকে যেমন থাকবে ঐশ্বর্যের আড়ম্বর অলৌকিক ক্রিয়াকাণ্ড এবং অতিমানবীয় চরিত্রের প্রকাশ।

বাংলা ভাষায় দুজন পৌরাণিক নাট্যকারের নাম হল গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়।

প্রশ্ন : শ্রেণিকক্ষে চরিত্রাভিনয়ের প্রয়োজনীয়তা কী?

উত্তর : শ্রেণিকক্ষে চরিত্রাভিনয়ের প্রয়োজনীয়তা হল—

(১) কোনো ব্যক্তি সম্পর্কে বা কোনো বিশেষ সামাজিক শ্রেণি সম্পর্কে শ্রদ্ধার মনোভাব জাগাবার জন্য (বা প্রয়োজনে সচেতনতা সৃষ্টির জন্য) চরিত্র অভিনয় বিশেষ জরুরি অন্তত বিদ্যালয় স্তরে।

(২) ব্যক্তির কর্মদক্ষতা (প্রয়োজনে অক্ষমতা, অসহিষ্ণুতা), ভাবাজ্ঞান ইত্যাদি বোঝাবার জন্য চরিত্র অভিনয়ের প্রয়োজন আছে।

(৩) বিজ্ঞানের প্রতি, সমাজের প্রতি শ্রদ্ধার মনোভাব জাগাবার জন্য কোনো বিশেষ ব্যক্তির ভূমিকায় অভিনয় করে, ব্যক্তির চরিত্র বিশ্লেষণ করে শিক্ষার্থীর আচরণের পরিবর্তন ঘটানো যেতে পারে।

(৪) শিক্ষক যখন তাঁর মতো করে শ্রেণিতে উপরোক্ত বিষয়ে আলোচনা করেন তখন শিক্ষার্থীরা আবেগের দিক থেকে বাইরে থেকে যায়। কিন্তু তারাই যখন অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করে আবেগগত দিক থেকে চরিত্রের ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে (চরিত্রের ভিতরে চলে যায়)

প্রশ্ন : শিখনের মাধ্যম হিসেবে নাটক খুবই গুরুত্বপূর্ণ—ব্যাখ্যা করুন।

উত্তর : শিক্ষার্থীদের শিক্ষা ও বিষয়বস্তুর মধ্যে সংযুক্তিকরণের ক্ষেত্রে নাটক একটি শক্তিশালী মাধ্যম। আমরা জানি যে শিখন একটি সক্রিয় নির্মাণ ভিত্তিক পদ্ধতি, যখন আমরা কোনো কিছুকে জানতে চাই। শ্রেণি শিখনে শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে যখন সংযোগ স্থাপিত হয়, আমরা তখন দেখতে পাই শ্রেণি শিখনে নাটক বিভিন্ন অভিজ্ঞতালব্ধ ঘটনাবলিকে উপস্থাপিত করে। কোনো কিছুর সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে নাটক প্রকৃতিগত ভাবেই ছাত্র-ছাত্রীদের সামাজিক ঘটনাবলি ব্যাখ্যাকরণ, চিন্তা ভাবনার আদানপ্রদান ও বিভিন্ন দক্ষতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে অসাধারণ ভূমিকা পালন করে। এইভাবে নাটক শিক্ষার্থীদের অর্জিত তথ্য, সত্য ঘটনার উপর প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন সামাজিক অভিজ্ঞতাগুলিকে জ্ঞান-উপলব্ধির বিকাশ সাধন করে। নাটকীয় উপস্থাপনার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মনে সমাজের বিভিন্ন বিষয় সমূহকে বুঝে নিতে ও আত্ম -উপলব্ধিতে বিশেষভাবে সাহায্য করে।

প্রশ্ন : পথনাটিকার বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ করুন।

উত্তর : পথনাটিকার বৈশিষ্ট্যগুলি হল—

(১) পথনাটকের জন্য কোনো মঞ্চ নির্মাণের প্রয়োজন হয় না। যে-কোনো খোলা জায়গায় পথনাট্য করা সম্ভব।

(২) পথনাটক খরচাসাপেক্ষ নয়।

(৩) এই নাটকের সাহায্যে তাৎক্ষণিক সংযোগ নির্মাণে সমাজের সমস্যাগুলি সহজেই সর্বসাধারণের সামনে তুলে ধরা যায়।

(৪) সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধিতে এই নাটক দুর্দান্ত ভূমিকা পালন করে।

(৫) কোনো পূর্ব প্রস্তুতি ছাড়াই এই নাটক কেবলমাত্র অভিনয় গুণে উপস্থাপন করা সম্ভব।

Scanned with CamScanner

সম্ভাব্য প্রশ্নাবলি

❑ অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন (Objective type questions) : Marks – 2

১। নাটকের উৎপত্তিস্থল কোথায়? প্রথম দিকের দুটি নাটকের নাম লিখুন। (Which is the land of origin of drama? Name two dramas written initially.)

২। আপনার জানা কোন নাটকে দ্বন্দ্বের উদাহরণ দিন। সেই দ্বন্দ্বটি কী? (Given an example of conflicts in any drama you know. What is that conflict?)

৩। স্বগতোক্তি এবং সংলাপের মধ্যে পার্থক্য কী? (What is the difference between monologue and dialogue?)

৪। উপমা ও প্রতীকের মধ্যে পার্থক্য কী? (Find the difference between allegory and symbolic)

৫। মূল্যহীন থিয়েটারের সংজ্ঞা দিন। (Define theatre of Absurd.)

৬। পৌরাণিক নাটকের সংজ্ঞা দিন। (Define mythological drama.)

৭। চরিত্রাভিনয়ের সংজ্ঞা দিন (Define Role Playing)

৮। কৃত্রিম পরিবেশে শিক্ষানবিশীর সংজ্ঞা দিন (Define simulation.)

৯। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নাটক ব্যবহারের দুটি উদ্দেশ্য লিখুন। (Write two objectives of using drama in educational institution.)

১০। শিক্ষকের বক্তৃতার পরিবর্তে নাটক ব্যবহারের দুটি উপকারিতা লিখুন। (Write two benefits of using drama over teacher's lecture.)

❑ সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন (Short type questions) : Marks – 5

১। বিদ্যালয়ে শেখার ক্ষেত্রে উপযোগি বিভিন্ন ধরনের নাটকের নাম লিখুন। (Find types of drama used for learning in school.)

২। চরিত্রাভিনয় ও নকল পরিবেশে শিক্ষানবিশীর মধ্যে পার্থক্য কী? (Distinguish between role playing and simulation.)

৩। শ্রুতিনাটক ও রেডিও নাটকের মধ্যে পার্থক্য কী? (Distinguish between audio and radio drama.)

৪। সামাজিক পরিবর্তনের জন্য নাটক কিভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে? (How can drama be used for social changes?)

৫। সামাজিক পরিবর্তনে পথ নাটিকার ভূমিকা উপযুক্ত উদাহরণ সহযোগে লিখুন। (Indicate the use of street drama in social change giving necessary examples.)

৬। শিক্ষার্থীর সামাজিক ও ব্যক্তিগত পরিবর্তনে বিদ্যালয়ে নাটক কিভাবে ব্যবহার করা যায়? (How can school drama be used for the social & personal development of a child?)

৭। কয়েকটি সামাজিক সমস্যার উল্লেখ করুন যা বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত নাটকের মাধ্যমে উপস্থাপন করা যায়। একটি উদাহরণ দিন। (State some social problems which can be staged through school drama. Give and example.)

❑ রচনাভিত্তিক প্রশ্ন (Essay type questions) : Marks – 10

১। শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার উন্নতিকল্পে নাটক কিভাবে ব্যবহার করা যায়? উপযুক্ত উদাহরণ দিন। এই ধরনের নাটক মঞ্চস্থ করার ব্যাপারে শিক্ষকের ভূমিকা উল্লেখ করুন। (Discuss how classroom teaching can be upgraded with the help of drama. Give necessary examples. What is the role of teacher in staging such drama?)

২। ভাষাসাহিত্য এবং অন্যান্য বিদ্যালয় বিষয়ের শিক্ষায় নাটক অভিনয়ের উদ্দেশ্যগুলি লিখুন। (Write the objectives of playing drama in language and other school subjects.)

৩। পরিবেশ সুরক্ষার শিক্ষা দিতে নকল পরিবেশ কিভাবে ব্যবহার করবেন? একটি ছোট উদাহরণ দিন। (How can simulation be used for learning protection of environment? Give a short example.)

৪। দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধীজির উপর নিগ্রহের ঘটনা নিয়ে একটি অতি সংক্ষিপ্ত নাটিকা প্রস্তুত করুন। এটিকে আপনি চরিত্রাভিনয় বা নকল পরিবেশে শিক্ষাগ্রহণ বলবেন? কেন? (Prepare a very short drama on 'Manhandling of Gandhiji in South Africa. Would you call it a role play or simulation? Why?)

৫। অণুপাঠে একজন শিক্ষক প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকের ভূমিকায় অভিনয় করেন না নকল পরিবেশে শিক্ষাদান করেন? আপনার উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দিন। (Do you think that a student teacher plays a 'role' or simulates teaching behavior in micro lesson? Give reasons in favour of your answer.)

Scanned with CamScanner

অধ্যায় ২

সংগীত (গায়ন এবং বাদন)

MUSIC (Gayan and Vadan)

❑ বিষয়বস্তুর রূপরেখা :

২.১ সুর, তাল ও লয়—স্বরগম (Sur, Taal and Laya (Sargam)

২.১.১ সুর তাল ও লয়-এর বৈশিষ্ট্য

২.১.২ তাল প্রসঙ্গ এবং সংগীতে তাল-তত্ত্ব (Context about Taal and Philosophical Knowledge of taal in music)

২.১.৩ লয়, মাত্রা, তাল ও ছন্দের মধ্যে পার্থক্য (Difference between laya, Matra, Taal, Chhanda)

২.১.৪ সংগীতে লয় তথা তালের মহত্ত্ব (Nabicity of Taal in Music)

২.১.৫ বিভাগ এবং তালে এর প্রয়োজনীয়তা (Division and necessity of Taal)

২.২ গলার স্বর সংক্রান্ত—লোকসংগীত (Vocal–Folk songs, Poems, Prayers)

২.৩ 'কারাওকে'-এর সঙ্গে গান (Singing along with "Karaoke")

২.৪ গান, কবিতা ও প্রার্থনা সংগীতের কৌশল (Composition of Songs, Poems, Prayers)

২.৪.১ গানের কৌশল (Composition of Songs)

২.৪.২ কবিতার কৌশল (Composition of Poems)

২.৪.২.১ কবিতার প্রকাশভঙ্গি (Expresion style of Poems)

২.৪.৩ প্রার্থনা সংগীতের কৌশল (Composition of Prayers)

২.৫ শিক্ষায় গান ও বাজনার সমন্বয় (Integration of Gayan and Vadan in Educational practices)

Scanned with CamScanner

✪ ২.১ সুর, তাল ও লয়—স্বরগম (Sur, Taal and Laya (Sargam)

সুর, তাল ও লয় : সংগীতের সুর, তাল ও লয় বিষয়টি বোঝার আগে আমরা সংগীত কী সে বিষয়ে কিছু জানার চেষ্টা করব।

◆ সংগীত :

'সংগীত' শব্দটির সঙ্গে আমরা সকলেই পরিচিত। কিন্তু 'সংগীত' কাকে বলে, তার পরিধি ইত্যাদি সম্পর্কে সকলের জানার অবকাশ না-ও থাকতে পারে। তাই, বহুজনের কাছে 'সংগীত' শব্দের নানারকম ধারণা পাওয়া যাবে, কিন্তু 'সাধারণ মানুষ' অপেক্ষা সংগীত -জ্ঞানী ও সংগীত-গুণী মানুষ তথা সংগীত-শাস্ত্রকারদের বক্তব্যই এই ধারণাকে সম্পূর্ণতা ও যথার্থতা দান করতে পারে। সবার আগে এ কথা জানতে হবে যে, 'সংগীত' শুধুমাত্র বিনোদনের জন্য নয়;— আবার শুধু 'শিল্পকলা'ও নয়, 'সংগীত' একটি 'বিজ্ঞান'। তাই সৃষ্টি ও বিবর্তনের ইতিহাস ও ধারাবাহিকতা বেয়ে, এই বিজ্ঞানভিত্তিক-শিল্প গড়ে উঠতে বহু যুগ কেটে গেছে। মানুষের কণ্ঠে সর্বপ্রথম উদ্‌গীত হয়েছিল 'ধ্বনি' অর্থাৎ 'শব্দ'; তারপরে 'সুর' (অর্থাৎ 'সংগীত' হওয়ার উপযোগী প্রাথমিক ও আবশ্যিক উপাদান) এবং সবশেষে এসেছিল 'ভাষা'। পাখির ডাক-কে অনুকরণ করেই হোক্, জীবন-সংগ্রামের নানা কায়িক-শ্রমের ভারে নির্গত ধ্বনির সাহায্যেই হোক্, শুধুমাত্র অবসরের মাঝে বিনোদনের জন্য সুরকে কণ্ঠে বা যে-কোনো বাদ্যযন্ত্রে স্থাপিত করে মানুষ 'সংগীত'কে রূপদান করেছে।

'সংগীত' হল— গীত, বাদ্য ও নৃত্য— এই তিনটি কলার সমাবেশ। বস্তুত, এই তিন কলারূপ পরস্পর স্বতন্ত্র, কিন্তু গীত-প্রধান হওয়ার জন্য 'সংগীতে' এই ত্রিবিধ-কলাকৃতির সমাবেশ ঘটেছে। ধ্বনি থেকে এসেছে সুর এবং সুরকে সঙ্গী করেই কখনও ভাষার সাহায্যে, কখনওবা ভাষার সাহায্য না নিয়েই সৃষ্টি হয়েছে 'সংগীত'। 'সংগীত' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হল— সম্যক্‌রূপে গীত ইতি সংগীত। অর্থাৎ যে ধ্বনি তথা সুর, মানুষের কণ্ঠে ও বাদনযোগ্য সংগীতোপযোগী - বাদ্যযন্ত্রে গীত (গায়ন + বাদন) হয়,— তাকে 'সংগীত' বলা হয়। ইংরেজিতে 'Music' শব্দটি এসেছে গ্রিক শব্দ 'Muse' (মিউজ্) থেকে। সংগীত-শাস্ত্র অত্যন্ত প্রাচীন এবং সংগীত-বিজ্ঞানের ব্যাখ্যা বিজ্ঞানের ধ্বনিতত্ত্বের ব্যাখ্যা দ্বারাই আমাদের কাছে পরিস্ফুট ও বিশ্লেষিত হয়ে থাকে।

কোনো বস্তুকে অন্য একটি বস্তু দিয়ে আঘাত করলে শব্দ সৃষ্টি হয় এবং যে বস্তুতে আঘাত করা হয় তার অণুগুলির মধ্যে কম্পন সৃষ্টি হয়। সেই কম্পন তার চারপাশের বায়ুকেও কম্পিত করে। ঠিক যেভাবে কোনো পুকুরের জলে ঢিল ছুঁড়লে ছোটো-ছোটো তরঙ্গ বা ঢেউ সৃষ্ট হয়ে ক্রমান্বয়ে ছোটো থেকে বড়ো আকারে চারদিকে ছড়িয়ে যেতে থাকে, সেইভাবেই কম্পিত-বায়ুতরঙ্গ আমাদের কানে প্রবেশ করে। কানের ভেতরে

সূক্ষ্ম-চামড়ার যে পর্দা থাকে, সেখানে ওই শব্দতরঙ্গ আঘাত করে। ওই পর্দা সংলগ্ন অস্থি ইত্যাদি দ্বারা শ্রবণ-স্নায়ুতে তরঙ্গ নীত হয়ে মস্তিষ্কে পৌঁছায় এবং আমরা 'শব্দ' শুনতে পাই। কিন্তু, জগতের সব শব্দই আমরা শুনতে পাই না, — যে শব্দে প্রতি-সেকেন্ডে ২২ হাজার বার বায়ুর কম্পন হয়, আমরা তা' শুনতে পাই, — তার বেশি হলে পাই না। আবার, প্রতি সেকেন্ডে ১৬ বারের কম বায়ুর কম্পন হলে সেই শব্দ আমরা শুনতে পাই না। সংগীতের ক্ষেত্রে এছাড়াও একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হল— কোনো শ্রুত-শব্দের মধ্যে যদি কম্পনগুলির মধ্যে যে সময়, তা প্রতিবারেই সমান থাকে, তাহলেই সুর সৃষ্টি হয়। যে শব্দে কম্পন-সমতা নেই, তা' সুররূপে পরিণত হয় না, সুর বলে বিবেচ্য নয়,— তাকে বেসুর, কোলাহল ইত্যাদি বলা যেতে পারে। সাধারণভাবে 'সংগীত' বলতে গীতকেই বোঝায়, কিন্তু 'গীত, বাদ্য ও নৃত্য'— এই 'ত্রার্যত্রিক'-এর মধ্যে গীতেরই শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকৃত। কারণ, প্রাচীন গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, গীতের অধীন বাদ্য এবং বাদ্যের অধীন নৃত্য। সংগীতে বিবেচ্য ধ্বনি স্বভাবতই মধুর ধ্বনি এবং অ-মধুর ধ্বনি দ্বারা সংগীতের সৃষ্টি হয় না। গীত, বাদ্য ও নৃত্য— এই তিনটির মধ্যে সাংগীতিক ধর্ম থাকায় ভারতীয়গণ একে একত্রে 'সংগীত' আখ্যায়িত করেছেন। 'সংগীত-রত্নাকর' শাস্ত্রে তাই বলা আছে— "গীতং বাদ্যং তথা নৃত্যং ত্রয়ং সংগীতমুচ্যতে"।

উৎস : ভারতীয় সংগীতের সৃষ্টিকাল নিরূপণ করার বিষয়ে পণ্ডিতগণ অদ্যাবধি একমত হতে পারেন নি, তার প্রথম কারণ হয়ত এই যে কোনও শিল্পকলাই হঠাৎ একদিন সৃষ্ট হতে পারে না। অনেক সংগীত-গুণীদের মতে বৈদিক সভ্যতাই ছিল ভারতের আদি সভ্যতা। কিন্তু যখন ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারো-তে প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় আবিষ্কার করে সভ্যতার আদিতে তার সময়কাল বিচার বিশ্লেষণ করলেন, তখনই জানা গেল— বৈদিক নয়, 'সিন্ধু-সভ্যতাই হল ভারতবর্ষের আদি সভ্যতা। এই সভ্যতায় সংগীতে ব্যবহৃত কিছু বাদ্যযন্ত্রের ভগ্নাবশেষ এবং কিছু অন্যান্য নিদর্শন দ্বারা বোঝা যায় যে, সংগীতের ব্যবহার সে যুগে ছিল।

বস্তুত, 'সামবেদ'কে বলা হয়েছে ভারতীয় সংগীতের উৎস। প্রাক্-বৈদিক যুগে অর্থাৎ সিন্ধু-সভ্যতার যুগে সংগীত কী-প্রকারের ছিল, আমরা তার পরিচয় না-পেলেও প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলি বিশ্লেষণ করে জানতে পারি সে যুগে সংগীতের ব্যবহার হতো, সংগীতের অস্তিত্ব ছিল। আনুমানিক ২০০০ খ্রিস্ট পূর্বাব্দে বৈদিক-যুগের সূত্রপাতের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা জানতে পারি ভারতবর্ষে অনার্যদের যথা দ্রাবিড় ইত্যাদি জাতির ভাষা, সাহিত্য ও সংগীত বিদ্যমান ছিল। সামবেদে 'সাম' শব্দের অর্থ হল 'সুমিষ্ট স্বর' অর্থাৎ 'সুর'। ঋক্-মন্ত্রগুলিকে সুরের মধ্যে সাজিয়ে সামবেদের সৃষ্টি; এর থেকেই আমরা পাই সংগীতের প্রাচীনতম রূপ। আর্যরা ভারতের বাইরে থেকে এসেছিলেন কিনা— এই মতানৈক্যে না-গিয়েও আমরা ইতিহাসের পাতায় দেখতে পাই— অনার্যদের সংগীত পরবর্তীকালে বিভিন্ন অঞ্চলের আদিবাসীদের নৃত্য-গীতে যে সংগীতের প্রতিফলন ঘটেছে তা আর্যদের সংগীতের সংমিশ্রণে অথবা আর্য-আগমনের পূর্বে অনার্যদের সংগীত রীতিরই প্রতিফলন বিশেষ।

Scanned with CamScanner

● **স্বর :** সংগীতে ব্যবহৃত যে সাত স্বরের পরিচয় আমরা এখনও পেয়ে থাকি, আর্যদের সঙ্গে অনার্যদের সংগীত-রীতি ও পদ্ধতির মধ্যে যোগাযোগ তেমন না থাকায় তাদের নামগুলিরও পার্থক্য থাকা কিছু অসম্ভব নয়। এই সাতটি স্বরের নাম ছিল — আর্চিক, গাথিক, সামিক, স্বরান্তর, ঔড়ব, ষাড়ব, সম্পূর্ণ। এই সাত স্বর বৈদিক সংগীতে পাওয়া গেলেও, অনার্যদের সংগীতে স্বরের এই সংখ্যার ব্যবহার কম ছিল। তাদের সংগীত ছিল 'দেশি-সংগীত'। আর্যদের সংগীত এই 'দেশি-সংগীত দ্বারা অনেকাংশে সমৃদ্ধ হয়েছিল। আমরা সংগীতে যে সাত-স্বরের নাম জানি — সেগুলি হল — সা (ষড়জ), রে (ঋষভ), গা (গান্ধার), মা (মধ্যম), পা (পঞ্চম), ধা (ধৈবত), এবং নি (নিষাদ), — এগুলি হল শুদ্ধ স্বর। আর আছে ৫টি 'বিকৃত স্বর' — কোমল রে, কোমল গা, তীব্র মা, কোমল ধা, এবং কোমল নি। ভারতীয় সংগীতে ৭টি শুদ্ধ ও ৫টি বিকৃত স্বর নিয়ে মোট ১২টি স্বরের দ্বারাই সংগীতের রচনা হয়। তাহলে জানা গেল স্বর প্রধানত ২ প্রকার — শুদ্ধ ও বিকৃত। এইবার জেনে নেওয়া যাক, 'স্বর' কাকে বলে — অর্থাৎ 'স্বর' বলতে সংগীতে কী বোঝানো হয়?

এককথায় 'স্বর' বলতে বোঝায় — সংগীতে ব্যবহৃত উপযুক্ত শ্রুতি। অর্থাৎ নানাপ্রকার কম্পাঙ্ক-বিশিষ্ট বিভিন্নরকম ধ্বনি যা সুমধুর ও শ্রবণযোগ্য, তাই সংগীত সৃষ্টির প্রযুক্ত 'স্বর'। স্বরের রঞ্জকতা শক্তি থাকবে, যা শ্রবণ করে শ্রোতার হৃদয় প্রসন্ন হবে। স্বর ২ প্রকার : শুদ্ধ (প্রাকৃত) ও বিকৃত। শুদ্ধ স্বর ২ প্রকার – চল স্বর (রে, গা মা, ধা, নি) ও অচল স্বর (সা, পা)। বিকৃত স্বর ২ প্রকার – কোমল স্বর (রে, গা, ধা, নি) ও তীব্র স্বর (মা)। অর্থাৎ —

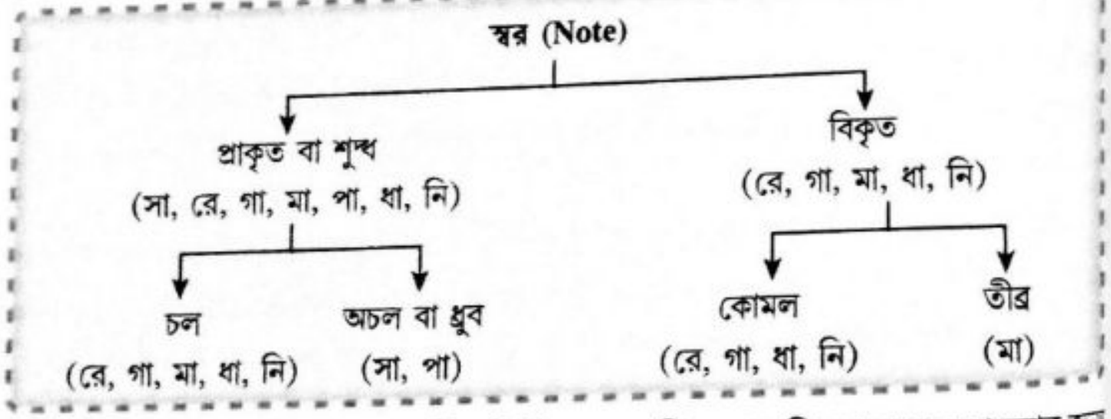

* [* এক্ষেত্রে উল্লেখ যে, স্বরগুলির লিখিত ব্যবহারিক রূপগুলির প্রকাশ সহায়তার জন্য নির্ধারিত আছে কিছু সংকেত বা Symbol (সিম্বল), সেগুলি স্বরলিপি বা NOTATION (নোটেশন) বিষয়ে আলোচ্য অংশে দ্রষ্টব্য।]

ভারতীয় সংগীত-রীতির দুই ধারা : ভারতবর্ষের যে সংগীতধারা আছে, তাকে আমরা প্রধানত ২টি বিভাগে ভাগ করতে পারি। ১) উত্তর ভারতীয় সংগীত ধারা (যথা : উত্তর ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীতের ধারাসমূহ এবং উত্তর-ভারতের বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় সংগীত সমূহ)। ২) দক্ষিণ ভারতীয় সংগীত ধারা (যথা: দক্ষিণ ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীতের ধারাসমূহ

এবং দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষার সংগীত সমূহ)। (১) নং ধারায় শাস্ত্রীয় সংগীত রীতিকে বলা হয় **উত্তর ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীত রীতি** বা **হিন্দুস্থানী সংগীত** পদ্ধতি। এবং (২) নং ধারায় শাস্ত্রীয় সংগীতরীতিকে বলা হয় **দক্ষিণ ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীত রীতি** বা **কর্ণাটকী সংগীত** পদ্ধতি। আর, (১) নং (২) নং ধারার প্রাদেশিক সংগীতগুলি অঞ্চলভেদে, ভাষা ভেদে যত প্রকার দেশি অর্থাৎ দেশজ ও লোকগান আছে সেগুলিকে বোঝায়। যথা : (১) নং ধারার প্রাদেশিক সংগীতে আমাদের পশ্চিমবঙ্গের উল্লেখযোগ্য দেশজ সংগীত হল — রবীন্দ্রসংগীত, নজরুলগীতি, অতুলপ্রসাদের গান, রজনীকান্তের গান, দ্বিজেন্দ্রগীতি (অর্থাৎ পঞ্চকবির গান), পুরাতনী গান, দেশাত্মবোধক গান সহ অন্যান্য উল্লেখযোগ্য রচয়িতাদের গান। আর, (১) নং ধারায় প্রাদেশিক সংগীতে লোকগান হল লোকের মুখে মুখে রচিত হওয়া মাটির গান। এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে, লোকসংগীতও হল এই লোকগানের একটি অংশবিশেষ। এই লোকসংগীতের মধ্যে অবিভক্ত বাংলার ভাটিয়ালি, পশ্চিমবঙ্গের ভাওয়াইয়া, ভাদু, টুসু, বাউল, মুর্শিদ্যা, গম্ভীরা, চট্‌কা, জারি, সারি ইত্যাদি রীতির লোকসংগীত অন্তর্ভুক্ত।

আমরা বর্তমানে ভারতীয় সংগীত ধারায় কর্ণাটকী-রীতি অপেক্ষা হিন্দুস্থানী-রীতিকেই অধিক বিবরণ সম্বন্ধে ধারণা লাভ করব। কারণ, বস্তুতপক্ষে, এই দুই রীতি গায়ন ও বাদন শিক্ষা ও চর্চার রীতি-নীতি বেশ অনেকটাই পৃথক। অর্থাৎ স্বরাভ্যাস ও সংগীত-রীতিগুলির শিক্ষণ ও অভ্যাস উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্য থাকলেও প্রয়োগগত অংশে (Practical-subject) এর পার্থক্য অনেক। দুটি পৃথকরীতি একইসঙ্গে আয়ত্ত করার [তাত্ত্বিক (Theoretical) ও প্রায়োগিক (Practical)] কুশলতা একই সঙ্গে এই স্থানে আলোচ্য পাঠ্যে ও পাঠক্রমে সম্ভবপর নয়। তাই, আমরা পাঠক্রমের অনুকূলে ও সামগ্রিক অবশ্যিক ধারণা লাভের জন্য এতক্ষণ পর্যন্ত এই সকল আলোচনা করলাম। ভারতীয় সংগীতের ধারণা পেতে হলে আরও বেশ কিছু সাংগীতিক পরিচয় ও পরিভাষা সম্বন্ধে জেনে নেওয়া অবশ্য প্রয়োজন—

স্বরকে কেন্দ্র করে নানা পরিচয়, পরিভাষা ও সংক্ষিপ্ত জ্ঞানার্জনের জন্য অবশ্যই যেসকল বিষয় ক্রমান্বয়ে আলোচ্য, সেগুলি—

(ক) **স্বরের স্থান :** স্বরগুলি কোথায় ব্যবহৃত হতে পারে, তার বিচারে একে তিনটি ভাগ করা যায়,— মন্দ্র (নীচু স্থান), মধ্য (মধ্য স্থান), তার (উঁচু স্থান)।

(খ) **সপ্তক :** স্বরের স্থান ভেদে সপ্তকও তিন প্রকার। ('সপ্তক' অর্থে ৭ স্বরের পারম্পর্যকে বোঝায়) — মন্ত্রসপ্তক বা উদারা, মধ্য সপ্তক বা মুদারা, তার-সপ্তক বা তারা। এই তিনটি স্থানে ব্যবহৃত স্বরের জন্য সংকেত বা symbol ব্যবহৃত হয়।

স্বরের নাম (শুদ্ধ + বিকৃত) = ১২টি	হিন্দুস্থানী পদ্ধতি	আকারমাত্রিক পদ্ধতি
	মন্দ্র মধ্য তার	মন্দ্র মধ্য তার

Scanned with CamScanner

(গ) **স্বরের (১২টি) সংকেত :** প্রধানত ২টি পদ্ধতিতে এই সংকেতগুলি দ্বারা ১২টি স্বরকে লিখিত রূপে প্রকাশ করা স্বীকৃত। হিন্দুস্থানী পদ্ধতি ও আকার মাত্রিক পদ্ধতি। (*স্বরলিপি - অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা দ্রষ্টব্য)।

(১) সা (ষড়জ)	=	স়া → সা → সাঁ	=	স্া → সা → র্সা
(২) (কোমল) রে (ঋষভ)	=	র়ে → রে → রেঁ	=	ঋ্া → ঋা → র্ঋা
(৩) (শুদ্ধ) রে (,,)	=	→ রে →	=	র্া → রা → র্রা
(৪) (কোমল) গা (গান্ধার)	=	→ গ →	=	জ্ঞ্া → জ্ঞা → র্জ্ঞা
(৫) (শুদ্ধ) গা (,,)	=	→ গ →	=	গ্া → গা → র্গা
(৬) (শুদ্ধ) মা (মধ্যম)	=	→ ম →	=	ম্া → মা → র্মা
(৭) (তীব্র) মা (,,)	=	→ ম̍ → ম̍ঁ	=	হ্ম্া → হ্মা → র্হ্মা
(৮) মা (পঞ্চম)	=	প় → প →	=	প্া → পা → র্পা
(৯) (কোমল) ধা (ধৈবত)	=	→ → ধ̱ঁ	=	দ্া → দা → র্দা
(১০) (শুদ্ধ) ধা (,,)	=	→ ধ →	=	ধ্া → ধা → র্ধা
(১১) (কোমল) নি (নিষাদ)	=	→ → নি̱ঁ	=	ণ্া → ণা → র্ণা
(১২) (শুদ্ধ) নি (,,)	=	→ নি →	=	ন্া → না → র্না

অতএব, উপরের আলোচনা থেকে এই পরিচয় পাওয়া গেল যে—

হিন্দুস্থানী পদ্ধতিতে ১২টি স্বরের ক্রমান্বয়ে লিখিত রূপ হল—

সা → → রে → গ̱ → গ → ম → ম̍ → প → ধ̱ → ধ → নি̱ → নি → (সাঁ)।

এবং আকারমাত্রিক পদ্ধতিতে ১২টি স্বরের ক্রমান্বয়ে লিখিত রূপ —

সা → ঋা → রা → জ্ঞা → গা → মা → হ্মা → পা → দা → ধা → ণা → না → (র্সা)।

মন্দ্র সপ্তকের সংকেত = স্বরের নীচে চিহ্ন (/ ঋ্া ইত্যাদি)

তার ,, ,, = ,, উপরে ,, (/র্মা ইত্যাদি)

(ঘ) **অলংকার :** স্বরের অলংকার হল স্বর দ্বারা রচিত বিভিন্ন প্রকার সজ্জিত বা রচিত অবস্থা। যথা : সারেগা → রেগামা → গামাপা ইত্যাদি

(ঙ) **আরোহ :** ক্রমানুসারে স্বরের উঁচু স্থানের দিকে প্রয়োগকে বলা হয় আরোহ বা অরোহণ। যথা : সা → রে → গা → মা ..... ইত্যাদি।

(চ) **অবরোহ :** ক্রমানুসারে স্বরের নীচুস্থানের দিকে প্রয়োগকে বলা অবরোহ বা অবরোহণ। যথা : সি → ধা → পা → মা → গা → ..... ইত্যাদি।

(ছ) **স্থায়ী :** যে-কোনো গানের প্রথম অংশের নাম স্থায়ী।

(জ) **অন্তরা :** এই শব্দের অর্থ হল 'পরবর্তী'। স্থায়ী'র পরবর্তী অংশের নাম অন্তরা।

(ঝ) **সঞ্চারী :** অন্তরা'র পরবর্তী যে অংশটি গানের শেষ অংশের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করার জন্য সঞ্চারিত হয়, তাকে সঞ্চারী বলে।

(ঞ) **আভোগ :** গানের পূর্ণতা-প্রাপ্তি হওয়ার অংশ তথা শেষ অংশটির নাম হল আভোগ। কোনো কোনো গীতরীতিতে এইস্থানে রচনাকারের নাম উল্লেখ করা থাকে।

(ট) **রাগ :** যে স্বরসমষ্টি শ্রোতাকে মুগ্ধ করে অর্থাৎ জনচিত্তরঞ্জনকারী স্বর সমষ্টিকেই বলা হয় 'রাগ' ("রঞ্জয়তি ইতি রাগঃ")। কয়েকটি রাগের নাম— ইমন, বিলাবল, ভৈরবী ইত্যাদি।

(ঠ) **ঠাট/থাট :** 'রাগ' তৈরি হওয়ার উৎস বা জনক হল ঠাট / থাট। ঠাট হল রাগের কাঠামো বিশেষ। হিন্দুস্থানী সংগীতে স্বীকৃত ঠাট হল ১০টি। এর থেকে অসংখ্য 'রাগ' সৃষ্ট হয়েছে। যথা— 'কল্যাণ' ঠাট থেকে 'ইমন' ইত্যাদি রাগ, 'বিলাবল' ঠাট থেকে 'বিলাবল' ইত্যাদি রাগ।

(ড) **তাল :** সংগীতে ছন্দের বিভিন্নতা সাপেক্ষে 'তাল'কে বলা হয় সংগীতের অঙ্গ; কতকগুলি মাত্রা ও বিভাগের সমষ্টিকেই সংগীতে 'তাল' বলে। তাল মূলত দুই প্রকার — সমপদী (যাদের বিভাগ সমান— যথা : দাদরা তাল, কাহারবা তাল, একতাল, তিনতাল বা ত্রিতাল ইত্যাদি)। এবং বিষমপদী (যাদের বিভাগ সমান নয়— যথা : রূপক তাল, তেওড়া তাল, ঝাঁপতাল ইত্যাদি)।

(ঢ) **লয় :** গীতের ছন্দকে সমান গতি এবং সমতা রক্ষা করার নাম 'লয়'। লয় প্রধানত তিন প্রকার — বিলম্বিত লয়, মধ্য লয়, দ্রুত লয়।

(ণ) **মাত্রা :** তাল মাপার একক সংখ্যাকে 'মাত্রা' বলে অর্থাৎ সমান গতির শব্দের নাম 'মাত্রা', যার দ্বারা 'লয়' এবং লয়ের আধারে 'তাল' নির্মিত হয়।

(ত) **বিভাগ :** মাত্রার সমষ্টিকে ছন্দোবদ্ধ করে কয়েকটি বিভাগে সাজানো হয়, যার দ্বারা তালের পূর্ণাঙ্গ গঠন এবং প্রকার (সমপদী বা বিষমপদী) ভেদ করা যায়, তাকে বলে 'বিভাগ'।

(থ) **মীড় :** সংগীতে একটি স্বর থেকে অপর স্বরের মধ্যবর্তী স্বরগুলিকে স্পর্শ করে যাওয়াকে 'মীড়' বলে।

(দ) **আলাপ :** কোনো রাগের রূপকে বিস্তৃত করে গায়ন বা বাদনের নাম আলাপ। কোনো রাগাশ্রয়ী গানের আগেও এই আলাপ গাওয়া হয়ে থাকে।

Scanned with CamScanner

(ধ) **তালি** : তালের মাত্রাসমষ্টির বিভাগ বোঝানোর সময় যে বিভাগে হাত দিয়ে আঘাত বা তালি দেওয়া হয়, তাকে 'তালি' বলে।

(ন) **খালি** : তালের মাত্রাসমষ্টির বিভাগ বোঝাতে এবং তালির সঙ্গে প্রভেদ দেখাতে যেখানে আঘাত করা বা তালি দেওয়া হয় না, তাকে 'খালি' বা ফাঁক' বলা হয়।

❑ ২.১.১ সুর তাল ও লয়-এর বৈশিষ্ট্য :

নিয়ন্ত্রিত ধ্বনিকেই সংগীতে সুর হিসেবে বিবেচিত করা হয়। সাধারণত যা আমাদের শ্রুতিগোচর তাকেই আমরা ধ্বনি বলি। ধ্বনির ছন্দময়তার উপর তার মাধুর্য ও কর্কশ ভাব প্রকাশিত হয়। ধ্বনি তাই সাধারণত দু-রকমের হয়। (১) সুরেলা ধ্বনি (২) কর্কশ ধ্বনি। সংগীতের ক্ষেত্রে আমরা সুরেলা ধ্বনি নিয়েই আলোচনা করব। শ্রবণযোগ্য যে কোনও ধ্বনিকেই সংগীতে শ্রুতি বলা হয়। এই শ্রুতি স্বরসমূহকে 'গ্রাম' বলে অভিহিত করা হয়। নিম্নে গ্রাম ও শ্রুতি সম্বন্ধে আলোচিত হল—

● **গ্রাম** : আমাদের সংগীতে শাস্ত্রে নির্দিষ্ট ব্যবধান যুক্ত ২২টি শ্রুতির উপর স্থাপিত স্বর সপ্তককেই বলা হয় গ্রাম। অর্থাৎ প্রাচীনকালে বর্তমানের উদারা, মুদারা ও তারা এই তিন স্বর সপ্তককে সাধারণত গ্রাম নামে অভিহিত করা হতো। গ্রাম ছিল তিন প্রকার যেমন—ষড়জ গ্রাম, মধ্যম গ্রাম ও গান্ধার গ্রাম। ষড়জ গ্রামের সপ্তস্বর যথাক্রমে ৪,৩,২,৪,৪,৩ ও ২ শ্রুতিবিশিষ্ট। অপরপক্ষে মধ্যম গ্রামের পঞ্চম ছিল ষড়জ গ্রামের পঞ্চম অপেক্ষা এক শ্রুতি কম। ফলে, সপ্তকের প্রতিটি স্বরই ছিল ষড়জ গ্রাম অপেক্ষা পরস্পর এক শ্রুতি কম। গান্ধার গ্রাম সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। "ভরত নাট্য শাস্ত্র"-তে ষড়জ ও মধ্যম গ্রামের উল্লেখ থাকলেও গান্ধার গ্রামের কোনো পরিচয় মেলে না। অনেকে মনে করেন, শুধুমাত্র গন্ধর্বরা এই গান্ধার গ্রামের ব্যবহার করতেন। কিন্তু গান্ধর্ব গীতির অবলুপ্তির সাথে সাথে গান্ধার গ্রাম ইতিহাস থেকে বিলীন হয়ে যায়। তবে ভরতপুত্র দত্তিল তাঁর 'দত্তিলম' নামক গ্রন্থে গান্ধার গ্রামের উল্লেখ করেন।

● **ষড়জ গ্রামের সপ্তস্বর** : যথাক্রমে ষড়জ চতুর্থ শ্রুতি (ছন্দোবতী)। ঋষভ সপ্তম শ্রুতি (রক্তিকা)। গান্ধার নবম শ্রুতি (ক্রোষী)। মধ্যম ত্রয়োদশ শ্রুতি (মার্জ্জনী)। পঞ্চম সপ্তদশ শ্রুতি (আলপিনী)। ধৈবত বিংশ শ্রুতি (রম্যা)। নিষাদ দ্বাবিংশ শ্রুতি (ক্ষোভিনী)।

পূর্বেই বলা হয়েছে, ষড়জ এবং মধ্যম গ্রামের স্বরের শ্রুতি সংখ্যা অভিন্ন হলেও ব্যতিক্রম শুধুমাত্র পঞ্চম স্বরের বেলায়। ষড়জ গ্রামের পঞ্চম থেকে মধ্যম গ্রামের পঞ্চম-এর স্থান এক শ্রুতি কম।

ebook.dascoaching.in

● **গান্ধার গ্রামের সপ্তস্বর** : যথাক্রমে নিষাদ প্রথম শ্রুতি (তীব্রা)। ষড়জ চতুর্থ শ্রুতি (ছন্দোবতী)। ঋষভ ষষ্ঠ শ্রুতি (রঞ্জনী)। গান্ধার দশম শ্রুতি (বজ্রিকা)। মধ্যম ত্রয়োদশ শ্রুতি (মার্জ্জনী)। পঞ্চম ষোড়শ শ্রুতি (সন্দিপিনী)। ধৈবত ঊনবিংশ শ্রুতি (রোহিণী)।

ষড়জ গ্রাম 'সা' মধ্যম গ্রাম 'ম' ও গান্ধার গ্রাম 'নি' স্বর থেকে সুরু করা হতো বলে উক্ত গ্রামগুলিকে যথাক্রমে—ষড়জ, মধ্যম ও নিষাদ গ্রাম বলা হতো। গন্ধর্বরা নিষাদ গ্রাম ব্যবহার করত বলে উক্ত গ্রামকে গান্ধর্ব গ্রাম বা পরবর্তীকালে গান্ধার গ্রাম নামে অভিহিত করা হয়।

২২টি শ্রুতিতে ষড়জ মধ্যম গান্ধার গ্রাম-এ স্বর স্থাপনা

শ্রুতিসংখ্যা	শ্রুতির নাম	ষড়জ গ্রাম	মধ্যম গ্রাম	গান্ধার গ্রাম
১	তীব্রা	...	...	নিষাদ
২	কুমুদ্বতী			
৩	মন্দা			
৪	ছদোবতী ...	ষড়জ ...	ষড়জ ...	ষড়জ
৫	দয়াবতী			
৬	রঞ্জনী			ঋষভ
৭	রক্তিকা ...	ঋষভ ...	ঋষভ	
৮	রৌদ্রী			
৯	ক্রোধী ...	গান্ধার ...	গান্ধার	
১০	বজ্রিকা ...	...	...	গান্ধার
১১	প্রসারিণী			
১২	প্রীতি			
১৩	মার্জ্জনী ...	মধ্যম ...	মধ্যম ...	মধ্যম
১৪	ক্ষিতি			
১৫	রক্তা			
১৬	সন্দিপিনী		পঞ্চম	পঞ্চম
১৭	আলাপিনী	পঞ্চম		
১৮	মদন্তী			
১৯	রোহিণী			ধৈবত
২০	রম্যা	ধৈবত	ধৈবত	
২১	উগ্রা			
২২	ক্ষোভিনী	নিষাদ	নিষাদ	

● **মূর্চ্ছনা** : বর্তমানে কোনো একটি স্বর থেকে অপর কোনো স্বরে দ্রুত গতিতে যাবার যে রীতি তাকেই মূর্চ্ছনা বলা হয়। কিন্তু প্রাচীনকালে সাত স্বরের ক্রমিক আরোহণকেই মূর্চ্ছনা বলা হতো। বর্তমানেও দক্ষিণ ভারতীয় সংগীতে আরোহণ-অবরোহণ ক্রমকে মূর্চ্ছনা

Scanned with CamScanner

বলা হয়। সপ্তস্বর বিশিষ্ট এক একটি গ্রাম থেকে প্রতিবার যদি ক্রমানুসারে আরোহ-অবরোহ করা হয় তাহলে আমরা প্রতিটি গ্রাম থেকে মোট সাতটি করে মূর্চ্ছনা পেতে পারি। ফলে পূর্বে উল্লিখিত তিনটি গ্রাম থেকে মোট ৭ × ৩ = ২১টি মূর্চ্ছনা পাওয়া যাবে। বলাবাহুল্য মূর্চ্ছনা দু' প্রকার, যথা—শুদ্ধ স্বরযুক্ত এবং বিকৃত স্বরযুক্ত। বিকৃত স্বরযুক্ত মূর্চ্ছনার তিনটি বিভাগ, যেমন—কাকলীকলিতা, সান্তরা এবং কাকলান্তরা। মূর্চ্ছনার তিনটি জাতি, যেমন—সাতস্বর যুক্ত মূর্চ্ছনা—সম্পূর্ণ মূর্চ্ছনা; ছয় স্বর যুক্ত মূর্চ্ছনা—ষাড়বী মূর্চ্ছনা; পাঁচস্বর যুক্ত মূর্চ্ছনা—ঔড়াবী মূর্চ্ছনা। বর্তমানে রাগগুলি যেমন ঠাটভিত্তিক তেমনি প্রাচীনকালের রাগগুলি মূর্চ্ছনাভিত্তিক ছিল। অর্থাৎ রাগের স্বর সমন্বয়ের উপর ভিত্তি করে কোনো রাগ কোনো মূর্চ্ছনার অন্তর্গত হবে তা নির্ধারিত হত।

❑ ২.১.২ তাল প্রসঙ্গ এবং সংগীতে তাল-তত্ত্ব (Context about Taal and Philosophical Knowledge of taal in music) :

গীত, বাদ্য, নৃত্য এই ত্রয়ীকলার সমন্বয়কে বলা হয় সংগীত। লক্ষ করলে দেখা যাবে যে উল্লিখিত প্রতিটি ধারায় তাল অপরিহার্য এবং প্রাসঙ্গিক। শাস্ত্রকারগণ তাল ব্যতিরেকে যে সংগীত পরিবেশিত হয় তাকে 'অনিবদ্ধ গান' হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। বলা বাহুল্য উক্ত অনিবদ্ধ গানে মাত্রাবদ্ধ তাল অনুপস্থিত থাকলেও সময় ভিত্তিক সুললিত লয় প্রকরণ বিশেষ একটা মাত্রার জন্ম দেয়। সংগীতে 'তাল' শব্দটির আভিধানিক অর্থ এবং প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আলোচিত হওয়া একান্ত আবশ্যক। ব্যাকরণগত বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে—**পুং-নৃত্য** তাণ্ডবের—'তা' এবং **স্ত্রী-নৃত্য** লাস্যের—'ল' এই দুটি শব্দ থেকে "তাল" কথাটির উদ্ভব হয়েছে।

দ্বিতীয়ত : 'তল' শব্দটির অর্থ হল প্রতিষ্ঠিত হওয়া অর্থাৎ যাতে গীত, বাদ্য ও নৃত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। অপরপক্ষে 'তল' ধাতু ঘঞ্ প্রত্যয়যোগে 'তাল' শব্দ ; দেখা যাচ্ছে যে, 'তল' প্রতিষ্ঠাবাচক শব্দ সুতরাং সর্ব্বপ্রকার সংগীত তালে সুপ্রতিষ্ঠিত। বর্তমানেও সংগীতে 'তাল' শব্দটি এবং এর তাৎপর্য যথেষ্ট পর্যালোচনার অপেক্ষা রাখে।

সুপ্রাচীনকাল থেকে আমাদের পূর্বসুরীগণ বিভিন্ন সময়ে সংগীতে তালের মহত্ত্ব বা এর কার্য্যকারিতার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে গ্রন্থাদিতে বিশেষ এক একটি অধ্যায়ে তাল সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। যদিও সংগীতে তালের উপস্থিতি সম্বন্ধে গুণীজনের একই বক্তব্য বা সুর অনুরণিত হয়েছে তাহলেও রূপায়ণের বৈচিত্র্য প্রণিধানের দাবি রাখে।

"ভরত নাট্যশাস্ত্র" থেকে শুরু করে—"সংগীত সময়সার", "দত্তিলম্", "সংগীত রত্নাকর" প্রভৃতি গ্রন্থের গ্রন্থকারগণ যথাক্রমে—মহর্ষি ভরত, দত্তিলমুনি, পার্শ্বদেব, মকরন্দকার নারদ, জগদেব মল্ল, পণ্ডিত সোমনাথ, শুভঙ্কর, সুধাকলস প্রমুখ গুণীগণ এই মন্তব্য করতে যে, মাত্রাবদ্ধ করে যতক্ষণ গানের অবয়ব বা সন্দর্ভ রচিত না হয় ততক্ষণ সংগীতের যথার্থ

রূপ-পরিগ্রহ বা প্রতিষ্ঠা পেতে পারে না। সুতরাং মাত্রা-বদ্ধ তাল বিভিন্ন ছন্দে ছন্দায়িত হয়ে স্বরূপ তথা পূর্ণ সৌষ্ঠবে প্রকাশমান। বিভিন্ন ছন্দোবদ্ধ তাল সুসামঞ্জস্যের প্রতীক এবং অন্তর্নিহিত মনের ছন্দায়িত গতির দ্যোতক। ফলে ছন্দবিহীন সংগীত বা তা অসামাঞ্জস্য বা অব্যাবস্থা সৃষ্টি করতে বাধ্য। অতএব অব্যবস্থা বা বিধিবদ্ধতাহীন শিল্পরাজ্যে কোনো প্রকার শোভা অথবা সুখ বর্দ্ধন করবার পরিবর্তে নৈরাজ্যজনিত শিল্পসুখ প্রদান করতে অসমর্থ। সংগীতে লয়-আশ্রিত মাত্রাবদ্ধ তাল, রঞ্জকতার রূপ পরিগ্রহ করে আমাদের মনে এক অনাবিল আনন্দ এবং সুখের জন্ম দিয়ে থাকে। তালের এই রূপ সংগীতে সম্পৃক্ত না হলে রঞ্জকতার উদ্ভব হবে না। বলা বাহুল্য রঞ্জকতা হল সংগীতের প্রথম এবং প্রধান দিশারী এই কথা মনে রেখে শোভা এবং সুখ বর্ধন করবার জন্য ছন্দবৈচিত্র্য আনয়নকল্পে একই সংখ্যক মাত্রায় অধিষ্ঠিত তালে, মাত্রাবদ্ধ বিভাগের মাধ্যমে আমাদের সংগীত প্রাজ্ঞগণ সচেষ্ট হয়েছেন।

'তাল' সংগীতে অধিষ্ঠান প্রসঙ্গে শার্ঙ্গদেব কৃত 'সংগীত রত্নাকর' গ্রন্থে যে সারগর্ভ মন্তব্য রয়েছে তা সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য—

"মুখ প্রধান দেহস্য নাসিকা মুখ মধ্যকে
তাল হীনং তথা গীতং নাসাহীনং মুখং যথা॥"

অর্থাৎ নাসিকা বিহীন মুখাবয়বের যেমন যথার্থতা বা পূর্ণতা হয় না, সেইরূপ তাল বিহীন গান বা গীতও নাসিকা বিহীন মুখাবয়বের অনুরূপ।

বহু সংখ্যক তালের প্রবর্তন হতে এটাই অনুভূত হয়, ছন্দোবদ্ধ বিভিন্ন রূপের তাল-প্রকাশ আমাদের সংগীতে কতখানি প্রয়োজনীয়। প্রয়োজন ব্যতিরেখে এই সংসারে কোনো জিনিস-ই নিরর্থক সৃষ্টি হয় না, সুতরাং এই কথা অনস্বীকার্য সংগীতের ক্ষেত্রেও পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে বহু তাল সংযোজিত হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ এবং কাজি নজরুল ইসলামের সংগীত সৃষ্টিও সুরাঙ্গনে অনুপ্রবেশে শিল্পায়নের বৈচিত্র্যের তাগিদে তাঁরা বেশ কয়েকটি তাল ও বিভিন্ন ছন্দের জন্ম দিয়েছেন। সংগীতের পূর্ব্বাপর এবং এর লৌকিক প্রয়োগক্রিয়া পদ্ধতির পর্য্যালোচনার সাপেক্ষে এই ধারণা অনুভূত হয় যে, সংগীতে তাল সৃষ্টি—শিল্পীর চেতনা থেকে উদ্ভূত। ফলে বিভিন্ন সময়ে বহু শিল্পী প্রয়োজনের তাগিদে বহু তাল সৃষ্টি করে গেছেন। তন্মধ্যে বেশ কিছু বর্ত্তমানেও প্রচলিত এবং অনেকগুলি অপ্রচলিত তাল সময়ের নিরিখে পরিত্যাজ্য। প্রশ্ন উঠিতে পারে তাল সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা কী এবং কেন? পূর্বেই আলোচিত হয়েছে তাল, সংগীতে প্রতিষ্ঠা এবং রঞ্জকতা আনয়ন করে। সুতরাং রঞ্জকতা বিহীন সংগীত, যে কোনো শ্রোতাকে সুখ বা আনন্দ থেকে বঞ্চিত করতে বাধ্য ফলে গীত, বাদ্য, নৃত্য এই তিনটি কলাতে তাল একান্ত প্রাসঙ্গিক ও প্রয়োজনীয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে গুরু পরম্পরা বহু বিদগ্ধজনকে প্রয়োজন ভিত্তিক তাল সৃষ্টিতে উদ্বুদ্ধ হতে দেখা যায়। এছাড়া সংগীতের ইতিহাস থেকে আমরা জানতে পারি যে, নান্দিকেশ্বর, শার্ঙ্গদেব, আমীর খসরু, জগদেব মল্ল, সুধাকলস প্রমুখের নাম এই প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখ্য।

Scanned with CamScanner

লয়—তালের গতির পরিমাপক মাত্রা, অপরপক্ষে মাত্রার গতির পরিমাপক হল লয়। লয় তিন প্রকারের ; যথা—বিলম্বিত, মধ্য ও দ্রুত।

মধ্য লয়—স্বাভাবিক গতির যে লয় একে মধ্য লয় বলা হয় অর্থাৎ মধ্য লয়ের গতি বিলম্বিত বা দ্রুত হবে না।

বিলম্বিত লয়—মধ্য লয় অপেক্ষা ধীর গতির লয়কে বিলম্বিত লয় বলা হয়।

দ্রুত লয়—মধ্য লয় অপেক্ষা দ্রুত গতির লয়কে দ্রুত লয় বলা হয়।

মাত্রা—তালের পরিমাপকে ছোটো ছোটো সমান অংশকে মাত্রা বলা হয়। সংগীতে বিশেষ বিশেষ সংখ্যক মাত্রার উপর ভিত্তি করেই এক একটি তালের সৃষ্টি হয়, যেমন—দাদরা ও ষষ্ঠীতাল ৬ মাত্রা, ঝাঁপতাল ও সুলতান ১০ মাত্রা, ধামার ঝুমরা ও দীপচন্দী তাল—১৪ মাত্রা বিশিষ্ট।

তাল—গান বাজনা করবার সময় বিশেষ কোনো মাত্রার মধ্যে আবদ্ধ করে লয় সহকারে গাইতে হয়। সেই বিশেষ মাত্রার সমষ্টিকে নিয়ে তাল গঠিত হয়। বিভিন্ন তাল অনুযায়ী মাত্রার বিভাগও ভিন্ন হয় এবং বিভাগগুলি সম, তালি দিয়ে চিহ্নিত হয়। যদি বিভাগগুলির মাত্রা সংখ্যা সমান হয় তবে তাকে সমপদী তাল বলে। অন্যথায় বিষমপদী তাল বলা হয়। যেমন, দাদরা—(৬ মাত্রা) ছন্দ ৩।৩ সমপদী। ঝাঁপতাল—(১০ মাত্রা) ছন্দ ২।৩।২।৩ বিষমপদী।

ছন্দ—কবিতার ধ্বনি এবং সাহিত্য রূপায়ণে ছন্দ অপিরহার্য। এক কথায় ধ্বনির বিভিন্ন তরঙ্গায়িত বৈচিত্র্যপূর্ণ বিভাগকেই ছন্দ বলা হয়। তালের ক্ষেত্রে বিভিন্ন মাত্রা বিশিষ্ট বিভাগের দ্বারা উক্ত ছন্দ রূপায়িত হয়ে থাকে। যেমন আমরা জানি যে, ঝাঁপতাল ও সূলতাল ১০ মাত্রা বিশিষ্ট। বিভাগ যথাক্রমে ২।৩।২।৩=১০ এবং ২।২।২।২।২=১০; অপরপক্ষে ধামার, ঝুমরা ও দীপচন্দী ১৪ মাত্রা বিশিষ্ট। বিভাগ যথাক্রমে ৫।২।৩।৪ অথবা ৩।২।২।৩।৪=১৪ মাত্রা এবং ৩।৪।৩।৪=১৪। ফলে আমাদের তাল বিভিন্ন ছন্দ এবং বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ। উক্ত ছন্দ এবং বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ। উক্ত ছন্দ দু'ভাগে বিভক্ত। যে ছন্দের বিভাগের মাত্রা সংখ্যা সমান তাকে সমপদী ছন্দ ও যে ছন্দেব বিভাগের মাত্রা সংখ্যা অসমান বা সমান নয় তাকে অসমপদী বা বিষমপদী ছন্দ বলে।

❑ ২.১.৩ লয়, মাত্রা, তাল ও ছন্দের মধ্যে পার্থক্য (Difference between laya, Matra, Taal, Chhanda) :

লয়কে মাত্রার গতির সূক্ষ্মতম পরিমাপক অংশ বলা যেতে পারে। ঘড়িকে রূপক হিসেবে সামনে রেখে লয়, মাত্রা ইত্যাদি বিষয়গুলি আলোচিত হলে বোধহয় শিক্ষার্থীর পক্ষে সহজসাধ্য এবং বোধগম্য হবে। তাই সেকেন্ড, মিনিটের অবতারণা করছি। আমরা জানি যে, ছন্দ বৈচিত্রহীন একঘেয়ে যে ঘড়ির টিকটিক শব্দ একে সেকেন্ড বলা হয়। উক্ত ৬০ সেকেন্ড ১

মিনিট, ৬০ মিনিট ১ ঘণ্টা এবং ২৪ ঘণ্টায় ১ দিন হয়ে থাকে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, সেকেন্ড তথা মিনিট এবং ঘণ্টা ১ দিন বা ২৪ ঘণ্টার সময়ের সূক্ষ্ম পরিমাপক অংশ। সেইরূপ লয়, মাত্রার এবং মাত্রা, তালের পরিমাপক অংশ বিশেষ। লয়ের গতিতে কোনো ঝোঁক বা ধাক্কা থাকবে না। মাত্রার গতিতে লয় অপেক্ষা একটু ঝোঁক থাকলেও অতি সামান্য। অপরপক্ষে, বিশেষ বিশেষ ঝোঁক দিয়ে তালের বৈশিষ্ট্য এবং ছন্দ সৃষ্টি হয়ে থাকে।

লয়ের গতির উপর নির্ভর করে তালের গতি নিরূপিত হয়, লয় তিন প্রকার। যথা—বিলম্বিত, মধ্য এবং দ্রুত লয়।

❑ ২.১.৪ সংগীতে লয় তথা তালের মহত্ত্ব (Nabicity of Taal in Music) :

এই মহান বিশ্বে গ্রহ-নক্ষত্র-জ্যোতিষ্কের দিকে লক্ষ করলে দেখা যায় যে সবই যেন নিয়মের রাজত্বের দাসস্বরূপ। গ্রহ এবং উপগ্রহগুলি স্ব স্ব নিয়মে গতি এবং সময়ের ব্যবধানে নিজ আবর্ত্তে ঘূর্ণায়মান। আমাদের পৃথিবীও গ্রহাদির মধ্যে অন্যতম। সূর্য উদয় এবং অস্ত অর্থাৎ দিবা এবং রাত্রি, চন্দ্রের অমাবস্যা-পূর্ণিমা এবং প্রকৃতির রূপ পরিগ্রহে দুমাস অন্তে ঋতু পরিবর্তন, সব কিছুর মধ্যেই গতি এবং সময়ের ইঙ্গিত রয়েছে, এই সময় এবং গতির ব্যতিক্রমে সৃষ্টির বিনাশ অবশ্যম্ভাবী।

এই লয়বদ্ধ জগতে মানুষ প্রকৃতিরই সৃষ্ট জীবদের মধ্যে অন্যতম এবং সর্বশ্রেষ্ঠ। সুতরাং তার জীবনের দৈনন্দিন কার্যকলাপ, সাহিত্য এবং শিল্পসৃষ্টিতে অনুরূপ গতির প্রকাশ অবশ্যম্ভাবী। ললিত কলার মধ্যে সংগীত একটি সবিশেষ স্থান দখল করে রয়েছে যা প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে পরিব্যাপ্ত এবং তা প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না।

কথায়, চিন্তায়, চলনে, বলনে পরিমিতিবোধ, শিল্পীর শিল্পত্বের প্রথম এবং প্রধান উপজীব্য। সাধারণত গীত, বাদ্য এবং নৃত্য এই তিন কলার একত্র সমন্বয়কেই আমরা সংগীত বলে থাকি। সুতরাং কণ্ঠসংগীত, বাদ্য তথা নৃত্যের ক্ষেত্রেও এই গতি এবং ছন্দ অপরিহার্য্য। বিশেষ বিশেষ ছন্দের ভিত্তিতেই তালের উৎপত্তি, সুতরাং সংগীতের ক্ষেত্রে মাত্রার সমষ্টিগত তাল অপরিহার্য। বর্তমান কালেও যে অনিবদ্ধ গান বা বাদ্য আমরা শুনে থাকি তাতে তালযন্ত্র না বাজালেও তার আলাপ প্রক্রিয়ায় লয় থাকে। উক্ত লয় এবং ছন্দ তালযন্ত্র ব্যতিরেকেও আমাদের মনকে বিশেষ এক রসে আপ্লুত করতে সক্ষম হয়। এই লয়ের দ্বারাই মাত্রা এবং মাত্রার সমষ্টির দ্বারা তাল সৃষ্ট। সুতরাং মাত্রাবদ্ধ তাল সংগীতের ক্ষেত্রে অপরিহার্য। তাল, সংগীতে প্রযোজ্য হওয়ার ফলে বিশেষ ছন্দেরও উদ্ভাবন হয়, একই মাত্রা সমষ্টির তাল বিশেষ বিশেষ ছন্দের উপর ভিত্তি করে নব নব রস সৃষ্টির সহায়ক। প্রসঙ্গক্রমে বলা যেতে পারে চৌদ্দ মাত্রা সমষ্টির তাল ঝুমরা ও আড়া-চারতাল এবং দশমাত্রা সমষ্টির তাল সুরতাল ও ঝাঁপতাল মাত্রা সংখ্যায় এক হলেও ছন্দে ভিন্ন। ফলে সংগীত পরিবেশনায় এই ছন্দ বিশেষ একটি নিজস্ব গতিতে প্রতীয়মান। যদি তালের নব নব ছন্দ আমাদের সংগীত জগতে

Scanned with CamScanner

সৃষ্টি না হতো তাহলে সংগীতে নিবন্ধগান নব নব রূপ পরিগ্রহ করতে সমর্থ হতো না। শিল্পক্ষেত্রে এই ছন্দ প্রয়োজনীয় এবং প্রাসঙ্গিক। কোনো অঙ্কনশিল্পী যেমন শিল্প সৃষ্টিতে তুলির স্পর্শে তার শিল্পটিতে জীবন্ত, উপভোগ্য এবং পরিস্ফুট করে তোলেন, ঠিক একই রূপে তাল নব নব ছন্দে সংগীতে নব রূপ পরিগ্রহ করতে সাহায্য করে। সুতরাং সংগীতে তাল অনিবার্য এবং অপরিহার্য। এখন দেখা যাচ্ছে যে, তালের মূল উৎস লয়। উক্ত লয়ের ভিন্ন ভিন্ন গতির উপর ভিত্তি করে মাত্রা তথা তালের গতি নির্ধারিত হয়। যে শিল্পীর লয় বোধ যত বেশি হবে তিনি তালের দক্ষতা এবং লয়কারিতে অর্থাৎ বাঁট্, তান, তিহাই প্রভৃতি পরিবেশনেও অনায়াস লভ্য হবেন। সুতরাং সংগীতের প্রতিটি ধারায় বাঁট্, তাল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে এতে কোনো সন্দেহ নেই। এছাড়া তিনি বৈচিত্র্যপূর্ণ ছন্দপ্রকরণ ও বিশেষ নৈপুণ্য প্রদর্শনে সক্ষম হবেন।

আবর্তন—তাল 'সম' হতে শুরু করে পুনরায় 'সমে' ফিরে আসা পর্য্যন্ত এই যে পরিক্রম তাকে আবর্তন বা আবৃত্তি বলা হয়।

দ্বিগুণ—দুই মাত্রাকে একমাত্রায় আবদ্ধ করে দেখাবার যে প্রক্রিয়া তাকে দ্বিগুণ লয় বলা হয়।

তিনগুণ—তিনমাত্রাকে একমাত্রায় আবদ্ধ করে দেখবার যে প্রক্রিয়া তাকে তিনগুণ লয় বলা হয়।

চৌগুণ—চারটি মাত্রাকে এক মাত্রায় আবদ্ধ করে দেখাবাব যে প্রক্রিয়া তাকে চৌগুণ লয় বলা হয়।

ঠেকা—তবলা, পাখোয়াজ বা তাল যন্ত্রে বোল সহযোগে সম, তালি, খালি দিয়ে যে রচনা করা হয় তাকেই ঠেকা বলা হয় অর্থাৎ বিভিন্ন মাত্রার সমষ্টি, তবলা বা অন্যান্য তালযন্ত্রের বোল ও বিভাগের দ্বারা যে বৈচিত্র্যপূর্ণ ছন্দগ্রাহ্য বোল তাকে ঠেকা বলা হয়। বলা বাহুল্য আমাদের সংগীতে একই সংখ্যক মাত্রাবিশিষ্ট তাল, বিভাগের এবং মাত্রা সংখ্যার হেরফেরের দরুন বিভিন্ন ছন্দের সৃষ্টি হয়। আমাদের সংগীতে ৫ মাত্র থেকে ১৬ মাত্রা বিশিষ্ট তাল বিশেষ প্রচলিত। পূর্বে ৩৬ মাত্রা পর্যন্ত তাল প্রচলিত থাকলেও বর্তমানে উক্ত তালের প্রচল আর দেখা যায় না।

ঠাহ বা ঠায়—লয়ের স্বাভাবিক গতিকে ঠাহ লয় বলা হয় অর্থাৎ এই লয় অধিক বিলম্বিত বা দ্রুত হবে না। এক কথায় মধ্যলয়ের যে গতি তাকে ঠায় বা ঠাহ লয় বলা হয়।

❑ ২.১.৫ বিভাগ এবং তালে এর প্রয়োজনীয়তা (Division and necessity of Taal) :

আমাদের সংগীতে তাল বা গানের ক্ষেত্রে যে ভাগগুলি দেখা হয় একেই বিভাগ বলে। যেমন—দাদরা তালে তিন মাত্রাবিশিষ্ট দুটি ও কার্ফাতালের চার মাত্রাবিশিষ্ট দুটি বিভাগ

প্রদর্শন করা হয়। আমাদের সংগীতে বহু তাল প্রচলিত আছে। তন্মধ্যে আবার একই মাত্রা সংখ্যা বিশিষ্ট কিন্তু বিভাগগুলি ভিন্ন, ঝাঁপতাল ও সুলতাল। এই দুটি তালই ১০ মাত্রা বিশিষ্ট। কিন্তু প্রথমটির বিভাগ ২।৩ মাত্রা বিশিষ্ট। দ্বিতীয়টির বিভাগ ২ মাত্রা বিশিষ্ট। সেইহেতু দুটি তালেরই তালি-খালি ভিন্ন এবং ছন্দও ভিন্নপ্রকার। সুতরাং "বিভাগ" তালের ক্ষেত্রে বিশেষ মহত্ত্বপূর্ণ।

আবার গীতের অবয়বকেও বিভাগ বা ধাতু বা তুক্ বলা হয়ে থাকে। এই বিভাগগুলি গানের বা স্বরবিস্তারের স্থান নির্দ্দেশক। এই বিভাগগুলিকে বর্তমানে স্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী ও আভোগ নামে অভিহিত করা হয়। প্রবন্ধাদির গানের সময় উক্ত বিভাগগুলির নাম ছিল ভিন্ন, যেমন—উদ্‌গ্রাহ, মেলাপক, ধ্রুব, অন্তরা, আভোগ।

সম—তাল আরম্ভ করবার প্রথম মাত্রাটিকে সম বলা হয়। তাল লিখিবার সময় সম চিহ্নকে '+', '×' বা কোন মতে ১, ২ ইত্যাদি দ্বারা চিহ্নিত করা হয়। এর ব্যতিক্রম ও লক্ষণীয় কারণ দুই একটি তাল অনেক সময় ফাঁক থেকে শুরু হয়। যেমন—রূপক তাল।

তালি বা ভরি—তাল প্রদর্শন কালে বিভাগের যে বিশেষ বিশেষ স্থানগুলিকে আঘাত করে বোঝান হয় তাকে তালি বলা হয়।

খালি—তাল প্রদর্শন কালে বিভাগের যে অংশে তালির পরিবর্তে খালি বা ফাঁক প্রদর্শিত হয় একে ফাঁক বা খালি বলা হয়। কোনো কোনো তালে একাধিক খালি প্রদর্শিত হয়ে থাকে।

■ **তাল-পরিচিতি :**

❖ **জয়জয়ন্তী (ধামার) বিলম্বিত**

স্থায়ী

০				৩				+								২															
ভ	লী	ভ	।	ই	ऽ	ব্রি	জ	।	হো	ऽ	ऽ	রী	ऽ	।	ঘ্	ऽ	র্	ऽ													
০				৩				+								২															
আ	ऽ	য়ে।	ঘ	ऽ	ऽ	ন	।	শ্যা	ऽ	ऽ	ऽ	ऽ	।	ম	ऽ															

দ্বিগুণ—স্থায়ীর দ্বিগুণ করা হতেছে। এখন লক্ষ করতে হবে যে, সম্পূর্ণ স্থায়ীটি কত আবর্তনে আছে এবং মুখড়াটি কত মাত্রার। এখানে স্থায়ীর মোট মাত্রাসংখ্যা ২৮ এবং মুখড়া আরম্ভ হয়েছে ৮ম মাত্রা হতে অর্থাৎ মুখড়াটি ৭ মাত্রার। এখন মুখড়ার (৭ মাত্রায়) সঙ্গে স্থায়ীর মোট মাত্রা সংখ্যার (২৮ মাত্রা) যোগ করতে হবে। ২৮+৭=৩৫ মাত্রা।

Follow Our B.Ed Related Website>>

www.dascoaching.in

Scanned with CamScanner

৩৫ ÷ ২ = ১৭$\frac{১}{২}$ = ১৪ + ৩ $\frac{১}{২}$ = অর্থাৎ এক আবৃত্তি + ৩ $\frac{১}{২}$। এইবার ১৪ মাত্রা হতে ৩ $\frac{১}{২}$ মাত্রা বাদ দিতে হবে। ১৪ – ৩ $\frac{১}{২}$ = ১০$\frac{১}{২}$; মাত্রা পর হতে দ্বিগুণ আরম্ভ করতে হবে।

০ ৩ + ২

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭

ভ লী ভ । ই S ব্রি জ । হো S S রী S । ঘS রS

০ ৩ + ২

৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪

আ S য়ে । Sভ লী ভ ইS ব্রিজ । হোS Sরী Sঘ র আ Sয়ে । ঘS Sন ।

০ ৩ +

শ্যাS SS Sম । Sভ লী ভ ইS ব্রিজ । হো S S রী S ।

৩৫ ÷ ৩ = ১১$\frac{২}{৩}$; ১৪ – ১১ $\frac{২}{৩}$। সুতরাং সম হতে ২$\frac{১}{৩}$ মাত্রা বাদ দিয়ে শুরু করতে হবে।

This E-Book Download From>>

www.ebook.dascoaching.in

Follow Our B.Ed Related Website>>

www.dascoaching.in

০ ৩ +

১ ২ ৩ ৪ ৫

ভ লী ভ । ই S ব্রি জ । হো S S, ভ,লী ভ, ই, S ব্রি, জ, হো

২ ০

৬ ৭ ৮ ৯ ১০

S, S, রী S, ঘS,রS, । আ, S, য়ে ঘ, S, S, ন, শ্যা, S

৩ +

১১ ১২ ১৩ ১৪

S, S, S ম, S, ভ লী, ভ, ই, S, ব্রি, জ । হো S S

চৌগুণ ঃ—

৩৫ ÷ ৪ = ৮ $\frac{৩}{৪}$; ১৪–৮ $\frac{৩}{৪}$ = ৫ $\frac{১}{৪}$ । সম হইতে ৫ $\frac{১}{৪}$ মাত্রা বাদ দিয়া চৌগুণ সুরু করিতে হইবে।

০ ৩ + ২

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭

ভ লী ভ । ই S ব্রি জ । হো S S রী S । S, ভ, লী,ভ ই,Sব্রি,জ

০ ৩

৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩

হো, S, S, রী S, ঘS, রS, আ S, য়ে, ঘ, S । S, ন, শ্যা, S S,S, S,ঘ S, ভ লী, ভ

+

১৪

ই, S, ব্রি, জ । হো S S

Scanned with CamScanner

❖ গণিতের সাহায্যে তালের লয়কারী প্রদর্শন :

প্রথমেই দেখা যাক্ লয়কারী কথাটির অর্থ কী? আমরা জানি যে, আমাদের সংগীতে ভিন্ন ভিন্ন মাত্রা ও ছন্দের তাল প্রচলিত। এই ভিন্ন মাত্রা বিশিষ্ট তালকে গণিতের সাহায্যে দু-গুণ, তিনগুণ, চৌগুণ, আড়, কুয়াড়, বিয়াড় ইত্যাদি লয়ে আবদ্ধ করবার যে বিজ্ঞানসম্মত প্রণালী একেই সাঙ্গীতিক অর্থে লয়কারী বলা হয়।

দু-গুণ অর্থাৎ দু-মাত্রাকে একমাত্রায় প্রদর্শন। **তিনগুণ** অর্থাৎ তিনমাত্রাকে একমাত্রায় প্রদর্শন। **চৌগুণ** অর্থাৎ চারমাত্রাকে একমাত্রায় প্রদর্শন। **আড়লয়** (দেড় গুণ) অর্থাৎ তিনমাত্রাকে দুই মাত্রায় প্রদর্শন, **কুয়াড় লয়** (সওয়া গুণ) অর্থাৎ পাঁচ মাত্রাকে চার মাত্রায় প্রদর্শন, **বিয়াড় লয়** (পৌনে দুগুণ) অর্থাৎ সাত মাত্রাকে চার মাত্রায় প্রদর্শন। এই গাণিতিক বিধিবদ্ধ প্রক্রিয়াকে লয়কারী বলা হয়। নিম্নে 'ত্রিতাল' তালটির লয়কারী দেখান হল।

সূত্র : তালের মোট মাত্রা সংখ্যা ÷ যতগুণ প্রয়োজন = ভাগফল

এইবার তালের মোট মাত্রাসংখ্যা হতে ভাগফলের বিয়োগ করে যা হবে, সেই মাত্রা সংখ্যা সম থেকে বাদ দিয়ে লয়কারী আরম্ভ করতে হবে।

ঠেকা ত্রিতাল—

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

ধা ধিন ধিন ধা । ধা ধিন ধিন ধা । না তিন তিন তা

× ২ ০

১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১

ধা ধিন ধিন ধা । ধা

৩ ×

ত্রিতালের দ্বিগুণ লয় :—

১৬ ÷ ২ = ৮, ১৬ − ৮ = ৮

সুতরাং সম হইতে আটমাত্রা বাদ দিয়া লয়কারী করা হইল।

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮

ধা ধিন্ ধিন্ ধা। ধা ধিন্ ধিন্ ধা

×

২

৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪

ধা ধিন্ ধিন্ ধা ধা ধিন্ ধিন্ ধা । না তিন্ তিন্ তা

০ ৩

১৫ ১৬ ১

ধা ধিন্ ধিন্ ধা । ধা

×

তিনগুণ লয় :—

১৬ ÷ ৩ = ৫$\frac{১}{৩}$, ১৬ − $\frac{১৬}{৩}$ = $\frac{৩২}{৩}$ = ১০$\frac{২}{৩}$

সুতরাং সম থেকে ১০$\frac{২}{৩}$ মাত্রা বাদ দিয়ে লয়কারী শুরু করা হল। এইবার $\frac{২}{৩}$ মাত্রাকে কীভাবে দেখান হবে—দুই অবগ্রহ এবং মূলঠেকার প্রথম মাত্রাকে একমাত্রায় দেখিয়ে লয়কারী শুরু করা হল।

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

ধা ধিন্ ধিন্ ধা । ধা ধিন্ ধিন্ ধা । না তিন্ --ধা ধিন্ ধিন্ ধা ।

× ২ ০

১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১

ধা ধিন্ ধিন্ ধা না তিন্ তিন্ তা ধা ধিন্ ধিন্ ধা । ধা

৩ ×

চৌগুণ লয় :—

১৬ ÷ ৪ = ৪, ১৬ - ৪ = ১২

সুতরাং সম থেকে বারো মাত্রা বাদ দিয়ে লয়কারী শুরু করা হল।

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

ধা ধিন ধিন ধা । ধা ধিন ধিন ধা । না তিন তিন তা

× ২ ০

১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১

ধা ধিন ধিন ধা ধা ধিন ধিন ধা না তিন তিন তা ধা ধিন ধিন ধা । ধা

৩ ×

Scanned with CamScanner

◆ **আড়লয় বা দেড়গুণ ছন্দ ($\frac{৩}{২}$) :** এই লয়কারীরে কথা ভাষায় অনেকে আড়ি শব্দও
বলে থাকেন। নির্দিষ্ট মাত্রা সংখ্যা বিশিষ্ট কোনো তালের যে মাত্রাসংখ্যা তার দেড়গুণ
মাত্রাসংখ্যা সম্বলিত বোল সমূহকে যদি ঐ নির্দিষ্ট তালের মাত্রাসংখ্যার মধ্যে সমবণ্টনের
মাধ্যমে বিভাজিত করা হয় তা হল যে শৈল্পিক ছন্দ-বৈচিত্র্য হয় একে আড়লয় বা আড়িছন্দ
বলা হয়ে থাকে। কোনো নির্দ্ধারিত তালের আড়লয়কারী প্রদর্শন কল্পে ঐ নির্দিষ্ট তালের
প্রতিটি বোলের পরে একটি করে '—' চিহ্ন প্রয়োগ করা হয়, যাকে অবগ্রহ বলা হয়
(বলাবাহুল্য, অনেক সুধীজন 'S' এই রূপেও অবগ্রহকে চিহ্নিত করে থাকেন।) এই '—
চিহ্ন সমেত তিনটি অনুমাত্রাকে বন্ধনী দ্বারা একত্রিত করা হয়। অতঃপর মাত্রাসংখ্যা, তালি
খালি, বিভাগ ইত্যাদি প্রদর্শিত করা হয়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, উক্ত আড়, কুয়াড় ও বিয়াড় লয়কারী প্রদর্শন করবার
নিমিত্ত নিম্নলিখিত নিয়মাবলি তথ্য সূত্র সমূহ যথাযথ প্রয়োগ করা একান্ত বাঞ্ছনীয় এবং
বিধিসম্মত।

◆ **সূত্র সমূহ :**

১। অবগ্রহ নির্ণয় সূত্র : (লব × হর – লব) ÷ লব

২। ভগ্নাংশ সম্পন্ন মাত্রা সংখ্যা নির্ণয় : নির্দ্ধারিত তালের মাত্রাসংখ্যা ÷ নির্দ্ধারিত লয়কারী

৩। পূর্ণ মাত্রাসংখ্যা নির্ণয় : নির্দ্ধারিত তালের মাত্রাসংখ্যা ভগ্নাংশ সম্পন্ন মাত্রা সংখ্যা

আপনাদের জ্ঞতার্থে ত্রিতালের মাধ্যমে আড় লয়কারী গাণিতিক প্রক্রিয়ায় প্রদর্শিত হল

অবগ্রহ নির্ণয় = (৩ × ২ – ৩) ÷ ৩ = (৬ – ৩) ÷ ৩ = ৩ ÷ ৩ = ১

ভগ্নাংশ সম্পন্ন মাত্রা = ১৬ ÷ $\frac{৩}{২}$ = ১৬ × $\frac{২}{৩}$ = $\frac{৩২}{৩}$ = ১০ $\frac{২}{৩}$

পূর্ণসংখ্যক মাত্রা = ১৬ – $\frac{৩২}{৩}$ = $\frac{৪৮-৩২}{৩}$ = $\frac{১৬}{৩}$ = ৫ $\frac{১}{৩}$

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯

ধা ধিন ধিন ধা | ধা S ধা- ধিন - ধিন - ধা - | ধা- ধিন

× ২ ০

১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১

- ধিন - ধা - না - তিন - | তিন - তা - ধা - ধিন - ধিন - ধা - | ধা

৩ ×

◆ **আড়লয়ের বিপরীত বা উল্টা আড় ($\frac{২}{৩}$) :** আড়লয় বলাতে আমরা বুঝি তিনমাত্রাকে দু-মাত্রায় দেখান, অপরপক্ষে উল্টা আড়লয় হল আড়লয়ের ঠিক বিপরীত অর্থাৎ দু-মাত্রাকে তিনমাত্রায় প্রদর্শন। ১৬ ÷ $\frac{২}{৩}$ = ২৪, ১৬ – ২৪ = –৮

এইক্ষেত্রে –৮ কথাটি পাঠক-পাঠিকার কাছে কিছুটা শক্ত বোধ হতে পারে, তাই বিষয়টি আলোচনা সাপেক্ষ।

এখন উপরের সূত্র হতে দেখা যাচ্ছে যে উক্ত লয়কারীকে ২৪ মাত্রায় দেখাতে হবে। কিন্তু আমরা জানি ত্রিতালের এক আবৃত্তি ১৬ মাত্রা, সুতরাং সহজেই বোঝা যায় এক আবৃত্তিতে উক্ত লয়কারী দেখানো সম্ভবপর নয়। এই ক্ষেত্রে–৮ কে বোঝাতে হলে সমের আটমাত্রা আগে হতে লয়কারী শুরু করতে হবে। তাই ত্রিতালের দুই আবৃত্তি অর্থাৎ ৩২ মাত্রা পূর্ণ করলেই আমরা সহজে সমের আটমাত্রা পূর্ব্ব হতে লয়কারী শুরু করতে ও ২৪ মাত্রায় উক্ত লয়কারী প্রদর্শন করতে পারি। মূল ঠেকার প্রতিটি মাত্রার সঙ্গে দুটি করে অবগ্রহ নিয়ে উক্ত অবগ্রহ সমেত দুটি করে মাত্রাকে একমাত্রায় অন্তর্গত ধরে নবম মাত্রা হতে লয়কারী করতে হবে।

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০

ধা ধিন্ ধিন্ ধা | ধা ধিন্ ধিন্ ধা | ধা - - ধিন

× ২ ০

১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬

- - ধিন - | - ধা - - ধা - - ধিন্

৩

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮

- - ধিন্ - - ধা - - | না - - তিন্ - - তিন্ -

× ২

৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১

- তা - - ধা - - ধিন্ | - - ধিন্ - - ধা - - | ধা

০ ৩ ×

Scanned with CamScanner

◆ **কুয়াড়লয় বা সওয়াগুণ ছন্দ** ($\frac{৫}{৪}$) : এই লয়কারীকে সওয়াগুণ ছন্দও বলা হয়। নির্দি
মাত্রাসংখ্যা বিশিষ্ট কোনো তালের যে মাত্রাসংখ্যা তার সওয়াগুণ মাত্রাসংখ্যা সম্বলিত বো
সমূহকে যদি ঐ নির্দিষ্ট তালের মাত্রাসংখ্যার মধ্যে সমবন্টনের মাধ্যমে বিভাজিত করা হয় ত
হলে যে শৈল্পিক ছন্দ বৈচিত্র্য প্রকটিত হয় একে কুয়াড় লয় বলা হয়। কোনো নির্ধারিত তালে
কুয়াড় লয়কারী প্রদর্শন কল্পে ঐ নির্দিষ্ট তালের প্রতিটি বোলের পরে তিনটি করে '—' চি
প্রয়োগ করা হয়। অতঃপর এই '—' চিহ্ন সমেত পাঁচটি অন্তরাকে বন্ধনী দ্বারা একত্রিত ক
মাত্রাসংখ্যা, তালি, খালি, বিভাগ ইত্যাদির চিহ্ন প্রদর্শিত করা হয়।

আপনাদের জ্ঞাতার্থে ত্রিতালের মাধ্যমে কুয়াড় লয়কারী গাণিতিক প্রক্রিয়ায় প্রদর্শিত হ

অবগ্রহ নির্ণয় = (৫ × ৪−৫) ÷ ৫ = (২০−৫) ÷ ৫ = ১৫ ÷ ৫ = ৩

ভগ্নাংশ সম্পন্ন মাত্রা = ১৬ ÷ $\frac{৫}{৪}$ = ১৬ × $\frac{৪}{৫}$ = $\frac{৬৪}{৫}$ = ১২ $\frac{৪}{৫}$

পূর্ণসংখ্যক মাত্রা = ১৬ − $\frac{৬৪}{৫}$ = $\frac{৮০ - ৬৪}{৫}$ = $\frac{১৬}{৫}$ = ৩ $\frac{১}{৫}$

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮

ধা ধিন ধিন Sধা- - - । ধিন- - - ধিন - - - ধা- - - ধা- - - ধিন - - - ।

× ২

৯ ১০ ১১ ১২

ধিন- - - ধা - - - না- - - তিন- - - তিন- - - ।

০

১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১

তা- - - ধা - - - ধিন- - - ধিন- - - ধা- - - । ধা

৩ ×

◆ **বিয়াড় লয় বা পৌনে দু-গুণ ছন্দ** ($\frac{৭}{৪}$) : এই লয়কারীকে পৌনে দু-গুণ ছন্দও বলা হয়। নির্দিষ্ট মাত্রাসংখ্যা বিশিষ্ট কোন তালের যে মাত্রা সংখ্যা তার পৌনে দু-গুণ মাত্রাসংখ্যা সম্বলিত বোল সমূহকে যদি ঐ নির্দিষ্ট তালের মাত্রাসংখ্যার মধ্যে সমবন্টনের মাধ্যমে বিভাজিত করা হয় তাহলে যে শৈল্পিক ছন্দ বৈচিত্র্য প্রকটিত হয় তাকে বিয়াড় লয় বলা হয়। কোনো নির্ধারিত তালের বিয়াড় লয়কারী প্রদর্শন কল্পে ঐ নির্দিষ্ট তালের প্রতিটি বোলের

পরে তিনটি করে '—' চিহ্ন প্রয়োগ করা হয়। অতঃপর এই '—' চিহ্ন সমেত সাতটি অনুমাত্রাকে বন্ধনী দ্বারা একত্রিত করে মাত্রাসংখ্যা, তালি, খালি, বিভাগ ইত্যাদির চিহ্ন প্রদর্শিত করা হয়।

আপনাদের জ্ঞাতার্থে ত্রিতালের মাধ্যমে বিয়াড় লয়কারী গাণিতিক প্রক্রিয়ায় প্রদর্শিত হল:

অবগ্রহ নির্ণয় = (৭× ৪−৭) ÷ ৭ = (২৮−৭) ÷ ৭ = ২১ ÷ ৭ = ৩

ভগ্নাংশ সম্পন্ন মাত্রা = ১৬ ÷ $\frac{৭}{৪}$ = ১৬ × $\frac{৪}{৭}$ = $\frac{৬৪}{৭}$ = ৯ $\frac{১}{৭}$

পূর্ণসংখ্যক মাত্রা = ১৬−$\frac{৬৪}{৭}$ = $\frac{১১২ - ৬৪}{৭}$ = $\frac{৪৮}{৭}$ = ৬ $\frac{৬}{৭}$

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮

ধা ধিন ধিন ধা । ধা ধিন SSSSSSধা - - - ধিন - - - ।

× ২

৯ ১০ ১১ ১২

ধিন- - - ধা- - - ধা- - - ধিন- - - ধিন- - - ধা - - - না- - - ।

০

১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১

তিন- - - তিন- - - তা- - - ধা- - - ধিন- - - ধিন - - - ধা- - - । ধা

৩ ×

◆ **এক আবর্ত্তনে তালের লয়কারী প্রদর্শন :**

হিন্দুস্থানী সংগীত পদ্ধতিতে একই মাত্রার ভিন্ন ভিন্ন তাল প্রচলিত আছে। যেমন ঝাঁপতাল ও সুলতাল ১০ মাত্রা বিশিষ্ট। অনুরূপ ধামার, আড়াচারতাল, দীপচন্দী, ঝুমড়া ইত্যাদি তালগুলি ১৪ মাত্রা বিশিষ্ট। সুতরাং পাঠক্রম অনুযায়ী সমস্ত তালের ঠেকা দিয়ে সমান সংখ্যক মাত্রা বিশিষ্ট তালগুলি থেকে যে-কোনো একটি তালের সম্পূর্ণ লয়কারী দেখান হল। উপরোক্ত লয়কারী ছাত্রছাত্রীদের তালি দিয়ে বলবার সুবিধার্থে ক্ষেত্রবিশেষে সম হতে এবং সাধারণ সূত্র অনুযায়ী দেখান বিধেয়।

Scanned with CamScanner

উপরে উল্লিখিত লয়কারী গণিতের মাধ্যমে দেখান হলেও ভিন্ন রূপে এক আবর্তনে লয়কারী দেখাইবার আরও একটি পদ্ধতি প্রচলিত আছে। যদি কোনো পাঠক-পাঠিকা তবলা বাদক এক আবর্তনে সম্ থেকে সম্ পর্যন্ত পুরো তালটি লয়কারীতে আবদ্ধ করতে চান অর্থাৎ দ্বিগুণ, তিনগুণ ইত্যাদি লয়কারী প্রদর্শন করতে ইচ্ছুক হন, তা হলে সম্ থেকে লয়কারী শুরু করে যতক্ষণ না আবার সমে ফিরে আসে সেই পর্যন্ত তালকে মাত্রাবদ্ধ করে যেতে হবে। আপনাদের সুবিধার্থে পুনরায় ত্রিতাল তালটিকেই নিম্নে উক্ত নিয়মে লয়কারী করে দেখান হল।

দ্বিগুণ লয় ঃ—

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
ধাধিন্	ধিন্‌ধা	ধাধিন্	ধিন্‌ধা	। নাতিন	তিন্‌তা	ধাধিন্	ধিন্‌ধা
×				২			
৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
ধাধিন্	ধিন্‌ধা	ধাধিন্	ধিন্‌ধা	। নাতিন	তিন্‌তা	ধাধিন্	ধিন্‌ধা
০				৩			

১
। ধা
×

তিনগুণ লয় ঃ—

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
ধাধিনধিন	ধাধাধিন	ধিনধানা	তিনতিনতা	। ধাধিনধিন	ধাধাধিন	ধিনধাধা
×				২		
৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
ধিনধিনধা	। নাতিনতিন	তাধাধিন	ধিনধাধা	ধিনধিনধা	। ধাধিনধিন	ধানাতিন
	০				৩	

১৫	১৬	১
তিনতাধা	ধিনধিনধা	। ধা
		×

চৌগুণ লয় ঃ—

১	২	৩	৪	৫
ধাধিনধিনধা	ধাধিনধিনধা	নাতিনতিনতা	ধাধিনধিনধা	। ধাধিনধিনধা
×				২
৬	৭	৮	৯	১০
ধাধিনধিনধা	নাতিনতিনতা	ধাধিনধিনধা	। ধাধিনধিনধা	ধাধিনধিনধা
			০	
১১	১২	১৩	১৪	১৫
নাতিনতিনতা	ধাধিনধিনধা	। ধাধিনধিনধা	ধাধিনধিনধা	নাতিনতিনতা
		৩		

১৬	১
ধাধিনধিনধা	। ধা
	×

আড়লয় ঃ—

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
ধা-ধিন	-ধিন-	ধা-ধা	-ধিন-	। ধিন-ধা	-না-	তিন-তিন	-তা-
×				২			
৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
ধা-ধিন	-ধিন-	ধা-ধা	-ধিন-	। ধিন-ধা	-ধা-	ধিন-ধিন	-ধা-
০				৩			

Scanned with CamScanner

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮

না-তিন -তিন- তা-ধা -ধিন- । ধিন-ধা -ধা- ধিন-ধিন -ধা-

× ২

৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১

ধা-ধিন -ধিন- ধা-না -তিন- । তিন-তা -ধা- ধিন-ধিন -ধা- । ধা

০ ৩ ×

কুয়াড় লয় ঃ—

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬

ধা - - - ধিন - - - ধিন - - - ধা - - - ধা - - - । ধিন - - - ধিন - - - ধা -

× ২

৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

- - না - - - তিন - - - । তিন - - - তা - - - ধা - - - ধিন - - - ধিন - - -

০

১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১ ২

ধা - - - ধা - - - ধিন - - - ধিন - - - ধা - - - । ধা - - - ধিন - - - ধিন -

৩ ×

৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮

- - ধা - - - না - - - । তিন - - - তিন - - - তা - - - ধা - - - ধিন - - -

২

৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪

ধিন - - - ধা - - - ধা - - - ধিন - - - ধিন - - - । ধা - - - ধা - - - ধিন -

০ ৩

১৫ ১৬ ১ ২ ৩ ৪

- - ধিন - - - ধা - - - । না - - - তিন - - - তিন - - - তা - - - ধা - - -

×

৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০

ধিন - - - ধিন - - - ধা - - - ধা - - - ধিন - - - । ধিন - - - ধা - - - ধা -

২ ০

১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬

- - ধিন - - - ধিন - - - । ধা - - - না - - - তিন - - - তিন - - - তা - - -

৩

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬

ধা - - - ধিন - - - ধিন - - - ধা - - - ধা - - - । ধিন - - - ধিন - - - ধা -

× ২

৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

- - ধা - - - ধিন - - - । ধিন - - - ধা - - - না - - - তিন - - - তিন - - -

০

১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১

তা - - - ধা - - - ধিন - - - ধিন - - - ধা - - - । ধা

৩ ×

বিয়াড়লয় ঃ—

১ ২ ৩ ৪

ধা - - - ধিন - - - ধিন - - - ধা - - - ধা - - - ধিন - - - ধিন - - -

×

৫ ৬ ৭ ৮

ধা - - - না - - - তিন - - - তিন - - - তা - - - ধা - - - ধিন - - -

২

৯ ১০ ১১ ১২

ধিন - - - ধা - - - ধা - - - ধিন - - - ধিন - - - ধা - - - ধা - - -

০

Scanned with CamScanner

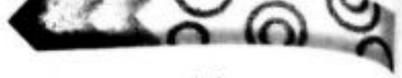

১৩	১৪	১৫	১৬
ধিন - - - ধিন - -	- ধা - - - না -	- - তিন - - - তিন	- - - তা - - -
৩			

১	২	৩	৪
ধা - - - ধিন - -	- ধিন - - - ধা -	- - ধা - - - ধিন	- - - ধিন - - -
×			

৫	৬	৭	৮
ধা - - - ধা - -	- ধিন - - - ধিন -	- - ধা - - - না	- - - তিন - - -
২			

৯	১০	১১	১২
তিন - - - তা - -	- ধা - - - ধিন -	- - ধিন - - - ধা	- - - ধা - - -
০			

১৩	১৪	১৫	১৬
ধিন - - - ধিন - -	- ধা - - - ধা -	- - ধিন - - - ধিন	- - - ধা - - -
৩			

১	২	৩	৪
না - - - তিন - -	- তিন - - - তা -	- - ধা - - - ধিন	- - - ধিন - - -
×			

৫	৬	৭	৮
ধা - - - ধা - -	- ধিন - - - ধিন -	- - ধা - - - ধা	- - - ধিন - - -
২			

৯	১০	১১	১২
ধিন - - - ধা - -	- না - - - তিন -	- - তিন - - - তা	- - - ধা - - -
০			

১৩	১৪	১৫	১৬
ধিন - - - ধিন - -	- ধা - - - ধা -	- - ধিন - - - ধিন	- - - ধা - - -
৩			

১	২	৩	৪
ধা - - - ধিন - -	- ধিন - - - ধা -	- - না - - - তিন	- - - তিন - - -
×			

৫	৬	৭	৮
তা - - - ধা - -	- ধিন - - - ধিন -	- - ধা - - - ধা	- - - ধিন - - -
২			

৯	১০	১১	১২
ধিন - - - ধা - -	- ধা - - - ধিন -	- - ধিন - - - ধা	- - - না - - -
০			

১৩	১৪	১৫	১৬	১
তিন - - - তিন - -	- তা - - - ধা -	- - ধিন - - - ধিন	- - - ধা - - -	ধা
৩				×

তিলওয়াড়া (১৬ মাত্রা)— এই তালের লয়কারী, তালি-খালি ত্রিতালের অনুরূপ। ভিন্নতা শুধুমাত্র বোল ও গতির। মাত্রা—১৬, বিভাগ—৪, জাতি— চৌমাত্রিক, পদ—সমপদী। তালি—৩, খালি—১, ছন্দ—৪ ।৪ ।৪ ।৪ ।

ঠেকা :—

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
ধা	-তেরেকেটে	ধিন্	ধিন্	। ধা	ধা	তিন্	তিন্
×				২			

৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১
তা	-তেরেকেটে	ধিন্	ধিন্	। ধা	ধা	ধিন্	ধিন্	। ধা
৩				০				×

Scanned with CamScanner

দাদরা (৬ মাত্রা)—এই তালে তিন মাত্রা বিশিষ্ট দুটি বিভাগ আছে। বিভাগের মাত্রা সংখ্যা সমান বলে একে সমপদী তাল বলা হয়। এই তালে একটি তালি ও একটি খালি ফাঁক আছে। ১ম মাত্রায় 'সম', ৪র্থ মাত্রায় খালি। তবলা তাল যন্ত্রেই এই তাল বেশি বাজান হয়ে থাকে। ছন্দ—৩।৩

ঠেকা :—

১	২	৩		৪	৫	৬		১
ধা	ধি	না	।	না	তি	না	।	ধা
×				০				×

দ্বিগুণ লয় : (৩ মাত্রার পর থেকে)

১	২	৩		৪	৫	৬		১
ধা	ধি	না	।	ধাধি	নানা	তিনা	।	ধা
×				০				×

তিনগুণ লয় : (৪ মাত্রার পর থেকে)

১	২	৩	৪	৫	৬	১
ধা	ধি	না	। না	ধাধিনা	নাতিনা	। ধা
×			০			×

চৌগুণ লয় : (৪$\frac{২}{৪}$ মাত্রা থেকে)

১	২	৩	৪	৫	৬	১
ধা	ধি	না	। না	SSধাধি	নানাতিনা	। ধা
×			০			×

আড়লয় :— $\frac{৩}{২}$ ভগ্নাংশ সম্পন্ন

ভগ্নাংশ সম্পন্ন মাত্রা $= ৬ \div \frac{৩}{২} = ৬ \times \frac{২}{৩} = \frac{১২}{৩} = ৪$

পূর্ণসংখ্যক মাত্রা $= ৬ - ৪ = ২$

১	২	৩		৪	৫	৬	১
ধা	ধি	ধা -	ধি ।	- না-	না-তি	-না-	। ধা
×				০			×

ebook.dascoaching.in

কুয়াড় লয় :— $\frac{৫}{৪}$ ভগ্নাংশ সম্পন্ন

ভগ্নাংশ সম্পন্ন মাত্রা $= ৬ \div \frac{৫}{৪} = ৬ \times \frac{৪}{৫} = \frac{২৪}{৫} = ৪\frac{৪}{৫}$

পূর্ণ সংখ্যক মাত্রা $= ৬ - \frac{২৪}{৫} = \frac{৩০ - ২৪}{৫} = \frac{৬}{৫} = ১\frac{১}{৫}$

১	২	৩	৪	৫	৬	১
ধা	Sধা ---	ধি---না ।	---না-	--তি--না---	। ধা	
×			০			×

বিয়াড় লয় :— $\frac{৭}{৪}$ ভগ্নাংশ সম্পন্ন

ভগ্নাংশ সম্পন্ন মাত্রা $= ৬ \div \frac{৭}{৪} = ৬ \times \frac{৪}{৭} = \frac{২৪}{৭} = ৩\frac{৩}{৭}$

পূর্ণ সংখ্যক মাত্রা $= ৬ - \frac{২৪}{৭} = \frac{৪২ - ২৪}{৭} = \frac{১৮}{৭} = ২\frac{৪}{৭}$

১	২	৩	৪	৫	৬	১
ধা ধি	SSSSধা -- ।	-ধি---না-	--না---তি	---না---।	ধা	
×			০			×

তেওড়া বা তীব্রা তাল (৭ মাত্রা)—এই তালের বিভাগ ৩টি এবং বিভাগের মাত্রা সমান সংখ্যক নহে। বিভাগগুলি যথাক্রমে ৩ মাত্রা এবং ২ মাত্রা বিশিষ্ট। বিভাগগুলির মাত্রা সমান সংখ্যক নয় বলে একে বিষমপদী তাল। এই তালে খালি নাই, ১ মাত্রায় সম, ৪ মাত্রায় দ্বিতীয় তালি এবং ৬ মাত্রায় তৃতীয় তালি। বর্তমানে এই তালটি তবলা তাল যন্ত্রে বাজান হলেও মূলত এটি পূর্বে পাখোয়াজে বাজান হতো। ছন্দ—৩।২।২

ঠেকা :—

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	১
ধা	দেন্	তা ।	তিট্	কৎ ।	গদি	গন।	ধা
×		২		৩			×

দ্বিগুণ লয় : (৩$\frac{১}{২}$ মাত্রার পর থেকে)

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	১
ধা	দেন্	তা ।	Sধা	দেনতা ।	তিট্কৎ	গদিগন ।	ধা
×			২		৩		×

Scanned with CamScanner

তিনগুণ লয় ঃ— ($৪\frac{২}{৩}$ মাত্রার পর হইতে)

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	১
ধা	দেন্	তা	তিট্	SSধা	দেন তা তিট	কৎ গদিগন	ধা
×				২	৩		×

চৌগুণ লয় : ($৫\frac{১}{৪}$ মাত্রার পর থেকে)

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	১
ধা	দেন্	তা	তিট্	কৎ	Sধা দেন	তা তিট্ কৎ গদি গন	ধা
×				২	৩		×

আড়লয় লয় ঃ— $\frac{৩}{২}$ ভগ্নাংশ সম্পন্ন

ভগ্নাংশ সম্পন্ন মাত্রা = $৭ \div \frac{৩}{২} = ৭ \times \frac{২}{৩} = \frac{১৪}{৩} = ৪\frac{২}{৩}$

পূর্ণ সংখ্যক মাত্রা = $৭ - \frac{১৪}{৩} = \frac{২১ - ১৪}{৩} = \frac{৭}{৩} = ২\frac{১}{৩}$

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	১
ধা	দেন	Sধা-	দেন - তা	-তিট -	কৎ - গদি	-গন -	ধা
×			২	৩		×	

কুয়াড় লয় ঃ— $\frac{৫}{৪}$ ভগ্নাংশ সম্পন্ন

ভগ্নাংশ সম্পন্ন মাত্রা = $৭ \div \frac{৫}{৪} = ৭ \times \frac{৪}{৫} = \frac{২৮}{৫} = ৫\frac{৩}{৫}$

পূর্ণ সংখ্যক মাত্রা = $৭ - \frac{২৮}{৫} = \frac{৩৫ - ২৮}{৫} = \frac{৭}{৫} = ১\frac{২}{৫}$

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	১
ধা	SSধা --	-দেন ---	তা --- তিট	--- কৎ -	-- গদি --	-গন ---	ধা
×		২		৩			×

বিয়াড় লয় ঃ— $\frac{৭}{৪}$ ভগ্নাংশ সম্পন্ন

ভগ্নাংশ সম্পন্ন মাত্রা = $৭ \div \frac{৭}{৪} = ৭ \times \frac{৪}{৭} = ৪$

পূর্ণ সংখ্যক মাত্রা = $৭ - ৪ = ৩$

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	১
ধা	দেন	তা	ধা --- দেন --	-তা --- তিট -	-- কৎ --- গদি	--- গন ---	ধা
×		২			৩		×

রূপক তাল (৭ মাত্রা)—এই তালের লয়কারী তীব্রা তালের অনুরূপ। ভিন্নতা শুধুমাত্র বোল-এর। এই তালের বিভাগ এবং মাত্রা সংখ্যা তীব্র তালেরই অনুরূপ, কিন্তু এই তালে সম নাই ফাঁক থেকে আরম্ভ। বাকি দুটি বিভাগে তালি। ১ মাত্রায় খালি ৪ মাত্রায় তালি (প্রথম তাল), ৬ মাত্রায় তালি (দ্বিতীয় তাল)। ছন্দ—৩।২।২।

ঠেকা ঃ—

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	১
তি	তি	না	ধি	না	ধি	না	তি
০			১		২		০

কাহারবা বা কার্ফা (৮ মাত্রা)—এই তালে চার মাত্রা বিশিষ্ট দুটি বিভাগ আছে। বিভাগের মাত্রা সংখ্যা সমান, একে সমপদী তাল বলা হয়। এই তালে একটি তালি ও একটি খালি বা ফাঁক আছে। ১ মাত্রায় 'সম', ৫ মাত্রায় খালি বা ফাঁক। ছন্দ—৪।৪।

ঠেকা ঃ—

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	১
ধা	গি	না	তে	না	গে	ধি	না	ধা
×				০				×

দ্বিগুণ লয় ঃ— (৫ মাত্রা হইতে)

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	১
ধা	গি	না	তে	ধাগি	নাতে	নাগে	ধিনা	ধা
×				০				×

তিনগুণ লয় ঃ— ($৫\frac{১}{৩}$ মাত্রার পর হইতে)

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	১
ধা	গি	না	তে	না	Sধাগি	নাতেনা	গেধিনা	ধা
×				০				×

চৌগুণ লয় ঃ— (৭ মাত্রা হইতে)

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	১
ধা	গি	না	তে	না	গে	ধাগিনাতে	নাগেধিনা	ধা
×				০				×

Scanned with CamScanner

আড়লয় লয় ঃ— $\frac{৩}{২}$ ভগ্নাংশ সম্পন্ন

ভগ্নাংশ সম্পন্ন মাত্রা $= ৮ \div \frac{৩}{২} = ৮ \times \frac{২}{৩} = \frac{১৬}{৩} = ৫\frac{১}{৩}$

পূর্ণ সংখ্যক মাত্রা $= ৮ - \frac{১৬}{৩} = \frac{২৪ - ১৬}{৩} = \frac{৮}{৩} = ২\frac{২}{৩}$

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ১

ধা গি SSধা -গি- । না-তে -না- গে - ধি -না- । ধা

× ০ ×

কুয়াড় লয় ঃ— $\frac{৫}{৪}$ ভগ্নাংশ সম্পন্ন

ভগ্নাংশ সম্পন্ন মাত্রা $= ৮ \div \frac{৫}{৪} = ৮ \times \frac{৪}{৫} = \frac{৩২}{৫} = ৬\frac{২}{৫}$

পূর্ণ সংখ্যক মাত্রা $= ৮ - \frac{৩২}{৫} = \frac{৪০ - ৩২}{৫} = \frac{৮}{৫} = ১\frac{৩}{৫}$

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ১

ধা SSSধা- --গি-- -না--- । তে---না ---গে- --ধি -- -না--- । ধা

× ০ ×

বিয়াড় লয় ঃ— $\frac{৭}{৪}$ ভগ্নাংশ সম্পন্ন

ভগ্নাংশ সম্পন্ন মাত্রা $= ৮ \div \frac{৭}{৪} = ৮ \times \frac{৪}{৭} = \frac{৩২}{৭} = ৪\frac{৪}{৭}$

পূর্ণ সংখ্যক মাত্রা $= ৮ - \frac{৩২}{৭} = \frac{৫৬ - ৩২}{৭} = \frac{২৪}{৭} = ৩\frac{৩}{৭}$

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ১

ধা গি না SSSধা--- । গি---না-- -তে---না- --গে---ধি ---না--- । ধা

× ০ ×

ঝাঁপতাল (১০ মাত্রা)—এই তালের বিভাগ ৪টি এবং বিভাগের মাত্রা সংখ্যা সমান সংখ্যক নহে। বিভাগগুলি যথাক্রমে ২ এবং ৩ মাত্রা বিশিষ্ট। বিভাগগুলির মাত্রা সংখ্যা সমান নয় বলে এটি বিষমপদী তাল। ধ্রুপদ, খেয়াল, সাদ্‌রা শৈলীর গানে এই তাল বাজান হয়ে থাকে। ১ মাত্রায় সম, ৩ মাত্রায় দ্বিতীয় তাল, ৬ মাত্রায় খালি, ৮ মাত্রায় তৃতীয় তাল। ছন্দ—২।৩।২।৩

ঠেকা ঃ—

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১

ধি না । ধি ধি না । তি না । ধি ধি না । ধি

× ২ ০ ৩ ×

দ্বিগুণ লয় ঃ— (৬ মাত্রা হইতে)

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১

ধি না । ধি ধি না । ধিনা ধিধি । নাতি নাধি ধিনা । ধি

× ২ ০ ৩ ×

তিনগুণ লয় ঃ— ($৬\frac{২}{৩}$ মাত্রার পর হইতে)

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১

ধি না । ধি ধি না । তি SSধি । নাধিধি নাতিনা ধিধিনা । ধি

× ২ ০ ৩ ×

চৌগুণ লয় ঃ— ($৭\frac{২}{৪}$ মাত্রার পর হইতে)

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১

ধি না । ধি ধি না । তি না । SSধিনা ধিধিনাতি নাধিধিনা । ধি

× ২ ০ ৩ ×

আড় লয় ঃ— $\frac{৩}{২}$ ভগ্নাংশ সম্পন্ন

ভগ্নাংশ সম্পন্ন মাত্রা $= ১০ \div \frac{৩}{২} = ১০ \times \frac{২}{৩} = \frac{২০}{৩} = ৬\frac{২}{৩}$

পূর্ণ সংখ্যক মাত্রা $= ১০ - \frac{২০}{৩} = \frac{৩০ - ২০}{৩} = \frac{১০}{৩} = ৩\frac{১}{৩}$

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১

ধি না । ধি Sধি- না-ধি । -ধি- না-তি । -না- ধি-ধি -না- । ধি

× ২ ০ ৩ ×

কুয়াড় লয় ঃ— $\frac{৫}{৪}$ ভগ্নাংশ সম্পন্ন

ভগ্নাংশ সম্পন্ন মাত্রা $= ১০ \div \frac{৫}{৪} = ১০ \times \frac{৪}{৫} = \frac{৪০}{৫} = ৮$

পূর্ণ সংখ্যক মাত্রা $= ১০ - ৮ = ২$

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭

ধি না । ধি---না---ধি---ধি--- । -না---তি---না ।

× ২ ০

Scanned with CamScanner

৮ ৯ ১০ ১

---ধি- --ধি-- -না--- । ধি

২ ×

বিয়াড় লয় :— $\frac{৭}{৪}$ ভগ্নাংশ সম্পন্ন

ভগ্নাংশ সম্পন্ন মাত্রা = $১০ \div \frac{৭}{৪} = ১০ \times \frac{৪}{৭} = \frac{৪০}{৭} = ৫\frac{৫}{৭}$

পূর্ণ সংখ্যক মাত্রা = $১০ - \frac{৪০}{৭} = \frac{৭০-৪০}{৭} = \frac{৩০}{৭} = ৪\frac{২}{৭}$

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭

ধি না । ধি ধি SSধি - - - না । - - - ধি - - - ধি - - - না - - ।

× ২ ০

৮ ৯ ১০ ১

- তি - - - না - - - ধি - - - ধি - - - না - - - । ধি

৩ ×

সুরতাল বা সুরফাঁক তাল (১০ মাত্রা)—এই তালের লয়কারী ঝাঁপতালের অনুরূপ। এই তালের বিভাগ ২ মাত্রা বিশিষ্ট এবং ৫টি বিভাগ। এটি সমপদী তাল। ১ মাত্রায় সম, ৩ মাত্রায় খালি, ৫ মাত্রায় দ্বিতীয় তাল, ৭ মাত্রায় তৃতীয় তালি ও ৯ মাত্রায় খালি বা ফাঁক। ছন্দ—২।২।২।২।২

ঠেকা :—

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১

ধা ধা । দেন্ তা । কিট্ ধা । তিট্ কৎ । গদি গন । ধা

× ০ ২ ৩ ০ ×

◆ **চৌতাল বা চারতাল** (১২ মাত্রা)—বিভাগ ৬টি, ১ মাত্রায় সম, ৩ মাত্রায় খালি, ৫ মাত্রায় দ্বিতীয় তাল, ৭ মাত্রায় খালি, ৯ মাত্রায় তৃতীয় তাল, ১১ মাত্রায় চতুর্থ তাল। এটি সমপদী তাল অর্থাৎ বিভাগগুলির মাত্রা সমান সংখ্যক। উক্ত তাল ধ্রুপদ গানে ও পাখোয়াজ তাল যন্ত্রে বাজান হয়ে থাকে। বর্তমানে তবলা তাল যন্ত্রেও বাজান হয়। ছন্দ—২।২।২।২।২।২

ঠেকা :—

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১

ধা ধা । দেন্ তা । কৎ তাগে । দেন্ তা । তেটে কতা । গদি গন । ধা

× ০ ২ ০ ৩ ৪ ×

দ্বিগুণ লয় : (৭ মাত্রা থেকে)

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০

ধা ধা । দেন্ তা । কৎ তাগে । ধাধা দেনতা । কৎতাগে দেনতা ।

× ০ ২ ০ ৩

১১ ১২ ১

তেটেকতা গদিগন । ধা

৪ ×

তিনগুণ লয় : (৯ মাত্রা থেকে)

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০

ধা ধা । দেন্ তা । কৎ তাগে । দেন্ তা । ধাধাদেন্ তাকৎতাগে ।

× ০ ২ ০ ৩

১১ ১২ ১

দেন্তাতেটে কতাগদিগন । ধা

৪ ×

চৌগুণ লয় : (১০ মাত্রা থেকে)

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০

ধা ধা । দেন্ তা । কৎ তাগে । দেন্ তা । তেটে ধাধাদেন্তা

× ০ ২ ০ ৩

১১ ১২ ১

কৎতাগেদেন্তা তেটেকতাগদিগন । ধা

৪ ×

Scanned with CamScanner

আড় লয় ঃ— $\frac{৩}{২}$ ভগ্নাংশ সম্পন্ন

ভগ্নাংশ সম্পন্ন মাত্রা = $১২ \div \frac{৩}{২} = ১২ \times \frac{২}{৩} = ৮$

পূর্ণ সংখ্যক মাত্রা = $১২ - ৮ = ৪$

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
ধা	ধা	দেন্	তা	ধা -	ধা -	দেন্ -	তা- কৎ - তাগে -
×		০		২		০	
৯		১০		১১	১২	১	
দেন্ -	তা -	তেটে -		কতা -	গদি -	গন -	ধা
৩				৪		×	

কুয়াড় লয় ঃ— $\frac{৫}{৪}$ ভগ্নাংশ সম্পন্ন

ভগ্নাংশ সম্পন্ন মাত্রা = $১২ \div \frac{৫}{৪} = ১২ \times \frac{৪}{৫} = \frac{৪৮}{৫} = ৯\frac{৩}{৫}$

পূর্ণ সংখ্যক মাত্রা = $১২ - \frac{৪৮}{৫} = \frac{৬০ - ৪৮}{৫} = \frac{১২}{৫} = ২\frac{২}{৫}$

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
ধা	ধা	SSধা - - -	ধা- - -	দেন্ - - - তা	- - - কৎ -	- - তাগে - -
×		০		২		০
৮		৯	১০	১১	১২	১
- দেন্ - - -		তা - - - তেটে	- - - কতা -	- - গদি - -	- গন - - -	ধা
৩				৪		×

বিয়াড় লয় ঃ— $\frac{৭}{৪}$ ভগ্নাংশ সম্পন্ন

ভগ্নাংশ সম্পন্ন মাত্রা = $১২ \div \frac{৭}{৪} = ১২ \times \frac{৪}{৭} = \frac{৪৮}{৭} = ৬\frac{৬}{৭}$

পূর্ণ সংখ্যক মাত্রা = $১২ - \frac{৪৮}{৭} = \frac{৮৪ - ৪৮}{৭} = \frac{৩৬}{৭} = ৫\frac{১}{৭}$

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
ধা	ধা	দেন্	তা	কৎ	Sধা - - - ধা -	- - দেন্ - - - তা	- - - কৎ - - -
×		০		২		০	
৯		১০		১১	১২	১	
তাগে - - -		দেন্ - -	তা - - -	তেটে -	- - কতা - - -	গদি - - - গন - - -	ধা
৩				৪		×	

◆ **একতাল** (১২ মাত্রা)—এই তালের লয়কারী চৌতালের অনুরূপ। এই তালের বিভাগ, মাত্রা সংখ্যা এবং তালি, খালি চৌতালের অনুরূপ। ত্রৈমাত্রিক ছন্দের একতালও বিশেষ প্রচলিত, কিন্তু এর তালি, খালি ভিন্ন প্রকার। নিম্নে দ্বিমাত্রিক ও ত্রৈমাত্রিক ঠেকা প্রদত্ত হল। এই তাল তবলা তাল যন্ত্রে বাজান হয়ে থাকে। চৌতাল অপেক্ষা একতালের গাম্ভীর্য তুলনামূলক কম। ছন্দ—ত্রৈমাত্রিক ৩।৩।৩।৩ অথবা দ্বিমাত্রিক ২।২।২।২।২।২।

দ্বিমাত্রিক ঠেকা ঃ—

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
ধিন্	ধিন্	ধাগে	তেটেকেটে	তু	না	কৎ	তা
×		০		২		০	
৯	১০		১১	১২		১	
ধাগে	তেটেকেটে		ধিন্	ধাধা		ধিন্	
৩			৪			×	

ভিন্ন প্রকার ঃ—

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
ধিন্	ধিন্	ধা	ধা	তু	না	কৎ	তা	ধাগি	তেটে।
×		০		২		০		৩	
১১	১২	১							
ধিন্	তেটে	ধিন্							
৪		×							

Our Online Class>>
www.online.dascoaching.in

ত্রৈমাত্রিক ছন্দ ঃ—

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১
ধিন্	ধিন্	ধা	ধা	তু	না	কৎ	তা	ধাগি	তেটে	ধিন্	তেটে	ধিন্
×			২		০			৩				×

খেম্‌টা (১২ মাত্রা)—এই তালের লয়কারী চৌতালের অনুরূপ। এই তালটি ১২ মাত্রা বিশিষ্ট। ৪টি বিভাগ। প্রতিটি বিভাগের মাত্রা সংখ্যা সমান ও ৩ মাত্রা বিশিষ্ট। ১ মাত্রায় সম, ৪, ১০ মাত্রায়

Scanned with CamScanner

তালি ও ৭ মাত্রায় খালি। সুতরাং এতে ৩টি তালি ও ১টি খালি, জাতি—ত্রৈমাত্রিক

ছন্দ—৩।৩।৩।৩

ঠেকা :—

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১

ধা তে ধি । না তি না । তা তে ধি । না তি না । ধা

× ২ ০ ৩ ×

আড়খেমটা (১২ মাত্রা)— তালি— খালি ত্রৈমাত্রিক একতালের অনুরূপ।

ঠেকা :—

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১

ধা -তেরেকেটে ধিন । ধা ধা তিন । তা -তেরেকেটে ধিন । ধা ধা ধিন । ধা

× ২ ০ ৩ ×

ধামার বা ধমার (১৪ মাত্রা)—এই তালের বিভাগ ৪টি এবং বিভাগের মাত্রা সংখ্যা সমান সংখ্যক নয়। বিভাগগুলি যথাক্রমে ৫, ২, ৩, ৪ মাত্রা বিশিষ্ট। বিভাগগুলির মাত্রা সংখ্যা সমান নয় বলে এটি বিষমপদী তাল। ১ মাত্রায় সম, ৬, ১১ মাত্রায় তালি, ৮ মাত্রায় খালি বা ফাঁক। ছন্দ—৫।২।৩।৪ ভিন্নমতে ৩।২।২।৩।৪

ঠেকা :—

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১

ক ধি ট ধি ট । ধা S । গ তি ট । তি ট তা S । ক

× ২ ০ ৩ ×

দ্বিগুণ লয় : (৮ মাত্রা থেকে)

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১

ক ধি ট ধি ট । ধা S। কধি টধি টধা । Sগ তিট তিট তাS। ক

× ২ ০ ৩ ×

তিনগুণ লয় : (৯$\frac{১}{৩}$ মাত্রার পর থেকে)

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১

ক ধি ট ধি ট । ধা S। গ তি Sকধি । টধিট ধাSগ তিটতি টতাS । ক

× ২ ০ ৩ ×

চৌগুণ লয় : (১০$\frac{২}{৪}$ মাত্রার পর থেকে)

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১

ক ধি ট ধি ট । ধা S। গ তি ট । SSকধি টধিটধা Sগতিট তিটতাS । ক

× ২ ০ ৩ ×

আড় লয় :— $\frac{৩}{২}$ভগ্নাংশ সম্পন্ন

ভগ্নাংশ সম্পন্ন মাত্রা = ১৪ ÷ $\frac{৩}{২}$ = ১৪ × $\frac{২}{৩}$ = $\frac{২৮}{৩}$ = ৯$\frac{১}{৩}$

পূর্ণ সংখ্যক মাত্রা = ১৪ − $\frac{২৮}{৩}$ = $\frac{৪২-২৮}{৩}$ = $\frac{১৪}{৩}$ = ৪$\frac{২}{৩}$

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০

ক ধি ট ধি SSক । -ধি- ট-ধি । -ট- ধা-S -গ- ।

× ২ ০

১১ ১২ ১৩ ১৪ ১

তি-ট -তি- ট-তা -S- । ক

৩ ×

কুয়াড় লয় :— $\frac{৫}{৪}$ভগ্নাংশ সম্পন্ন

ভগ্নাংশ সম্পন্ন মাত্রা = ১৪ ÷ $\frac{৫}{৪}$ = ১৪ × $\frac{৪}{৫}$ = $\frac{৫৬}{৫}$ = ১১$\frac{১}{৫}$

পূর্ণ সংখ্যক মাত্রা = ১৪ − $\frac{৫৬}{৫}$ = $\frac{৭০-৫৬}{৫}$ = $\frac{১৪}{৫}$ = ২$\frac{৪}{৫}$

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮

ক ধি SSSSক ---ধি- --ট-- |-ধি--- ট---ধা |---S-

× ২ ০

৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১

--গ-- -তি--- |ট---তি ---ট- --তা-- -S--- |ক

৩ ×

বিয়াড় লয় :— $\frac{৭}{৪}$ভগ্নাংশ সম্পন্ন

ভগ্নাংশ সম্পন্ন মাত্রা = ১৪ ÷ $\frac{৭}{৪}$ = ১৪ × $\frac{৪}{৭}$ = ৮

পূর্ণ সংখ্যক মাত্রা = ১৪ − ৮ = ৬

Scanned with CamScanner

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯

ক ধি ট ধি ট । ধা ক - - - ধি - - । - ট - - - ধি - - - ট - - - ধা

০ ×

২

১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১

- - - S - - - । গ - - - তি - - - ট - - - তি - - - ট - - - তা - - - S - - - । ক

×

৩

◆ **ঝুমরা তাল** (১৪ মাত্রা)—এই তালের বিভাগ ৪টি এবং বিভাগের মাত্রা সংখ্যা সমান সংখ্যক নয়। বিভাগগুলি যথাক্রমে ৩, ৪ মাত্রা বিশিষ্ট। বিভাগগুলির মাত্রা সংখ্যা সমান না বলে এটি বিষমপদী তাল। এই তাল বিলম্বিত খেয়াল গানে বাজানো হয় এবং তবলা তাল যন্ত্রে বাজানো হয়ে থাকে। ১ মাত্রায় সম, ৪ মাত্রায় দ্বিতীয় তাল, ৮ মাত্রায় খালি ও ১১ মাত্রায় তৃতীয় তাল। ছন্দ—৩।৪।৩।৪। এই তালের চলন আড় গতির হয়ে থাকে এবং উহা তালের লয়কারী ধামার তালের অনুরূপ।

ঠেকা :—

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১

ধি -ধা তৃক । ধি ধি ধাগি তৃক । তি -তা তৃক । ধি ধি ধাগি তৃক । ধি

× ২ ০ ৩ ×

দীপচন্দী (১৪ মাত্রা)—এই তালের বিভাগ, তালি, খালি ঝুমরা তালের অনুরূপ, প্রভেদ শুধুমাত্র বোলের। একে অনেকে সাত মাত্রার যত্ বলে থাকেন। লয়কারী ধামার তালের অনুরূপ।

ঠেকা :—

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১

ধি ধি –। ধা গ তি – । তা তি – । ধা গ ধি – । ধি

× ২ ০ ৩ ×

আড় চারতাল বা আড়া চৌতাল (১৪ মাত্রা)— মাত্রা ১৪, বিভাগ ৭, জাতি দ্বিমাত্রিক, সমপদী, ৪টি তালি, ৩টি খালি। ছন্দ—২।২।২।২।২।২।২। ১ মাত্রায় সম, ৩, ৭, ১১ মাত্রায় তালি ও ৫, ৯, ১৩ মাত্রায় খালি।

ঠেকা :—

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০

ধিন -তিরকিট । ধি না । তু না । কৎ তা । -তিরকিট ধিন।

× ২ ০ ৩ ০

১১ ১২ ১৩ ১৪ ১

না ধি । ধি না । ধিন

৪ ০ ×

বিঃ দ্রঃ :— ১৪ মাত্রাবিশিষ্ট তালের লয়কারী ধামার তালের অনুরূপ।

মত্ততাল (১৮ মাত্রা)— মাত্রা— ১৮, বিভাগ—৯, জাতি— দ্বিমাত্রিক, পদ—সমপদী, তালি—৬, খালি—৩, ছন্দ— ২।২।২।২।২।২।২।২।২।

ঠেকা :—

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

ধি – । না – । ধিন তেরেকেটে । ধি না । তু না । কৎ তা ।

× ০ ২ ৩ ০ ৪

১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১

তেরেকেটে ধিন । না ধি। ধি না । ধি

৫ ৬ ০ ×

ভিন্নমতে—

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪

ধা – । ঘি ড় । ন ক । ঘি ড় । ন ক । তি ট। কৎ তা ।

× ০ ২ ৩ ০ ৪ ৫

১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১

গ দি । গ ন । ধা

৬ ০ ×

Scanned with CamScanner

দ্বিগুণ— (১০ মাত্রা থেকে)

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

ধা — | ঘি ড় | ন ক | ঘি ড় | ন ধা— | ঘিড় নক |

× ০ ২ ৩ ০ ৪

১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১

ঘিড় নক | তিট কত | গদি গন | ধা

৫ ৬ ০ ×

তিনগুণ— (১৩ মাত্রা থেকে)

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪

ধা — | ঘি ড় | ন ক | ঘি ড় | ন ক | তি ট | ধা-ঘি ড়নক |

× ০ ২ ৩ ০ ৪ ৫

১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১

ঘিড়ন কতিট | কতগ দিগন | ধা

৬ ০ ×

চৌগুণ— (১৩$\frac{১}{৪}$ মাত্রার পর থেকে)

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪

ধা — | ঘি ড় | ন ক | ঘি ড় | ন ক | তি ট | ক --ধা- |

× ০ ২ ৩ ০ ৪ ৫

১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১

ঘিড়নক ঘিড়নক | তিটকত গদিগন | ধা

৬ ০ ×

আড় লয়ঃ— $\frac{৩}{২}$ ভগ্নাংশ সম্পন্ন

ভগ্নাংশ সম্পন্ন মাত্রা = ১৮ ÷ $\frac{৩}{২}$ = ১৮ × $\frac{২}{৩}$ = ১২

পূর্ণ সংখ্যক মাত্রা = ১৮ − ১২ = ৬

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০

ধি S | না S | ধিন তেরেকেটে | ধি - S - না- | S - ধিন - তেরেকেটে- |

× ০ ২ ৩ ০

১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১

ধি-না - তু - | না -কৎ - তা - | তেরেকেটে ধিন - না - | ধি - ধি - না - | ধি

৪ ৫ ৬ ০ ×

কুয়াড় লয়ঃ— $\frac{৫}{৪}$ ভগ্নাংশ সম্পন্ন

ভগ্নাংশ সম্পন্ন মাত্রা = ১৮ ÷ $\frac{৫}{৪}$ = ১৮ × $\frac{৪}{৫}$ = $\frac{৭২}{৫}$ = ১৪$\frac{২}{৫}$

পূর্ণ সংখ্যক মাত্রা = ১৮ − $\frac{৭২}{৫}$ = $\frac{৯০-৭২}{৫}$ = $\frac{১৮}{৫}$ = ৩$\frac{৩}{৫}$

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮

ধি S | না SSSধি- | --S-- -না--- | S---ধিন---তেরেকেটে- |

× ০ ২ ৩

৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪

--ধি-- -না--- | তু---না---কৎ- | --তা-- -তেরেকেটে---- |

০ ৪ ৫

১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১

ধিন---না---ধি- | --ধি-- -না--- | ধি

৬ ০ ×

বিয়াড় লয়ঃ— $\frac{৭}{৪}$ ভগ্নাংশ সম্পন্ন

ভগ্নাংশ সম্পন্ন মাত্রা = ১৮ ÷ $\frac{৭}{৪}$ = ১৮ × $\frac{৪}{৭}$ = $\frac{৭২}{৭}$ = ১০$\frac{২}{৭}$

পূর্ণ সংখ্যক মাত্রা = ১৮ − $\frac{৭২}{৭}$ = $\frac{১২৬-৭২}{৭}$ = $\frac{৫৪}{৭}$ = ৭$\frac{৫}{৭}$

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০

ধি S | না S | ধিন তেরেকেটে | ধি SSSSSধি- | --S---না ---S--- |

× ০ ২ ৩ ০

Scanned with CamScanner

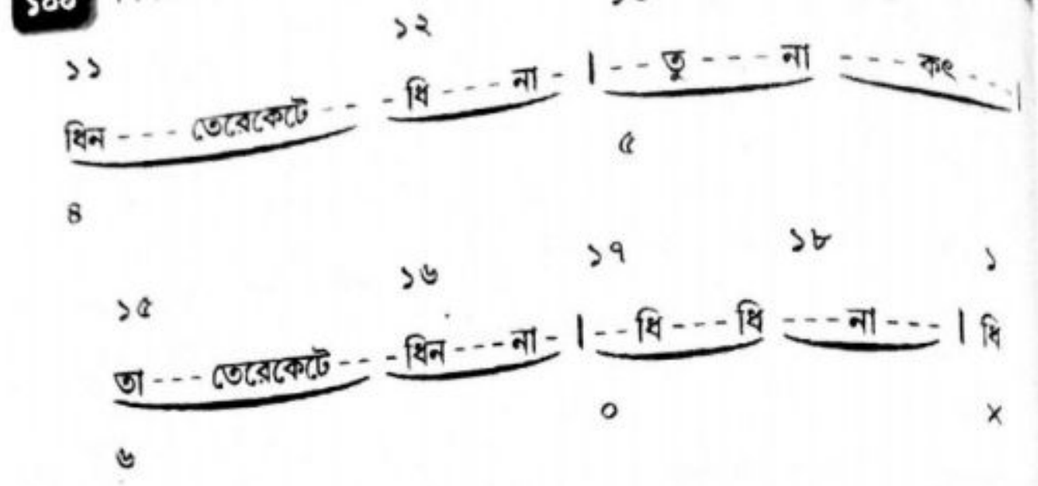

☛ **বিশেষ দ্রষ্টব্য :**

তাল প্রসঙ্গে গণিতের সাহায্যে অবগ্রহের দ্বারা তালের লয়কারী দেখানো হয়ে অপরপক্ষে এক আবর্তনে সম্পূর্ণ তালের লয়কারী যথা দ্বিগুণ, তিনগুণ ইত্যাদি দেখ হলে সম থেকে শুরু করা বিধেয়।

✪ ২.২ গলার স্বর সংক্রান্ত—লোকসংগীত, কবিতা, প্রার্থনা সংগীত (Vocal Folk songs, Poems, Prayers) :

নগরের রূঢ় বাস্তব এবং যান্ত্রিক সভ্যতার বহু দূরে প্রকৃতির অকৃপণ শ্যামলিমার মধ্যে যে ওঠা সহজ, সরল, অনাড়ম্বর মানুষগুলির ভিতর থেকে যে স্বতঃস্ফূর্ত বিরহ, আনন্দ, সুখ দুঃখের সংগীত নিঃসৃত হয়েছে সেটাই লোকসংগীত নামে আমাদের কাছে পরিচিত। এ সংগীত দেশ, কাল ও পাত্র ভেদে আমাদের কাছে ভিন্ন ভিন্ন রূপে ধরা দেয়। লোকসংগীত (Folk music) আমরা আঞ্চলিক সংগীত বলে অভিহিত করে থাকি। পুজো-পার্ব নানাবিধ লোকাচার এবং মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানাদিতে এই সংগীতের ব্যপ্তি বহুল পরিমাণে যায়।

সাধারণত দেশ, স্থান কাল, আচার এবং ভাষার উপর ভিত্তি করে এই সংগীত হয়ে থাকে। নিম্নে বাংলা তথা ভারতের কয়েকটি লোকসংগীতের ধারা নিয়ে সংক্ষি আলোচনা করা হল।

● **ভাটিয়ালি :** নদীমাতৃক পূর্ববঙ্গের (অধুনা বাংলাদেশ) মাঝিমাল্লাদের দ্বারা উদ্ভূত এ সংগীত সর্বজনগ্রাহ্য এবং প্রিয়। নৌকা যখন ভাটির দিকে বইতে থাকে তখন উদাস মাঝি তার আত্মীয় প্রিয়জন থেকে বহু দূরে থেকে এই ভাটিয়ালী সংগীতের মাধ্যমে তার বিরহ ব্যাথাতুর মনটিকে তুলে ধরে। এই সংগীতের বিশেষ ভাষার গুরুত্ব না থাকলেও তার উদা করা সুর, যে-কোনো সংবেদনশীল শ্রোতার মনকে উধাও করে দেয়।

● **গম্ভীরা :** এটি প্রধানত মালদহ অঞ্চলের গান। সাধারণত শিবকে উপলক্ষ্য করে এ গানের ভাষা রচিত। যদিও বর্তমান কালে নানা সামাজিক বা অর্থনৈতিক ভাষাও এর

স্থান পেয়েছে। মূলত পৌষ সংক্রান্তি, গাজন ইত্যাদি ধর্মীয় অনুষ্ঠানেই উক্ত সংগীত পরিবেশিত হয়ে থাকে। বয়সেও এই সংগীত বিশেষ প্রাচীন।

● **বাউল :** বাউল একটি সম্প্রদায়। মানব ধর্মই এই সম্প্রদায়ের মূল কথা। মানুষের দেহকেই ভগবানের দেউল বলে মনে করা হয় এবং দেশ-দেশান্তরে এই সম্প্রদায়ের লোকেরা গান গাহিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। বাউল গানের অর্থ দ্ব্যর্থবোধক। সাধারণ ভাবে এ গানের অর্থ এক প্রকার কিন্তু গভীরে এর অর্থ ভিন্নরূপ, মূলত পরমার্থ বিষয়ক। তাদের পোষাক-পরিচ্ছদও স্বাতন্ত্র্যপূর্ণ একতারা হাতে এবং পায়ে ঘুঙ্গুর বেঁধে নৃত্যের তালে এ গান পরিবেশিত হয়। অদিকন্তু আনন্দলহরী, মন্দিরা এই গানের সহযোগী বাদ্যযন্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

● **ভাওয়াইয়া :** এ গান সাধারণত কোচবিহার এবং এর উত্তরাঞ্চলের বিশেষ জনপ্রিয় গান। এই গানে সাধারণত প্রড়য-প্রণয়ীর বিরহ ব্যথা মিশ্রিত করুণ রসের সুরটি বিশেষ করে ফুটিয়া উঠে। যদিও বর্তমানে মনে হয় ভাষার ক্ষেত্রে কিছুটা পরিবর্তন ঘটিয়াছে।

● **লেটো :** এই গান সাধারণত বর্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া ইত্যাদি জায়গায় গ্রাম্য পরিবেশে গীত হয়ে থাকে। লেটো গানে দুটি দল বা একটি দল দ্বিধা বিভক্ত হয়ে পালা গান করে থাকে। একপক্ষ গান, ছড়া এবং অভিনয়ের মাধ্যমে বিরোধীপক্ষের কাছে প্রশ্ন রাখে, উত্তরে বিরোধীপক্ষ প্রশ্নের উত্তরসহ পাল্টা প্রশ্ন করে জবাব চায়। একে অনেকটা তরজা গানের অনুরূপ বলা চলে।

● **কীর্তন :** এই গানের সঠিক জন্ম যে কবে হয়েছে তা জানা যায়নি। কীর্তন গান বাঙালির জীবনধারার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত। সাধারণত রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক ভাষার ভিত্তিতে এই শৈলীর গান হয়ে থাকে এবং সহযোগীযন্ত্র হিসাবে শ্রীখোল, মন্দিরা, করতাল, সারিন্দা ব্যবহৃত হয়। প্রাচীন ঐতিহ্যপূর্ণ এই শৈলীর গান বাঙালির বিশেষ গর্বের ও সংস্কৃতির পরিচায়ক। তালের বিভিন্ন প্রকরণ ও গায়ন শৈলীর বিশেষত্ব অন্য সব গান থেকে বৈশিষ্ট্যের দাবি রাখে। কীর্তন গান মোট চারিটি বিভাগে বিভক্ত—(ক) গরাণহাটা, (খ) মনোহর সাহী, (গ) মন্দারিণী, (ঘ) রেনেটী।

● **যাত্রাগান :** যাত্রা ভারতের বিশেষ ঐতিহ্যপূর্ণ গান এবং প্রাচীন। যাত্রাগান সাধারণত রাম-সীতা, রাধাকৃষ্ণ ও ঐতিহাসিক পটভূমিকায় হৈ পালাগান সৃষ্ট হলেও বর্তমানে এই গানের বিশেষ পট পরিবর্তন ঘটেছে। নানা সামাজিক উপাখ্যান ও দৈনন্দিন জীবনের বহু দুরূহ সামাজিক সমালোচনা ইত্যাদি বিষয়বস্তুর ভিত্তিতে এই পালাগান গ্রামেগঞ্জে পরিবেশিত হতে দেখা যায়, যাত্রাগান নব কলেবরে জনসমাজে আজ বিশেষ আদৃত।

● **কবিগান :** এই গান তরজা ও লেটো গানের অনুরূপ। সাধানত দুটি দলের মধ্যে এই গান অনুষ্ঠিত হয় বা কবিগানে প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও বিশেষ বুদ্ধির পরিচয় মিলে। দুই দলের নায়কের মধ্যে কোনো একটি বিষয়কে কেন্দ্র করে কবিতার মাধ্যমে লড়াই শ্রোতৃবৃন্দকে বিশেষ আনন্দ দিতে সক্ষম এবং সবিশেষ উপভোগ্য।

Scanned with CamScanner

● **সারিগান :** পূর্ববঙ্গে নৌকাদৌড় এবং ছাদ পিটাইবার সময় সারিবদ্ধ ভাবে বিশে তালে ও ছন্দের মাধ্যমে এই গান গাওয়া হয়ে থাকে। মনে হয় উক্ত গান সাধারণ সারিবদ্ধভাবে গাওয়া হয় বলে একে সারিগান বলা হয়ে থাকে। এই গান আঞ্চলিক ভাষা গীত হয় এবং ভাষা অনেকাংশে সরল হলেও শালীনতা বর্জিত। নৌকাদৌড় প্রতিযোগিত নদীমাতৃক বাংলাদেশে বর্ষাকালে অর্থাৎ শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন মাসে হয়ে থাকে।

● **জারিগান :** এই গান সাধারণত মুসলমানদের মহরমকে উপলক্ষ্য করে হাসান-হোসেনে কারবালা প্রান্তরে অমানবিক মৃত্যুকে কেন্দ্র করে রচিত। বিষাদ ও করুণরস এই গানের প্রধা উপজীব্য হলেও মাঝে মধ্যে বীর রসেরও এতে আবির্ভাব ঘটে থাকে। পরবর্তীকালে এ বিষয়বস্তু ব্যতীত পল্লী কাহিনিও এই গানে স্থান পেয়েছে। পাগলা কানাই ও ইদ্ বিষ জারি গানে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। জারিগান মুখ্যত নৃত্য সম্বলিত সংগীত। একজন মূ গায়কের তত্ত্বাবধানে আনুমানিক ২০/২৫ জন গায়ক পায়ে নুপুর ও হাতে একটি গামছ নিয়ে বৃত্তাকারে নৃত্যের মাধ্যমে এই গান পরিবেশন করে থাকে। মূল গায়ক সংগীতে মাধ্যমে আখ্যান গেয়ে থাকে এবং অন্যান্য অংশগ্রহণকারীরা নৃত্যভঙ্গির মাধ্যমে নুপুরে তালে তালে ও হাতের গামছাটি আঁচলের ন্যায় ছন্দোবদ্ধভাবে দুলিয়ে বৃত্তাকারে মূল গানে বিশেষ একটি অংশকে ধূয়া হিসেবে একত্রে গেয়ে থাকে।

● **আলকাপ গান :** এই গান সাধারণত মুসলমান কৃষকগণ গান ও ছড়ার মাধ্যমে গেয় থাকেন। এর দুটি অংশ। গানের অংশে রাধাকৃষ্ণের প্রণয় বিষয় স্থান পেলেও ছড়ার ভাগে সমসাময়িক হাল্কা রসের ও ঘটনার বিষয়বস্তুর উল্লেখ রয়েছে। এই শ্রেণির গান মুর্শিদাবাদ, মালদহ, নদীয়া ও রাঢ় অঞ্চলে বেশি শোনা যায়।

● **মুর্শীদা গান :** 'মুর্শীদ' শব্দের অর্থ হল গুরু। মধ্য যুগে মুসলমান ফকির ও সূফি সাধকদের দ্বারা এই গান প্রবর্তিত হওয়ার জন্য সাধারণত ভক্তপ্রাণ মুসলমানগণ এই গান বেশিরভাগ ক্ষেত্রে গেয়ে থাকেন। এই গানের বিষয়বস্তু ধর্ম বিষয়ক ও আধ্যাত্মবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। পূর্ববঙ্গে বিশেষ করে ময়মনসিংহ জেলায় এই গান বিশেষ সুপ্রচলিত।

● **টুসুগান :** এই গান সাধারণত রাঢ় অঞ্চলে ও বাংলা-বিহার সীমান্তে বেশি শোন যায়। বীরভূম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, মালভূম, সিংভূম, বর্ধমান এবং মেদিনীপুর জেলায় ১ পৌষ নবান্ন উৎসবকে উপলক্ষ্য করে টুসুদেবীর পূজা ও টুসুগান হয়ে থাকে। টুসুপূজায় একটি ছোটো মাটির সরায় তুষ ভরতি করে তার গায়ে একটি নারীর মুখ আঁকা হয়। তিন দিন এই পূজা করবার পরে টুসুদেবীকে জলে বিসর্জন দেওয়া হয়। টুসুগান প্রতিবেশিদের মধ্যে গানের প্রতিযোগিতার মাধ্যমে উত্তর-প্রত্যুত্তরের পালা চলে। টুসুদেবীকে লক্ষ্মীদেবীর প্রতিরূ হিসেবে গণ্য করা হয়। ভদ্রেশ্বরী দেবীর (ভাদুর) মত টুসুকেও ঘরের মেয়ের ন্যায় বরণ করে পূজা, পার্বণ ইত্যাদি করা হয়ে থাকে। নবান্ন উৎসব গ্রাম বাংলার বিশেষ আনন্দের উৎসব তাই এই গানের গতি-প্রকৃতি একটু হাল্কা এবং লঘু প্রকৃতির হয়ে থাকে। বলা বাহুল্য

টুসুদেবীর পূজা মুলত মেয়েদের কান্ত গার্হস্থ্য অনুষ্ঠান বললেও অত্যুক্তি হয় না।

লোকপরম্পরা, গাঁথা ও কাহিনি অনুধাবন করলে এ কথা-ই মনে হয় যে টুসুদেবীও ভদ্রেশ্বরীর ন্যায় এ পৃথিবীর একজন অনন্যা সাধারণ মহিলা ছিলেন। তাঁর বিশেষ সদগুণ এবং মহেশ্বর ফলশ্রুতি তাঁকে কালক্রমে দেবীর আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে। পৌষ মাসের প্রতি সন্ধ্যায় ঘরে ঘরে সর্ষে ফুল ও গাঁদা ফুল দিয়ে নিষ্ঠা সহযোগে নানা উপাচারে এই পূজা হয়ে থাকে।

কথিত আছে যে, বিশেষ গুণে গুণান্বিতা রূপবতী টুসু কোনো এক হিন্দু জমিদার তনয়া ছিলেন এবং তাঁর ফুল ও ফলের বাগানের প্রতি বিশেষ আকর্ষণ ছিল। একবার গৌড়ের বাদ্‌শাহের একমাত্র পুত্রের কঠিন পীড়া হয়। সমস্ত চিকিৎসা নিস্ফল হওয়ার পর কোনো এক সাধক মৃত্যু পথযাত্রী শাহের পুত্রের আরোগ্য লাভের জন্য এক অবিশ্বাস্য ফল ও ফুলের কথা জানায়, যার দ্বারা পুত্রের প্রাণ বাঁচানো সম্ভব। বলা বাহুল্য, সেই অসম্ভাব্য ফল ও ফুল টুসুর বাগান হতে সংগ্রহ করে বাদশাহের পুত্র পুনর্জীবন লাভ করে। তখন বাদশাহ রূপবতী কন্যার সাথে নিজের পুত্রের বিবাহের প্রস্তাব করে। কিন্তু, জাতিকুল রক্ষার্থে টুসুর পিতা পরিবারসহ বাদশাহের ভয়ে জঙ্গলে আশ্রয় নেয়। সেখানেও মুক্তির কোনো উপায় না দেখে নিজের ধর্ম ও সতীত্ব রক্ষার্থে সতী টুসু নদীর জলে প্রাণ বিসর্জন দিয়ে নিজের সম্মান রক্ষা করেন। পরবর্তীকালে এই উপাখ্যানের উপর ভিত্তি করে অবিবাহিতা মেয়েরা টুসুর আদর্শ এবং চারিত্রিক দৃঢ়তাকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে তাকে লক্ষ্মীজ্ঞানে ১ল পৌষ নবান্ন উৎসব উপলক্ষ্যে পূজা করে থাকে। যেহেতু তিনি লক্ষ্মীগুণসম্পন্না এবং লক্ষ্মীশ্রীযুক্তা, তাই আজও টুসু মহিলাদের নিকট লক্ষ্মীপ্রতিভূ রূপে গণ্যা।

ভাদুগান : বীরভূম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, মানভূম, বর্ধমান প্রভৃতি জায়গায় ভাদুগান শোনা যায়। সাধারণতঃ কুমারীরা ভাদ্রমাসে এই পূজা করে থাকে। এই গানের সুর টুসুগানের অনুরূপ। ভাদুগান অন্যান্য জায়গায় শোনা গেলেও সাধারণত মানভূম অঞ্চলে এই পূজার প্রচার-প্রসার বেশি। ভাদুদেবীর পূজা শ্রাবণ সংক্রান্তি হতে শুরু করে ভাদ্র মাসের সংক্রান্তি পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। সাধারণতঃ নূতন পাত্রে গোবরের উপর ধান ছড়িয়ে ভাদুদেবীর রূপ দান করা হয়। অবশ্য বর্তমানে মাটির প্রতিমারও প্রচলন হয়েছে। এই গানে কুমারী এমন কি বিবাহিতা মহিলারাও অপনজন হিসেবে ভাদুদেবীর নিকট নিজের একান্ত মনের কথা ব্যক্ত করে থাকেন। যদিও আজকাল ছেলেদেরও এই অনুষ্ঠানে যোগদান করতে দেখা যায়। ভাদুদেবীকে লক্ষ্মীর প্রতিভূ ও ঘরের মেয়ের মতো বরণ করা হয়ে থাকে। রসাত্মক ভাবের মাধ্যমে এই গানের ভাব সৃষ্টি। কথিত আছে, ১৮১৩ সনে কাশীপুর রাজতনয়া ভদ্রেশ্বরী দেবীর বিবাহ স্থির হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে বরানুগমনকালে পথিমধ্যে ডাকাত দ্বারা আক্রান্ত হয়ে বরের মৃত্যু হয়। সতীলক্ষ্মী ভদ্রেশ্বরী পিতা ও আত্মীয় পরিজনের অনুরোধ উপেক্ষা করে নব বরের সাথে সহমরণ বরণ করেন। সেই সময়কাল হতে মহিলারা বিশেষ

Scanned with CamScanner

করে কুমারী মেয়েরা ভদ্রেশ্বরীর (ভাদু) আদর্শকে সম্মুখে রেখে ভাদু-পূজা করে থাকে। বলা বাহুল্য, যতটুকু জানা যায় যে, ভাদু বিরাট ধনী-মানী লোকের কন্যা হওয়া সত্ত্বেও সর্বসাধারণের সহিত অত্যন্ত আন্তরিক ভাবে মেলামেশা করতেন। ফলে সকলেই তাঁকে অত্যন্ত ভালোবাসিত ও স্নেহ করিত।

● **ছড়া ও পাঁচালী গান :** প্রাচীনতম কাল হতে ছড়া, পাঁচালী গান ইত্যাদি বিষয়ে বিশেষ করে মেয়েদের মাধ্যমে সুর ও ছন্দ দ্বারা এই গান গীত হতে শোনা যায়। এর সৃষ্টির জন্মকাল সঠিকভাবে নিরূপণ করা আজ প্রায় অসম্ভব। খুব সম্ভবত প্রাত্যহিক জীবনে নানা অনুষ্ঠানাদির মধ্যে ছড়া প্রাচীনতার সাক্ষ্য বহন করে। এই ছড়া তথা পাঁচালী গানকে আমাদের সমাজ জীবনের অঙ্গ স্বরূপ বলা যেতে পারে। এটি সাধারণত দু-ভাগে বিভক্ত : (১) মা, অশান্ত শিশুকে বা ক্রন্দনরত অবস্থা হতে শান্ত করবার উদ্দেশ্যে কিংবা ঘুম পাড়াবার নিমিত্ত আপন আঞ্চলিক ভাষার সাহায্যে ছড়া গান করে থাকেন।। অপরপক্ষে (২) গার্হস্থ্য জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও আপন আত্মীয়স্বজনের কল্যাণ কামনায় নানা উপচারে ব্রত ইত্যাদির মাধ্যমে ব্রতকথা বা পাঁচালী গান মেয়েদের এক বিশেষ সামাজিক অনুষ্ঠান। যেমন—মাঘ মণ্ডল, পরশ্বের, বন দুর্গা, ভাদুলি, নাটাই চন্ডি, তেলপান, সেঁজুতি, পিবদনাশিনী, অসময় নারায়ণী, তুষতুষলি, ইতুপূজা, পাটাইপূজা, পুণ্যিপুকুর, মঙ্গলচন্ডি, নিরাকলি ইত্যাদি।

● **আগমনী ও বিজয়ার গান :** এই গান সমূহ বাঙালি মনের সুখ ও অন্তর্বেদনার প্রতিচ্ছবি স্বরূপ। উমার পিতৃ গৃহে আগমনে বহু আকাঙ্ক্ষিত মাতা মেনকার মনে আনন্দের সঙ্গে বিচ্ছেদ মিশ্রিত হয়ে এই গান বাঙালি মনকে শুভ প্রতীক্ষায় দোলায়িত করলেও বিজয়ার বিচ্ছেদের বিয়োগ ব্যথা মনকে অত্যন্ত ভারাক্রান্ত করিয়ে তোলে। সাধক রামপ্রসাদ ও কমলাকান্তের গান সমূহে এই অন্তর্বেদনা ফুটে উঠেছে। এছাড়া পল্লী বাংলার অনেক অজ্ঞাত কবি সহজ-সরল ভাষায় এই মর্মবেদনাকে তাঁদের সংগীতের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন, যা গ্রাম্য জীবনে চিরায়ত আগমনী ও বিজয়ার গান হিসেবে সমাজ জীবনে স্থান পেয়ে আসছে। ক্ষেত্র বিশেষে মূল গানের ভাষাগত আংশিক অদল-বদল করে বর্তমানেও বাংলাদেশে পূজামণ্ডপে এই গান গাইতে শোনা যায়। একসঙ্গে কয়েকজন দল বেঁধে ও পায়ে তাল দিয়ে সম্পূর্ণ এক ভিন্ন সুরে নৃত্যের ভঙ্গিমায় এই সুখশ্রাব্য গান গেয়ে থাকেন। বলাবাহুল্য, পূজার তিনদিন (সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী) একই গান রূপায়িত না হয়ে ভিন্ন ভাষা ও সুরে আঙ্গিকে এই গান সমূহ গীত হয়ে থাকে।

● **রাখালিয়া গান :** এই গান সাধারণত রাখাল বালকেরা ক্ষেতে গরু চরাবার সময় গেয়ে থাকে। অনেক সময় বাঁশীও এই গানে বাজানো হয়। রাখালিয়া গানের বিষয়বস্তু সাধারণত কৃষ্ণ ও গোপাল বালকদের গোচারণকে উপলক্ষ্য করে লেখা হয়ে থাকে।

● **ঘেঁটু গান :** ঘেঁটুর অপর নাম ঘণ্টাকর্ণ। শীতলা দেবী যেমন বসন্ত রোগ নিরাময়ের দেবী তেমনি ঘেঁটু বা ঘণ্টাকর্ণ চর্ম রোগ বা খোস পাঁচড়া দূরীকরণের দেবতা।

কিশোর-কিশোরীরা ফাল্গুন মাসে ঘেঁটু গান গায়ে বাড়ি বাড়ি থেকে চাল ও পয়সা সংগ্রহ করে এবং সংক্রান্তির দিনে চাল আর ডালের নৈবেদ্য, দূর্বা, ভাঁটফুল, সিঁদুর কৌটা, ভাজনা খোলায় (চাল ভাজবার পাত্র) সাজিয়ে সিজ গাছ (কণ্টক বিশিষ্ট ত্রিশিরা যুক্ত গাছ)-এর তলায় ঘেঁটুর পূজা করে থাকে।

● **ঘাটু গান :** একটি সুন্দর কিশোরকে সুন্দর ভাবে সাজিয়ে ঘাটু গানের আসরে নামানো হয়। শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে রাধিকার মিলনের ঘটনাকে অবলম্বন করে এই গান রচিত। ময়মনসিংহে ঘাটু গান বিশেষ প্রচলিত।

● **জাগ গান :** 'জাগ' এই কথাটির শব্দার্থ হল সারারাত্রি জেগে অর্থাৎ জাগরণ পূর্বক যে গান করবার মাধ্যমে ধর্মানুষ্ঠান উদ্‌যাপিত করা হয় এটাই 'জাগ গান' নামে আখ্যায়িত হয়ে থাকে। বলা বাহুল্য, হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই এক মহত্ত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান করে থাকেন। এই গান সাধারণত রাখাল বালকেরা সারারাত্রি জেগে পীর দরবেশ, সুফি ও ফকিরদের অলৌকিক আখ্যান ও তাঁদের মাহাত্ম্যের কথা বর্ণনা করে থাকেন। এছাড়া হিন্দু ধর্মের মহাপুরুষ ও সাধকদের বিষয় ধর্মমূলক ভাষাও এই গানে স্থান পেয়ে থাকে। পশ্চিমবঙ্গেও সারা রাত্রি জেগে থেকে দেব-দেবীর অলৌকিক তথা মহত্ত্বপূর্ণ গান অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত গানকে 'জাগরণ' গান বলা হয়। অপর পক্ষে কৃষ্ণ-রাধার আখ্যানযুক্ত যে গানে রাধিকার সারা রাত্রি যাপনের বিষয়বস্তু দ্বারা গান রচিত হয় একে 'জাগরণী' গান নামে আখ্যায়িত করা হয়। উত্তরবঙ্গে প্রচলিত জাগ-গান বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সোনাপরি-এর অলৌকিক মহত্ত্বপূর্ণ বিষয়বস্তু সম্বলিত গান। এই গান সাধারণত রাজশাহী, পাবনা, রংপুর ইত্যাদি স্থানে বেশি শোনা যায়।

● **বোলান গান :** এই গান চৈত্র সংক্রান্তিতে শিব পুজোর সময় প্রায় ৩/৪ দিন ধরে অনুষ্ঠিত হওয়ার রীতি আছে। বেশ কয়েকজন পুরুষ বৈচিত্র্য আনয়নের জন্য মেয়ের সাজে সেজে থাকে। এই গানে বিষয়বস্তু বা আখ্যান সাধারণত রামায়ণের সীতার বনবাস বা লবকুশ-এর বিষয় তথা মহাভারতের দাতা কর্ণের কিংবা শ্রীকৃষ্ণে লীলা ও নৌকাবিলাস এবং রাজা হরিশচন্দ্রের জীবনদর্শন ও সাবিত্রী-সত্যবানের আখ্যান অবলম্বনে ঢোলক ইত্যাদি জুড়ি সহযোগে গীত হয়ে থাকে। এই গানে ছড়া, পাঁচালী ইত্যাদিও গীত হওয়ার রীতি আছে।

● **পটুয়ার গান :** পট বা পটুয়া শব্দের আভিধানিক অর্থ হল চিত্রকর। পটুয়া নামে এক বিশেষ সম্প্রদায় আছে যারা কাগজ কিংবা কাপড়ের মধ্যে ধর্মমূলক নানা বিষয়বস্তু চিত্রায়িত করে বিশেষ ধরনের গান বা ছড়ার মাধ্যমে বাড়ি বাড়ি গিয়ে তা শুনে অর্থ উপার্জন করে থাকে। পূর্ব এবং পশ্চিম উভয় বঙ্গে এই শ্রেণির লোকদের দেখা গেলেও এঁকে অস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য পটুয়া সম্প্রদায় ও পটুয়ার গান বর্তমানে প্রায় লুপ্ত হতে বসেছে। বাংলাদেশের হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায় কাগজ কিংবা কাপড়ে পট আঁকিয়া অর্থ উপার্জ্জন করে

Scanned with CamScanner

থাকে। উক্ত পটের বিষয়বস্তুতে হিন্দু দেব-দেবী বা গাজিদের উপাখ্যান বর্ণিত হয়। পশ্চিমবঙ্গের নানা জেলায় বিশেষ করে বীরভূম, মেদিনীপুর ইত্যাদি স্থানে পটুয়া সম্প্রদায়ভুক্ত এক শ্রেণির লোক বেশি দেখা যায়। তাদের সামাজিক অনুষ্ঠানাদি বিশেষ বৈচিত্র্যপূর্ণ। এই পটুয়াগণ হিন্দু নাম ধারণ করলেও এবং মেয়েরা শাঁখা সিঁদুর পরা সত্ত্বেও মুসলমানদের নাম প্রথা তাদের মধ্যে প্রচলিত। সত্যি কথা বলতে কী বর্তমানে ধর্ম নিয়ে হানাহানির যুগে পটুয়াগণ হিন্দু/মুসলমানরা সম্প্রীতির এক মূর্ত প্রতীক।

পটুয়াদের পট মূলত দু শ্রেণির : (১) চতুষ্কোণ বিশিষ্ট চিত্রায়িত ছোটো ছোটো পট, (২) ক্রমানুসারে বহু চিত্রাঙ্কিত প্রায় ২০/২৫ হাত পর্যন্ত লম্বা পট। বলাবাহুল্য, এই উভয় প্রকার পট গোটানো অবস্থায় রাখা হয়। প্রদর্শনকালে একটি লম্বা সরু বাঁশের অগ্রভাগে এই গোটানো পটটি স্থাপন করে একটি সরু কঞ্চির সাহায্যে ক্রমান্বয়ে গোটান পটটির বিশেষ বিশেষ চিত্র কঞ্চির দ্বারা সংগীত বা ছড়ার মাধ্যমে প্রদর্শন করে দর্শকদের আকৃষ্ট করা হয়ে থাকে। এইভাবে সম্পূর্ণ দীর্ঘ চিত্রায়িত পটটি দর্শকদের নিকট উন্মোচিত করা হয়ে থাকে। কাহিনির দিক থেকে চিত্রসমূহ বিচ্ছিন্ন হলেও এক আখ্যান থেকে পরবর্তী আখ্যায়িকায় যাওয়ার মধ্যবর্তী সময়ে ছড়া কিংবা গানের মাধ্যমে পূর্ণ করা হয়। ফলে চিত্রসমূহ এবং আখ্যানের বিষয়বস্তু তথা গান ও ছড়ার একে অপরের শ্রুতি এবং দৃষ্টি নন্দনের পরিপূরক স্থান গ্রহণ করে। পটুয়াদের পটের বিষয়বস্তু সাধারণত মনসা মঙ্গল, বেহুলা-লখিন্দর, রামায়ণ বিষয়ক বিভিন্ন রূপ বর্ণনা, কমলে কামিনী, ভাগবত বিষয়ক, শ্রীগৌরাঙ্গ-নিতাই পর্ব, গোঁসাই পট, যম পট, সাহেব পট ইত্যাদি বহু বিচিত্র তথা বর্তমানের বহু ঘটনা সম্বলিত আখ্যানও এতে স্থান পেয়েছে। এই পটে চিত্রগুলির মাধ্যমে সমাজ এবং বাঙালি স্ত্রী-পুরুষদের জীবনকাহিনি এবং শিক্ষণীয় বহু বিষয় বস্তুর আদর্শ প্রতিবিম্বিত হয়েছে।

● **ঝাঁপান গান** : শ্রাবণ মাসে বিশেষ করে শ্রাবণ সংক্রান্তির দিনে সাপুড়িয়া বা সাপের ওঝাগণ বিশেষ একটি নির্দিষ্ট স্থানে একত্রিত হয়ে সাপসহ বিষ দূর করবার কৌশল বা তাদের মন্ত্রশক্তি প্রদর্শন করতে গিয়ে যে গানের সাহায্য নিয়ে থাকে সেই গানসমূহকে বলা হয় 'ঝাঁপানি গান'।

কর্ম সংগীত : দৈহিক শক্তি প্রয়োগ করে কোনো ভারি বা শক্ত কাজ করবার সময় শ্রম লাঘব করবার কল্পে সমবেতভাবে যে গান করা হয় তাকে কর্ম সংগীত বলা হয়। এই গান সাধারণত মূল গায়ক কোনো বিশেষ ধ্বনি বা সুর ছন্দোবদ্ধ করে প্রয়োগের পরক্ষণে সমবেত কর্মীরা একত্রে ও একই সময় ভারী বা বিশেষ কর্মটি সম্পন্ন করবার জন্য যে বিধিবদ্ধ আওয়াজ বা সুর প্রয়োগের মাধ্যমে বল বা শক্তি প্রয়োগ করে থাকে একে কর্ম সংগীত বলে। এটি মূলত সারি গানের পরিপূরক। নৌকা দৌড় বা নৌকা বাইচের গান, ছাদ পেটানোর গান, তাঁত চালানোর গান ইত্যাদিকে কর্ম সংগীতের পর্যায়ভুক্ত করা হয়েছে।

● **করম পরবের গান** : এই গান মূলত ছোটোনাগপুরের আদিবাসীদের পরব হলেও বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগণা, বর্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভূম ইত্যাদি জেলায় যে সমস্ত স্থানে আদিবাসী অর্থাৎ সাঁওতাল, ওঁরাও, মুণ্ডা আদিবাসীরা বসবাস করে তারা প্রচুর ফসল পাওয়ার কামনায় একটি খোলা জায়গায় কদম্ব গাছের ডাল পুঁতে একে ফুলের মালা দিয়ে সাজিয়ে সারা রাত্রিব্যাপী লৌকিক কাহিনি যুক্ত করে তালসহ নৃত্য গান করে থাকে। এই গানকে করম পরবের গান বলা হয়।

● **বিহুগান** : এই গান বা উৎসব আসামের আনন্দোচ্ছল পাগল করা নৃত্যগীত-এর প্রধান অনুষ্ঠান বললে অতিশয়োক্তি হবে না। 'বহাগ' মাস মূলত আসামের ভাষা অর্থাৎ বৈশাখ মাসকে তারা বহা বলে থাকেন ; বৈশাখ মাসের বিহু গান বা উৎসবকে রঙালি বিহু নামে অভিহিত করা হয়, কারণ এই উৎসবে আনন্দ, রঙ্গ, নৃত্য, গান ইত্যাদি বিশেষরূপে প্রাধান্য পায়। চৈত্র-সংক্রান্তিতে বহাগ-বিহুর সুর হয়। অপরপক্ষে পৌষ-সংক্রান্তিতে সুরু হয় মাঘ বিহু বা ভোগালী বিহু। এটি মূলত নবান্ন বা নতুন ফসল গৃহে তোলবার মহোৎসব।

● **ঝুমুর** : মানভূম, সিংভূম, বীরভূম, বাঁকুড়া ও ছোটোনাগপুর ইত্যাদি জায়গায় এই লোকগীতি বেশি শোনা যায়। রাধাকৃষ্ণ প্রেমলীলা বিষয়ক বিষয়বস্তু এই গানের প্রধান উপজীব্য। বিশেষ করে সাঁওতালীদের মধ্যে মাদল সহযোগে এই গানের বহুল প্রচার দেখা যায়।

● **চটকা** : উত্তরবঙ্গে আরও একটি লোকসংগীতের নাম হল চটকা গান, শৃঙ্গার রসাত্মক হাল্ক ভাষায় এই গান সৃষ্ট।

● **চৈতী** : এই শৈলীর গানও বিহারের প্রধান লোকসংগীতগুলির মধ্যে অন্যতম। সম্ভবত চৈত্র মাসে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয় বলে এই গানকে চৈতী বলা হয়ে থাকে। এটি শৃঙ্গার রসাত্মক হলেও বিরহ ব্যথার স্পর্শই উক্ত শৈলীর গানে সুস্পষ্ট। সাধারণভাবে রাম-সীতার ব্যথাভরা জীবনদর্শনই এই গানে প্রধান স্থান পেয়ে থাকে। চৈতী গান বিহার প্রদেশে বিশেষ লোকপ্রিয় এবং আদৃত।

● **কাজরী** : উত্তরপ্রদেশে কাজলীদেবীকে কেন্দ্র করে যে গান গাওয়া হয় তাকেই কাজরী বা কাজলী সংগীত বলা হয়। এই গান মূলত এই প্রদেশের লোক-সংগীতের মধ্যে এক বিশেষ স্থান দখল করে আছে। ভাদ্র মাসের কৃষ্ণা তৃতীয়া তিথিতে এই পূজা অনুষ্ঠিত হয়। এই দিনে মহিলারা নববস্ত্রে সুসজ্জিতা হয়ে শৃঙ্গার রসাত্মক ভাষায় কাজলীদেবীর গান সারা-রাত্রিব্যাপী গেয়ে থাকেন। উক্ত দিনে ভাই তথা ভ্রাতৃসমকে রাখি বাঁধা হয়। এই গান উত্তর প্রদেশে লৌকিক আচারের মধ্যে গণ্য হলেও বিশেষ ব্যাপকতা কাশি, মির্জাপুরে বেশ দেখতে পাওয়া যায়। এই গানের বৈশিষ্ট্য হল এই যে, ভাষা শৃঙ্গার রসাত্মক এবং মূল গায়ককে কেন্দ্র করে দুহার হিসেবে আরও অনেকে অনুসরণ করে থাকে। এই অনুষ্ঠানে হিন্দু, মুসলমান সবাই অংশগ্রহণ করে থাকে। নিজ নিজ আঞ্চলিক ভাষায়ও এই গান গাওয়া হয়।

Scanned with CamScanner

এতদ্ভিন্ন মালসী, ভপগান ইত্যাদি বহু প্রকার লোকসংগীত আমাদের বাংলাদেশকে সমৃদ্ধ করেছে। বাংলার বাইরে কাজরী, চৈতী, ভাঙ্গরা ইত্যাদি গান বাংলা তথা ভারতের সমাজ জীবনের সংস্কৃতির দর্পণ স্বরূপ।

❹ ২.৩ 'কারাওকে'-এর সঙ্গে গান (Singing along with "Karaoke") :

জাপানি শব্দ 'কারা' (Kara) অর্থাৎ খালি (Empty), ওকেসুতরা (Okesutora) অর্থাৎ অর্কেস্টা (Orchestra) শব্দ থেকে 'কারাওকে' শব্দটির উৎপত্তি। জাপানি ব্যবসায়ী দেইস্কে ইনোই (Daisuke Inoue) কারাওকে মেশিন আবিষ্কার করেন। কারাওকের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র গানের মিউজিক রেকর্ড করা থাকে এবং ওই মিউজিকের সঙ্গে কোনো গায়ক ওই গানটির সঙ্গে গলা মেলায়। সাধারণত জনপ্রিয় গানের ক্ষেত্রে এই ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করে মিউজিক অর্কেস্টা ছাড়াই দর্শকদের গান শুনিয়ে বিনোদন করা হয়। Empty Track তৈরি করে সাউন্ড ইঞ্জিনিয়াররা Vocal Track-টিকে উহ্য করে দেওয়ায় গায়ক গলায় সুর তুলে ওই গান সহজেই পরিবেশন করতে সক্ষম হয়। এই পদ্ধতি চিন, কম্বোডিয়া, জাপান প্রভৃতি দেশে খুবই জনপ্রিয়। বর্তমানে ভারতবর্ষেও জনপ্রিয় হিন্দি, ইংরেজি ও আঞ্চলিক ভাষার গানগুলিকে এই কারাওকে সিস্টেমে দর্শকদের সামনে উপস্থাপিত করা হয়। এই পদ্ধতি সুবিধে হল—কোনো গায়ক মিউজিক অ্যারেঞ্জমেন্ট ছাড়াই সে নিজেকে সুরের সঙ্গে তাল মিলিয়ে সামঞ্জস্যপূর্ণ ভাবে কোনো ঘরোয়া পরিবেশে কিংবা একক খেয়ালে গানের অনুশীলন করতে পারে।

❹ ২.৪ গান, কবিতা ও প্রার্থনা সংগীতের কৌশল (Composition of Songs, Poems, Prayers) :

❑ ২.৪.১ গানের কৌশল (Composition of Songs) :

পরের পাতায় কয়েকটি গানের নির্মাণ স্বরলিপি আকারে দেখানো হল।

Follow Our B.Ed Related Website>>

www.dascoaching.in

তাল ঃ—কাহারবা

জনগণমন অধিনায়ক জয় হে ভারত ভাগ্যবিধাতা
পঞ্জাব সিন্ধু গুজরাট মরাঠা দ্রাবিড় উৎকল বঙ্গ
বিন্ধ্য হিমাচল যমুনা গঙ্গা উচ্ছল জলধিতরঙ্গ
তব শুভ নামে জাগে তব শুভ আশীষ মাগে
গাহে তব জয় গাথা।
জনমনমঙ্গলদায়ক জয় হে ভারত ভাগ্যবিধাতা
জয় হে, জয় হে, জয়হে, জয় জয়, জয়হে।

II সা রা গা গা । গা গা গা গা । গা -া গা গা । রা গা মা -া I
জ ন গ ন ম ন অ ধি না ০ য় ক জ য় হে ০

I গা -া গা গা । রা -া রা রা । ন্ রা সা -া । -া -া সা সা I
ভা ০ র ত ভা ০ গ্য বি ধা ০ তা ০ ০ ০ প ন্ I

I সপা -া পা পা । পা পা পা পা । পা -া পা পক্ষা । পা ক্ষা ধপা -া I
জা০ ০ ব সি ন্ ধু গু জ রা ০ ট মা০ রা ০ ঠা০০ I

I মা -া মা মা । মা মা মা গা । রা মা গা -া । -া -া -া -া I
দ্রা ০ বি ড় উ ৎ ক ল ব ঙ্ গ ০ ০ ০ ০ ০

I সগা গা গা গা । গা -া গা রা । পা পা পা মা । মা মা মা -া I
বি০ ন্ ধ্য হি মা ০ চ ল য মু না ০ গ ঙ্ গা ০

I গা গা গা গা । রা রা রা রা । ন্ রা সা -া । -া -া -া -া I
উ চ্ ছ ল জ ল ধি ত র ঙ্ গ ০ ০ ০ ০ ০

Scanned with CamScanner

I গা গা গা গা । গা -া গা মা । রা গা মা -া । -া -া -া -া ।
ত ব শু ভ না ০ মে ০ জা ০ গে ০ ০ ০ ০ ০

I গা মা পা পা । পা -া মা গা । রা মা গা -া । -া -া -া -া ।
ত ব শু ভ আ ০ শী ষ মা ০ গে ০ ০ ০ ০ ০

I গা -া গা -া । রা রা রা রা । না রা সা -া । -া -া -া -া ।
গা ০ হে ০ ত ব জ য় গা ০ ধা ০ ০ ০ ০ ০

I পা পা পা পা । পা পা পা ক্ষা । পা -া পা পা । ক্ষা ধা পা -া ।
জ ন গ ণ ম ঙ্ গ ল দা ০ য় ক জ য় হে ০

I মা -া মা মা । গা -া গা গমা। রা মা গা -া । -া -া না না ।
ভা ০ র ত ভা ০ গ্য বি০ ধা ০ তা ০ ০ ০ জ য়

I র্সা -া -া -া । -া -া না ধা । না -া -া -া । -া -া পা পা ।
হে ০ ০ ০ ০ ০ জ য় হে ০ ০ ০ ০ ০ জ য়

I ধা -া -া -া । -া -া -া -া । সা সা রা রা । গা গা গা গা ।
হে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ জ য় জ য় জ য় জ য়

I মা -া -া -া । -া -া -া -া II
হে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

টুসু গান

তাল ঃ—তেওড়া

টুসু সিনাচ্ছেন গা দোলাচ্ছেন
হাতে তেলের বাটি
নয়ে নয়ে চুল ঝাড়ছেন
গলায় সোনার কাঠি।
কার ঘরে মা বৌঝি আছে
কে বা খাবে পান
শাশুড়ী ননদের ঘরে করে অপমান।
টুসালু গো রাই গাঙ সিনানে যাই॥
গাঙের জলে রাধি মরাকের জল খাই॥

পা পা পা	পা ।	পণা ধণা	পা ।	ধা	পা ।
টু সু সি	না ০	চ্ছে ন	গা ০	দো	লা ০

গা ।	গা পা ।	পা ।	ধর্সা নর্সা	ধা । ।
চ্ছে ন	হা তে ০	তে ০	লে র	বা ০ ০

ধা ।	। ।	ধা র্সা ।	র্সা ।	র্সনা ধপা
টি ০	০ ০	ন য়ে ০	ন ০	য়ে ০০

পা । ।	ধর্সা নর্সা	ধা ।	মা পা ।	ধণা ধণা
চু ০ ল	ঝা ড়	ছে ন	গ লা য়	সো ০০

Scanned with CamScanner

ধপা	।	পা	।	।	সা	।	সা	।	মা	পা	প
না	র	কা	০	০	ঠি	০	০	০	কা	র	ই

পা	পা	ধা	র্সা	সা	র্রা	র্রা	র্রা	র্রা	র্রা	র্রা	
রে	০	মা	০	ব	উ	ঝি	আ	০	ছে	০	

র্সা	র্সা	।	র্সা	।	র্সনা	ধপা	ধা	।	।	।	।
কে	বা	০	খা	০	বে	০০	পা	০	০	০	০

।	।	গা	পা	।	পা	।	পণা	ধণা	ধা	পা	প
০	ন	শা	শু	০	ড়ী	০	ন০	০০	ন	দে	র

পা	।	গা	।	গা	পা	।	পা	।	পণা	ধণা	
ঘ	০	রে	০	ক	রে	০	অ	০	প	০০	

ধপা	।	।	পা	।	পা	।	গা	পা	পা	পা	।
মা	০	০	০	০	০	ন	টু	সা	লু	গো	০

পণা	ধণা	ধপা	।	ধা	পা	।	গা	।	গা	পা	।
রা	ই	গা	ঙ	সি	না	নে	যা	ই	গা	ঙে	র

পা	।	ধর্সা	নর্সা	ধনা	ধা	।	।	।	।	।	
জ	০	লে	০০	রাঁ	ধি	০	০	০	০	০	

গা	পা	।	পা	।	পণা	ধণা	ধপা	।	।	।	।
ম	ক	০	রে	র	জ	ল	খা	০	০	০	০

।	পা
০	ই

পল্লীগীতি

তাল ঃ—দাদরা

দেখেছি রূপ সাগরে মনের মানুষ কাঁচা সোনা
তারে ধরি ধরি মনে করি ধরতে গেলাম
আর পেলাম না ॥
সে মানুষ চেয়ে চেয়ে
খুঁজিতেছি পাগল হয়ে
হৃদয়ে জ্বলছে আগুন আর নেভে না
এখন বলে বলুক মন্দ লোকে
বিরহে আর প্রাণ বাঁচে না ॥
পথিক কয় ভেবো না রে
ডুবে যাও রূপ সাগরে
বিরলে বসে কর রূপ সাধনা
আবার ধরতে পেলে মনের মানুষ
ছেড়ে যেতে অর দিও না ॥

।	।	পা	পা	পা	ধা	মা	।	ধা	পা	পা	ধা
০	০	দে	খে	ছি	০	রূ	প	সা	গ	রে	০

মা	পা	ধপা	মা	গা	মা	রগা	রা	গা	মা	পা	।
ম	নে	র	মা	নু	ষ	কাঁ	০	চা	সো	না	০

পধা	না	না	ধা	পা	ধা	।	।	।	।	পা	ধা
হা	য়	দে	খে	ছি	০	০	০	০	০	তা	রে

ধর্সা	র্সা	।	র্সা	র্সা	।	র্সা	র্সা	।	র্রা	র্সা	র্রা
ধ	রি	০	ধ	রি	০	ম	নে	০	ক	রি	০

Scanned with CamScanner

না	।	র্সা	না	ধা	না	পা	।	ধা	ধা	না	র্সা
ধ	র	তে	গো	লা	ম	আ	র	পে	লাম	না	০
ধনা	র্সা	না	ধা	পা	ধা						
০০	০	দে	খে	ছি	০						
॥ ।	।	মা	মা	মা	পা	পা	।	পা	পা	পা	।
০	০	সে	মা	নু	ষ	চে	০	য়ে	চে	য়ে	০
।	।	পা	ধা	র্সা	র্সা	ন	ধনা	র্সা	না	ধা	না
০	০	খুঁ	জি	তে	ছি	পা	গ	ল	হ	য়ে	০
পধা	না	না	ধা	পা	ধা	পমা	পা	পা	পা	পা	।
০০	০	সে	মা	নু	ষ	চে	০	য়ে	চে	য়ে	০
।	।	পা	ধা	র্সা	র্সা	না	ধনা	র্সা	না	ধা	পা
০	০	খুঁ	জি	তে	ছি	পা	গ	ল	হ	য়ে	০
।	।	পা	ধা	ধা	না	পা	।	না	ধা	পা	ধা
০	০	হৃ	দ	য়ে	০	জ্ব	ল	ছে	আ	ণ্ড	ন
মপা	।	মগা	মা	পা	।	।	।	।	।	পা	ধা
আ	র	নে	ভে	না	০	০	০	০	০	এ	খন
ধর্সা	র্সা	।	র্সা	র্সা	।	র্সা	।	র্সা	র্রা	র্সা	র্রা
ব	লে	০	ব	লু	ক	ম	ন	দ	লো	কে	০
না	না	র্সা	না	ধা	না	পা	।	ধা	ধা	না	র্সা
বি	র	০	হে	তা	র	প্রা	ণ	বাঁ	চে	না	০
ধনা	র্সা	না	ধা	পা	ধা						
০০	০	দে	খে	ছি	০						

॥ ।	।	পা	পা	গা	মা	মা	মা	পা	পা	পা	।
০	০	প	থিক	ক	য়	ভে	বো	০	না	রে	০
।	।	পা	ধা	র্সা	।	না	।	র্সা	না	ধা	পা
০	০	ড়ু	বে	যা	ও	রু	প	সা	গ	রে	০
।	।	পা	ধা	ধা	না	পা	।	না	ধা	পা	ধা
০	০	বি	র	লে	০	ব	সে	০	ক	র	০
মা	পা	মগা	মা	পা	।	।	।	।	।	পা	ধা
রু	প	সা	ধ	না	০	০	০	০	০	আ	বার
ধর্সা	।	র্সা	র্সা	র্সা	।	র্সা	র্সা	।	র্রা	র্সা	র্রা
ধ	র	তে	পে	লে	০	ম	নে	র	মা	নু	ষ
না	না	র্সা	না	ধা	না	পা	।	ধা	ধা	না	র্সা
ছে	ড়ে	০	যে	তে	০	আ	র	দি	ও	না	০
ধনা	র্সা	না	ধা	পা	ধা						
০	০	দে	খে	ছি	০						

This E-Book Download From>>

www.ebook.dascoaching.in

Follow Our B.Ed Related Website>>

www.dascoaching.in

Scanned with CamScanner

❑ ২.৪.২ কবিতার কৌশল (Composition of Poems) :

কবিতা কী : অল্প কথায় বলা যায় যে এ এমন একটি বিশিষ্ট শিল্পমাধ্যম। বা সাহিত্যমাধ্যম যা রূপ, রস ও ভাষার বিশেষ ব্যবহারের মাধ্যমে কবির হৃদয়াবেগ পাঠকের কাছে পৌঁছে দেয়। **ড. জনসন** ও এমনটাই বলেছেন; কবিতা হল 'Metrical Composition : the art of uniting pleasure with truth by calling imagination to the help of reason'। অ্যারিস্টোটলও বলেছেন, 'modes of imitation of human actions'। অনুকরণই হোক বা আনন্দ ও সত্যের মেল বন্ধনই হোক, এ সব সংজ্ঞায় বিশেষ কিছুই বলা হয়নি, না কবিতার সাধারণ রূপ, না কবিতার পূর্ণ অবয়ব। **ম্যাথু আর্নল্ড** যখন বলেন কবিতা হল 'the most delightful and perfect from of utterance that human words can reach': বা কবিতার অন্তর্মর্ম অনুধাবন করতে গিয়ে **স্টুয়ার্ট মিল** যখন বলেন, "the thought and words in which emotion spontaneously embodies itself", বা **মেকলে** যখন বলেন, "the art of employing words in such a manner as to produce an illusion on the imagination, the art of doing by means of words what the painter does by means of colours", তখন একটি কথাই প্রণিধানযোগ্য হয়ে ওঠে যে ধ্বনির তাৎপর্যময় বিন্যাসই যেমন সংগীত, বা রেখা ও রং-এর তাৎপর্যময় সমন্বয়ই চিত্রকলা, সেরকমই শব্দগুচ্ছের তাৎপর্যময় প্রয়োগই কবিতা। ম্যাথু **আর্নল্ড** সংজ্ঞার ব্যাখ্যায় আরও কিছু কিছু যুক্ত করে বলেছেন, "Poetry is at bottom criticism of life under the condition fixed for such a criticism by the laws of poetic truth and poetic beauty." পোয়েটিক ট্রুথ বা বিউটির কথা বলা হলেও তা 'Creative imagination' কে তাৎপর্যময় করে তোলে কিনা তার কোনো ইঙ্গিত নেই।

সংস্কৃত আলংকারিকগণ বিশেষ করে সাহিত্য দর্পণ প্রণেতা বিশ্বনাথ কবিরাজ কবিতার সংজ্ঞা নির্ণয়ে বলেছেন 'বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম' এবং এর রসগঙ্গাধরও সেই কথাই বলেছেন "রমণীয়ার্থ প্রতিপাদক : শব্দ কাব্যম"। কাব্যালঙ্কার প্রণেতা ভামহ শব্দ ও অর্থের সমন্বয়ের রূপকে কাব্য বলেছেন এবং দণ্ডী তা সমর্থন করেছেন কাব্য বা কবিতাকে 'ইষ্টার্থব্যবচ্ছিন্ন পদ' আখ্যা দিয়ে। কাব্য প্রকাশে মম্মথ ভট্ট দোষবর্জিত ও গুণযুক্ত সালঙ্কার শব্দার্থকে কাব্য আখ্যা দিয়েছেন এই বলে যে 'তদদোষৌ শব্দার্থৌ সগুণাবণলঙ্কৃতি পুনঃক্কাপি'। শব্দ ও অর্থের পারস্পরিক সম্পর্ককে আলংকারিক কুন্তক বলেছেন 'পরস্পর স্পর্ধা' অর্থাৎ শব্দ ও অর্থের ধ্বনি ও ব্যঞ্জনাময় দ্বান্দ্বিক সংশ্লেষ। একেই কবিকুলগুরু কালিদাস বলেছেন পার্বতীও পরমেশ্বরের দ্বৈত মিলন ... 'বাগর্থ প্রতিপত্তয়ে'। কুন্তন ও কালিদাসের চিন্তা ভাবনার সঙ্গে সাদৃশ্য আছে ফরাসি কাব্যবিদ **পল ভ্যালেরির** বলেছেন **আবু সয়ীদ আইয়ুব** তাঁর 'পোয়েট্রি অ্যান্ড ট্রুথ, গ্রন্থে। শব্দ ও অর্থের দ্বান্দ্বিক সম্পর্ককে ঘড়ির পেন্ডুলামের দোলনের সঙ্গে তুলনা করে পল ভ্যালেরি বলেছেন যে ঘড়ির পেন্ডুলাম প্রথম যে পয়েন্ট হতে যাত্রা শুরু

করে তা প্রতীকায়িত করে, 'the ideas of Poetic form, the force of rhythm, the conority of syllables, the Physical act of declamation and the natural psychological surprise caused by the unexpected association of words'। যাত্রা শুরু করার পর পেন্ডুলাম যে পয়েন্টে উপস্থিত হয় তাকে বলা যায়, the intellectual effects, the visions and feelings that for you, make up the content, the meaning of the given poem and then observe that the movement of your mind, or of your attention, when subjected to poetry and submissive and docile to the successive impulses of the language the gods, goes from the sound to the sense, from the container to the contained everything happening at first as with the ordinary use of speech'.

কবিতাকে সক্রেটিস বলেছিলেন 'mimesis or imitation' এবং প্লেটো তাঁর Republic এ কবিতাকে বলেছেন "thrice removed from the truth'; এবং সেই কারণেই moral, emotional ও intellectual ground এর ভিত্তিতে কবিতার সমালোচনা করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে কবিরা সম্মানিত হলেও ideal state-এ তাদের প্রয়োজন নেই, "no poetry should be admitted save hymns to the gods and Panegyrics on famous men". অতীন্দ্রিয়বাদী ও আদর্শবাদী (Transcendentalist and idealist) গুরুর-শিষ্য অ্যারিস্টোটল গুরু প্লেটোর এই সিদ্ধান্তকে অভ্রান্ত বলে মেনে না নিয়ে 'পোয়েটিক্স'-এর Defence of Poetry অধ্যায়ে inductive বা আরোহ পদ্ধতির মাধ্যমে real হতে ideal বা Particular হতে general-এ পৌঁছেছেন, Plato-র 'imitation' শব্দটি তিনি ব্যবহার করেছেন। কিন্তু Plato যখন বলেন এই imitation হল 'merely as minicry or a service Copy of Nature', অ্যারিষ্টোটল এই imitation তত্ত্বকে বলেছেন 'creative process' তাঁর মতে 'Poetry imitates not only the externals, but also internal emotions and experiences."

ইংরেজি রোমান্টিক যুগে যাঁরা কবিতার সংজ্ঞা নির্ণয় করেছেন, তাদের মধ্যে অনেকেই শব্দ সম্ভারের উপর জোর দিয়েছেন। যেমন কোলরিজের মতে কবিতা ও গদ্যের মধ্যে পার্থক্য হল—"Prose is words in their best order, Poetry in the last words in the best order". ওয়ার্ডসওয়ার্থ ও শেলী উভয়েই গুরুত্ব আরোপ করেছেন অনুভূতি ও কল্পনার উপর। শেলী যখন কবিতার স্বরূপ ব্যাখ্যায় বলেন 'the expression of the imagination', ওয়ার্ডসওয়ার্থ তখন কবিতাকে চিহ্নিত করেন, 'the breath and finer spirit of all knowledge' বলে এবং স্বরূপ ব্যাখ্যায় বলেন "Poetry is the spontaneous overflow of powerful feeling.' ওয়াটস্ ডাল্টন আবার উভয়ের উপরেই গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁর মতে 'Absolute Poetry is the concrete and artistic expression of the human mind in emotional and rhythmic language"। কবি ও গল্পকার এড্‌গার

Scanned with CamScanner

অ্যালান পো ডাল্টনকে সমর্থন করে বলেছেন "It is the ryhythmic creation of beauty"।

'বহিঃ প্রকৃতি ও মানব চরিত্র মানুষের হৃদয়ের মধ্যে অণুক্ষণ যে আকার ধারণ করতেছে যে সংগীত ধ্বনিত করে তুলিতেছে ভাষা রচিত সেই চিত্র এবং সেই গানই সাহিত্য'—অর্থাৎ কবিতা। রবীন্দ্রনাথে অভাববাদী এই সংজ্ঞাতেই হৃদয়ানুভূতির সঙ্গে প্রকাশশীলতার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ছন্দোবন্ধ সালঙ্কারা পংক্তি গুণহীনা ধনী পত্নীর মতোই শোভনীয়। যাঁরা এই আলঙ্কারিক সৌন্দর্যে বিভোর হন অতুল চন্দ্রগুপ্তের মতে তাঁর দেহাত্মবাদী, যথার্থ কাব্যরসিক নন। মোহিতলাল মজুমদার যে সংজ্ঞাটি দিয়েছেন তাও ভাববাদ সম্পৃক্ত। 'কাব্যলক্ষ্মী ও আত্মার রতিসুখ সম্ভোগ কালে রসোন্মত্ত মানুষের গদগদ ভাবই হল কবিতা।' রবীন্দ্রনাথের মতো কার্লাইলও বলেছেন যে কবিতা হল একধরনের 'Musical thought'।

উপরিউক্ত সংজ্ঞাগুলির কোনোটিই স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়; পক্ষান্তরে অন্ধের হস্তীদর্শনের মতোই কবিতার বহুমাত্রিকতার এক একটি ক্ষুদ্র অংশের উপর আলোকপাত মাত্র। তবে সব সংজ্ঞাগুলিকে একত্র করলে কবিতার সাধারণ অবয়ব সম্পর্কে একটা ধারণা তৈরি হয়ে যাওয়া সম্ভব। সাধারণভাবে মনে হতে পারে যে কবিতা হল কবির কল্পনাশক্তি ও হৃদয়াবেগের সম্মিলিতরূপ যার মাধ্যমে তিনি জীবনকে ব্যাখ্যা করেন। এ দুটি কবিতার প্রধান উপাদান হতে পারে, কিন্তু কবিতার সামগ্রিক রূপ এর দ্বারা ফুটে ওঠে না। কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর 'কবিতা নিয়ে ভাবনা' প্রবন্ধের কিছুটা অংশ উদ্ধৃত করা যেতে পারে।

"... মনে হলে, যেন একটা ট্রেনের কামরায় আমরা বসে আছি, ভীষণ জোরে ছুটছে সেই ট্রেন, ছুটেই চলেছে; দুপাশের বাড়ি-ঘর, গাছপালা, টেলিগ্রাফের খুঁটি, তারের উপর মাছরাঙা, খেলার মাঠ আর খেত খামারও সেই সঙ্গে উল্টোদিকে দৌড়াচ্ছে। এই এখুনি যেটা আমাদের চোখের সামনে, পরক্ষণেই সেটা পিছনে অন্ধকারে হারিয়ে গেল। অনেকক্ষণ পরে পরে আসছে এক একটা স্টেশন, কিন্তু তারাও তাদের প্ল্যাটফর্ম, জলের কল, কলের পাশে কৃষ্ণচূড়া, টিকিট কাউন্টার, মানুষজন ইত্যাদিকে এক লহমার বেশি দৃশ্যমান রাখছে না, যেন সেই সব কিছু সমেত মানুষী পরিশ্রমের এক একটা চমৎকার বিন্যাস মাত্রই এক মুহূর্তের জন্য ভুল করে আমাদের চোখের সামনে ভেসে উঠছে, তারপরেই ঝাঁপ দিচ্ছে উল্টোদিকে—চোখের অন্তরালে হারিয়ে যাচ্ছে।"

অংশটুকুতে পরিষ্কার একটা চিত্রকল্প ফুটে উঠেছে। ভাষার অনবদ্য ব্যবহারে লেখকের আবেগ ও কল্পনার সংশ্লেষে এটি কবিতার কাছাকাছি হলেও কবিতা নয়, বড়জোর কাব্যগন্ধী প্রবন্ধ বা গদ্য বলা যেতে পারে। কিন্তু কীসের অভাবে এটি কবিতা হল না? কোন্ সেই উপাদান যা গদ্য হতে কবিতাকে পৃথক করে? সেই উপাদানটি হল প্রকাশ মাধ্যমে বা Form of expression। চিত্রশিল্পী বা ভাস্করের যেমন প্রকাশ মাধ্যম আছে, কবির ক্ষেত্রে সেই প্রকাশ মাধ্যম হল কবির বিশেষ ভাব। অনেক সমালোচকই মনে করেন কবিতার ভাষা হল

ছন্দবদ্ধ সুরের মূর্চ্ছনা। কল্পনা ও আবেগ যদি হয় কবিতার অন্তরাত্মা, তবে বিশেষ ভাষা তার বাইরের অবয়ব।

এই তৃতীয় উপাদান নিয়ে কবি ও সমালোচকেরা কখনও একমত নন। ফিলিপ সিডনে ও কোলরজি কবিতার ভাষা নির্মাণে ছন্দের প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকার করেননি। আধুনিক কবিরা ছন্দকে নির্বাসনে পাঠিয়েছেন। পোস্ট মর্ডানরা আরও এগিয়ে গিয়ে কবিতার অবয়ব সংক্রান্ত সব স্বীকৃত প্রথাকেই ভাঙতে চাইছেন। সম্পূর্ণ কথ্য ভাষায় যে কবিতা রচনা করা যায় তার অন্যতম নিদর্শন ফরাসি কবি **জাক প্রেভের**-এর Le bouquet (তোড়া) কবিতা:

ওগো ছোটো খুকি, কী করছো তুমি
সদ্য ছেঁড়া এফুলগুলো নিয়ে
হে তরুণী মেয়ে কী করছো তুমি
শুকিয়ে যাওয়া এফুলগুলো নিয়ে
সুন্দরী নারী, কী করছো তুমি
বিবর্ণ এই ফুলগুলো সব নিয়ে
প্রৌঢ় রমণী, কী করছো তুমি
মরে যাওয়া এই ফুলগুলো সব নিয়ে
আমি অপেক্ষা করছি, দেখছি কে জেতে।
(অনুবাদ পলাশ বরণ পাল, অনুষ্টুপ।)

অন্যদিকে **লি হান্ট**-এর মতো সমালোচকেরা ছন্দের উপর গুরুত্ব দিয়ে বলেছেন,

"... the reason why verse in necessary to the form of poetry is that the perfection of Poetical spirit demands it... That the circle of its enthusiasm, beauty and power, is incomplete without it."

এ এক ধরনের মৌলবাদী চিন্তা। ছন্দ সর্বস্বতা যে কবিতা সৃষ্টিতে অক্ষম তা উজ্জ্বল কুমার মজুমদার 'বৃন্দাবন অন্ধকার' কবিতাটির উল্লেখ করে প্রমাণ করেছেন। ছন্দের গণ্ডির বাইরে সম্পূর্ণ গদ্য শৈলীতে কবিতা লেখা যায়। বড়জোর ছন্দকে কবিতার অনুষঙ্গ বলা যেতে পারে, কিন্তু তৃতীয় উপাদান কখনোই নয়। ছন্দের একটা অবদান অবশ্যই আছে, একটা ছন্দবন্ধ কবিতার স্তবক আমাদের মনে সুরের মূর্চ্ছনা তুলে কবিতার আবেদনকে, তার অর্ন্তনির্হিত সৌন্দর্যকে তীব্রতর করে পাঠকের অনুভূতির রাজ্যে প্রবিষ্ট করায়। সংগীতময়তার এ এক অনুরণন, মানসিক প্রশান্তির এক নিবিড় নির্জনতায় পাঠক হৃদয় বুঁদ হয়ে থাকে।

যান্ত্রিক কেরাণীরা ছুটছে লন্ডন ব্রীজ পার হয়ে, নটায় হাজিরা দিতে হবে। তারা ভুলে গেছে যে বহু শতাব্দী পূর্বে ঠিক এ সময়েই যীশুকে ক্রুশ বিদ্ধ করা হয়েছিল, তাই আধ্যাত্মিক

Scanned with CamScanner

দিক হতে তারা মৃত। এই মৃত অথচ জীবিত কেরাণীদের কথা বলতে গিয়ে টি.এস.এ লিখেছেন;

'Son of Man
You can not say or guess, for you know only
A heap of broken images, where the sun beats,
And the dead tree gives no shelter, the cricket no relief,
And the dry stone no sound of water'

'স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যত'—এ বিষ্ণু দে লিখলেন,

'এ নরকে
মনে হয় আশা নেই জীবনের ভাষা নেই
যেখানে রয়েছি আজ সে কোনো গ্রাম ও নয়, শহরও তো নয়,
প্রান্তর পাহাড় নয়, নদী নয়, দুঃস্বপ্ন কেবল,
সেখানে মজুর নেই, চাষা নেই,
যেখানে রয়েছি আজ মনে হয় আশা নেই,
বাঁচাবার আশা নেই, বাঁচাবার ভাষা নেই
সেখানে মড়ক অবিরত,
সেখানে কান্নার সুর এক ঘেয়ে নির্জলা আকাশে
মরমে পশে না আর, সেখানে কান্নাই মৃত
স্মরণ কারোই কোন আশা নেই
অথবা তা এত কম, যে কোনো নিরাশা নেই,
চৈতন্যে মড়ক।'

তাহলে কি সেই পার্থক্য যা কবিতাকে কবিতা করে, গদ্যকে গদ্য? কি সেই বিশেষ কবিতাকে 'অকবিতা' বা না-কবিতা হতে পৃথক করে? এই বিশেষত্ব হল কবিতার নির্মাণ ও শব্দ চয়ন। কবির মনে যে অনুভূতির সৃষ্টি হয়, সেই অনুভূতিকে তিনি শব্দের মাধ্যমে প্রকাশ করতে চেষ্টা করেন। অর্থাৎ কবিতার ভাষা হল কবির মনের ভাবনার বৌদ্ধিক প্রতিরূপ বা intellectual equivalent। এটি এক ধরনের রূপান্তর প্রক্রিয়া। আলংকারিক অভিনব গুপ্ত একেই বলেছেন 'অপূর্ব বস্তু নির্মাক্ষম প্রজ্ঞা'-এর অপর নাম প্রতিভা, যাকে বামনাচার্য বলেছেন 'কবিত্ববীজ' এবং কাব্য মীমাংসা প্রণেতা রাজশেখর বলেছেন 'মানস প্রত্যক্ষ'। কান্টের মতে এই শক্তির নাম 'genius : the innate mental disposition through which nature gives the rule to art' এই প্রতিভাকেই প্লেটো ভেবেছিলেন অলৌকিক শক্তি। গ্রিক পুরাণে এই শক্তিই Muse এবং ভারতীয় অলংকার শাস্ত্রে বর্ণিত 'সর্ব শুক্লা সরস্বতী'। বার্নার্ড শ-এর Life force বা রবীন্দ্রনাথের 'ভূমা

দেবতা'। এই রূপান্তর প্রক্রিয়াকেই ওয়ার্ডসওয়ার্থ বলেছেন 'emotion recollected in tranquility'।

কাব্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে দৈবী প্রেরণার ধারণা খুবই প্রাচীন। ডিমোক্রিটাস, প্লেটো, সিসেরো প্রায় সকলেই কবিতা রচনার ক্ষেত্রে এই দৈবী প্রেরণার যাদুর কথা বলেছেন। অ্যারিস্টটল কবিতা রচনার ক্ষেত্রে দৈবী প্রেরণার কথা না বললেও 'Rhetoric'-এর আলোচনায় এই প্রভাবকে অস্বীকার করেননি। মহাকবিরা প্রায় প্রত্যেকেই দৈবী শক্তিকে আহ্বান করেছেন। বাংলা মহাকাব্যে মাইকেল যেমন বাণীর বন্দনা করেছেন, ভার্জিল, দান্তে এবং মিল্টন ও তাই করেছেন। বিষয়টাকে যতই আনুষ্ঠানিক আখ্যা দেওয়া হোক না কেন, এঁদের অসীম ক্ষমতা ব্যাখ্যার অতীত বলে অনেকে ধারণা করেন। রোমান্টিক যুগেও তার পূর্ববর্তী কাল হতে এই ধারণার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন এডওয়ার্ড ইয়ং, ব্লেক, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, কোলরিজ ও শেলী। এঁরা সকলেই কোনও না কোনও ভাবে দৈবী অনুপ্রেরণার কথা স্বীকার করেছেন।

কবিতা রচনার ক্ষেত্রে কবি শব্দের অভিঘাতকে জারিত করেন বৌদ্ধিক চেতনায় রূপকল্প, প্রতীক, চিত্রকল্প এবং অনুশীলন জাতে ভাষার মাধ্যমে তিনি তাঁর মনের ভাবকে, ব্যক্তিগত অনুভূতিকে পাঠকের কাছে পৌঁছে দেন। কবির সবচেয়ে বড়ো প্রেষণা (Motivation) হল পাঠককে তাঁর অনুভূতির শরিক করা। এরই জন্য ভাষাকে শক্তিশালী করতে হয় সেই রসহ্যকে বজায় রেখে যা শব্দের সমাহারে কবিতা হয়ে ওঠে। এ বিষয়ে কবি নীরেন্দ্র চক্রবর্তীর স্বীকারোক্তিটি খুবই প্রণিধানযোগ্য।

"স্বীকার করা ভালো, বাল্য বয়সেই এই একটা ব্যাপারে আমি স্পষ্ট বুঝতে পেরেছিলুম যে, গদ্য আমার মাতৃভাষা নয়। সুতরাং কবিতা"

কবিতা যে বিশেষ ভাষা আছে তা যেমন কবি মাত্রেই জানেন, পাঠকেরাও তা অনুভব করেন। কবির অন্যতম প্রদান দায়িত্বই হল ভাষা নির্মাণ। 'কবি করোতি কাব্যানি, স্বাদু জানন্তি পণ্ডিতা :'। সমালোচনার নামে ভাষার অবয়ব ভেঙ্গে অপারেশান থিয়েটারে ছুরি কাঁচি চালিয়ে তার ব্যবচ্ছেদ করা সহজসাধ্য বিষয় নয়, কারণ কবিতার রূপকল্প চিত্রকল্প, প্রতীক-এসব কীভাবে ব্যবহৃত হয় তার যেমন কোনো ধরা বাঁধা নিয়ম নেই, তেমনি কোনটা কবিতা-কোনটা নয় তা বিচারেরও কোনো প্রতিষ্ঠিত সূত্র নেই। সবটাই অনুভূতি আর বৌদ্ধিক মনের বিষয়।

কবিতার বিষয়বস্তু খুব মহৎ বা বড়ো হতে পারে, আবার অতি তুচ্ছও হতে পারে। 'কাব্যিক বিষয়' সংক্রান্ত প্রাচীন ধারণাকে নস্যাৎ করে দিয়ে আধুনিক কবিরা অতিতুচ্ছ বিষয় নিয়ে কবিতা লিখেছেন। বিষয় নির্বাচনে কবির স্বাধীনতার উপর কোনো কালাকানুনই এ যাবৎ যুক্ত হয়নি। বিষয়বস্তু যাই হোক না কেন, তা আবেগ দীপ্ত ও রসোত্তীর্ণ হয়ে উঠেছে কিনা ততটাই দেখার বিষয়। তবে একথা মানতেই হবে যে শুধুমাত্র মনোজগৎকে কেন্দ্র করে সাহিত্য সৃষ্টি হয় না। বস্তুজগৎ বিবিক্ত ধারণার কোনো মূল্য নেই, কেননা সাহিত্য বা কাব্য বস্তু জগৎ হতেই তার উপকরণ সংগ্রহ করে। এটাই অনুকরণ তত্ত্ব; যার প্রবক্তা প্লেটো এবং

Scanned with CamScanner

অ্যারিস্টটল এবং যাকে অস্বীকার করার মতো কোনো যথার্থ সূত্র অদ্যাপিও খুঁজে পাওয়া যায়নি। সমাজসেবী ও মার্কসবাদী সমালোচকগণ মনে করেন যে নিখিল বিশ্বের যাবতীয় বস্তু নিশ্চয় ভৌগোলিক-সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। কবির মনে এই নিয়ন্ত্রণে প্রভাব পড়ে এবং কবির উদ্দীপনা উদ্দীপ্ত হয়, ঘটে তার অনুভূতির প্রতিফলন।

'কবিতা কৌমারহন। তার ডাকাতিয়া বাঁশি শুনে
দশ হাতে ঘর দোর জানালা পাঁচিল ভেঙে চুরে
চিনে বাসনের মতো নিজেকে ছড়াই ফুটপাতে
সে তখন নীল জিভে স্বপ্ন চাটে প্রতিটি চুর্ণের।
এমন বাসনা ছিল, ভূত ছিল মাথার ভিতর
শিরা কেটে রক্ত দেব, বদরক্ত বিষ তেতো কালো
যা শরীরে মেখে নেবে এক ঝাঁক শিসের অক্ষর
কবিতার ডাকে নষ্ট হতে ছিল এরকমই সাধ
(অমিতাভ দাশগুপ্ত; কবিতা কৌমার হর।)

❖ ২.৪.২.১ কবিতার প্রকাশভঙ্গি (Expresion style of Poems) :

ছন্দের ইংরেজি প্রতিশব্দ মিটার (Metre)। I.V. Cunningham বলেন, "Poetry is Metrical writing. If it is anything else, I do not know what it is"–Chatman মিটারকে বলেছেন "a systematic literary Convention whereby Certai aspects of Phonology are organised for aesthetic purpose"। রবীন্দ্রনাথও এমনটাই বলেছেন,

"মানবের জীর্ণবাক্যে মোর ছন্দ দিবে নব সুর
অর্থের বন্ধন হতে নিয়ে তারে যাবে কিছুদুর
ভাবের স্বাধীন লোকে।"

'ভাবের স্বাধীন লোক'ই Chatman এর 'aesthetic world'। রবীন্দ্রনাথ অনুভব করেন যে পার্বতী পরমেশ্বরের মতই কথা ও ধ্বনি, সুর ও ছন্দ, ভাব ও রূপ পরস্পরের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত হয়ে ভাবলোক সৃজন করে।

'সুর আপনারে ধরা দিতে চাহে ছন্দে/ছন্দ ফিরিয়া ছুটে যেতে চায় সুরে।
ভাব পেতে চায় রূপের মাঝারে অঙ্গ/রূপ পেতে চায় ভাবের মাঝারে ছাড়া।"

সংস্কৃত, ইংরেজি এবং বাংলা— এই ত্রি ভাষার ছন্দ নিরূপণের রীতি এক নয়। ইংরেজিতে Prosody এবং Scan করার সময় সিলেবেলের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। একটি সিলেবেলে একাধিক Vowel থাকতে পারে, তার মধ্যে একটি vowel ই vowel sound হবে। যেমন glide বা goal এ একটাই vowel sound, তাই এদের বলা হয় Monosyllabic। কিন্তু

Be-long, lit-tle, এ গুলির 2টি vowel sound, এবং E-lec-tricity তে ৫টি vowel sound বর্তমান। একটি word বা শব্দে একাধিক সিলেবেল থাকলেও একটিই তার মধ্যে accented হবে। ac'-ci-dent শব্দটিতে তিনটি syllable থাকলেও প্রথম syllable এ strees পড়েছে। কিন্তু ওই accident শব্দটিকে যখন infliction সহযোগে লম্বা করা হয় অর্থাৎ ac-ci dent-al করা হয়, তখন strees পড়ে প্রথম ও তৃতীয় syllable-এ। কিন্তু প্রথমটিতে stress পড়লেও তা তৃতীয় syllable অপেক্ষা কম জোড় পড়ে। সে কারণে তৃতীয়টিকে বলা হয় Primary accented এবং প্রথমটিকে বলা হয় Secondary accented sylalbles। Article, preposition, Conjunction প্রভৃতি কোনো সময়েই Accented হয় না।

দুই বা তিনের অনধিক Syllable নিয়ে একটি measure বা foot হয়। নিচের উদাহরণে প্রতি foot এ তিনটি accented syllable আছে।

A'll this/ toi'-l for hu'-man/ cul'-ture"

দুটি সিলেবেল যুক্ত foot এ যদি accented syllable unaccented syllable এর দ্বারা অনুসৃত হয়, তবে তাকে বলা হয় Trochaic।

"ni-'gh-er / sti'll and / hi'-gh-er."

(Bole & Sterling এর 'Elements of English Rhetoric and Prosody গ্রন্থ হতে বিভিন্ন Prosodic name, Metrical formula এবং example এর তালিকা এখানে উদ্ধৃত করা হল)

Prosodic name		Metrical formula		Esample
1. Iambus	.....	–/	.....	re-fe'r
2. Trochee	.....	/–	.....	su'f-fer
3. Dauty1	.....	/– –	.....	réfer-ence'
4. Anapaest	.....	– –/	.....	ref-er-ee'
5. Amphibrach	.....	–/–	.....	refé-r-er

কবিতার চরণে একাধিক foot এর সমন্বয় ঘটলে এক হতে ৭ম পর্যন্ত তার নাম হল, Monometer, Dimeter, Trimeter, Tetrameter, Pentameter, Hexameter এবং Heptameter। ইংরেজি scanning এর একটি উদাহরণ হল—

For bóld/ in heárt/ and áct/ and wórld/ was hé
when-év/er slán/ der breáthed/ a-gainst/ the ki'ng = Iambi'c Pentameter

Scanned with CamScanner

❑ ২.৪.৩ প্রার্থনা সংগীতের কৌশল (Composition of Prayers) :

প্রার্থনা সংগীত : 'হিম এর গ্রিক অর্থ song in praise of God or Hero. হোমারের Hymn to Demeter এবং The First Delphic সবচেয়ে প্রাচীন। অধিকাংশ গ্রিক কবিদের প্রার্থনাসংগীত অধুনা অবলুপ্ত হলেও কালিমাকাস (Callimachus 350-240 B.C.) এবং ক্লিনথিস অব অ্যাসস (Cleanthes of Assos 331-232 B.C.) আজও স্মরণীয়। মধ্য যুগে 'Pange lingua gloriosi'-র মতো বহু লাতিন প্রার্থনা সংগীত রচিত হয়। খ্রিস্টান প্রার্থনা সংগীতে ইহুদি প্রার্থনা সংগীতের এবং গ্রিক প্রার্থনা সংগীতের ধারা যুগ্মভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে। দীর্ঘ নির্বাসন ও অত্যাচার জনিত কারণে ইহুদিদের প্রার্থনা সংগীতে অবিচল ঈশ্বর ভক্তির সঙ্গে শত্রু নিধন ও জাতীয় মুক্তির আশাঙ্কা বর্তমান। গ্লোরিয়া ইন একেসলসিস-এ আছে ইহুদি প্রভাব, কিন্তু টে ডিউস'-এ আছে গ্রিক প্রভাব। খ্রিস্টান চার্চ সংগীতেও এই যুগ্ম প্রভাব বর্তমান। ষোড়শ শতকে রেনেসাঁ ও রিফরমেসান-এর প্রভাবে মার্টিন লুথার ও তাঁর অনুগামীদের প্রচেষ্টায় ল্যাটিন প্রার্থনা সংগীতের ধারায় ইউরোপীয় লোকভাষায় প্রার্থনা সংগীত রচনা শুরু হয়। পল রেনহার্ট-এর বিখ্যাত প্যাশান হিম 'O Haupt Voll Blut und Whnden' এই সময়ের রচনা। এই সময়ে আরও যাঁরা হিম রচনা করেছেন, তাঁরা হলেন Nahum Tate, Isaac Watts, Charles weslay, Reginald Heber, John Keble ও John Mason Neale।

ইংরেজিতে যাঁরা হিম রচনা করেছেন তাঁদের মধ্যে আছেন ইংল্যান্ড ও আমেরিকার George Herbert, Dryden, Milton, Blake, Cowper, Henry Wadsworth Longfello, John Greenleaf whittier, Tennyson, Christina Rossetti এবং Rudyard Kipling.

প্রাচীন ভারতে সত্য শিব ও সুন্দরের উপাসক বেদিক ঋষিরা প্রার্থনা সংগীতের মতো কোনো সংগীত রচনা না করলেও তাদের বিভিন্ন বিষয়ের উপর মহিমাময় বর্ণনার মধ্যে আদিত্য বর্ণ মহান পুরুষের প্রতি ভাবগম্ভীর আন্তরিকতা পেয়েছে। উপনিষদের পরবর্তীকালীন সময়েও কবীর, সুরদাস, বল্লভদাস, মীরাবাঈ প্রমুখের হিন্দি দোঁহা ও ভজন, রামদাস ও তুকারামের মারাঠী ভজন, বাংলা সাহিত্যের বৈষ্ণব পদাবলী, শাক্ত সংগীত ও বাউলগান ইত্যাদির ধারার মধ্যে অধ্যাত্মবোধের প্রকাশ ঘটেছে। মুসলমান সুফী সম্প্রদায়ের ঈশ্বরের সঙ্গে প্রেম সম্পর্ক ভক্তিবাদকে সুদৃঢ় করে 'রাগানুগা' ভক্তিরসের বৈষ্ণবীয় স্রোতধারায় লীন হয়েছে। আরও পরে টমসন ও হপকিন্সের মতো রবীন্দ্রনাথও প্রার্থনা সংগীত রচনা করেছেন।

'চিত্ত যেথা ভয় শূন্য, উচ্চ যেথা শির ... নিজ হস্তে নির্দয় আঘাত করি, পিতঃ
ভারতের সেই স্বর্গে করো জাগরিত ... প্রার্থনা, নৈবেদ্য।

বা

'মহা সম্পদ তোমারে লভিব
সব সম্পদ খোয়ায়ে—
মৃত্যুরে লব অমৃত করিয়া
তোমার চরণে ছোঁয়ায়ে।।' সুপ্রভাত।

সাধারণত ভগবানের কাছে প্রার্থনা করা বা উপাসনার ক্ষেত্রে যেসকল সংগীত পরিবেশিত হয় তাকেই প্রার্থনা সংগীত বলা হয়। মূলত আধ্যাত্মিক মার্গের শব্দচয়ন এবং শান্ত সুরের মূর্ছনায় এই সংগীত গীত হয়। প্রাচীনকালে বৈদিকযুগের সময় থেকেই ভারতবর্ষে প্রার্থনা সংগীত 'কোরাস' বা সমবেত ভাবে গীত হত। বিভিন্ন ধর্মের দর্শন ও মূল্যবোধ পাথেয় করে এই সকল সংগীতের কথা রচিত হত। কোনও সভার প্রাক্কালে, বিদ্যালয়ের পড়াশোনার সূচনায়, কোনও অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে প্রার্থনা সংগীত করে মানুষের একাগ্রতা, মনসংযোগ পবিত্রতা ইত্যাদি বৃদ্ধি করা হয়। নিম্নে কয়েকটি প্রার্থনা সংগীতের নির্মাণ কৌশল দেওয়া হল—

তাল ঃ—দাদরা

আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে।
এ জীবন পুণ্য করো দহন-দানে॥
আমার এই দেহখানি তুলে ধরো,
তোমার ওই দেবালয়ের প্রদীপ করো—
নিশিদিন আলোক-শিখা জ্বলুক গানে॥
আঁধারের গায়ে গায়ে পরশ তব
সারা রাত ফোটাক তারা নব নব।
নয়নের দৃষ্টি হতে ঘুচবে কালো,
যেখানে পড়বে সেথায় দেখবে আলো—
ব্যথা মোর উঠবে জ্বলে উর্ধ্ব-পানে॥

ebook.dascoaching.in

Scanned with CamScanner

গা । গা গা গা I
আ গু নে র

II গা গা গা । গা গা -া । গা গা গা । গা রা মা I
প র শ ম নি ০ ছোঁ য়া ও প্রা ০ ০

I মা -া মা । মা মা মা। মগা -া পা । মা গা -া I
ণে ০ এ জী ব ন পু০ ০ ণ্য ক রো ০

I -া -া গা । গা গা গা । গরা রা মা । গা রা -া I
০ ০ এ জী ব ন পু০ ০ ণ্য ক রো ০

I -া -া রা । রা রা গা । রসা -া গা । রা সা -া I
০ ০ এ জী ব ন পু০ ০ ণ্য ক রো ০

I -া -া সা । সা সা পা । পা -া পা । পা পা -া I
০ ০ এ জী ব ন পূ ০ ণ্য ক রো ০

I পা পা হ্মা । পা -া হ্মা । ধপা -া -া । -া -া -া I
দ হ ন দা ০ ০ নে০ ০ ০ ০ ০ ০

I সা রা গা । গা গা গা II
০ ০ আ গু নে র

This E-Book Download From>>

www.ebook.dascoaching.in

II -া -া পা । পা পা পা । পা পা -া । পা পা -া I
০ ০ আ মার এ ই দে হ ০ খা নি ০

I পা পা হ্মা । পা -া হ্মা । ধপা -া না না না না I
তু লে ০ ধ ০ ০ রো০ ০ তো মার ও ই

I ধা ধা পা । পা পা পা । পমা মা গা । গরা -া মা I
দে বা ০ ল য়ে র প্র০ দী প্ ক০ ০ ০

I পা -া {পা । না না না । না না না । না নধা না I
রো ০ নি শি দি ন আ লো ক শি খা০ ০

I র্সা র্সনা র্রা । র্সা -া নধা । ধনা -া} -া । -া -া -া I
জ্ব লু ক গা ০ ০০ নে০ ০ ০ ০ ০ ০

I সা রা গা । গা গা গা II
০ ০ আ । গু নে র

II -া -া সা । সা সা সা । সা সা -া । সা সা -া I
০ ০ আঁ ধা রে র গা য়ে ০ গা য়ে ০

I সা সা সা । সা ন্া সরা । রা -া সা । গা গা গা I
প র শ ত ০ ০০ ব ০ সা রা রা ত্

I গা গা গা । মা পা মগা । গা পমা গা । গরা -া গমা I
ফো টা ক্ তা রা ০০ ন ব০ ০ ন০ ০ ০০

I গা -া (সা । সা সা সা)} । -া । -া -া পা । পা পা পা I
ব ০ আঁ ধা রে র ০ ০ ০ ন য় নে র

Scanned with CamScanner

I	পা	পা	পা	।	পা	পা	-া	।	পা	পা	পা	।	পা	-া	ক্ষা	I
	দু	য্	টি		হ	তে	০		ঘু	চ্	বে		কা	০	০	
I	ধপক্ষা	পা	না	।	না	না	-া	।	ধা	ধা	ধা	।	পা	পা	পা	I
	লো০০	০	যে		খা	নে	০		প	ড়	বে		সে	থা	য়	
I	পমা	মা	মপা	।	গরা	-া	গমা	।	গা	-া	{পা।		না	না	না	I
	দে০	খ্	বে০		আ০	০	০০		লো	০	ব্য		থা	মো	র্	
I	না	না	না	।	না	নধা	না	।	র্সা	র্সা	র্রা	।	র্রর্সা	-া	নধা	I
	উ	ঠ্	বে		জু	লে০	০		উ	র্	ধ		পা০	০	০০	
I	ধনা	-া}	-া	।	-া	-া	-া	।	সা	রা	গা	।	গা	গা	গা	IIII
	নে০	০	০		০	০	০		০	০	আ		ও	নে	র	

২.৫ শিক্ষায় গান ও বাজনার সমন্বয় (Integration of Gayan and Vadan in Educational practices) :

● মানব জীবনে সংগীত শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অথবা প্রকৃতি, মানব ও সংগীত :

সংগীত একটি প্রাথমিক রূপ-কলা বিদ্যা। যে কোনও শিক্ষাই মানুষকে প্রণালীবদ্ধ করে এবং এর মধ্যে সংগীত-শিক্ষার একটু বিশেষত্ব আছে। এটি সংগীতকলার বিশেষত্ব।

খাদ্য-জল-বায়ুর আবশ্যকতা মানে জীবন ধারণের আবশ্যকতা। বিজ্ঞান এর ধারক-সহায়ক। আর কলার জীবনের জীবনত্ব—রূপে-রসে-গন্ধে ফুটে ওঠে। এই রূপ-রস-ভঙ্গির ভিতর তাল-সুরের জগতের সন্ধানই সংগীতের উপজীব্য। এই জগতে সবই আছে, আছে ঘুমন্ত কিছু পত্রচূর্ণ, আর আছে একটি পদ্মের ফুটে ওঠা, বিহঙ্গের কাকলী আবার কাঁকর, জল, শূন্যতা। বিচিত্র এই বিচ্ছিন্ন জগতে একটি ঐক্যবোধ খোঁজার অর্থ হল সুরের দিশা পাওয়া। এই সুরের দিশায় মানুষ নামে এক জীব হল আপন হতে আপন-হারা। হাত-পা-চোখ-নাক ইত্যাদি দেহের বন্ধন হতে সে পেল মুক্তি নাচ, গান, বাদ্যের মাধ্যমে। এই সূর্যের আলো আর একটু ভালো লাগল—প্রকৃতি সম্বন্ধে সে হল সচেতন।

আমাদের প্রয়োজনীয় কাজ-কর্ম, স্বার্থের দ্বন্দ্ব-সংঘাত ইত্যাদির মধ্যে অনুক্ষণ নিমজ্জনে জীবনের যে কল্যাণরূপ ফুটে উঠে না—সেই অসম্পূর্ণ জীবনকে সম্পূর্ণ করাতেই সংগীত-শিক্ষা। সংগীতের মাধ্যমে আমাদের সঙ্গী ও শত্রু বিবিধ ভাব ও প্রবৃত্তিকে একটি উন্নয়নের নির্দিষ্ট দিকে পরিচালন করতে পারি। সবচেয়ে বড়ো কথা হল এই বিচ্ছিন্নতার মধ্যে বেঁচে থাকতে থাকতে মানুষ কিছু নিয়ম তৈরি করে নেয়। কিন্তু সেই নিয়মই হয়ে দাঁড়ায় মানুষের শত্রু ও একঘেয়েমীর উৎস। সংগীতের নিয়ম কিন্তু স্বচ্ছ-নিয়ম—এর নিয়মে আনন্দেই মুক্তি কিংবা অবতরণ। তাই এখানে নিয়মেও স্বেচ্ছা-বিচরণের পথ উন্মুক্ত। নিয়মকে ভালবেসে মানুষ এখানে নিজেরই নিয়মবদ্ধ জীবনের পথ সহজ করে নেয়। আধুনিক এই বিশৃঙ্খল জীবনে (বিশেষত তরুণ সমাজে) তাই সংগীত শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম।

এছাড়া সংগীত একটি আদিম কলাবিদ্যা। এর মাধ্যমে মানুষের যুগ-পরম্পরায় বিধৃত ভাব-সমূহ উপলব্ধি করা সম্ভব। বিভিন্ন লোকসংগীতে বিভিন্ন সভ্যতার বিশেষত্ব ফুটে উঠিয়াছে। সেইগুলি অনুধাবনও বর্তমান সভ্যতার এগিয়ে চলবার পথের একটি পাথেয়। আমাদের দেশের শাস্ত্রীয় সংগীত অনুশীলনের মাধ্যমে আমরা প্রাচীন ঐতিহ্যের উত্তর সাধকরূপে গণ্য হব।

মানবজীবনের অনুপ্রেরক ও উদ্বোধক সংগীতের শিক্ষা তাই "মানুষ" গড়বার গৌরব নিয়ে বেঁচে আছে!

● সংগীত ও মনোবিজ্ঞান বা চিকিৎসা শাস্ত্রে সংগীতের অবদান :

পৃথিবী যখন আজিকার পৃথিবী হয়নি, ভাষা যখন কল্পনার কূলে নিদ্রিত, বৃক্ষকোটরবাসী মানুষের জীবন যখন নখ-দাঁত সর্বস্ব, সেই আদিমমানবের মনও ভরে উঠেছিল দিবাশেষের রক্তিম সূর্য্যের আলোকে আলোকিত বাসায় ফেরা পাখিদের দেখে। অনির্বচনীয় আনন্দে এবং না বলা প্রেমের বোধে ভরে উঠেছে মন, এক অব্যক্ত চীৎকারে সে সুরে সুর মেলাতে চেয়েছে নাম না জানা সেই উড়ে যাওয়া পাখিটির সাথে। এভাবেই আস্তে আস্তে অতি ধীরে ধীরে বিবর্তনের পায়ে পা মিলিয়ে পৃথিবীর আদিমতম শিল্প সংগীত আজ তার প্রথম পাতা যেখানে শুরু করেছে এর আগেও যদি একটি চোখ মেলি তবে দেখব যে, প্রকৃতির প্রতিটি স্তরে স্তরে সঙ্গীত পরিব্যপ্ত। বাতাসের সন্ সন্ শব্দ ও পাখির কূজনে এবং অব্যক্ত প্রেমের আকর্ষণে পাহাড়-পর্বত চিরিয়া নির্ঝরিণীর কল্লোলে সংগীত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে জড়িত। বিজ্ঞান কথাটি হল পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে যুক্তিগ্রাহ্য যে সমাধান, একে বিজ্ঞানের সংজ্ঞা দেওয়া যেতে পারে। আমরা জানি যে আমাদের মন নামক বস্তুটি বিশেষ জটিল, এর তল পাওয়া ভার এবং মন নামক বস্তুটিই আমাদের প্রতিটি চিন্তা, ভাবনা এমনকি দৈহিক ভারসাম্য পর্যন্ত নিয়ন্ত্রিত করে। এইবার আমরা বিশ্লেষণ করে দেখতে পারি যে মন এবং সংগীতের পারস্পরিক সম্পর্ক কতখানি। আমাদের পূর্বসুরী এবং মনীষীদের ধারণা এই যে, উক্ত মনকে

Scanned with CamScanner

যথানিয়মে পরিচালিত করলে এবং মানসিক ইচ্ছাশক্তির সাহায্যে অসম্ভবকে সম্ভব করা যায়। সেই কারণে পৃথিবীর বিখ্যাত মনস্তাত্ত্বিকগণ তাঁদের চিকিৎসার সঙ্গে সংগীতকে একটি বিশেষ স্থান দিয়েছেন বিশ্ববরেণ্য কালোত্তীর্ণ মহান্ দার্শনিক প্লেটো বলেছেন—"সংগীত একাধারে দেহ এবং আত্মার মহৌষধ সংগীত আনন্দবর্ধক, আত্মার পোষক, শিক্ষার সহায়ক এবং রোগ নিয়ামক।" এটি বর্তমানে সুপ্রমাণিত যে, মানসিক ভারসাম্য ও বিশেষ বিশেষ দুরূহ পীড়া নিরাময়ের ক্ষেত্রে সংগীত একটি বিশেষ ঔষধি। শুধু এটাই নয়, প্রকৃতি তথা প্রতিটি জীবজন্তুর উপর সংগীতের প্রভাব অপরিসীম তাই নয় এই কথাটি আজ বিজ্ঞানস্বীকৃত। বীরেশ্বর বিবেকানন্দ সংগীতের অন্তর্নিহিত ভাব উন্মোচন করতে গিয়ে বলেছেন—"মনুষ্য মনের উপর সংগীতের প্রচন্ড প্রভাব। উহা মুহূর্তে মনকে একাগ্র করে দেয়। দেখিবে, অতিশয় তামসিক জড়প্রকৃতি ব্যক্তিগণ—যাহারা এক মুহূর্তেও মন স্থির করতে পারে না, তারাও উত্তম সংগীতে শ্রবণ করে মুগ্ধ হয়ে যায়, একাগ্র হয়ে যায়। এমনকি কুকুর, বিড়াল, সর্প, সিংহ প্রভৃতি জন্তুগণও সংগীত শ্রবণে মোহিত হয়ে থাকে।" কর্কশ ধ্বনি এবং বর্তমান যান্ত্রিক সভ্যতার কুফল স্বরূপ, কলের বা যন্ত্রের তীব্র আওয়াজ মানুষের অসুস্থতার এবং মনোবিকৃতির একটা বিশেষ কারণ বলে মনস্তাত্ত্বিকগণ মনে করেন। এমনকি প্রাজ্ঞজনের ধারণা— শব্দদূষণ থেকে স্নায়বিক পীড়া, অম্লঘটিত নানারূপ রোগ তথা ক্যানসার হওয়াও বিচিত্র নয়। অপরপক্ষে সুরেলা সুমিষ্ট ধ্বনি বা নাদ মানুষের অস্থির চিত্তকে সংযত এবং সমাহিত করতে সক্ষম। মানুষ শোকে, দুঃখে আনন্দে, উৎসবে সংগীতকেই সাথী করে নিয়েছে। নিঃসঙ্গ ও বিক্ষিপ্ত মনকে সংযত করে পরমার্থের পায়ে সমর্পণ করবার জন্য সংগীতকে আমরা অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপায় বলে গণ্য করতে পারি। সংগীতের মহৎ গুণ এই যে তা মনের গ্লানি, নিরাশা ইত্যাদি দূর করে এনে দেয় ভক্তি-আশা-উদ্দীপনা। সংগীতের সঙ্গে মানুষের শিক্ষার একটি আত্মিক যোগ আছে। সংগীতের প্রধান দুটি দিক হল আত্মবিকাশ ও চিত্তবিনোদন। সঙ্গীত সাধনার দ্বারা আত্মবিকাশ সম্ভব, সংগীত মনোরঞ্জনের ক্ষেত্রে অপরিহার্য্য। সংগীতের এই সর্বগ্রাহ্য রূপ, একে বিশেষ এক নান্দনিক রূপ প্রদান করেছে।

প্রকৃতির হাতে চির-অসহায় মনুষ্য সমাজের সম্বল মানুষেরই সৃষ্ট এই একটি কলা, সংগীত। আকাশ যখন নিষ্করুণ, তখন সংগীত সহযোগে মাদল বাজিয়ে নৃত্য করেছে মানুষ। দুর্ভিক্ষে, মহামারীতে এবং প্রাকৃতিক শক্তিরও অর্চনার সহায় এই সংগীত। সামগান প্রাচীন ভারতীয় আর্যদের উপাসনায় ছিল নিত্যসঙ্গী।

সভ্যতার উষাকাল হতেই উৎসবে ও লোকাচারে সংগীতের অনুপ্রবেশ এবং সভ্যতার বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সংগীতেরও পরিবর্তন ঘটেছে। ভারতবর্ষেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। প্রকৃতপক্ষে সভ্যতাকে চেনার একটি সহজ উপায় হচ্ছে সংগীত। সামাজিক উৎসবের

রূপভেদেও সংগীতের পরিবর্তন হয়েছে। বিজয়োৎসবের সংগীত, বিবাহের সংগীত, নবান্নের সংগীত প্রভৃতি আকার ও প্রকৃতিকে বিভিন্ন অর্থাৎ সংগীত যেমন উৎসবের মেজাজকে একটি নতুন অর্থদান করে তেমনি সমাজের ক্রিয়াকলাপের প্রয়োজনে নতুন সুর ও আকৃতির আগমন ঘটায়। সংগীত ক্লেশ-গ্লানি দূর করে। সংগীতের প্রভাবে সামাজিক মানসিক স্ফূর্তি ঘটে অর্থাৎ মানুষে মানুষে মিলনের মহামন্ত্র এই সংগীত।

"তুমি যে সুরের আগুন লাগিয়ে দিলে মোর প্রাণে,
এ আগুন ছড়িয়ে গেল সব খানে॥
যতসব মরাগাছের ডালে ডালে নাচে আগুন তালে তালে,
আকাশে হাত তোলে সে কার পানে॥"

সুরের এই অগ্নি-শক্তি চিরকাল মানুষকে উদ্দীপিত করেছে। পরাধীন ভারতে চারণ কবি মুকুন্দ দাস সংগীতের এই অগ্নি-শক্তিকে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন গ্রামে-গ্রামান্তরে। রবীন্দ্রনাথের স্বদেশি মেলায় কিংবা বিদ্রোহী কবি নজরুলের কণ্ঠেও দলিত মথিত হতাশ জাতির ভাগ্যে এই সেইদিনও আমরা পেয়েছি সামাজিক পরিবর্তনের অগ্রধ্বনি। সংগীতের এই রূপই সত্যের রূপ। সুস্থ সমর্থ সামাজিক জীবনেব প্রতিবন্ধকতা, মানুষের মনের কুটিলতা, হিংসা, দ্বেষ, ক্রোধ, পরশ্রীকাতরতা প্রভৃতি ক্রিয়াশীল ক্লেদাক্ত পঙ্কিল আবর্জনা দূর করে সংগীত আমাদের চির আনন্দময় এক নতুন আধ্যাত্মিক জীবনের গভীরে প্রবেশ করায়। আমাদের এক শক্তিময় রূপকেই অনুভব করি সংগীতের মাধ্যমে। সংগীতের রূপকলা সংহত এবং সম্পূর্ণ। তাই শিক্ষার্থীদের সামাজিক সৃজনশীল প্রতিভা বিকাশের মাধ্যম এই সংগীত। দেশকাল নির্বিশেষে সমস্ত সমাজের মানুষই অন্তহীনভাবে এই সংগীত সায়রে নিমজ্জিত রয়েছে এবং থাকবে।

সংগীতের প্রভাব সর্বব্যাপী। দুঃখের কথা এই যে, হেন মহান সংগীতকে কিছু লোক বিপথে চালনা করে। আমরা আধুনিক যৌন বিকৃতি সম্পন্ন সংগীতের কথাই এখানে বলছি। আশা করি সমাজ জীবনে শুভবুদ্ধির পুনঃপ্রতিষ্ঠা ঘটিয়ে এর দ্রুত মুক্তি এবং সমাজে সংগীতের মহৎ দিকেরই বিকাশ ঘটবে।

শ্রেণিকক্ষে সংগীতের ব্যবহারে শিক্ষার্থীদের যে পরিবর্তন ঘটে তা নিম্নরূপ—

(১) সংগীতের মাধ্যমে একঘেঁয়েমি দূর হয়।
(২) এর মাধ্যমে শিক্ষার্থী মুক্তির আস্বাদ গ্রহণ করে।
(৩) আমাদের মন নামক বস্তুটি ভার মুক্ত করে সহজ করে।

Scanned with CamScanner

(৪) মানসিক ভারসাম্যহীন ও দুরূহ পীড়া আক্রান্ত শিক্ষার্থীর শিক্ষার ক্ষেত্রে সংগীত মহৌষধ হিসেবে কাজ করে।
(৫) সংগীতের মুগ্ধতায় শিক্ষার্থীর একাগ্রতা বৃদ্ধি করে।
(৬) সংগীতের সুরেলা সুমিষ্ট ধ্বনি শিক্ষার্থীর অস্থির চিত্রকে সংযত ও সমাহীত করে।
(৭) নিঃসঙ্গ বিক্ষিপ্ত মনকেও নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।
(৮) মনের গ্লানি, নিরাশা দূর করে সংগীত শিক্ষায় ভক্তি-আশা-উদ্দীপনা সঞ্চার করে।
(৯) সংগীত সাধনায় শিক্ষার্থীর আত্মবিকাশ সম্ভব হয়।
(১০) শুভবুদ্ধি বিকাশের ক্ষেত্রে সংগীত শিক্ষার্থীদের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে।
(১১) শিক্ষার্থী মনের কুটিলতা, হিংসা, দ্বেষ, ক্রোধ, পরশ্রীকাতরতা প্রভৃতি দূর করে সংগীত শিক্ষার্থীদের চির আনন্দময় নতুন জীবনের গভীরে প্রবেশ করতে সাহায্য করে।

Scanning Copyright By DASCoaching.in

Thank You

Visit Our Educational Website

Regularly For More Update:

https://www.dascoaching.in/

Contact Us On:

Facebook: fb/dascoaching.in

YouTube: DAS Coaching

mailto:contact.dascoaching@gmail.com

Follow on Dailyhunt Apps: DAS Coaching

Telegram: DAS Coaching

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ও উত্তর
(Short Questions & Answers)

❑ **অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ও উত্তর (Objective type questions & answers) :** Marks - 2

প্রশ্ন : সংগীত কী?
উত্তর : 'সংগীত' হল— গীত, বাদ্য ও নৃত্য— এই তিনটি কলার সমাবেশ। বস্তুত, এই তিন কলারূপ পরস্পর স্বতন্ত্র, কিন্তু গীত-প্রধান হওয়ার জন্য 'সংগীতে' এই ত্রিবিধ-কলাকৃতির সমাবেশ ঘটেছে। ধ্বনি থেকে এসেছে সুর এবং সুরকে সঙ্গী করেই কখনও ভাষার সাহায্যে, কখনওবা ভাষার সাহায্য না নিয়েই সৃষ্টি হয়েছে 'সংগীত'। 'সংগীত' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হল— সম্যক্‌রূপে গীত ইতি সংগীত। অর্থাৎ যে ধ্বনি তথা সুর, মানুষের কণ্ঠে ও বাদনযোগ্য সংগীতোপযোগী - বাদ্যযন্ত্রে গীত (গায়ন + বাদন) হয়,— তাকে 'সংগীত' বলা হয়।

প্রশ্ন : তাল ও লয় কী?
উত্তর : তাল : সংগীতে ছন্দের বিভিন্নতা সাপেক্ষে 'তাল'কে বলা হয় সংগীতের অঙ্গ; কতকগুলি মাত্রা ও বিভাগের সমষ্টিকেই সংগীতে 'তাল' বলে। তাল মূলত দুই প্রকার — সমপদী (যাদের বিভাগ সমান— যথা : দাদরা তাল, কাহারবা তাল, একতাল, তিনতাল বা ত্রিতাল ইত্যাদি)। এবং বিষমপদী (যাদের বিভাগ সমান নয়— যথা : রূপক তাল, তেওড়া তাল, ঝাঁপতাল ইত্যাদি)।

লয় : গীতের ছন্দকে সমান গতি এবং সমতা রক্ষা করার নাম 'লয়'। লয় প্রধানত তিন প্রকার — বিলম্বিত লয়, মধ্য লয়, দ্রুত লয়।

প্রশ্ন : ছন্দ কাকে বলে?
উত্তর : কবিতার ধ্বনি এবং সাহিত্য রূপায়ণে ছন্দ অপিরহার্য। এক কথায় ধ্বনির বিভিন্ন তরঙ্গায়িত বৈচিত্র্যপূর্ণ বিভাগকেই ছন্দ বলা হয়। তালের ক্ষেত্রে বিভিন্ন মাত্রা বিশিষ্ট বিভাগের দ্বারা উক্ত ছন্দ রূপায়িত হয়ে থাকে।

প্রশ্ন : বাউল কাকে বলে?
উত্তর : বাউল একটি সম্প্রদায়। মানব ধর্মই এই সম্প্রদায়ের মূল কথা। মানুষের দেহকেই ভগবানের দেউল বলে মনে করা হয় এবং দেশ-দেশান্তরে এই সম্প্রদায়ের লোকেরা গান

Scanned with CamScanner

গাহিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। বাউল গানের অর্থ দ্ব্যর্থবোধক। সাধারণ ভাবে এ গানের অর্থ এক প্রকার কিন্তু গভীরে এর অর্থ ভিন্নরূপ, মূলত পরমার্থ বিষয়ক। তাদের পোষাক-পরিচ্ছদও স্বাতন্ত্র্যপূর্ণ একতারা হাতে এবং পায়ে ঘুঙ্ঘুর বেঁধে নৃত্যের তালে এ গান পরিবেশিত হয়। অদিকন্তু আনন্দলহরী, মন্দিরা এই গানের সহযোগী বাদ্যযন্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

প্রশ্ন : কবিতা কী ?

উত্তর : অল্প কথায় বলা যায় যে এ এমন একটি বিশিষ্ট শিল্পমাধ্যম। বা সাহিত্যমাধ্যম য রূপ, রস ও ভাষার বিশেষ ব্যবহারের মাধ্যমে কবির হৃদয়াবেগ পাঠকের কাছে পৌঁছে দেয় **ড. জনসন** ও এমনটাই বলেছেন; কবিতা হল 'Metrical Composition : the art of uniting pleasure with truth by calling imagination to the help of reason' অ্যারিস্টোটলও বলেছেন, 'modes of imitation of human actions'।

প্রশ্ন : প্রার্থণা সংগীত কাকে বলে?

উত্তর :সাধারণত ভগবানের কাছে প্রার্থনা করা বা উপাসনার ক্ষেত্রে যেসকল সংগীত পরিবেশিত হয় তাকেই প্রার্থনা সংগীত বলা হয়। মূলত আধ্যাত্মিক মার্গের শব্দচয়ন এবং শান্ত সুরের মূর্ছনায় এই সংগীত গীত হয়। প্রাচীনকালে বৈদিকযুগের সময় থেকেই ভারতবর্ষে প্রার্থনা সংগীত 'কোরাস' বা সমবেত ভাবে গীত হত। বিভিন্ন ধর্মের দর্শন ও মূল্যবোধ পাথেয় করে এই সকল সংগীতের কথা রচিত হত। কোনও সভার প্রাক্কালে, বিদ্যালয়ে পড়াশোনার সূচনায়, কোনও অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে প্রার্থনা সংগীত করে মানুষের একাগ্রতা মনসংযোগ পবিত্রতা ইত্যাদি বৃদ্ধি করা হয়।

সম্ভাব্য প্রশ্নাবলি

❑ অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন (Objective type questions) : Marks – 2

১। ঝুমুর গান কাকে বলে?
২। সপ্তক কয়প্রকারের ও কী কী?
৩। গজল কী?
৪। সাতটি শুদ্ধ স্বরের উদ্ভব কোথা থেকে হয়েছিল? দুটি উদাহরণ দিন।
৫। সংগীত কী?
৬। ভারতীয় সংগীতের উৎপত্তি কোথায় উল্লেখ করুন।
৭। বিলম্বিত লয় বলতে কী বোঝায়?
৮। কাহারবা কাকে বলে?

❑ সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন (Short type questions) : Marks – 5

১। লোকসংগীত কাকে বলে? দুটি লোকসংগীত নিয়ে আলোচনা করুন।
২। কণ্ঠ সাধনার পদ্ধতি বলতে কী বোঝায়?
৩। গানের তিনটি প্রকার নিয়ে লিখুন।
৪। ভারতের সংগীতের দুটি কাল নিয়ে আলোচনা করুন।
৫। আবৃত্তিতে উচ্চারণ নিয়ে আলোচনা করুন।
৬। সংগীতের ভাষায় অলংকার বলতে কী বোঝায়? কয়েকটি উদাহরণ দিন।
৭। শ্রুতি ও স্বর নিয়ে আলোচনা করুন।

❑ রচনাভিত্তিক প্রশ্ন (Essay type questions) : Marks – 10

১। লোকসংগীত কাকে বলে? বিভিন্ন ধরনের লোকসংগীত নিয়ে আলোচনা করুন।
২। সংগীত কী? সংগীতের উৎপত্তি ও গান নিয়ে আলোচনা করুন।
৩। প্রার্থনা সংগীত বলতে কী বোঝায়? স্বরলিপিসহ একটি প্রার্থনা সংগীত বর্ণনা করুন।
৪। তাল ও লয় সম্পর্কে বর্ণনা করুন।

Scanned with CamScanner

অধ্যায় ৩

নৃত্যকলা
(The Art of Dance)

❑ বিষয়বস্তুর রূপরেখা :

৩.১ বিভিন্ন নৃত্যকলা — ভরতনাট্যম, কথাকলি, লোকনৃত্য : গরবা, ভাভাই, ভাঙ্গরা, বিহু, এবং অন্যান্য লোকনৃত্য **(Various Dance Forms– Bharat Natyam, Kathakali, Folk dance: Garba, Bhavai, Bhangada, Bihu and various other dances)**

৩.১.১ ভূমিকা (Introduction)

৩.১.২ ভরতনাট্যম (Bharat Natyam)

৩.১.৩ কথাকলি (Kathakali)

৩.১.৪ লোকনৃত্য (Folk dance)

৩.১.৪.১ ভূমিকা (Introduction)

৩.১.৪.২ গরবা নৃত্য (Garba Dance)

৩.১.৪.৩ ভাভাই নৃত্য (Bhavai Dance)

৩.১.৪.৪ ভাঙ্গড়া নৃত্য (Bhangada Dance)

৩.১.৪.৫ বিহু (Bihu Dance)

৩.১.৪.৬ অন্যান্য লোকনৃত্য (Various other dances)

৩.২ শিক্ষার সঙ্গে নৃত্যের একীকরণ (কার্যকরী সংগীত, নৃত্যনাটিকা) **[Integration of Dance in educational practices *(Action songs, Nritya Natika)*]**

৩.২.১ শিক্ষাক্ষেত্রে নাটকের একীকরণ (Integration of Dance in educational practices)

৩.২.২ নৃত্যনাটিকা (Nritya Natika)

Scanned with CamScanner

✪ ৩.১ বিভিন্ন নৃত্যকলা— ভরতনাট্যম, কথাকলি, লোকনৃত্য : গরবা, ভাওাই, ভাঙ্গরা, বিহু এবং অন্যান্য লোকনৃত্য (Various Dance Forms– Bharat Natyam, Kathakali, Folk dance : Garba, Bhavai, Bhangada, Bihu and various other dances) :

❑ ৩.১.১ ভূমিকা (Introduction) :

সকল শিল্পকলার জননী— সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রাচীনতম ধারা নৃত্যকলা বিশ্ব-সংস্কৃতি ভাণ্ডারের অমূল্য সম্পদ। নৃত্যলোকে শিল্পীর হস্তমুদ্রায় স্বর্গের ফুল ফোটে; দেহভঙ্গির বিচিত্র সঙ্গীতে ছন্দিত হয় সিন্ধুতরঙ্গের হিল্লোল; গ্রীবা-বিভঙ্গে মূর্ত হয় লীলাবিলাস, গ ও আত্মনিবেদন; আঁখিপল্লবের উন্মোচন ও পাতনে প্রতিবিম্বিত হয় প্রেম, প্রতীক্ষা ও সংশয় ললিতছন্দে শরীরী হয়ে ওঠে চিত্রকলা ও স্থাপত্যের সচল সুষমব্যঞ্জনা। কাব্য, সঙ্গীত নৃত্য ও ছন্দের বিশিষ্ট বিভঙ্গে লীলায়িত একটি অন্যন্য রূপভাবনা দর্শককে রসমার্গে উদ্বোধি করে। এতগুলি নিরবয়ব ভাবনাকে একই দেহের বিচিত্র বিভঙ্গে শরীরী করে তুলে দর্শ মনে আস্বাদন করার ক্ষমতা অন্য কোনো শিল্পধারায় বিরল। "ক্ষণে ক্ষণে যন্নবতামুপৈ তদেব রূপং রমণীয়তায়া" ঃ— অনন্তকালে ধরে নব নব তরঙ্গে বিশ্বব্যাপী এই ছন্দোলী অমৃতসঞ্চার করে মানব মনকে সংস্কৃত করেছে। অনুরূপভাবে ভারতের বিশ্বসংস্কৃতি ভাণ্ডারে অমূল্য সম্পদ সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রাচীনতম ধারা নৃত্যকলা, উৎকর্ষে, রূপ পরিকল্পনায় ভাবরসের ঐশ্বর্যে বিজ্ঞান, শিল্পকলা ও দর্শনের স্বভাবসুন্দর পরম অভিব্যক্তি। নিম্নে ভারতী নৃত্যকলা বিষয়ে আলোচিত হল।

❑ ৩.১.২ ভরতনাট্যম (Bharat Natyam) :

ভারতের মার্গনৃত্যধারার পূর্ণাঙ্গরূপের শ্রেষ্ঠতম অভিব্যক্তি ভরতনাট্যম। সাহিত্য, সঙ্গীত নৃত্যকলা, স্থাপত্য, চিত্রকলা, সংস্কৃতির বিভিন্ন অঙ্গের সমন্বয়ে ভরতনাট্যম সারস্বত চেতনাসমৃদ্ধ মহিমায় প্রোজ্জ্বল। অন্যান্য মার্গ নৃত্যধারাগুলিতে এই সম্পূর্ণতা নেই, সেজন্যে অন্যান্য নৃত্যধারা অপেক্ষা ভরতনাট্যম প্রাণময়তায় প্রবহমান ও গতিশীল। ভারতীয় সংস্কৃতি ও শিল্পকলার ধ্রুবরীতির ছন্দোময় রূপ ভরতনাট্যম। গ্রহণ-বর্জনের মধ্য দিয়ে ছন্দ, লাস্য ও মাধুর্যের সমন্বয়ে সংস্কৃতির প্রবহমান অভিযাত্রায় নিজস্ব মৌলিকতা বজায় রেখে ভরতনাট্যম তার শ্রেষ্টত্ব অক্ষুণ্ণ রেখেছে। প্রেম, আনন্দ, সৌন্দর্য, প্রশান্তি ও আশা— মানবতার এই মহৎ ধারাগুলি ভরতনাট্যমের ছন্দে ভাব বিভাবের দ্যোতনায় আধারীকৃত।

ভাব, রাগ ও তাল—এই তিনের সমন্বয়ে নৃত্যের সৃষ্টি হয়। কেউ কেউ বলেন এই ভাব রাগ ও তালের প্রথম তিনটি বর্ণকে কেন্দ্র করেই ভরতনাট্যম নামের উৎপত্তি হয়েছে

ebook.dascoaching.in

আবার কেউ কেউ বলেন ভারতমুনি প্রবর্তিত নৃত্য বলেই এর নাম ভরতনাট্যম। এ বিষয়ে কোনো সঠিক সিদ্ধান্ত এখনও পাওয়া যায় নি।

ভরতনাট্যম নৃত্যকলার সম্পর্কে একটি ভ্রান্ত ধারণা ব্যাপকভাবে প্রচলিত আছে। এই নৃত্যকলা সম্পর্কে যাদের প্রকৃত ধারণা নেই তারা অনেকেই ভরতনাট্যমকে দক্ষিণ ভারতের আঞ্চলিক নৃত্যধারা বলে মনে করেন। এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। পরবর্তীকালে আঞ্চলিকতা ও সংকীর্ণতাবোধ থেকে এটি প্রচারিত হয়েছে। আসলে ভরতনাট্যম একটি নৃত্যধারা মাত্র নয়, একটি পূর্ণাঙ্গ শাস্ত্রীয় নৃত্যপদ্ধতি যা অন্যান্য মার্গ নৃত্যধারাকেও অনুসরণ করা হয়ে থাকে। ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে এই পূর্ণাঙ্গ শাস্ত্রীয় নৃত্যপদ্ধতি ভরতনাট্যম অতি সুপ্রাচীন কাল থেকেই কেবলমাত্র দক্ষিণ-ভারতে নয়, সমগ্র দেশে প্রচলিত ছিল। অবশ্য একথা সত্য যে দক্ষিণ ভারতে এই নৃত্যকলার প্রসার ও অনুশীলন হয়েছে। এর অন্যতম কারণ এই যে উত্তর ভারতে দীর্ঘকালব্যাপী রাষ্ট্রনৈতিক কলহ, মুসলমান আক্রমণ ও পাঁচ শতাব্দী-ব্যাপী মুসলমান রাজত্বকালে উত্তর ভারতে এই ধর্মভিত্তিক শাস্ত্রীয় নৃত্যধারার প্রসার ব্যাহত হয়, এবং সমগ্র উত্তর ভারতে এক মিশ্র সংস্কৃতির বিকাশ হয়। স্বভাবতই দক্ষিণ ভারতের হিন্দু রাজাদের আনুকূল্যে ও পৃষ্ঠপোশকতায় সেখানে এই ধর্মভিত্তিক নৃত্যকলার বিকাশ অব্যাহত থাকে। এবং পরবর্তীকালে কিছু কিছু আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ নৃত্য এই নৃত্যপদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত হয়।

ভারতের নৃত্যকলার অন্যান্য ধারার মতো ভরতনাট্যম নৃত্যপদ্ধতির মূল ভাবধারাও ধর্মভিত্তিক ও দেবতাকেন্দ্রিক। শিবতাণ্ডব থেকে এর জয়যাত্রার সূচনা। দেবতাকেন্দ্রিকতা থেকে মানবকেন্দ্রিকতা, নৃত্যকলার উত্তরণের এই পথ-পরিক্রমার মধ্যেই ভরতনাট্যম নৃত্যধারার ইতিহাসকে অনুসরণ করতে হবে।

বর্তমানে ভরতনাট্যম অনুষ্ঠান বলতে সাধারণভাবে আল্লারিপু, যতিস্বরম, শব্দম, বর্ণম, পদম, তিল্লানা—এগুলিই প্রচলিত। কিন্তু এই ধারাগুলি পরবর্তীকালে ভরতনাট্যম নৃত্যপদ্ধতিতে সংযোজিত হয়েছে। সাদিরনাট্যম, ভগবতমেলা নাটক, কুরুভাঞ্জি ও কুচিপুড়ি—এই চার পদ্ধতিতেই পূর্বে ভরতনাট্যম প্রচলিত ছিল।

ভরতনাট্যম নৃত্যের শুদ্ধমৌলিক রূপ সাদিরনাট্যম। বহু শতাব্দী ধরে মন্দিরে ও রাজদরবারে দেবদাসীদের দ্বারা এই নৃত্য অনুষ্ঠিত হত। সাদিরনাট্যম, দাসীআট্যম, চিন্নমেলন, ভোগমেলম, তাঞ্জোরী নাট প্রভৃতি বিভিন্ন নামে এই নৃত্যধারা বিভিন্ন অঞ্চলে জনপ্রিয় হয়। এর গঠনে নৃত্ত ও নৃত্য দুইই সমভাবে প্রযুক্ত হত। শৃঙ্গার রসাত্মক অভিনয়ে এই নৃত্য সাধারণভাবে স্ত্রীশিল্পীদের মাধ্যমেই পরিবেশিত হত।

আল্লারিপু ভরতনাট্যম অনুষ্ঠানের প্রথম নৃত্য। তেলেগু শব্দ আল্লারিপু থেকে এই শব্দটির উদ্ভব। আল্লারিপু শব্দের অর্থ পুষ্পিত বা প্রস্ফুট হওয়া। এই পর্যায়ে অঙ্গ-প্রতঙ্গকে বিশুদ্ধ নৃত্যের জন্যে দেহভঙ্গির সুষম সৌন্দর্যে পুষ্পিত ও প্রস্ফুটিত করা হয়। শিল্পী মাথার ওপর

Scanned with CamScanner

দুটি হাত নমস্কারের ভঙ্গিতে রেখে বোলের সঙ্গে দৃষ্টি ও গ্রীবাকর্মের মাধ্যমে এই নৃত্য আরম্ভ করেন। এটি পূর্বরঙ্গ বা বন্দনা সূচক অনুষ্ঠান। নৃত্যের মাধ্যমে শিল্পী রঙ্গাদেবতা, দর্শক, সঙ্গীত-শিল্পী সকলের আশীর্বাদ প্রার্থনা করে। এই নৃত্যে সাবলীল ও সহজ ভঙ্গি অনুসরণ করা হয়। বর্তমানে অনেক শিল্পী আল্লারিপু নৃত্যসংগঠনে বিভিন্ন আড়াউ ও যতি প্রয়োগে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করার প্রয়াস করেন, কিন্তু এই প্রচেষ্টা অত্যন্ত অনুচিত। সাধারণভাবে এই পর্যায়ে নৃত্য প্রদর্শনের সময় লাগে তিন থেকে পাঁচ মিনিট।

আল্লারিপুর পর অনুষ্ঠিত হয় **যতিস্বরম**। দেহভঙ্গির সঙ্গীতে সুষম সৌন্দর্য সৃষ্টি করাই এই পর্যায়ের প্রধান লক্ষ্য। এই নৃত্য-সংগঠনে সাধারণভাবে পাঁচ থেকে সাতটি জটিল যতি রাগাশ্রয়ী সরগম ও তাল সমন্বয়ে মৃদঙ্গ ও মন্দিরার সাহায্যে পরিবেশিত হয়। এতে দৃষ্টি, গ্রীবা, হস্ত ও পাদকর্ম প্রধান এবং কোনো বিশেষ ভাব প্রকাশ করতে হয় না। এই নৃত্যে শিল্পী বিশেষ দক্ষতার সঙ্গে এক-একটি যতি শেষ করে সরে আসে ও অপর একটি যতি আরম্ভ করে।

যতিস্বরম-এর পর অনুষ্ঠিত হয় **শব্দম**। তেলেগু ভাষায় রচিত ভক্তিমূলক সঙ্গীতকে অভিনয়ের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করাই এই পর্যায়ে নৃত্যের লক্ষ্য। সঙ্গীতের মাধ্যমে দেবতা অথবা রাজার শৌর্য, বীর্য ও মহত্ব বর্ণনা করা হয় এবং সঙ্গীতের শেষে অভিবন্দনা করে নৃত্যের সমাপ্তি। সংস্কৃতে এই ধরনের সঙ্গীতকে 'যশোগীতি' বলা হয়। এতে সঞ্চারী ভাবেরই প্রাধান্য দেখা যায়।

শব্দমের পরে অনুষ্ঠিত হয় **বর্ণম**। বর্ণম ভরতনাট্যম নৃত্যপদ্ধতির সর্বাপেক্ষা জটিল ও আকর্ষণীয় পর্যায়। এতে নাট্য, নৃত্ত ও নৃত্যের সমন্বয় দেখা যায়। ভাব, রাগ ও তালযুক্ত এই অনুষ্ঠান প্রায় একঘণ্টা ধরে চলে। আবহসঙ্গীত প্রণয়ের অভিব্যক্তিতে রচিত হয়। যতিগুলি অত্যন্ত জটিল ও দ্রুত হয়ে থাকে; একে থিরমণম্ বলে। এর চরণমগুলি অত্যন্ত সুন্দর। সঙ্গীতাংশে কল্যাণী, নবরত্নমালিকা প্রভৃতি অপ্রচলিত রাগের প্রয়োগ দেখা যায়। এই সঙ্গীত ভাবোচ্ছল ও ভক্তিমূলক। প্রতিটি যতির সমাপ্তিতে শিল্পী সঙ্গীত সমন্বয়ে অভিনয়ের মাধ্যমে অভিব্যক্তি প্রকাশ করে। এই পর্যায়ে সুর ও ভাব, ছন্দ, লাস্য ও মাধুর্যের সমন্বয়ে দেহভঙ্গির সুষম স্থাপনা সচল স্থাপত্যের কারুকৃতি রচনা করে।

পরবর্তী অনুষ্ঠান **পদম**। বর্ণম অনুষ্ঠানের শ্রমবিনোদনের জন্যে এই পর্যায়ে প্রেমগীতিমূলক পদগুলি অভিনয়ের মাধ্যমে পরিবেশিত হয়। সঙ্গীতাংশে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জনপ্রিয় কবি জয়দেব, পুরন্দর দাস, ক্ষেত্রায়া রচিত মধুর পদাবলী পরিবেশিত হয়।

সর্বশেষ অনুষ্ঠান **তিল্লানা**। ভরতনাট্যম নৃত্যধারার ছন্দ, লাস্য, মাধুর্য ও গভীরতার সমন্বয় সৌন্দর্যের শ্রেষ্ঠতম প্রকাশ এই পর্যায়ে ছন্দিত হয়। এই নৃত্যের প্রত্যেকটি যতি বিলম্বিত, মধ্য ও দ্রুতলয়ে পরিবেশিত হয়। এই পর্যায়ে শিল্পী মাঝে মাঝে ক্ষিপ্রচটুল পাদবিন্যাসে ও বিভিন্ন মুদ্রা প্রয়োগে বিভিন্ন ভাবব্যঞ্জনা মূর্ত করেন। বিভিন্ন আলাপে ও বিস্তারে, লাবণ্যযুক্ত

নৃত্যবিন্যাসে, বিভিন্ন অঙ্গাহার ও করণের প্রয়োগে শিল্পী এই পর্যায়ে মাঝে মাঝে নিজের দেহসৌষ্ঠবকে স্থাপত্যের অপরূপ ভঙ্গিমায় রূপায়িত করে। শিরকর্ম, দৃষ্টি, নাস্যকর্ম, গণ্ডভেদ, ভ্রূকর্ম, পাদকর্ম ও সুললিত আবহসঙ্গীতসমৃদ্ধ এই নৃত্য ভাবসৌন্দর্যের শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন।

ভরতনাট্যমের আশ্রয়রূপে আঙ্গিক, বাচিক, সাত্ত্বিক ও আহার্য— এই চার প্রকার অভিনয়। দুটি ধর্ম—লোকধর্মী ও নাট্যধর্মী। চারটি বৃত্তি—ভারতী, সাত্ত্বতী, কৈশিকী ও আরভট্টী। দুই প্রকার সিদ্ধি—দৈবী ও মানুষী। পাঁচটি আসন— পদ্মাসনম, সিংহাসনম, যোগ্যাসনম, বীরসনম ও সিদ্ধাসনম। চারটি মণ্ডলা—মণ্ডলা, অর্ধমণ্ডলা, সমমণ্ডলা ও নৃত্যমণ্ডলা। তিনটে পদসংস্থান—অঞ্চিতা, কুঞ্চিতা ও অর্ধাঞ্চিতা। তিনটি ভঙ্গি— সম, ললিতা ও বলিতা। তিন প্রকার অঙ্গাভেদ-এর মধ্যে করণ, অঙ্গাহার ও মুদ্রা প্রধান।

তাঁর রূপায়িত প্রাণবন্ত বর্ণম ও পদম অনুষ্ঠান শুধুমাত্র ভারতের নৃত্যধারায় নয়, পৃথিবীর যে-কোনো শিল্পকলার ক্ষেত্রে ভাবাভিনয়ের চরম উৎকর্ষের নিদর্শন। কাহিনিনাশ্রয়ক সংঘাত-জনিত ভাবটিকে সর্বাঙ্গের অভিব্যক্তি দিয়ে শরীরী করে তুলে দর্শক মনের আবেগবৃত্তে সঞ্চারিত করার এই অপূর্ব অভিনয় নৈপুণ্য আর কোনো শিল্পী আজ পর্যন্ত দেখাতে পারেন নি।

ভরতনাট্যম্ নৃত্যকলার ক্ষেত্রে শ্রীমতী শান্তারাও-এর অবদানের কথাও নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য। কেবলমাত্র ভারতীয় নৃত্যের একজন শ্রেষ্ঠ শিল্পীরূপেই নয়, 'মোহিনী আট্যম্' নৃত্যের পুনরুজ্জীবনে তাঁর গৌরবময় ভূমিকার জন্যে তিনি শিল্পী ও সংস্কৃতি-ব্রতীদের কৃতজ্ঞতা অর্জন করেছেন।

❑ ৩.১.৩ কথাকলি (Kathakali) :

কেরলের সম্পদ কথাকলি নৃত্য। অনন্ত গর্জনশীল চিরসংক্ষুব্ধ ভারত মহাসাগর উচ্চারণ করছে গতির মহামন্ত্র, আর পূর্বে নদীমালাশোভিত শ্যামসুন্দর ধ্যানগম্ভীর পর্বতবিন্যস্ত স্নিগ্ধছায়া বনদপ্তরে। কোমল-কঠোর মধুরে-ভয়ঙ্করে পূর্ণপ্রাণ মালাবারের জনজীবনের সংস্কৃতির পূর্ণবিন্দু রূপায়িত হয়েছে কথাকলি নৃত্যে। প্রকৃতির মুক্ত লীলাভূমিতে যে সহজ সরল সাধারণ মানুষগুলি বাস করে ছোটোবড়ো গ্রামগুলিতে, পাহাড়তলীতে, বনপ্রান্তরের আড়ালে কৃষ্ণছায়া নারিকেলকুঞ্জের মর্মরিত জীবনস্পন্দনের ছন্দেঃছন্দে, তাদের স্বতঃস্ফূর্ত শিল্পীপ্রাণ সমস্ত সৌকুমার্য নিয়ে যেন লীলায়িত হয়েছে এই কথাকলি নৃত্যে।

কিংবদন্তী থেকে জানা যায় বিষ্ণুর অবতারের ঋষি ভার্গব পরশুরাম কেরলরাজ্য সৃষ্টি করেন। মাতৃভাষার পাপ থেকে মুক্ত হবার জন্যে তিনি গোকর্ণ থেকে তার কুঠার সবেগে নিক্ষেপ করলে তা ভারত মহাসাগরে পতিত হয়। যেখানে কুঠার পড়ে সেখান থেকে সমুদ্র সরে গিয়ে যে স্থলভাগের সৃষ্টি হয় তা তিনি মাতৃহত্যার পাপস্খলনের জন্যে ব্রাহ্মণদের দান করেন। এই কাহিনি সম্ভবত পরবর্তীকালে ব্রাহ্মণদের দ্বারা পূর্বতন দ্রাবিড় সভ্যতার অবদানকে অস্বীকার করার জন্যে রচিত হয়েছে।

Scanned with CamScanner

খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতক থেকেই মালাবার উপকূলে গ্রীক, রোমান, ফিনিসীয়, আরবদেশের বণিকদের বাণিজ্যসূত্রে যাতায়াত ছিল। ১৯৪৮ সালে ভাস্কো-দা-গামা মালাবার উপকূলে অবতরণ করেন। ভারতে খ্রিস্টধর্মের প্রথম আবির্ভাবও মালাবারেই ঘটে। বিভিন্ন ধর্ম ও জাতির সমন্বয়ে মালাবার বহির্জগতের সঙ্গে যোগসূত্রের অন্যতম কেন্দ্র হয়ে ওঠে।

কেরলের প্রাচীন অধিবাসীরা ছিল দ্রাবিড় জাতীয়। পরে আর্য সভ্যতার প্রসার হয়। আর্য ও দ্রাবিড সভ্যতার মিশ্রণেই এখানকার শিল্প সংস্কৃতি গড়ে ওঠে। কথাকলি নৃত্য তার অন্যতম নিদর্শন। দীর্ঘকাল ধরে মালাবার নাম্বুদ্রি ব্রাহ্মণরাই শাসনকার্যে প্রধান স্থান অধিকার করেছিলেন। খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতক থেকে এই ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় বারো বৎসর অন্তর মিলিত হয়ে চোল অথবা পাণ্ড্য বংশের কোনো রাজপুত্রকে রাজা নির্বাচিত করতেন। এই নির্বাচিত রাজা 'পেরুমল' নামে খ্যাত হতেন।

কেরলের প্রাচীন লোকনৃত্যধারা, পেরুমল যুগের চাক্কিয়ার কুথু, কুডিয়াট্যম্ ও পরবর্তীকালে কৃষ্ণনাট্যম্ ও রামনাট্যম্-এর স্তর অতিক্রম করে এই বিভিন্ন নৃত্যশৈলীর অফুরন্ত জীবনীশক্তি, ছন্দোময়তা ও উদ্দামতা, তান্ত্রিক পূজাপাঠের আভিচারিক পদ্ধতি কথাকলি নৃত্যে এক বিচিত্র সজীবতা সৃষ্টি করেছে।

কথাকলি-শিল্পকলা, কথাকলি-সাহিত্য অপেক্ষাও প্রাচীন। কথাকলি-সাহিত্য চারশত বৎসরের পুরোনো, কিন্তু কথাকলি-শিল্পকলা প্রায় হাজার বছর ধরে প্রচলিত। কথাকলি নৃত্যনাট্যগুলি গভীর ভাবসম্পদ ও নাটকীয়তাপূর্ণ। এটি সাধারণত গদ্য ও কবিতা উভয় পর্যায়ে রচিত। সংলাপ-অংশ মালয়ালম্ ভাষায় রচিত কিন্তু দৃশ্যান্তরস্থ কবিতাংশ সংস্কৃত ও মালয়ম্ উভয় ভাষাতেই রচিত হয়। কথাকলি-সাহিত্য শিল্প, সঙ্গীত ও সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় দীর্ঘকালের শ্রম ও অনুশীলনের ফলে বিশেষ ঐতিহ্যসম্পন্ন। পুরাণের বৈচিত্র্যপূর্ণ আখ্যানমালাকে ভিত্তি করে গভীর ভাব-সম্পদপূর্ণ ও সুললিত ছন্দোবদ্ধ কথাকলি সাহিত্য স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল।

ভারতীয় নৃত্যকলার ইতিহাসে কথাকলি এক প্রাচীন ঐতিহ্য বহনকারী শিল্প যা প্রায় সম্পূর্ণ বিদেশীয় প্রভাবমুক্ত। কথাকলি মূলত দৃশ্যকাব্য। এতে বাদক ও সঙ্গীতশিল্পীর গীতি মিলিতভাবে পরিবেশিত হয়। বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ভাবব্যঞ্জক মূকাভিনয় সমন্বিত দৃশ্যকাব্য এই কথাকলি নৃত্যের সঙ্গে একমাত্র জাভা দ্বীপের ছায়ানাট্য ও ছায়ানৃত্যের তুলনা চলে। এর কারণ প্রসঙ্গে ঐতিহাসিকেরা বলেন যে, প্রায় হাজার বছর পূর্বে বলিদ্বীপের অম্বুরাজা ত্রিবাঙ্কুর থেকে কয়েকজন শিল্পীকে বন্দী করে নিয়ে যান। পরবর্তীকালে সেই বন্দী শিল্পীদের মাধ্যমে জাভা ও বলিদ্বীপে কথাকলি নৃত্যের অনুরূপ সাদৃশ্যপূর্ণ নৃত্যের প্রচলন হয়। সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যবর্তীকালে এই দৃশ্যকাব্য কেরলের প্রাচীন লোকনৃত্য ও পেরুমল যুগের শাস্ত্রীয় চাক্কিয়ার কুথু ও কুডিয়াট্যম্ নাট্যধারার সমন্বয়ে পূর্ণাঙ্গ রূপ প্রাপ্ত হয়। শাস্ত্রীয় নৃত্যের

সুসংবদ্ধ প্রকাশভঙ্গি ও লোকনৃত্যের প্রাণময় উদ্দামতা কথাকলি নৃত্যনাট্যে স্বতস্ফূর্ত সজীবতা সৃষ্টি করেছে।

আদিমযুগে মানুষ আকারে-ইঙ্গিতে এবং হাত ও মুখের নানারূপ ভঙ্গিতে নিজ নিজ মনোভাব ব্যক্ত করত। এই বিভিন্ন প্রকার প্রতীকধর্মী ভঙ্গি ও মুদ্রাগুলিরই সংস্কৃতরূপ পরবর্তীকালে নৃত্য ও অভিনয়কলার প্রধান বাহন হয়ে উঠেছে। কথাকলি অনুষ্ঠানের বিশেষ রীতির মধ্যেই এই দৃশ্যকাব্য পরিকল্পনার গাম্ভীর্য ও বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

প্রকৃতির বিচিত্র খেলাঘর কেরলের গ্রামে গ্রামে, মন্দির প্রাঙ্গণে সারারাত্রিব্যাপী কথাকলি নৃত্যের অনুষ্ঠান হয়। কথাকলি নৃত্যানুষ্ঠানের পদ্ধতির মধ্যেই রয়েছে এর ধর্মপ্রবণতা, ভাবগাম্ভীর্য ও বৈচিত্র্যের পরিচয়। কথাকলি অভিনয় কখনও দিবাভাগে অনুষ্ঠিত হয় না। সাধারণত পাঁচ থেকে পনেরো জন শিল্পী সমন্বয়ে কথাকলি নৃত্যসম্প্রদায় গঠিত হয়। কথাকলি সম্প্রদায়ে সাধারণত কোনো মহিলা-শিল্পী অংশগ্রহণ করে না, পুরুষেরাই স্ত্রী ভূমিকা অভিনয় করে। সাধারণভাবে এই তথ্য সত্য হলেও মহিলা শিল্পীরাও কিছু কিছু ক্ষেত্রে অংশ গ্রহণ করেছেন।

অপরাহ্নের সূর্য যখন আরব সাগরের ব্যাকুল আহ্বানে মিলন অভিসারের আরক্তিম লজ্জায় লোহিত হয়ে মালাবারের শ্যামল পাহাড়ের নীরব গাম্ভীর্যকেও সলজ্জ রক্তিম করে তোলে, তখন চতুর্বাদ্যের মহামন্ত্র ঐকতানে কথাকলি অনুষ্ঠানের সুদূরপ্রসারী আহ্বান ঘোষিত হয়। চতুর্বাদ্যের এই অমোঘ আহ্বানে গ্রামে গ্রামান্তরের মানুষ কথাকলি নৃত্য মহামণ্ডপে সমবেত হয়। এই প্রারম্ভিক অনুষ্ঠানের নাম **কেলি**।

রাত্রি আটটার পর কথাকলি নৃত্যের সূচনা এবং পরদিন সকালে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি। মুক্তাঙ্গন অভিনয়-মঞ্চ— দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে প্রায় ষোল ফুট। চারদিকে চারটি স্তম্ভাকৃতি দণ্ডের সঙ্গে সামিয়ানা বেঁধে তৈরি হয় মঞ্চের উপরিভাগের আচ্ছাদন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মঞ্চের জন্যে কোনো বিশেষ প্লাটফর্ম তৈরি করা হয় না। জমির ওপরেই আচ্ছাদন দেওয়া হয়। সবুজ পাতা ও ফুল দিয়ে মঞ্চসজ্জা করা হয়। চার থেকে পাঁচফুট লম্বা একটি বিরাট পিতলের পিলসুজের ওপর একটি প্রদীপ প্রজ্বলিত করার সঙ্গে সঙ্গে এই অনুষ্ঠানের শুভারম্ভ। এই সময় চাণ্ডা, মাদলম, চ্যাংগালা ও কাইমনি বাজানো হয়ে থাকে। একে বলা হয় **আরঙ্গকেলি**।

কথাকলি নৃত্যনাট্য আঙ্গিক, বাচিক, সাত্ত্বিক ও আহার্য—এই চার প্রকার অভিনয় সমৃদ্ধ। অঙ্গপ্রত্যঙ্গের গতিভঙ্গির যে চলন তাকে **আঙ্গিক** অভিনয় বলে। এই অভিনয়ের উৎস যজুর্বেদ, ভাব স্থায়ী। কাব্য নাটক ও সাহিত্যের ভাষা নিয়ে ভাবের মাধ্যমে যে অভিনয় তাকে **বাচিক অভিনয়** বলে। এর উৎস ঋগ্বেদ, ভাব সঞ্চারী। নাটকের চরিত্রানুযায়ী পরিবেশ সৃষ্টিতে চরিত্র অলঙ্করণের অঙ্গসজ্জা, বসনভূষণ, মঞ্চসজ্জা প্রভৃতির মাধ্যমে যে অভিনয় তাকে **আহার্য অভিনয়** বলে। এর উৎস সামবেদ, ভাব বিপাস্থায়ী। মনের বিভিন্ন

Scanned with CamScanner

অভিব্যক্তি ও মানসিকতাকে সত্ত্বভাবে সমাহিতকরণের নাম **সাত্ত্বিক অভিনয়**। এই অভিনয়ের উৎস অথর্ববেদ, ভাব অস্থায়ী। কথাকলি নৃত্যে আহার্য অভিনয় একটি প্রধান ও অন্যতম উপকরণ।

কথাকলি নৃত্যে পোশাক ও রূপসজ্জার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে রচিত হয়েছে। এই পোশাক সম্পর্কে একটি কাহিনি প্রচলিত আছে। যখন কালিকটের জামুরিন বংশীয় মানবদেবরাজ কৃষ্ণনাট্যম্ সৃষ্টি করেন, তখন একদিন তিনি স্বপ্নে দেখেন যেন সমুদ্রে ঝড় একটি ঢেউ সঙ্গে যাচ্ছে আর কথাকলি অনুষ্ঠানের পুরপ্পাডের সময় তেরেশিলা ধীরে ধীরে অপসারিত করা হয় ও শিল্পীর পোশাক ও রূপসজ্জার বর্ণবৈচিত্র্য অন্ধকার থেকে ধীরে ধীরে প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে।

কথাকলি নৃত্যে পুরুষ চরিত্রাভিনেতার মস্তকাভরণ 'কিরীটম' এক অপূর্ব শিল্পকলার নিদর্শন। কানের পাশে কাঠের গোল দুটি বড়ো অলঙ্কার, একে 'তোড়া' বলে। কানের ছোটো দুটি অলঙ্কারকে 'চেতিপুরু' বলা হয়। মুকুটের নীচে কপালের উপর যে লাল কাপড়ের বন্ধনী তাকে 'চুট্টির্তুন' বলে। **চুট্টির্তুনির** উপর মোতির বা পুঁতির কাজ করা যে ফিতা থাকে তাকে 'নারা' বলা হয়। পিঠে যে লম্বা কালো রং-এর নকল চুল থাকে তাকে 'চামরম্' বলে।

চরিত্রানুযায়ী কথাকলি নৃত্যশিল্পীরা **ঊর্ধ্বাঙ্গে** যে বিভিন্ন রঙের জামা পরেন তাকে 'কুপ্পায়াম' বলে। উপর হাতে যে কাঠের গহনা পরা হয় তার নাম 'তোলপুট'। তোলপুটের ঠিক নীচের হাতের কাঠের গহনার নাম 'ভালই'। ভালই-এর নীচে ব্রেস্‌লেটের মতো কাঠের গহনাকে 'হস্তকটকম্' বলা হয়। গলার পুঁতির মালার নাম 'কাজুহারম্'। গলা থেকে ঝোলানো চাদরের দুপাশে দুটি আয়না থাকে। একে 'উত্তরীয়ম্' বলে। কথাকলি শিল্পীরা যে ঘাঘরা পরেন তাকে 'উরুতেকেট্টা' বলে। ঘাঘরার ওপর দিয়ে দুই পাশে যে দুটি লাল রং-এর কাপড়ের ফালি ঝোলানো থাকে তাকে 'পাটুওয়ালা' বলে। ঘাঘরার সামনের দিকে রূপোর কাজ করা কেঁচাকে 'মুন্ডি' বলা হয়। কোমরের উপর অর্ধবৃত্তাকার সোনালী ঝালরটিকে '**পাড়িএরেজানম্**' বলে। পায়ের গোড়ালিতে লাল রং-এর দড়ি দিয়ে তৈরি যে আভরণ থাকে। তাকে 'তাণ্ডপদম্' বলে। কথাকলি নৃত্যের ঘুঙুরকে 'গোচামণি' বলে।

মহিলা শিল্পীরা মাথায় যে উড়নী ব্যবহার করে তাকে 'উরুমণ' বলা হয়। উড়নীর ভিতরের পরচুলাটিকে 'কোন্ডা' বলা হয়। মহিলা চরিত্রের শিল্পীরা 'উত্তরীয়ম্' ব্যবহার করে না। এ ছাড়া অন্যান্য অলঙ্কার পুরুষ চরিত্রের অনুরূপ। চরিত্র অনুযায়ী মাথায় বিভিন্ন প্রকারের 'মুডি' ব্যবহার প্রচলিত।

কথাকলি নৃত্যে বাচিক অভিনয়ের অংশ অত্যন্ত গৌণ—নেপথ্যে সঙ্গীতের সঙ্গে মুদ্রা ও ভাবের মাধ্যমে অভিনয় হয়। শ্রী আয়ার-এর মতে—

> 'The Natyacharya of kathakali stage took the view that the spoken word was a needless burden on the actor and that it was imperfectly equipped to discharge the function it was called upon to bear in the drama.'

রসাভিনয় কথাকলি নৃত্যনাট্যের কঠিনতম ও শ্রেষ্ঠতম অঙ্গ। নাট্যশাস্ত্রের মতে শৃঙ্গার, হাস্য, করুণ, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, বীভৎস ও অদ্ভুত—এই আটটি রস মন ও অনুভূতির সংঘাতে সৃষ্ট। রসই স্থায়ীভাবের উৎস। রতি, শোক, ক্রোধ, উৎসাহ, ভয়, জুগুপ্সা ও বিস্ময়—এই সাতটি স্থায়ীভাব। পরবর্তীকালে 'শান্ত'কে নবম রসরূপে অভিহিত করা হয়েছে। কথাকলি নৃত্যে নবরসেরই প্রয়োগ হয়ে থাকে। এই রসনিষ্পত্তি শিল্পকলার উন্নততম পর্যায়। কথাকলি নৃত্যশিল্পীর ভাবাভিনয়ে যে উৎকর্ষের পরিচয় পাওয়া যায়, তা সত্যই বিস্ময়কর।

কথাকলি নৃত্যে সঙ্গীত ও বাদ্যযন্ত্রের প্রয়োগও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। কথাকলি গীতি পদম, শ্লোকম্ ও দণ্ডকম—তিন পর্যায়ে গীত হয়। দক্ষিণ ভারতীয় সঙ্গীতের বিভিন্ন রাগ ও রাগিনী ব্যবহৃত হয়। সঙ্গীত শিল্পীরা সোপান ভঙ্গিতে গীতি পরিবেশন করেন। জয়দেবের গীতগোবিন্দ অবলম্বনে অষ্টপদীগুলি কথাকলি সঙ্গীতের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। কথাকলি নৃত্যনাট্যে সঙ্গীতশিল্পীদের মধ্যে যিনি প্রধান তাঁকে 'পেন্নান' বলা হয়। অপর শিল্পী যিনি প্রধান গায়ক কর্তৃক গীত হবার পর তার পুনরাবৃত্তি করেন তাঁকে 'সংকোটি বলা হয়। কথাকলি নৃত্যে চান্ডা, মাদলম্, চাংগালা ও এলাতালম বা কাইমনি এই চতুর্যন্ত্রই প্রধান। কথাকলি সঙ্গীত শিল্পীদের মধ্যে কেশবন নায়ার, গোপালকৃষ্ণ ভগবাতার, নীলকান্ত, নাম্বেশন, মাধবন নায়ার, সুব্রহ্মণ্য আয়ার, কেশবন নাম্বুদ্রি প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

কথাকলিতে মূলত পাঁচটি তাল প্রচলিত। যথা—চাম্বাড়া, চাম্পা, আড়ান্দা, ত্রিপাড় ও পঞ্চারী। কলাশম্ তালাশ্রয়ী নৃত্য, এই নৃত্যের দেহভঙ্গি ও পাদবিন্যাসগুলি বিচিত্র তালগুচ্ছ সহযোগে সুপরিস্ফুট হয়। এই তালগুচ্ছের প্রধান তাল গুচ্ছবিন্যাসের স্তরে স্তরে বিভিন্ন গুণারোপিত হয়ে একাধিকবার আবির্ভূত হয়ে যখন সমে এসে শেষ হয় তখন সমগ্র নৃত্যের এক একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ একক তৈরি হয়। সাধারণত পদমের শেষেও অন্য পদম আরম্ভের আগে কলাশম্ ব্যবহৃত হয়। এডা কলাশম, অষ্ট কলাশম, এডিত্ব কলাশম, ওয়াট্রাম, বেচ্চা কলাশম্ প্রভৃতি বিভিন্ন রূপে কলাশম ব্যবহৃত হয়।

সারি কথাকলি নৃত্যের লাস্য ধরনের নৃত্যচ্ছন্দ। এই নৃত্যে নারীচরিত্র অথবা চরিত্রগুলি কোনো উদ্যানে নৃত্যের মাধ্যমে আত্মবিনোদন করে। রাজদরবারের দৃশ্যেও নৃত্য অনুষ্ঠিত হয়। সারি শব্দটি মূল সংস্কৃত শব্দ **চারীর** সঙ্গে সম্পর্কিত। নাট্যশাস্ত্রের মতে একে হস্ত চালন ও পদক্ষেপের মাধ্যমে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সুষম ভঙ্গি রচনা বলা যেতে পারে। ললিতা, চিত্রলেখা, ঊষা, রম্ভা প্রভৃতি স্ত্রী চরিত্রে শিল্পীরা সারি নৃত্য করে থাকেন। সারি নৃত্যে

Scanned with CamScanner

মাদলম্, চাংগালা ও কাইমনি ব্যবহৃত হয়। চান্দা এই নৃত্যে ব্যবহার হয় না। সারি নৃত্যে চাম্বাড়া (আট মাত্রা) তাল ব্যবহৃত হয় মিনিক্কু জাতীয় রূপসজ্জা। স্ত্রীলোকের ভূমিকার উপযোগী লোকনৃত্যের ভিত্তিতে সৃষ্ট লাস্য ধরনের সমবেত নৃত্য কুম্মিও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সাধারণভাবে কথাকলি নৃত্যশৈলীতে তাণ্ডব লক্ষণ-ই অধিকতর স্পষ্টভাবে প্রযুক্ত হয়। সে জন্যে এই নৃত্য নিঃসন্দেহে পুরুষ শিল্পীদের অধিকতর উপযোগী।

কথাকলি নৃত্য শিক্ষাদানের একটি বিশেষ পদ্ধতি প্রচলিত। এই অনুশীলন পদ্ধতির মধ্যেও এই নৃত্যকলার বৈচিত্র্যের পরিচয় পাওয়া যায়। এগারো থেকে চোদ্দ বৎসর বয়স ছাত্ররা কালারীতে (গুরুর আশ্রম) গিয়ে গুরুকে অর্থ ও বস্ত্র দক্ষিণা দিয়ে ছয় হাত লম্বা ও ছয় ইঞ্চি চওড়া মোটা কাপড়ের 'কাচ্চা' ও তৈল গ্রহণ করে। প্রত্যুষে চোখে তেল লাগিয়ে ও ছয় ঘন্টা ধরে অবিরাম দৃষ্টিকর্ম অভ্যাস করতে হয়। তারপরে সমস্ত দেহে ভালো করে তেল মাখতে হয়। তারপর বিভিন্ন অঙ্গ সঞ্চালনের শিক্ষা দেওয়া হয়। ছাত্র ক্লান্ত ও ঘর্মাক্ত হবার পর গুরু পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দিয়ে ছাত্রের দেহের গ্রন্থিসমূহ মালিশ করে দেন। এতে মাংসপেশী ও গ্রন্থিসমূহের নমনীয়তা ও সঞ্চালনক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। এর পর স্নান প্রাতরাশ গ্রহণের পর ছন্দের তালে তালে নৃত্যশিক্ষা দেওয়া হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ে শিক্ষা দেওয়া হয়—চক্ষু, অক্ষিপুট, ভ্রু, গ্রীবা ও অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সঞ্চালন পদ্ধতি। তৃতীয় পর্যায়ে—মুদ্রা, ভাবাভিনয় ও বিভিন্ন ভঙ্গি প্রকাশের শিক্ষা দেওয়া হয়। শেষ পর্যায়ে চতুর্বাদ্যের সঙ্গে অনুশীলন করানো হয়। এই সব শিক্ষা সমাপ্ত হলে ছাত্রের অধ্যাবসায় ও দক্ষতা অনুসারে তাকে কথাকলি অনুষ্ঠানের মহড়ায় উপস্থিত করা হয়। এই শিক্ষাক্রমের মোট সময় অন্যূন এগার বৎসর। এই অত্যন্ত কঠোর পরিশ্রম ও নিরলস অনুশীলন পদ্ধতিই কথাকলি শিল্পীদের প্রাণবন্ত অভিনেতায় পরিণত করে।

কথাকলি শিল্পকলার পুনরুজ্জীবন ও বিকাশের ক্ষেত্রে মহাকবি ভাল্লাথেল নারায়ণ মেননের নাম চিরস্মরণীয়। তিনি ভারতীয় সংস্কৃতির এই লুপ্তপ্রায় মহান ধারাটিকে নবজীবন দান করেছেন। নিরলস ও অক্লান্ত প্রচেষ্টায় জীবনের দীর্ঘ চব্বিশ বৎসর কেরালা কলামণ্ডলম স্থাপন করে এই মহান সাধনায় আত্মদান করেছেন। তাঁর নেতৃত্বে মালয়, চিন, সিংহল ও সোভিয়েত ইউনিয়নে কথাকলি শিল্পীসম্প্রদায়-এর অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়েছে।

প্রখ্যাত কথাকলি নৃত্যগুরুদের মধ্যে চেঙ্গানুর রমন পিল্লাই, কুঞ্চু কুরুপ, কৃষ্ণান নায়ার, কুঞ্চু নায়ার, রামন কুট্টি নায়ার, কৃষ্ণকুট্টি, চম্পাকুলম, পাচু পিল্লাই প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শ্রীউদয়শঙ্করের কথাকলি নৃত্যগুরু শঙ্করণ নাম্বুদ্রি কথাকলি অভিনয়মের সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পীরূপে স্বীকৃত। বর্তমান কালের সর্বশ্রেষ্ঠ ও জনপ্রিয় আচার্য গুরু গোপীনাথ কথাকলি নৃত্যধারার সংস্কারসাধনের অগ্রদূত। এই প্রাচীন নৃত্যকলার ঐতিহ্য অক্ষুণ্ণ রেখে যুগোপযোগী পরিমার্জিত নবরূপায়ণে এই ধারাটিকে সার্থক প্রয়োগে সাম্প্রতিককালে কলামণ্ডলম গোবিন্দন কুট্টি, বালকৃষ্ণ মেনন, কেলু নায়ার প্রভৃতি বিশেষ সাফল্য অর্জন করেছেন।

❑ ৩.১.৪ লোকনৃত্য (Folk dance) :

❖ ৩.১.৪.১ ভূমিকা (Introduction) :

সৃষ্টির প্রথম প্রভাত থেকেই আদিম জীবনে প্রকৃতির উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে বিশ্বছন্দের চাঞ্চল্যে, জীবনছন্দের স্বতঃস্ফূর্ত আবেগে কখনও শিকারের উন্মাদনা জাগাতে, কখনও বা অপদেবতাকে তুষ্ট করতে উৎপ্লাবনপূর্ণ সহজ আনন্দে মানুষ দলগতভাবে রচনা করেছে নৃত্যছন্দ। শ্বাপদসঙ্কুল আরণ্যক পরিবেশে প্রথম পর্যায়ে নৃত্যভঙ্গি ছিল হিংস্র, আক্রমণাত্মক ও আত্মরক্ষার উৎপ্লাবনে পূর্ণ। সমতল ভূমিতে নেমে এসে সেই মানুষ যখন ঘর বাঁধল, শিখল চাষ আবাদ, তখন সঙ্ঘবদ্ধ হল, সমাজবদ্ধ হল। নৃত্যছন্দের আবয়বিক ও আন্তর রূপেরও এল পরিবর্তন; নতুন সামাজিক পরিবেশে জীবনচর্চার অঙ্গরূপে মধুর, বলিষ্ঠ ও সরল ভঙ্গিতে এল লোকনৃত্য।

লোকনৃত্য এই সংহত সমাজের সৃষ্টি। অনেকে আদিম নৃত্য (Folk Dance)-কে একই পর্যায়ে ফেলেন। কিন্তু এই ধারণা ভ্রান্ত। আদিম সমাজ থেকে উন্নত ও অগ্রসর সমাজ অর্থাৎ যে সমাজে বিশেষ গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের সমষ্টিগত আচার আচরণ, সংস্কার, অনুষ্ঠান, রীতিনীতি ও জীবন অভিব্যক্তি বিশেষ বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে, লোকনৃত্য সেই সংহত, উন্নত সমাজের সৃষ্টি।

আদিম সমাজে নৃত্যের জন্ম হয়েছে ব্যবহারিক প্রয়োজনের প্রেরণায়। কিন্তু সামাজিক অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সংহত সমাজে মানুষের বুদ্ধি ও চেতনা যেমন দীপ্ত হয়েছে তেমনি আবার সামাজিক সম্বন্ধগুলির মধ্যে জটিলতা বৃদ্ধি পেয়েছে। তার ফলেই প্রত্যেক শিল্পরূপই স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট চরিত্র অর্জন করেছে, জন্ম নিয়েছে আদিম নৃত্য থেকে লোকনৃত্য।

লোকনৃত্যে আদিমনৃত্যের ব্যবহারিক তাৎপর্য পুরোপুরি বজায় না থাকলেও আবেগ প্রকাশের ধারা অবিকল অক্ষুণ্ণ থেকে গেছে। আদিম নৃত্যের প্রত্যক্ষ ব্যবহারিক রূপটি ক্রমশ লোকনৃত্যে এতে প্রতীকধর্মী হয়েছে। বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানমূলক লোকনৃত্যের মধ্যে আদিম আচার অনুষ্ঠানের প্রভাব অনেক ক্ষেত্রেই বিদ্যমান, কিন্তু সংহত সমাজের দৃঢ়ভিত্তির জন্য তার মধ্যে লৌকিক উপকরণে ক্রমশ আবির্ভাব ঘটেছে। এককথায় বলা যেতে পারে সংহত সমাজে সমষ্টিগত প্রচেষ্টায় জীবনছন্দের রূপসৃষ্টিশক্তির স্বতস্ফূর্ত অবারিত প্রকাশ হচ্ছে লোকনৃত্য। পরে অঞ্চল ও রুচিভেদে এল বৈচিত্র্য, সৃষ্টি হল লোকনৃত্যের বিভিন্ন ধারা।

লোকনৃত্য সামগ্রিক সমাজের সৃষ্টি। কারণ সংহত সমাজের সকল সামাজিক অনুষ্ঠান ও উৎসবই দলগতভাবে পালন করা হয়। সুতরাং সাধারণভাবে লোকনৃত্যকে "collective creation of the folk" এই সংজ্ঞা দেওয়া হয়। যদিও সাধারণভাবে লোকনৃত্যে ব্যক্তিপ্রতিভা

Scanned with CamScanner

অস্বীকৃত, তবুও অনেকে বলেন এটি ব্যক্তিচেতনার কোনো স্বাক্ষর বহন করে না-এ কথা সর্বাংশে ঠিক নয়, তবু ব্যক্তিচেতনা সম্প্রদায়গত সৃষ্টির মাধ্যমে পরিপূর্ণতা লাভ করে।

শাস্ত্রীয় নৃত্যধারা উন্নত সভ্যতার সৃষ্টি। লোকনৃত্যের আঙ্গিক রূপান্তরিত ও শোধিত হয়ে উচ্চাঙ্গ শাস্ত্রীয় নৃত্যের উদ্ভব হয়েছে। শার্ঙ্গদেব-এর মতানুসারে আহার্যাভিনয় বর্জিত আঙ্গিক, বাচিক ও সাত্ত্বিক অভিনয়যুক্ত ভাবের অভিব্যঞ্জক নর্তনকে 'মার্গ' বা শাস্ত্রীয় নৃত্ত বলা হয়। এবং আঙ্গিক, বাচিক, সাত্ত্বিক ও আহার্য—এই চতুর্বিধ অভিনয় বর্জিত গাত্রবিক্ষেপকে দেশি (folk) নৃত্ত বলে। অবশ্য প্রচলিত অনেক লোকনৃত্যের ক্ষেত্রেই এই সংজ্ঞা প্রযোজ্য নয়।

উন্নত সভ্যতর সমাজে রূপান্তরিত ও সমৃদ্ধ আঙ্গিকপুষ্ট হলেও এর স্বতঃস্ফূর্ততা ও সৌন্দর্য দলগত অনুষ্ঠানে গোষ্ঠীজীবনের কেন্দ্রগত ভাবটিকে অক্ষুণ্ণ রাখে।

> লোকসঙ্গীত সম্পর্কে এই উক্তিটি লোকনৃত্য সম্পর্কেও বিশেষ প্রযোজ্য :
> ''It is like a forest with its root deeply buried in the past but which continually puts forth new branches, new leaves and new fruits''.

প্রত্যেক জাতি ও গোষ্ঠীজীবনের মধ্যে দেখা যায় যে স্মরণাতীত কাল থেকেই পুরুষানুক্রমে তাদের মধ্যে লোকনৃত্যের বিভিন্ন ধারা চলে আসছে। ঠিক কোন্ সময় এগুলির উৎপত্তি বা কারা এর স্রষ্টা সঠিকভাবে তা নির্ণয় করার কোনো উপায় নেই। এগুলি যুগ যুগ সংশ্লিষ্ট জনসমষ্টির যৌথ উত্তরাধিকার রূপে প্রবহমান এবং সমাজের সমবেত সৃষ্টি রূপে বিবেচিত। অবশ্য বিভিন্ন সময়ে নব নব আঙ্গিক ও রূপকর্মে সমৃদ্ধ হয়ে এই সকল লোকনৃত্যের অনেক ধারাই নবপল্লবে সুশোভিত হয়ে উঠেছে।

আবহমানকাল প্রচলিত লোকনৃত্যের এই প্রবাহই দেশের শাস্ত্রীয় নৃত্যকলার মূল উৎস। অবশ্য শাস্ত্রীয় নৃত্যধারায় লোকনৃত্যের পূর্ণ প্রকাশ সম্ভবপর নয়, সেজন্যে এর আঙ্গিক সম্পূর্ণ পরিবর্তিত ও শোধিত রূপ ধারণ করে।

শুধামাত্র ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত লোকনৃত্যধারায় নয়, পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে প্রচলিত লোকসঙ্গীত ও লোকনৃত্যের মধ্যে অনেক সময় বিস্ময়কর সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। অনেক ক্ষেত্রে এই সব জনসমষ্টির পরস্পরের মধ্যে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অতীত যোগাযোগের সূত্র পাওয়া যায়। কিন্তু বহুক্ষেত্রে এই সংযোগ না ঘটলেও সাদৃশ্য চোখে পড়ে। এ বিষয়ে গবেষকদের মত এই যে অনুরূপ সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশে মানবমন একইভাবে চিন্তা করে ও শিল্পসৃষ্টি করে ; পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে লোকনৃত্য ও লোকসংস্কৃতির বিস্ময়কর সাদৃশ্যের এও অন্যতম কারণ।

লোকনৃত্যের মধ্যে ধর্মীয় ধারণা, কাব্যময় কল্পনা, অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাসের মূলে আদিম মানুষদের ইচ্ছাপূরণের আকাঙ্ক্ষা, ব্যবহারিক প্রয়োজন প্রভৃতির ভূমিকা স্পষ্ট প্রতিফলিত। একথা সত্য যে বিভিন্ন দেশের মানবগোষ্ঠী সমাজবিকাশের প্রক্রিয়ার অনুরূপ স্তরগুলির মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয় বলেই লোকনৃত্যে এখনও আদিমযুগে প্রচলিত প্রথা ও সংস্কারের অবশেষ দেখতে পাওয়া যায়। বিশেষ করে উপজাতির লোকনৃত্যের মধ্যে এই লক্ষণ অত্যন্ত স্পষ্ট।

লোকনৃত্যের মধ্যে পুরাতন যুগের অবশেষ খুঁজে পাওয়া যায় একথা সত্য, কিন্তু এ শুধুমাত্র পুরাতনের প্রতিচ্ছবি নয়। চলমান জীবনের ছন্দে সমসাময়িক সমাজজীবন ও ইতিহাসের প্রবাহ লোকমানসের অভিজ্ঞতায় পুষ্ট হয়ে লোকনৃত্যে শিল্পায়িত হয়েছে। দুঃখের বিষয় আমাদের দেশে বিভিন্ন লোকনৃত্যের পুনরুজ্জীবনের কিছু প্রয়াস সূচিত হলেও এ বিষয়ে অধ্যায়ন, গবেষণা ও তত্ত্বগত বিশ্লেষণের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয় নি। কারণ লোকনৃত্যের ধারা শুধুমাত্র স্মৃতিচারণ বা সংগ্রহশালার বিষয় নয়; এই শিল্পকলা অতীতেও যেমন সমাজজীবনের আশা আকাঙ্ক্ষাকে ব্যক্ত করেছে, তেমনই উপযুক্ত অনুশীলনে ও লালনে মহাভবিষ্যৎ রচনার ভূমিকাও গ্রহণ করতে সক্ষম।

নিম্নে বিভিন্ন লোকনৃত্য সম্বন্ধে আলোচিত হল—

❖ ৩.১.৪.২ গরবা নৃত্য (Garba Dance) :

গুজরাট প্রদেশের লোকনৃত্যকে মোটামুটিভাবে তিনটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়—গরবা, গরবী ও রাস। এ ছাড়াও দধিলীলা নামে যাত্রা ধরনের অনুষ্ঠান প্রচলিত আছে যাতে নাটক ও নাচের সমন্বয় দেখা যায়।

গরবা নৃত্যে মেয়ে ও পুরুষেরা অংশগ্রহণ করে। অম্বামাতার উৎসব উপলক্ষে নবরাত্রির সময় প্রকৃতপক্ষে সারা প্রদেশেই গরবা নাচ ও গানের সমারোহ দেখা যায়। গরবা নাচে শিল্পীসংখ্যার কোনো বিধিনিষেধ নেই। হাতে তাল, তুনি দিয়ে বা মাথায় কলসী নিয়ে বিভিন্ন ভঙ্গিতে এই নাচ অনুষ্ঠিত হয়।

গরবী নৃত্যও অম্বামাতার উৎসব উপলক্ষ্যে নবরাত্রিতে অনুষ্ঠিত হয়। ধুতি ও শার্ট পরা সাধারণ পোশাকই সংগীত সহযোগে সহজ স্বচ্ছন্দ ভঙ্গিতে নাচ হয়।

রাসনৃত্য সাধারণভাবে পুরুষদের জন্যে নির্দিষ্ট হলেও কোনো কোনো সময় এতে স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েই একত্রে যোগদান করে। পুরাণে উল্লিখিত ''হল্লীসক'' নৃত্যের সঙ্গে রাসনৃত্যের সাদৃশ্য দেখা যায়। এই রাসনৃত্য তিন প্রকারের-লাঠি সহযোগে দণ্ডরাস, তালি সহযোগে তালরাস ও ভাব সহযোগে ললিতরাস।

Scanned with CamScanner

❖ ৩.১.৪.৩ ভাভাই নৃত্য (Bhavai Dance) :

ভাভাই হল রাজস্থানের একটি লোকনৃত্য। এই নৃত্যর সময় স্ত্রী-পুরুষ নৃত্যশিল্পীরা মাটির পাত্রের ওপর অথবা পিতলের পাত্রের ওপর এক পায়ের আঙুলে ভর দিয়ে ঘুরপাক খেতে থাকে। এবং একটি পিতলের থালার ওপর কাঁচ নির্মিত দ্রব্য হাতে নিয়ে নৃত্যটি নিয়ন্ত্রিত হয়। প্রধানত পুরুষেরা হারমোনিয়াম বাজিয়ে গান করে, অপরদিকে নারীরা ওই তালে সঙ্গ দিয়ে নাচ করতে থাকে। হারমোনিয়াম ছাড়াও ঢোল, পাখোয়াজ, সারেঙ্গি ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র ব্যবহৃত হয়।

❖ ৩.১.৪.৪ ভাঙ্গড়া নৃত্য (Bhangada Dance) :

ভাঙ্গড়া হল পাঞ্জাবের মাঝহা (majha) অঞ্চলের উৎসকৃত একটি নৃত্য। ভাঙ্গড়া শব্দটি পাঞ্জাবী নৃত্য 'ভাগা' (bagaa) থেকে উৎপন্ন। এই নৃত্যটি মাঝহা থেকে উৎসকৃত হয়ে শিয়ালকোট, গুজরানওয়ালা, শেখপুর, গুজরাট (বর্তমানে পাঞ্জাব প্রদেশের পাকিস্তানে অবস্থিত) প্রভৃতি স্থানে অনুষ্টিত হয়। এই নৃত্য পাঞ্জাবিদের বৈশাখী উৎসবে বিশেষভাবে অনুষ্ঠিত হয়। শস্য উৎপন্নের সময়, বিশেষত গম উৎপাদনের সময় এই বৈশাখী উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। এই নৃত্য সাধারণত পুরুষ ও নারী উভয়ই অংশগ্রহণ করে। পুরুষেরা কুর্তা পাগড়ি ও সিল্কের কাপড় পরে ও নারীরা ঘাঘরা, দোপাট্টা, সালোয়ারকামিজ পরে নৃত্য করে। অনেকে মিলে ঢোল, বাঁশি ইত্যাদি বাজাতে থাকে। এই নৃত্যে সাধারণত উচ্চস্বরে সঙ্গীত পরিবেশিত হয় ও পুরুষের উদ্দামভাবে নৃত্যে আপ্লুত হয়।

❖ ৩.১.৪.৫ বিহু (Bihu Dance) :

আসাম ও মণিপুরেও লোকনৃত্যের অসংখ্য বৈচিত্র্য দেখা যায়। আসামের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় ও প্রচলিত লোকনৃত্য **বিহু**। বিহু উৎসবে সমাজের সব স্তরের লোকেরাই অংশগ্রহণ করে। একত্রিশে চৈত্র অর্থাৎ বৎসরের শেষ দিনে বিহু উৎসব সূচিত হয় এবং প্রায় একমাস ধরে এই উৎসব চলে। বিহু নৃত্যের দুটি অংশ—বিহু ও হুচারী। বিহু নৃত্য শ্যামল প্রান্তরে বৃক্ষছায়ায় অনুষ্ঠিত হয়। বিহু ঢোল, গাগনা, বাঁশী, সিঙা প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র ও গানের সহাযোগে এই অনুষ্ঠান হয়। ছেলেমেয়েরা তাকা (চেরা বাঁশের দ্বারা প্রস্তুত) দ্বারা সমবেতভাবে তালরক্ষা করে। বিভিন্ন ভঙ্গিতে চক্রকারে মণ্ডলরচনা করে এই নৃত্যের স্বতঃস্ফূর্ত সাবলীল ছন্দ মাধুর্য রচনা করে।

হুচারী অংশ গ্রামের সম্ভ্রান্ত অধিবাসীদের বাড়ির সামনে অনুষ্ঠিত হয়। এই অংশে কেবলমাত্র যুবক সম্প্রদায় অংশ গ্রহণ করে। প্রথম অংশে ভক্তিমূলক গানের। (হুচারী কীর্তন) মাধ্যমে শুভ নববর্ষের জন্যে দেবতার আশীর্বাদ প্রার্থনা করা হয়। তারপরে **বিহুগীতি** অনুষ্ঠিত হয়।

ebook.dascoaching.in

আসামের রণনৃত্যের মধ্যে টুলিয়া ও ভাওয়ারিয়া বিশেষ প্রসিদ্ধ। জয়ঢাক, শিঙা ও বাঁশী সহযোগে অসিনৃত্যের মতো যুদ্ধের মহড়ার ভঙ্গিতে নৃত্য প্রদর্শিত হয়।

দেওধনি বা নাগকন্যার নৃত্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই নৃত্যের শিল্পীকে আজীবন কুমারী থাকতে হয়। খোলাচুলে, একটি ঘুঘুপাখির রক্ত পান করে জয়ঢাক ও বাঁশীর সহযোগে এই নৃত্য প্রচণ্ড উদ্দামতা সৃষ্টি করে। শিল্পী মূর্ছিত হয়ে পড়ে না যাওয়া পর্যন্ত এই নৃত্যের বিরতি হয় না।

আসামের গোয়ালপাড়া অঞ্চলে ভাটিয়ালী, ধামাইল, ঝুমুর ভঙ্গিযুক্ত বিভিন্ন লোকনৃত্যের প্রচলন আছে।

বিচিত্র মানবগোষ্ঠী অধ্যুষিত আসাম প্রদেশের মতো জাতিবৈচিত্র্য ভারতের অন্য কোনো প্রদেশে দেখা যায় না। সে জন্যে বিভিন্ন ধর্ম, উপজাতির সংস্কার প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে বহু বিচিত্র লোকসংস্কৃতি গড়ে উঠেছে। লুসাই, জয়ন্তিয়া, খাসিয়া, মিরি, সারদুকপেন, কাচেরী, আরব প্রভৃতি পার্বত্য ও সমতলবাসী গোষ্ঠীদের মধ্যে লোকনৃত্যের ধারায় সাধারণভাবে রণনৃত্যের প্রভাব বেশি দেখা যায়। সামাজিক অনুষ্ঠানমূলক গোষ্ঠীনৃত্যও প্রচলিত।

❖ ৩.১.৪.৬ অন্যান্য লোকনৃত্য (Various other dances) :

ভারতীয় গ্রামীণ লোকনৃত্যের শিক্ষাপদ্ধতির সঙ্গে কি নিবিড় সংযোগ ছিল শ্রদ্ধেয় শান্তিদেব ঘোষ অতি সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করেছেন ঃ

'ভারতীয় গ্রামীণ নৃত্যের মধ্যে প্রধান ও সবচেয়ে বেশি প্রচলিত হল দলবদ্ধ সামাজিক নৃত্য। মানুষ চায় জীবনকে সুন্দর করে গড়ে তুলতে, তেমনি মানুষের সমষ্টি যে সমাজ সেও চায় নিজেকে সুন্দর করে প্রকাশ করতে। সমাজের সুন্দর হওয়ার অর্থ হল বিভিন্ন প্রকৃতির মানুষের মধ্যে একটা সামঞ্জস্যের সৃষ্টি করা, নানা বিপরীতগামী মনোবৃত্তিকে একটি ছন্দোময় শৃঙ্খলার মধ্যে গ্রথিত করা। একত্রে এক গ্রামে বাস করতে হলেও মানুষকে অনেক রকম নিয়মের মধ্যে চলতে হয়। এমন কি গ্রামের বাসস্থানগুলিকে, চলাফেরা র রাস্তাঘাটকে এমনভাবে সাজাতে হয় যেন সমগ্র গ্রাম্য-রচনার মধ্যে একটা ছন্দ থাকে। কোথাও যেন বিরোধ না দেখা যায় কোনো দিক থেকে। সমাজের ওই বস্তুর মধ্যে ঐক্য রচনার প্রধান ও সুন্দর উপায় হল নৃত্যগীতবাদ্য। সেই জন্যেই সামাজিক নাচ হল সমাজকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করার একটি প্রধান অবলম্বন। সামাজিক নৃত্যের এই হল প্রকৃত উদ্দেশ্য। ভারতের পল্লীগ্রামে এর কাজ আরো সার্থক হয়ে মানব সমাজের কল্যাণকে পরিস্ফুট করেছে।'

বারো মাসে তের পার্বণের দেশ বাংলা দেশেও লোকনৃত্যের বৈচিত্র্যের অন্ত নেই। সম্প্রদায়গত লোকনৃত্যের মধ্যে বাউল নাচ ও ত্রিনাথের নাচ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিভিন্ন ধর্মের সাধনরীতির সমন্বয়ে সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে উদ্ভূত এই বাউল সম্প্রদায়ের নৃত্য শান্ত মধুর রসের দ্যোতনায় ভাবরূপায়ণের অপূর্ব নিদর্শন। বাউল সম্প্রদায়ের নৃত্য লোকনৃত্যের

Scanned with CamScanner

অঙ্গীভূত হলেও এর বিনিয়োগ ও প্রয়োগ পদ্ধতিতে উচ্চাঙ্গ নৃত্যের রীতি-পদ্ধতি অনুসৃত হয়। বাউল নৃত্যেও উচ্চাঙ্গ নৃত্যের মতো নৃত্য ও নৃত্ত এই দুই-এরই প্রয়োগ আছে। গানের সঙ্গে ভাবরূপায়ণের সময় নৃত্যাংশ ও গানের বিরতিতে একতারা বা দোতারা সহযোগে নৃত্তাংশের প্রয়োগ হয়। দেহতত্ত্ব, গুরুবাদ, সাধন অঙ্গাভিনয় প্রযুক্ত হয় তার মধ্যে শাস্ত্রীয় নৃত্যের পাদকর্ম, শিরকর্ম, গ্রীবাভেদ, অক্ষিকর্ম ও বিভিন্ন গতি ও ভ্রমরীর সাদৃশ্য দেখা যায়।

বীর, রৌদ্রসাত্মক রণনৃত্যের ধারাও লোকনৃত্যের একটি প্রধান অঙ্গ। ঢালিনৃত্য, রায়বেঁশে পাইকান প্রভৃতি নৃত্য শক্তিচর্চার মাধ্যমে ও প্রদর্শনীর অঙ্গরূপে প্রচলিত ছিল। মাথায় লাল কাপড়, পরনে মালকোঁচা, হাতে ঢাল ও বল্লম নিয়ে ঢালী নাচে তিন জনকে নিয়ে দল গঠন করা হয়। দুই দলে প্রদর্শনীমূলক নৃত্য চলে। এক সময় বাংলাদেশের জমিদারদের পৃষ্ঠপোষকতায় ঢালী নৃত্যের বিশেষ প্রসার ছিল। পাইকান নৃত্যে হাতে লাঠি থাকত। মেদিনীপুর ও বাঁকুড়া অঞ্চলে এই নৃত্যের প্রচলন ছিল। বীরভূমের রায়বেঁশে নৃত্য গতির উদ্দামতা ও বলিষ্ঠতার সমন্বয়ে ঢাক ঢোলের বাজনার তালে তালে অপূর্ব পরিবেশ সৃষ্ট করে।

লোকনৃত্যের আর একটি ধারা বাংলাদেশে মেয়েদের ব্রতকথা, বিবাহ উৎসব, বিভিন্ন ঋতু আচার ও সামাজিক অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে প্রবাহিত। এই নৃত্যলোকের ছন্দ যে বন্য সৌন্দর্য সুরভিত। নদী যেমন আপন আবেগে কলকল স্বরে ছন্দ সৃষ্টি করে, বনফুল যেমন আপন খুশিতে সৌন্দর্য সৃষ্টি করে, মেয়েলী উৎসব ও ব্রতপার্বণকে কেন্দ্র করে, তেমনি বহু বিচিত্র লোকনৃত্য রচিত হয়েছে। ফসল বোনা ও তোলার সময়ে, ঋতু উৎসবে, গ্রামদেবতার পূজায়, পুত্রকন্যার জন্ম ও বিবাহে, শান্তিস্বস্ত্যয়ণে ও বিভিন্ন মঙ্গলসূচক গার্হস্থ্য অনুষ্ঠানে এই সব লোকনৃত্য অনুষ্ঠিত হত।

ভাদ্র ও পৌষ মাসে ফসল ওঠার সময়ে গ্রামে আনন্দের সাড়া পড়ত ও তাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন লোকনৃত্য অনুষ্ঠিত হত। ভাদু ও টুসু পরবে এখনো এ ধারা বজায় আছে। ভাদু ও টুসু পরবে অবশ্য গানের অংশই প্রধান, তবে স্বতঃস্ফূর্ত ভঙ্গিতে এর সঙ্গে আনন্দসূচক নাচও প্রচলিত।

পুরুলিয়া অঞ্চলে প্রচলিত ছৌনৃত্য বিশেষ প্রসিদ্ধ। এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে ময়ূরভঞ্জ ও সেরাইকেল্লা অঞ্চলের ছৌনৃত্যের সঙ্গে বাংলা দেশের ছৌনৃত্যের পার্থক্য আছে। বাংলা দেশে ছৌনৃত্যের ধারা বহু প্রাচীন। সেকালে সাধারণত নাচ, গান ও অভিনয় একসঙ্গে অনুষ্ঠিত হত। নৃত্যাভিনয়ে "পাত্র নৃত্য" ও "প্রেরণ নৃত্য" এই পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। পাত্র নৃত্যে বিভিন্ন চরিত্রের উপযোগী মুখোস সাজসজ্জা ব্যবহার করা হত এবং প্রেরণ নৃত্যে স্বাভাবিক বেশভূষা ব্যবহার করা হত। ছৌনৃত্যে পাত্র নৃত্যের পদ্ধতি অনুযায়ী বিভিন্ন মুখোস ও অঙ্গসজ্জা, বিচিত্র অলঙ্কার ব্যবহার করা হয়। ছৌনৃত্য বছরের যে-কোনো

পালপার্বণ উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হতে পারে। তবে চৈত্র-বৈশাখ মাসে গাজনের সময়েই বিভিন্ন নৃত্য সম্প্রদায়ের প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। নাচের সময় কোনো গান থাকে না, আবহসঙ্গীতে ঢাক, ঢোল, কাঁসর প্রধান। নারীচরিত্রে পুরুষরাই অংশগ্রহণ করে। এই ধরনের নৃত্য ও মূকাভিনয়কে পতঞ্জলি তার মহাভাষ্যে "শৌভিক" আখ্যা দিয়েছেন। সেজন্যে অনেকে বলেন যে ছৌ শব্দটি "শৌভিক" থেকেই উদ্ভূত।

প্রেরণ নৃত্য পদ্ধতি অনুযায়ী পুতুলনাচের ধারাটিও বাংলাদেশে বহুকাল থেকে প্রচলিত। সে কালে পাত্রপাত্রীর পঞ্চালিকা বা পুতুলরূপ-এর নাচের রীতি ছিল। সংস্কৃতে "পঞ্চালিকা" শব্দের অর্থ কাঠ, কাপড়, হাতির দাঁত, চামড়া প্রভৃতির দ্বারা তৈরি পুতুল। চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতকে সঙ্কলিত "বৃহৎ ধর্মপুরাণ"-এ পাঞ্চালী নৃত্যগীতের বর্ণনা পাওয়া যায়। বর্তমান পুতুলনাচের যে ধারা প্রচলিত তাতে পুতুলগুলি দু-ফুট থেকে আড়াই ফুটের মতো উচ্চ, এদের হাত, মুখ ও পায়ের সঙ্গে কালো সুতো বাঁধা থাকে। প্রত্যেকটি পুতুল নাচানোর জন্যে একজন আলাদা লোক নির্দিষ্ট থাকে, সে পরদার আড়াল থেকে পুতুল নাচায়। সানাই, ঢোল, কাঁসির ছন্দে চলে নৃত্য অভিনয়।

ঝুমুর, খেমটা, ঘাটু, লেটো প্রভৃতি লোকনৃত্যগুলি সাধারণভাবে মেদিনীপুর, রাঢ় অঞ্চল, মানভূম, বীরভূম, বাঁকুড়া প্রভৃতি অঞ্চলে বিশেষ প্রচলিত। ঝুমুর নৃত্যের পদ্ধতির সঙ্গে সাঁওতালী নাচের মিল আছে। প্রেমবিষয়ক গানের সঙ্গে স্বতঃস্ফূর্তভাবে মাদল ও বাঁশির সহযোগে নাচ হয়।

খেমটা নাচের সঙ্গে বাইজী নাচের সাদৃশ দেখা যায়। মোগলযুগে নাচওয়ালী সম্প্রদায়ের যে সব শাখা দেশের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে পড়ে তাদের মাধ্যমেই খেমটা নাচের প্রচলন। নৃত্যের ভঙ্গি চটুল ও আদিরসাত্মক।

ঘাটু নাচে পুরুষেরা শাড়ী, ঘাঘরা ও গহনা পরে নারীবেশে হারমোনিয়াম ও তবলা সহযোগে চটুল নৃত্য করে। ময়মনসিংহ, ত্রিপুরা শ্রীহট্ট প্রভৃতি অঞ্চলে ঘাটু নৃত্যগীতের বিশেষ প্রচলন ঠিস। লেটো নাচও ঘাটুর অনুরূপ তবে এর মাঝে পালাগান ও সংলাপ থাকে।

এছাড়াও সারি, জারি, পাতা, ঢোলি, মেচিনী প্রভৃতি বহু বিচিত্র লোকনৃত্যের ধারা বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত।

নাগা সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্মানুষ্ঠানের সঙ্গে নৃত্য অবিচ্ছেদ্যরূপে জড়িত। বড়ো বড়ো ঢাকের বাদ্য, শিঙা ও কর্ণপটহভেদী সঙ্গীতের সঙ্গে উদ্দাম নৃত্যে ও কলহাস্যে উৎসব প্রাঙ্গণ মুখর হয়ে ওঠে। নাচের পোশাক খুব আকর্ষণীয়। কোমরে লাল কাপড়ের টুকরা, মাথায় ধাতুনির্মিত ভূষণ, তাতে দীর্ঘ পাখির পালক। কানে বিচিত্র কর্ণভূষণ। হাতে নক্‌শাকাটা দা বা বর্শা থাকে। এছাড়া কোমরে দড়ি দেওয়া বন্ধনী থাকে। পায়ের বিচিত্র ছন্দে বলিষ্ঠ পদক্ষেপে মাটি কাঁপিয়ে এদের অপরূপ নৃত্যভঙ্গিমা শুধুমাত্র উদ্দামতা নয়, মনোমুগ্ধকর

Scanned with CamScanner

শক্তির মাধুর্যে অপূর্ব বৈচিত্র্য সৃষ্টি করে।

ফাইকিৎলাম, মৈগৈনাহ, বাগরোম্বা, হুরাইরঙ্গিলী, অফিলকুব, তপুকিখিলে, মিরি, খুয়ালাম প্রভৃতি অসংখ্য লোকনৃত্য আসামের সমতল ও পার্বত্য অঞ্চলে প্রচলিত।

বিহার মধ্যপ্রদেশের লোকনৃত্যধারায় আদিবাসী ও মিথিলা অঞ্চলের ভক্তিমূলক লোকনৃত্যের অংশই প্রধান। ধর্মমূলক লোকনৃত্যের মধ্যে রামলীলা, কীর্তনীয়া, কুঞ্জবাসী, নারদী, ভগতা, বিদ্যাপত, পূজারিত প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। কেবলমাত্র মেয়েদের জন্যে ঝিঝিয়া, যাতা-যাতিন, সমা-চাকুয়া প্রচলিত। এছাড়া বংশীলীলা, কদমলীলা, নাগলীলা, প্রভৃতি ধর্মমূলক নাচেরও প্রচলন দেখা যায়। নিম্নশ্রেণির অধিবাসীদের মধ্যে চামর নাটুয়া, কমলামাই নাচ, দম্ফাবাসুলী ও মুসলমানদের মধ্যে ঝারপী নাচ প্রচলিত।

দক্ষিণ বিহারের অধিবাসীদের মধ্যে মধ্যে বুবু, দশাই, হোলি উপলক্ষ্যে ঝিকা ও ডাঙ্গা নাচ, পাইকা, লাঝুরি, যাদুর, লুরিম্বয়ায়ু, ঝুমুর, শিকার, ছৌ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

রসিক, নাটুয়া ও নাচনী—এই তিন প্রকারের চটুলনৃত্যের প্রচলন আছে। এগুলি বাইজী নৃত্যের অনুকরণযুক্ত আদিরসাত্মক নাচ। সেরাইকেল্লা খারসোয়ান অঞ্চলের ছৌনৃত্য লোকনৃত্য ধারার অন্তর্ভুক্ত হলেও আঙ্গিক বৈচিত্র্যে ও উৎকর্ষে শাস্ত্রীয় নৃত্যের প্রভাব দৃষ্টিগোচর হয়।

অন্দ্র প্রদেশের লোকনৃত্যের মধ্যে দম্পু বাদ্যম, মাথরী, বথকম্ম, কুস্মি, কোলাট্রম, লাম্বাডি ও সিদ্দি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

হিমাচল প্রদেশে ডাঙ্গি, দীপক, ঝাঁঝর, পাঙ্গি, সাঙলা প্রভৃতি লোকনৃত্য প্রচলিত।

কেরলের লোকনৃত্যের ধারায় দ্রাবিড় সংস্কৃতির বিশেষ প্রভাব দেখা যায়। তিয়াট্টম, খেরায়ট্টম, ভেলাকলি, কোলকলি প্রভৃতি প্রচলিত।

জম্মু ও কাশ্মীরে হাফিজা, বচা নজমা, ধুমল, রৌফ, হিকাত্ পাঠের প্রভৃতি লোকনৃত্য বিশেষ জনপ্রিয়।

মহারাষ্ট্র অঞ্চলে গাওরিচা, বেলিয়াছা, লাজিম, দহিকল, দশাবতার, গৌলন, তামাশা বিশেষ জনপ্রিয়।

রাজস্থানের লোকনৃত্যের মধ্যে গীদার, রসিয়া, ঝুমার, ডাঙ্গিয়া, কাছি খোড়ি, ভালার প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

উত্তরপ্রদেশে নৌটাঙ্কি, নাচুয়া, কাজরী, ঝুলা প্রভৃতি ও পার্বত্য অঞ্চলে চাউলিয়া, চঞ্চরী, যাদ্দা ঝেন্তিয়া, ছাপেলী খাসিয়ারা শোখী প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

যুগযুগান্তের সংস্কৃতির সমন্বয়ে রসবৈচিত্র্যে অনুরঞ্জিত লোকনৃত্যধারা যথাযথ অনুশীলন ও প্রয়োগে শুধুমাত্র লোকরঞ্জনে নয়, লোকশিক্ষা প্রচারের অন্যতম মাধ্যমরূপে প্রযুক্ত হতে পারে।

৩.২ শিক্ষার সঙ্গে নৃত্যের একীকরণ (কার্যকরী সংগীত, নৃত্যনাট্যিকা) [Integration of Dance in educational practices (Action songs, Nritya Natika)]

৩.২.১ শিক্ষাক্ষেত্রে নাটকের একীকরণে কার্যকরী সংগীত [Intregration of Dance (*Action songs*) in educational practices] :

ভারতে নৃত্যশিল্পকে যতখানি গুরুত্ব দেওয়া হয়, ততখানি বোধ হয় আর কোথাও দেওয়া হয় না। তারই ফলশ্রুতি হল স্বয়ং বিশ্বের নিয়ামক শক্তিকে নটরাজ শিবরূপে কল্পনা করে তাঁর বিগ্রহ চিদাম্বরমের মন্দিরে স্থাপন। নৃত্যকে এতখানি মর্যাদা কোথাও দেওয়া হয়নি। এই মন্দিরেই সংলগ্ন গোপুরমের দেয়ালে 'নাট্যশাস্ত্র' বর্ণিত একশত আটটি করণের চিত্ররূপ খোদিত আছে। ফলে চিদাম্বরমের মন্দির নৃত্যশিল্পীর তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে।

ভারতে যে সকল নৃত্যরীতি বিকাশলাভ করেছে তাদের ভিত্তি হল ভরত কর্তৃক 'নাট্যশাস্ত্রে' স্থাপিত কয়েকটি মৌলিক নীতি। তাতে নৃত্যকে তিনটি রূপে কল্পিত করা হয়েছে : নৃত্ত, নৃত্য এবং অভিনয়। ভরত মুনি তিনটি রূপেরই উল্লেখ করেছেন। তবে তার সবিস্তার ব্যাখ্যা পাই নন্দিকিশোরের 'অভিনয় দর্পণে'। নৃত্ত বলতে বুঝি শুদ্ধ বিমূর্ত নৃত্য, অর্থাৎ তা দেহভঙ্গি-সর্বস্ব এবং ভাবের কোনো সংযোগ নেই। 'ভাবাভিনয় হীনং তু নৃত্তমিত্যবিধীয়তে।' আর নৃত্যে পাই মনের ভাবের প্রকাশ। তা বিমূর্ত নৃত্য, অর্থাৎ তা দেহভঙ্গিসর্বস্ব এবং তার সঙ্গে ভাবের কোনো সংযোগ নেই। 'ভাবাভিনয় হীনং তু নৃত্তমিত্যভিধীয়তে।' তা বিমূর্ত নৃত্য, অর্থাৎ তা দেহভঙ্গি সর্বস্ব এবং তার সঙ্গে ভাবের কোনো সংযোগ নেই। আর নৃত্যে পাই মনের ভাবের প্রকাশ। তা বিমূর্ত নয়, তা মানসিক অনুভূতিকে প্রকাশ করে। আর অভিনয় কাহিনি বলে। সেখানে একটি সমগ্র নাট্যকে নৃত্যে রূপ দেওয়া হয়। ভরতনাট্যম নৃত্য ও কথক নৃত্য প্রধানত নৃত্ত শ্রেণির, মণিপুরী নৃত্য নৃত্য শ্রেণির এবং কথাকলি নৃত্য অভিনয় শ্রেণির।

এই শ্রেণি বিভাগের ভিত্তি হল ভরতমুনির ভাব রস তত্ত্ব। তিনি বলেন, শিল্পের দুটি দিক আছে : একটি অন্তরের দিক, অন্যটি বাহিরের দিক; একটি প্রেরণা অপরটি তার বহিঃপ্রকাশ। অন্তরের প্রেরণাকে ভাব বলা হয়েছে এবং তার বাহিরের প্রকাশকে রস বলা হয়েছে। সুতরাং ভাবের বিশেষ সম্পর্কে শিল্পীর মনের সহিত। তা শিল্পীর মনে ভাব জাগ্রত করে বলে তা ভাব। 'ভাবয়তি ইতি ভাবঃ'। আর রসের সম্পর্ক শিল্পী ও শিল্পরসিক, উভয়ের সঙ্গে। এখানে শিল্পীর ভূমিকা সক্রিয়; কারণ তিনি ভাবের প্রকাশ দেন। আর রসিকের বা দর্পণের ভূমিকা সক্রিয়; কারণ সেই প্রকাশ দেখে তিনি রসিক হন; অর্থাৎ তাঁর মনে শিল্পতাত্ত্বিক অনুভূতি বা আনন্দ সঞ্চারিত হয়। এই প্রকাশ দর্শককে রসিত করে বলেই তা রস। 'রসয়তি

Scanned with CamScanner

ইতি রসম।' কাজেই যে প্রকাশ ভাববর্জিত তা নৃত্ত এবং যে প্রকাশ ভাবের বাহন তা নৃত্য এবং অভিনয়। সুতরাং নৃত্য শিক্ষার ক্ষেত্রে নান্দনিক-উৎকর্ষতা বৃদ্ধি করে, সহমর্মিতা দলবদ্ধতার বিকাশ ঘটায়। নৃত্য প্রভূত আনন্দদায়ক একটি বিষয়। আনন্দলাভের মধ্য শারীরিক উৎকর্ষতাও বৃদ্ধি করে নৃত্য শিখনে একটি অনন্য ও উল্লেখযোগ্য মাধ্যম হল নৃত্য

গান

আমরা চাষ করি আনন্দে
মাঠে মাঠে বেলা কাটে সকাল হ'তে সন্ধে।
রৌদ্র ওঠে বৃষ্টি পড়ে, বাঁশের বনে পাতা নড়ে
বাতাস ওঠে ভরে ভরে চষা মাটির গন্ধে।
সবুজ প্রাণের গানের লেখা রেখায় রেখায় দেয় রে দেখা
মাতে রে কোন্ তরুণ কবি নৃত্য দোদুল ছন্দে।
ধানের শিষে পুলক ছোটে সকল ধরা হেসে ওঠে
অঘ্রাণেরই সোনার রোদে, পূর্ণিমারই চন্দ্রে।

◆ **নৃত্যের ভঙ্গি :**

(১) **আমরা চাষ করি আনন্দে :** দুই হাতের কনুই সোজা করে সামনের দিকে শরীর ঝুঁকিয়ে সমান্তরাল ভাবে হাত নাড়তে হবে।

(২) **মাঠে মাঠে :** ডান পা এগিয়ে সামনে রেখে পেছনের পায়ে গোড়ালি তুলে দুই হাত খোলা করে সমান্তরালভাবে নাড়তে হবে।

(৩) **বেলা কাটে সকাল হ'তে সন্ধে :** বাঁ পা পিছনে নিয়ে ডান হাত সামনে এগিয়ে তেজদৃপ্ত ভঙ্গিমায় শরীরকে সোজা করে দাঁড় করাতে হবে। ডান হাত নিম্নগামী ও বাঁ হাত ঊর্ধ্বমুখী হবে।

(৪) **রৌদ্র ওঠে বৃষ্টি পড়ে :** দু-হাত মাথার ওপরে তুলে বাঁ দিকে-ডান দিকে-বাঁ দিকে চারবার দোলাতে হবে। দু-হাতের চেটো খোলা থাকবে ও হাত ভাঙবে না।

(৫) **বাঁশের বনে পাতা নড়ে :** পা জড়ো করতে হবে। বাঁ-হাত ভেঙে ও আঙুলগুলি খোলা রেখে ডান হাত প্রসারিত করতে হবে। আঙুলগুলি খোলা অবস্থায় কাঁপতে থাকবে।

(৬) **বাতাস ওঠে ভরে ভরে :** দু-হাত সামনে অল্প ক্রশ করে দু-পাশে সমবেত ভাবে নিতে হবে।

(৬) **চষা মাটির গন্ধে :** দু-পায়ের গোড়ালি নামিয়ে ডান হাত খুলে পুনরায় বুকের মাঝে রাখতে হবে। ডান পা সামনে কিছুটা এগনো থাকবে।

(৭) **সবুজ প্রাণের গানের লেখা :** ডান হাত ভেঙে শরীরের সামনে বাঁ দিকে দুলিয়ে নিয়ে পুনরায় ডানদিকে আনতে হবে। এটি দু-মাত্রায় করতে হবে।

(৮) **রেখায় রেখায় দেয় রে দেখা :** ডান হাত ভেঙে হাতের চেটো বুকের মাঝে আনতে হবে।

(৯) **মাতে রে কোন্ তরুণ কবি :** দু-হাত ভেঙে বাঁদিকে কাঁধের নীচে আনতে হবে। পরপর ডান হাত নামানো ও বাঁ হাত ওঠানো পরপর চলতে থাকবে।

(১০) **নৃত্য দোদুল ছন্দে :** দু-হাত সামনে অল্প ক্রশ করে দু পাশে ছড়িয়ে দিয়ে শরীরকে দোলাতে হবে। এটি চারমাত্রায় হবে।

(১১) **ধানের শিষে পুলক ছোটে :** ডান হাতের তর্জনী খুলে বুকের কাছে থেকে সামনে হাত সোজা করে ছুঁড়তে হবে। বাঁ হাত ঋজু থাকবে।

(১২) **সকল ধরা হেসে ওঠে :** সকলে ডানদিকে ঘুরে পরস্পর মুখের দিকে চেয়ে দুলতে থাকবে। মুখে স্মৃত হাসি লেগে থাকবে।

(১৩) **অঘ্রাণেরই সোনার রোদে :** দু-হাত মাথার ওপরে তুলে বাঁদিক ডানদিক করতে করতে তিনবার দোলাবে। দু-হাতের চেটো খোলা থাকবে ও হাত ভাঙবে না।

(১৫) **পূর্ণিমারই চন্দ্রে :** পূর্বের ভঙ্গিমায় ওপরের দিকে তাকাতে তাকাতে ও হাত নাড়তে নাড়তে মার্চিং করতে করতে স্টেজের বাইরে চলে আসবে।

❑ ৩.২.২ নৃত্যনাটিকা (Nritya Natika) :

নৃত্যনাটক বলতে সাধারণত নির্বাক নৃত্যকেই বোঝায়। এই নাটকে ব্যাকগ্রাউন্ডে যন্ত্রসংগীত পরিবেশিত হয়, মঞ্চে বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গিমায় নৃত্যশিল্পী গানের ভাব প্রকাশ করে। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গতিভঙ্গির চলনের মাধ্যমে যে অভিনয় অনুষ্ঠিত হয় তাকেই নৃত্যনাট্য বলে। এই অভিনয় চার প্রকার-আঙ্গিক, বাচিক, সাত্ত্বিক ও আহার্য। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গতিভঙ্গির যে চলন তাকে আঙ্গিক অভিনয়ও বলে। এই অভিনয়ের উৎস যজুর্বেদ, ভাব স্থায়ী। কাব্য, নাটক ও সাহিত্যের ভাষা নিয়ে ভাবের মাধ্যমে যে অভিনয় তাকে বাচিক অভিনয় বলে। এই অভিনয়ের উৎস ঋকবেদ, ভাব সঞ্চারী। নাটকের চরিত্রানুযায়ী পরিবেশ সৃষ্টিতে চরিত্র অলঙ্করণের অঙ্গসজ্জা, বসনভূষণ, মঞ্চসজ্জা প্রভৃতির মাধ্যমে যে অভিনয় তাকে আহার্য অভিনয় বলে। এর উৎস-সামবেদ, ভাব-বিপাস্থায়ী। মনের বিভিন্ন অভিব্যক্তি ও মানসিকতাকে ভাবের সাহায্যে প্রকাশের নাম সাত্ত্বিক অভিনয়। এই অভিনয়ের উৎস অথর্ববেদ, ভাব অস্থায়ী।

মনে রাখতে হবে নৃত্যনাটিকায় অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ ও উপাঙ্গ সমূহের মাধ্যমে অভিনয় হয়। শির, হস্তদয়, বক্ষ, কটি, পার্শ্বদ্বয় ও পদদ্বয়—এই ছয়টি প্রধান অঙ্গ। কেউ কেউ গ্রীবাকেও

Scanned with CamScanner

অঙ্গ বলে গণ্য করেন। স্কন্ধদ্বয়, বাহুদ্বয়, পৃষ্ঠ, উদর, উরুদ্বয়, জঙ্ঘাদ্বয়—এই ছয়টি প্রত্যঙ্গ
নাট্যশাস্ত্রের মতে নেত্র, ভ্রূ, নাসা, অধর, কপোল ও চিবুক—এই ছয়টি উপাঙ্গ
অভিনয়-দর্পণের মতে—নেত্র, ভ্রূ, অক্ষিপুট, অক্ষিতারা, গণ্ডদ্বয়, নাসিকা, গণ্ডাস্থি, অধর
দন্তপঙ্‌ক্তি, জিহ্বা, চিবুক, মুখ। মনে রাখতে হবে অঙ্গগুলির চলনেই প্রত্যক্ষ উপাঙ্গগুলি
চালিত হয়।

আঙ্গিক অভিনয় আবার নাট্যশাস্ত্রের মতে তিন প্রকার—(ক) মুখজ (খ) চেষ্টাকৃত ও
(গ) শারীর। মুখজ অভিনয় বলতে শির, চক্ষু প্রভৃতির বিভিন্ন সঞ্চালন ও প্রয়োগ বোঝায়
চেষ্টাকৃত অভিনয় বিভাগে হস্তাভিনয় প্রধান। আর বক্ষাদেশ, উদর, পার্শ্ব, কটি, উরু, জঙ্ঘা
প্রভৃতির সঞ্চালন ও প্রয়োগের মাধ্যমে শারীর অভিনয়। প্রতীকধর্মী অঙ্গাভিনয় ভারতীয়
নৃত্যকলার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এই নৃত্যনাটিকার মাধ্যমে শিখনে নতুন ধারণার বিকাশ
মনস্তাত্ত্বিক বিকাশ, পর্যবেক্ষণ-দক্ষতা ও নান্দনিক উৎকর্ষিতা বৃদ্ধি করে।

This E-Book Download From>>

www.ebook.dascoaching.in

Follow Our B.Ed Related Website>>

www.dascoaching.in

Our Online Class>>

www.online.dascoaching.in

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ও উত্তর
(Short Questions & Answers)

❑ অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ও উত্তর (Objective type questions & answers) :

Marks – 2

প্রশ্ন : বর্তমানে ভারতনাট্যমে কতগুলি নৃত্যপদ্ধতি অনুষ্ঠিত হয় ও সেগুলি কী কী?

উত্তর : বর্তমানে ভরতনাট্যম অনুষ্ঠান বলতে সাধারণভাবে আল্লারিপু, যতিস্বরম, শব্দম, বর্ণম, পদম, তিল্লানা—এগুলিই প্রচলিত।

প্রশ্ন : কেরালার প্রাচীনতম নৃত্যটির নাম কী? এর একটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করুন।

উত্তর : কেরালার প্রাচীনতম নৃত্যটির নাম হল কথাকলি।

কথাকলির একটি বৈশিষ্ট্য হল কথাকলি নৃত্যনাট্য আঙ্গিক, বাচিক, সাত্ত্বিক ও আহার্য—এই চার প্রকার অভিনয় সমৃদ্ধ।

প্রশ্ন : রসাভিনয় কী?

উত্তর : রসাভিনয় কথাকলি নৃত্যনাট্যের কঠিনতম ও শ্রেষ্ঠতম অঙ্গ। নাট্যশাস্ত্রের মতে শৃঙ্গার, হাস্য, করুণ, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, বীভৎস ও অদ্ভুত—এই আটটি রস মন ও অনুভূতির সংঘাতে সৃষ্ট। রসই স্থায়ীভাবের উৎস। রতি, শোক, ক্রোধ, উৎসাহ, ভয়, জুগুপ্সা ও বিস্ময়—এই সাতটি স্থায়ীভাব। পরবর্তীকালে 'শান্ত'কে নবম রসরূপে অভিহিত করা হয়েছে। কথাকলি নৃত্যে নবরসেরই প্রয়োগ হয়ে থাকে। এই রসনিষ্পত্তি শিল্পকলার উন্নততম পর্যায়। কথাকলি নৃত্যশিল্পীর ভাবাভিনয়ে যে উৎকর্ষের পরিচয় পাওয়া যায়, তা সত্যই বিস্ময়কর।

প্রশ্ন : খেমটা নাচের সঙ্গে কোন্ নাচের সাদৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়? এই নাচের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করুন।

উত্তর : খেমটা নাচের সঙ্গে বাইজী নাচের সাদৃশ দেখা যায়। মোগলযুগে নাচওয়ালী সম্প্রদায়ের যে সব শাখা দেশের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে পড়ে তাদের মাধ্যমেই খেমটা নাচের প্রচলন। নৃত্যের ভঙ্গি চটুল ও আদিরসাত্মক।

প্রশ্ন : লোকনৃত্য কাকে বলে?

উত্তর : লোকনৃত্য সংহত সমাজের সৃষ্টি। অনেকে আদিম নৃত্য (Folk Dance)-কে একই পর্যায়ে ফেলেন। কিন্তু এই ধারণা ভ্রান্ত। আদিম সমাজ থেকে উন্নত ও অগ্রসর সমাজ অর্থাৎ যে সমাজে বিশেষ গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের সমষ্টিগত আচার আচরণ, সংস্কার, অনুষ্ঠান,

Scanned with CamScanner

রীতিনীতি ও জীবন অভিব্যক্তি বিশেষ বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে, লোকনৃত্য সেই সংহত, উদ্ভূত সমাজের সৃষ্টি।

প্রশ্ন : নৃত্যের মাধ্যমে শিখন কীভাবে হয়?

উত্তর : নৃত্য শিক্ষা ক্ষেত্রে নান্দনিক-উৎকর্ষতা বৃদ্ধি করে, সহমর্মিতা ও দলবদ্ধতার বিকাশ ঘটায়। নৃত্য প্রভূত আনন্দদায়ক একটি বিষয়। আনন্দলাভের মধ্যে শারীরিক উৎকর্ষতা বৃদ্ধি করে নৃত্য শিখনে একটি অনন্য ও উল্লেখযোগ্য মাধ্যম হল নৃত্য।

প্রশ্ন : নৃত্যনাটিকা কী ?

উত্তর : নৃত্যনাটক বলতে সাধারণত নির্বাক নৃত্যকেই বোঝায়। এই নাটকে ব্যাকগ্রাউন্ডে যন্ত্রসংগীত পরিবেশিত হয়, মঞ্চে বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গিমায় নৃত্যশিল্পী গানের ভাব প্রকাশ করে। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গতিভঙ্গির চলনের মাধ্যমে যে অভিনয় অনুষ্ঠিত হয় তাকেই নৃত্যনাট্য বলে। এই অভিনয় চার প্রকার-আঙ্গিক, বাচিক, সাত্ত্বিক ও আহার্য।

প্রশ্ন : কিরীটম কী? চুট্টির্তুন কাকে বলে?

উত্তর : কথাকলি নৃত্যে পুরুষ চরিত্রাভিনেতার মস্তকাভরণ 'কিরীটম' এক অপূর্ব শিল্পকলার নিদর্শন। কানের পাশে কাঠের গোল দুটি বড়ো অলঙ্কার, একে 'তোড়া' বলে। কানের ছোটো দুটি অলঙ্কারকে 'চেতিপুরু' বলা হয়। মুকুটের নীচে কপালের উপর যে লম্বা কাপড়ের বন্ধনী তাকে 'চুট্টির্তুন' বলে। চুট্টির্তুনির উপর মোতির বা পুঁতির কাজ করা যে ফিতা থাকে তাকে 'নারা' বলা হয়। পিঠে যে লম্বা কালো রং-এর নকল চুল থাকে তাকে 'চামরম্' বলে।

প্রশ্ন : বিহু নাচ কোথায় দেখা যায়? এই নাচের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করুন।

উত্তর : আসামের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় ও প্রচলিত লোকনৃত্য বিহু।

বিহু উৎসবে সমাজের সব স্তরের লোকেরাই অংশগ্রহণ করে। একত্রিশে চৈত্র অর্থাৎ বৎসরের শেষ দিনে বিহু উৎসব সূচিত হয় এবং প্রায় একমাস ধরে এই উৎসব চলে। বিহু নৃত্যের দুটি অংশ—বিহু ও হুচারী। বিহু নৃত্য শ্যামল প্রান্তরে বৃক্ষছায়ায় অনুষ্ঠিত হয়। বিহু ঢোল, গাগনা, বাঁশী, সিঙা প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র ও গানের সহাযোগে এই অনুষ্ঠান হয়। ছেলেমেয়েরা তাকা (চেরা বাঁশের দ্বারা প্রস্তুত) দ্বারা সমবেতভাবে তালরক্ষা করে।

সম্ভাব্য প্রশ্নাবলি

❑ অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন (Objective type questions) : Marks – 2

১। ভরতনাট্যমের আদি রূপটি কী? ভরতনাট্যমের একটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করুন। (What is the oldest form of the dance Bharat Natyam? Give one characteristic of the dance.)

২। কেরালার প্রাচীনতম নৃত্যটির নাম কী? এর একটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করুন। (What is the oldest form of dance in Kerala? Give one characteristic of it.)

৩। কুপ্পায়াম বলতে কী বোঝায়? (What is Kuppayam?)

৪। লোকনৃত্যের দুটি মূল বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করুন। (Write two basic characteristics of folk dance.)

৫। বিহুনৃত্যে ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্রগুলির নাম লিখুন। (What are the musical instruments used in Bihu dance)

৬। অবিভক্ত বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে ব্যবহৃত চারটি লোকনৃত্যের উল্লেখ করুন। (Discuss four types of folk dances followed in different parts of united Bengal.)

৭। যে সব নাটকে মুখোশ ব্যবহার হয় তাদের নাম লিখুন। (Mention different types of dance where mask is used.)

৮। নাট্যশাস্ত্রে ভরত মুনি যেসব নৃত্যের উল্লেখ করেছেন তাদের মূল নীতিগুলি কী কী (What are the basic principles of dances discussed by Bharat 'muni' in 'Natyashastra'?)

৯। পূর্বভারতে জনপ্রিয় চারটি নৃত্যের উল্লেখ করুন। (Write the names of four popular dances in Eastern India.)

১০। কুচিপুড়ী নৃত্যের চারটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করুন। (Give four characteristics of Kuchipudi dance.)

Scanned with CamScanner

❑ সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন (Short type questions) : Marks – 1

১। ভরতনাট্যমের উৎপত্তির বিষয়ে লিখুন (Give the genesis Bharat Natyam.)

২। ভারতীয় নৃত্যে রুক্মিনীদেবীর অবদান উল্লেখ করুন। (Find the role of Ruksmini Devi in Indian dances.)

৩। কথাকলি নৃত্যের উৎপত্তির বিষয়ে লিখুন (Briefly discuss the origin of Kathakali dance.)

৪। কথাকলি নৃত্যের পথিকৃতদের নাম এবং সংক্ষেপে তাঁদের অবদান সম্পর্কে লিখুন। (Write the name of the pioneers in Kathakali dance and their respective contributions, in brief.)

৫। উত্তর ভারত কেন প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী নৃত্যে পশ্চাদপদ সে সম্পর্কে আলোচনা করুন। (Discuss briefly why north India could not flourish in time honoured styles of dances.)

৬। কথাকলিনৃত্যে শিল্পীদের সাজসজ্জা এবং বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার সম্পর্কে আলোচনা করুন। (Describe the makeup taken by the dancers in Kathakali and the music system accompanying the dance.)

❑ রচনাভিত্তিক প্রশ্ন (Essay type questions) : Marks – 10

১। ভরতনাট্যমের ক্রমবিকাশের ইতিহাস লিখুন। কথাকলির সাথে ভরতনাট্যমের গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্যগুলি উল্লেখ করুন। (Trace the history of development of Bharatnatyam. Indicate its potential difference with Kathakali.)

২। লোকনৃত্যের ক্রমবিকাশের ইতিহাস লিখুন। ভারতের ধর্ম ও সংস্কৃতির সাথে এই নৃত্য কিভাবে সম্পর্কযুক্ত (Trace the evolution of folkdance down the ages. How is it related with the religion and culture of India?)

৩। দেখান যে ভারতীয় নৃত্যের ক্রমবিকাশে ভারতের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রয়েছে। (Show that the cultural diversity of India has remarkable impact on evolution of dances.)

৪। সামাজিকীকরণ, মানবাধিকার, বিনোদন ও দৈহিক বিকাশের প্রেক্ষিতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নৃত্যের গুরুত্ব কতখানি-আলোচনা করুন। (Discuss the importance of dance in the educational institutions from the standpoint of socialication, human rights, recreation and physical development.)

৫। গ্রামীণ ভারতে বিভিন্ন নৃত্য এবং তাদের উপস্থাপনা সম্পর্কে আলোচনা করুন। এদের শিক্ষাগত মূল্য নিরূপণ করুন। (Discuss the types of dances and their style of presentation in rural India. Estimate their educative value.)

Scanned with CamScanner

অধ্যায়

৪

চিত্রশিল্প কলা ও অঙ্কন
(Drawing & Painting)

❑ বিষয়বস্তুর রূপরেখা :

৪.১ **রং, স্ট্রোক ও স্কেচিং—বিভিন্ন কাজের পদ্ধতি ও পরিপ্রেক্ষিত (Colours, Strokes and Sketching–understanding of various means and perspectives)**

৪.১.১ রং (Colour)

৪.১.২ স্ট্রোক এবং স্কেচিং (Strokes & Sketching)

৪.১.৩ কার্যাদি সাধনের উপায় ও পরিপ্রেক্ষিত (Understanding of Various means and Perspectives)

৪.২ **বিভিন্ন শৈলীর চিত্র—ওয়ারলি চিত্র, মধুবনি চিত্র, গ্লাস চিত্র, ফেব্রিক চিত্র ও অন্যান্য শৈলীর চিত্র (Different forms of painting– Worli art, Madhubani art, Glass painting, Fabric painting and various forms of painting)**

৪.২.১ ওয়ারলি লেখচিত্র (Worli art)

৪.২.২ মধুবনী চিত্রকলা (Madhubani art)

৪.২.৩ গ্লাস পেন্টিং (Glass painting)

৪.২.৪ ফেব্রিক (Fabric painting)

৪.২.৫ অন্যান্য শৈলীর চিত্র (Various forms of painting)

৪.৩ **শিক্ষায় ড্রইং ও পেন্টিং-এর ব্যবহার—চার্ট তৈরি, পোস্টার তৈরি, ম্যাচস্টিক ড্রইং ও অন্যান্য শিক্ষোপকরণ (Use of Drawing and Painting in Education– Chart making, Poster making, match-stick drawing and other forms)**

৪.৩.১ চার্ট তৈরি (Chart making)

৪.৩.২ পোস্টার তৈরি (Postar making)

৪.৩.৩ ম্যাচস্টিক ড্রইং (Match-stick drawing)

Scanned with CamScanner

✪ ৪.১ রং, স্ট্রোক ও স্কেচিং— বিভিন্ন কাজের পদ্ধতি ও পরিপ্রেক্ষিত (Colours, Strokes and Sketching– understanding of various means and perspectives) :

❑ ৪.১.১ রং (Colour) :

রং হল শিল্পীদের সবচেয়ে বড় শক্তি এবং ঐশ্বর্য্য কিন্তু একইসঙ্গে রং শিল্পীদের সর্বাপেক্ষা বড় চ্যালেঞ্জ। রং কেবল শিল্পীদের কল্পনা প্রকাশের উপায় নয় বরং এই বিশ্বচরাচর ব্যাপি সর্বভূতে ব্যপ্ত মহাশক্তির প্রকাশ। তাই মানুষরা জ্ঞাতে অজ্ঞাতে বারবার নতি স্বীকার করছে রঙের কাছে। মানুষের এ ভুবন ব্যাপ্ত হয়ে আছে রং যাকে ছাড়া মানুষ বাঁচতে পারে না। রং হয়ে ওঠে মানুষের সভ্যতার অপরিহার্য অঙ্গ।

একজন শিশু চোখ মেললেই দেখে রং ও আলো। রং ও আলো পরস্পরের পরিপূরক। আলো ছাড়া মানুষের দর্শনেন্দ্রিয় রং বুঝতে পারে না। তাই আলো সর্বদা রংকে প্রভাবিত করেছে। সাদা আলোর নিচে আমরা একটি রংকে যেমন দেখি অন্যরঙের আলোর নিচে সেই রংটি অন্যরকম দেখায়। অর্থাৎ রং কোন বস্তুর স্থায়ী গুণ নয় তা আলোর দ্বারা নিয়ত পরিবর্তনশীল। রং ও আলো নিয়ত পরিবর্তনশীল, পারস্পরিক প্রভাব সুসম্পর্ককেই ছবিতে ফুটিয়ে তুলেছিলেন ইম্প্রেসানিস্টরা।

★ প্রাথমিক বর্ণ বা রং ও মিশ্র বর্ণ বা রং :

আলোর রং ছবির রং এ দুইটি কিন্তু এক নয়। আলোর রং সংযোগাত্মক ও ছবির রং বিয়োগাত্মক। চিত্রের ক্ষেত্রে কেউ যখন সাদা ক্যানভাসে কোন রং লাগায় তখন মূলত ছবিতে রং লাগায় না বরং কিছু রং তুলে নেয়। অর্থাৎ চিত্রের জন্য ব্যবহৃত রঞ্জক পদার্থ কিছু বর্ণের আলোকে শোষণ করে বাকিগুলিকে প্রতিফলিত করে দেয়। এই কারণে সকল বর্ণগুলির মিশ্রণে আলোকবর্ণ সাদা হলেও চিত্রের ক্ষেত্রে সাতটি রঞ্জকবর্ণ মিশ্রিত করলে তা ধূসর বর্ণ ধারণ করে। আলোর ক্ষেত্রে তিনটি মুখ্য বর্ণ **হল লাল, হলুদ** ও **নীল**। লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি লাল, নীল, হলুদ ও সবুজ এই চারটি রংকেই প্রাথমিক বর্ণ বলে জ্ঞান করেছিলেন যদিও সবুজ বর্ণটিকে **মিশ্রিত** বা **সেকেন্ডারী বর্ণ** বলেই ধরা হয়। প্রাথমিক বর্ণদুটিকে মেশালে যে বর্ণ পাওয়া যায় তাকে মিশ্র বর্ণ বলা হয়। যেমন নীল ও হলুদ মেশালে সবুজ বর্ণ, লাল ও নীল মেশালে বেগুনী বর্ণ হলুদ ও একটি মিশ্র বর্ণ মেশালে টারশিয়ারি বর্ণ তৈরী হয়। তিনটি প্রাথমিক বর্ণ মেশালে প্রতিটি বর্ণ তার নিজস্বতা হারিয়ে ধূসরে পরিণত হয়। বর্ণচক্রের পাশাপাশি বর্ণকে পরিপূরক বর্ণ ও বিপরীত দিকের রংকে

বিপরীতার্থক বর্ণ বলা হয়। সাদা ও কালাকে নিউট্রাল বর্ণ বলা হয়। কোন রঙের সঙ্গে সাদা মেশালে তাকে টিন্টিং (tinting) ও কালো মেশালে তাকে shading বলা হয়।

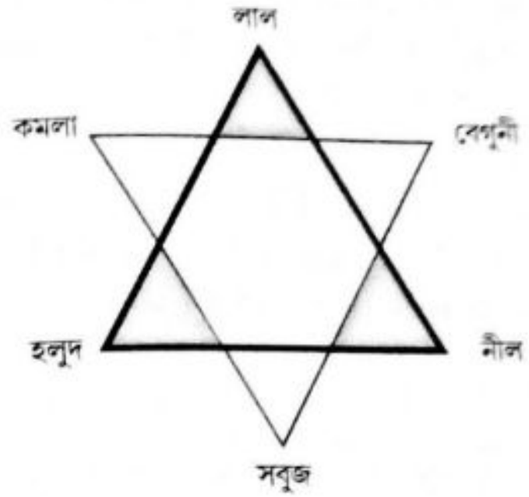

★ উষ্ণ বর্ণ বা রং ও শীতল বর্ণ বা রং :

কোনো বর্ণকে কোনো সময় উষ্ণ বা শীতল বর্ণ বলে আখ্যা দেওয়া হয়। বৈজ্ঞানিক সূত্রানুযায়ী প্রতিটি বর্ণের একটি নির্দিষ্ট তরঙ্গ দৈর্ঘ্য আছে। দৃষ্টিগ্রাহ্য বর্ণগুলির তরঙ্গদৈর্ঘ্য মূলত ৩৮০ থেকে ৭৬০ মিলিমাইক্রোনের মধ্যে সীমিত। সাদারণত বেনীয়াসহকালে বর্ণমণ্ডলের সর্বাপেক্ষা কম তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট বর্ণ বেগুনী লাল ৩৮০-৪৫০ মিলিমইক্রন, নীল বর্ণের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য ৪৫০-৪৯০ মিলিমাইক্রন, সবুজ বর্ণের তরঙ্গদৈর্ঘ্য ৪৯০-৫৬০ মিলিমাইক্রন হলুদ বর্ণের তরঙ্গদৈর্ঘ্য ৫৯০-৬৩০ মিলিমাইক্রন লাল বর্ণের তরঙ্গদৈর্ঘ্য ৬৩০-৭৬০ মিলিমাইক্রন। যে সমস্ত বর্ণগুলির তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেশী সেগুলিকে **উষ্ণ বর্ণ** বলে গণ্য করা হয় যেমন লাল, কমলা, হলুদ প্রভৃতি। বেগুনী, নীল, সবুজ প্রভৃতি কম তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট বর্ণগুলিকে ঠান্ডা বা শীতল রং বলা হয়। রঙের এই ভৌত বৈশিষ্ট্য ব্যতিত ঠান্ডা ও উষ্ণতা বিচারে মনস্তাত্ত্বিক উপাদানও কাজ করে। যেমন লালের সঙ্গে আমরা আগুনের আনুষঙ্গে লালকে উষ্ণ ভাবি আবার নীল দেখলে আমরা ঠান্ডা জল ও রাত্রির অনুভূতি পাই। ঠিক একইভাবে হলুদ দেখলে মনে হয় রোদের মত উষ্ণ ও উজ্জ্বল। তাই **ভ্যানগখ** তার চিত্রে রোদের উষ্ণতা ও ঔজ্জ্বল্য আনার জন্য প্রচুর হলুদ রং ব্যবহার করতেন।

◆ হিউ, ভ্যালু, ক্রোমা :

Munsee কোনো বর্ণ বলতে তার তিনটি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন **হিউ** (Hue), **ভ্যালু** (Value) ও **ক্রোমা** (Chroma)। হিউ হল বর্ণনাম, যেমন লাল, হলুদ, বেগুনী প্রভৃতি। রং কতটা হাল্কা বা-গাঢ়, কতখানি আলো বিচ্ছুরণ করছে তাকে **ভ্যালু** বলে। সাদা

Scanned with CamScanner

মেশালে রঙের ভ্যালু বাড়ে ও কালো মেশালে রঙের ভ্যালু কমে। **ক্রোমা বা স্যাচুরেশন** হল রঙের তীব্রতা বা শুদ্ধতা। কোন রঙের সঙ্গে সাদা, কালো বা অন্য কোন রং মেশালে হলে রঙের স্যাচুরেশান কমে যায়। একজন চিত্রশিল্পীর ক্ষেত্রে রঙের এই গুণগুলি বোঝা অত্যন্ত আবশ্যিক। কারণ রঙের ওপর আলো পড়লে তার ভ্যালুর পরিবর্তন হয় এবং বর্ণের ক্রমাঙ্ক প্রভাবিত হয়।

● রঙের প্রতীকী ব্যবহার :

মনুষ্য সভ্যতার প্রথম লগ্ন থেকে রং সভ্যতার প্রতিটি ক্ষেত্রে তার স্থান করে নিয়েছে। সংস্কৃতিতে, ভাষায়, ধর্মে, রাজনীতিতে, অর্থনীতিতে, চিত্রের আচার আচরণে, চিহ্ন ও প্রতীকে এত বৈচিত্রময় সর্বব্যাপি, ক্ষমতাময়, সর্বগ্রাসী হয়ে ওঠে বর্ণ, যে সভ্যতা তাকে বাদ দিয়ে চলতে পারে না।

● রঙের প্রতীক :

প্রতিটি সভ্যতা তাদের সংস্কৃতিতে রংকে প্রতিনিয়ত ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ব্যবহার করেছে। সময়ের চাকা গড়িয়েছে, বদলে গেছে রঙের ব্যবহার ও অর্থ। আদিম মানুষের কাছে লাল ছিল জীবন ও রক্তের সমার্থক। তাই সে নিজ শরীর চিত্রিত করত লাল রং দিয়ে। প্রাচীনকাল থেকে রঙের ওপর আরোপিত হয়েছে বিভিন্ন প্রতীকী অর্থ। যেমন হিন্দু ধর্মে দেবদেবীকে আঁকা হয় মূলত হলুদ বা সাদা রঙে যেখানে অসুরের দৃশ্য সবুজ রং নির্দিষ্ট করা হয়েছে। ইসলামে এই সবুজ রংটিকেই আবার শুভ জ্ঞান করা হয়। ফ্রান্সে দশম শতকে অপরাধী ও দেশদ্রোহীদের চিহ্নিত করার জন্য তাদের বাড়ির দরজায় হলুদ রং লাগিয়ে দেওয়া হত। গোলাপী রংটি মেয়েলি হলে নীলরংটি পুরুষালি। সাদা পবিত্রতা ও পূর্ণতার প্রতীক হলেও হিন্দু ধর্মে বিধবারূপ শূন্যতার প্রতীকরূপী সাদা পোষাক ধারণ করে। এইভাবে সভ্যতার পরতে পরতে রং আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে থাকে।

রঙের বিভিন্ন প্রতীক :

সাদা — পবিত্রতা, শুভ্রতা, পূর্ণতা, আশা, শুভ, শান্তি
কালো — অশুভ, অজ্ঞানতা, ধ্বংস, মানসিক নঞার্থক আবেগ
লাল — কামনা, রাজকীয়ত্ব, ভালোবাসা, রক্ত, বিপ্লব, বিপদ
নীল — প্রশান্তি, শীতলতা, নিদ্রা, স্বপ্ন, রোমান্টিসিজম, মৃত্যু
সবুজ — নতুন জীবন, তারুণ্য, বিশালতা, প্রকৃতি
হলুদ — জ্ঞান, প্রজ্ঞা, আলো, তাপ, ভালোবাসা
বেগুনী — শীতলতা, হতাশা, শোক
কমলা — উষ্ণতা, আলো, উৎসাহ, প্রেম
খয়েরী — পার্থিব, ভারী, বিশ্বস্ত, স্থির
ধূসর — হতাশা, ঔদাসিন্য, বিষাদ

● চিত্রশিল্পে রং বা বর্ণ :

চিত্রশিল্পীরা শুধু বস্তুর বা আলোর চরিত্র ও গুণাগুণ হিসাবে বর্ণকে তাদের চিত্রে প্রকাশ করে না বরং তার সঙ্গে মিশে যায় বর্ণের মনস্তাত্ত্বিক ও প্রতীকী অনুষঙ্গ। প্রতিটি দেশে প্রতিটি সংস্কৃতিতে বর্ণকে বিভিন্নভাবে চিত্রশিল্পে ব্যবহার করা হয়েছে। মিশরীয় শিল্পে বর্ণ ধর্মীয় নিয়মনীতি ও প্রতীকের বন্ধনে নির্দিষ্ট। প্রতিটি বর্ণের নিজস্ব প্রতীকী অর্থ বর্তমান। মিশরীয় শিল্পে বস্তুর লোকাল রঙের পরিবর্তে যে বিশেষ নির্দিষ্ট বর্ণ প্রয়োগ করা হচ্ছে তা আমরা গথিক ও বাইজান্টাইন শিল্পেও দেখতে পাই। ভারতীয় চিত্রের বর্ণ সমতলীয় ও নিত্য। দিনের আলো ছায়ার কোন প্রভাব ভারতীয় চিত্রের বর্ণে পরিলক্ষিত হয় না। বর্ণগুলিকে অনেকটা কালার্ড ফর্ম হিসাবেই দেখা হয় যেভাবে আমরা **মতিসের** চিত্রে দেখি। রেঁনেসা থেকে আধুনিক চিত্রকলা পর্যন্ত বর্ণকে বস্তুর একটি গুণ বলেই ধরা হয়েছে। রেঁনেসা শিল্পীরা লক্ষ্য করেছিলেন বর্ণের বস্তুর ওপর আলো পড়লে বস্তুর উত্তল অংশটি ফ্যাকাশে আলোকময় ও অবতল অংশটিকে গাঢ় লাগে। বর্ণের সঙ্গে সাদা ও কালো রং মিশিয়ে রঙের ভ্যালু পরিবর্তন করে বস্তুর উত্তলতা অবতলতার আভাস তৈরি করে বস্তুর ত্রিমাত্রিকতা নির্মাণ করতেন। আলো ও ছায়ার পাশাপাশি উপস্থাপন যাতে কাটা কাটা না লাগে তার জন্য লিওনার্দো **স্ফুমাতো** ব্যবহার করেছিলেন। ব্যারোক শিল্পীরা রঙের ও আলোর বৈপরীত্যকে কাজে লাগান। গঁগ্যার বর্ণ ছিল সাবজেক্টিভ। তাঁর বন্ধু ভ্যানগফের ছবি রং ছিল অস্থির।

● রঙের উৎস অনুযায়ী শ্রেণিবিভাগ :

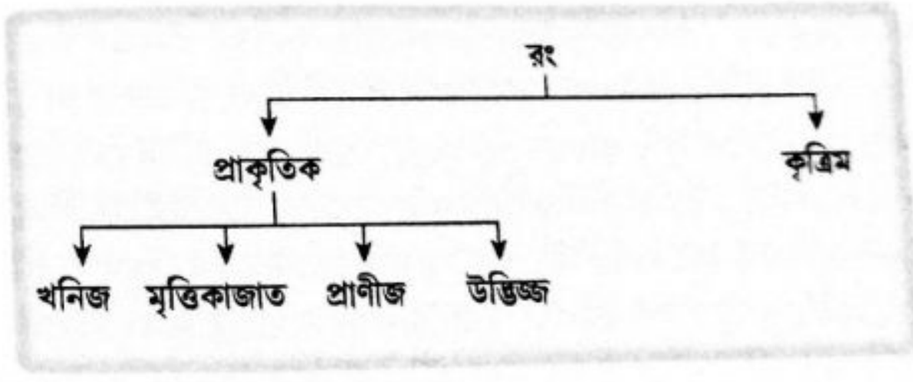

রঞ্জক পদার্থ (colour pigment) তার উৎস অনুযায়ী চারভাগে ভাগ করা হয়। (১) খনিজ, (২) মৃত্তিকাজাত, (৩) প্রাণীজাত (৪) উদ্ভিদজাত।

◆ প্রাকৃতিক রঞ্জক :

(১) খনিজ পাথর থেকে প্রাপ্ত রঙের মধ্যে উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হল **টেরাভার্ট** পাথর থেকে পাওয়া সবুজ রং ও **ল্যাপিস লাজুলি** থেকে প্রাপ্ত নীল রং। খনিজ ধাতু সোনা ও রুপা দিয়ে যথাক্রমে সোনালি ও রুপালি রং পাওয়া যায়। তামার কুচির

Scanned with CamScanner

সঙ্গে বিক্রিয়া ঘটিয়ে সবুজ রং পাওয়া যায়। এইভাবে লোহার গুঁড়ো হতে কালো রং নিষ্কাষণ করা হয়।

(২) মৃত্তিকাজাত রংগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল এলামাটি জাত হলুদ, গেরিমাটি জাত লাল।

(৩) লাক্ষা হতে অলক্ত ও ঝিনুক পুড়িয়ে সাদা রং পাওয়া যায়। এগুলি প্রাণীজাত রঙের এলাকাভুক্ত।

(৪) উদ্ভিদ হতে প্রাপ্ত রঙের সংখ্যা অনেক। তার মধ্যে নীলগাছ হতে প্রাপ্ত নীল রংটি সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য।

এছাড়া কুসুম ফুল হতে হলুদ, কুমকুম হতে লাল, সীম পাতা থেকে সবুজ, শিউলি হতে কমলা রং পাওয়া যায়। নন্দলাল বসু লিখিত শিল্পচর্চা বইখানিতে প্রাকৃতিক রংগুলিকে কিভাবে বানাতে হয় তার বিস্তারিত বিবরণ আছে। এখনও পশ্চিম বাংলার ঐতিহ্যবাহী পটুয়ারা মৃত্তিকজাত ও উদ্ভিদজাত রং দিয়েই ছবি আঁকেন।

◆ কৃত্রিম রঞ্জক :

১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে ইংল্যান্ডের বিখ্যাত রসায়নবিদ **উইলিয়াম হেনরী পার্কিন** কৃত্রিম কুইনাইন আবিষ্কার করতে গিয়ে কৃত্রিম বেগুনীরং আবিষ্কার করেন যার নাম দিয়েছিলেন **অ্যানিলিন মভ**। এরপর ক্রমে ক্রমে রসায়নাগারে নানারকম কৃত্রিম রঞ্জক তৈরি হতে থাকে। ১৮৫৯ সালে ভারগুইন এই অ্যানিলিন হতেই ম্যাজেন্টা রং তৈরি করেন কৃত্রিম রঞ্জক পদার্থের ইতিহাস ১৮৬০ থেকে ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দে বিশেষভাবে স্মরণীয়। এইসময় রসায়নবিদদের প্রচেষ্টায় নানাবিধ কৃত্রিমরং আবিষ্কার হয়। **বিজ্ঞানী গিয়ার্ড ও দ্য লেয়ার** প্রথম কৃত্রিম নীল রং ইফম্যান ভায়োলেট প্রস্তুতি করলেন। এই সময় নাগাদই লক্ষ কৃত্রিম বেগুনীরং মিথাইল ভায়োলেট, লাইটফুট, কৃত্রিম মূল্যবান চেরপিন কৃত্রিম সবুজ রং অ্যালডিহাইড গ্রীন, আবিষ্কার করেন। এই সময়ে আবিষ্কৃত অন্যান্য উল্লেখযোগ্য কৃত্রিম রংগুলি হল **বিসমাক ব্রাউন** নামক বাদামী রং, **মার্টিরাস ইয়েলো** নামক পীত রং, পেলটিন অরেঞ্জ নামক কমলা রং এবং **ম্যাগভালা রেড** নামক লালা রং উল্লেখযোগ্য। কৃত্রিম রঙের আবিষ্কার চিত্রজগতে যুগান্তের সৃষ্টি করে। বৈচিত্রময় রঙের আবির্ভাব ঘটে। যার ফলে শিল্পীদের কালার প্যালেট পরিবর্তন ঘটে। কৃত্রিম রঞ্জক হতে প্রস্তুত ওয়েল পেন্ট টিউবে করে থকথকে পেস্টের মত পাওয়া যেতে লাগল যার ফলে তৈলচিত্রীদের করনকৌশলও গেল বদলে। পূর্বেকার পাতলা করে ঘসে ঘসে রং লাগানোর বদলে মোটা করে রং লাগানো সম্ভব হয়ে উঠল। কৃত্রিম রঞ্জকগুলি এভাবে ঘন পেষ্টের মত টিউবে ভর্তি হয়ে বাজারজাত হলে হমপ্রেশনিষ্ট শিল্পীরা আলাপ্রাইমা পদ্ধতিতে ছবি আঁকতে পারতেন না। কৃত্রিম রঞ্জকের দুনিয়ায় নবতম সংযোজন হল **অ্যাক্রেলিক** পেন্ট যা বর্তমান চিত্রশিল্পীদের কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয়তা লাভ করেছে।

● **রংগুলির বর্তমান নাম :**

লাল : স্কারলেট, ক্রিমসন, ভারমিলিয়ন, পোস্টার রেড,
নীল : কোবাল্ট ব্লু, প্রুশিয়ান ব্লু, আল্টামেরিন ব্লু, টার্কিশ ব্লু।
সবুজ : স্যাপ গ্রিন, ভিরিডিয়াম গ্রিন।
হলুদ : ক্রোম ইয়োলো, লেমন ইয়েলো, ইয়েলো অকার।
খয়েরি : বার্ণ সিয়েনা, বার্ণ সাম্বার, র আম্বার
বেগুনি : কোবাল্ট ভায়োলেট, ম্যাঙ্গানিজ ভায়োলেট।

◆ **রং চরিত্রের বিভিন্নতা নিয়ে যেমন, জলরং, তৈলরং, টেম্পারা, অ্যাক্রেলিক, প্যাস্টেল প্রভৃতি সম্পর্কে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব।**

★ (ক) জলরং :

জলরং বা aquarelle অষ্টাদশ শতকের শেষভাগ হতে ক্রমশ চিত্রমাধ্যম হিসেবে জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। এর আগে পর্যন্ত শিল্পীরা কেবল খসড়া বা স্কেচ করার জন্য জলরং মাধ্যমকে ব্যবহার করতেন। স্বতন্ত্র শিল্প মাধ্যম হিসেবে জলরং মর্যাদা লাভ করে অনেক পরে।

সাধারণতঃ চরিত্রের উপর নির্ভর করে জলরংকে দু-ভাগে ভাগ করা যায়। (১) Tansparent বা **স্বচ্ছ জলরং** এবং (২) **গুয়াশ বা অনচ্ছ জলরং**। জলরং করার জন্য টিউব বা কেক হিসেবে যে রংগুলি পাওয়া যায় তার কতগুলি স্বচ্ছ এবং কতকগুলি অনচ্ছ। কোনো রংটি স্বচ্ছ ও কোনো রংটি অনচ্ছ (opaque) তা বোঝার একটি সহজ উপায় আছে। কোনো সাদা কাগজের উপর পেন্সিলের দাগ টেনে তার ওপর রঙের পোঁচ দিলে যদি পেন্সিলের দাগ ঢাকা পড়ে যায় তাহলে সেই রংগুলিকে **অনচ্ছ** বা opaque রং বলা হয় এবং পেন্সিলের রং যদি দেখা যায় তাহলে তাকে **স্বচ্ছ** বা transparent রং বলা হয়। স্বচ্ছ জলরংগুলি হল— প্রুসিয়ান ব্লু, ইনডিগো, ক্রোম ইয়েলো, মঙ, র'সায়ানা, কারমাইন, অ্যালিজারিন, ক্রিমসন, বার্ণ সায়না প্রভৃতি এবং **অনচ্ছ** রংগুলি হল— ইয়োলো অকার, ইন্ডিয়ান রেড, লাইট রেড, র'আম্বার, ক্রোম গ্রীন, টেরাভাট, টার্কিস ব্লু, হোয়াইট প্রভৃতি।

❖ অস্বচ্ছ জলরং :

মাধ্যমগতভাবে শিল্পীরা যখন অনচ্ছ জলরং ব্যবহার করেন তখন তাকে গুয়াশ বলে। গুয়াশকে বডি কালারও বলা হয়। গুয়াশ শব্দটি মূলত ফরাসী শব্দ যার ইটালিয় প্রতিশব্দ 'a guazzo', যার আক্ষরিক অর্থ কর্দমাক্ত পুকুর।

● **প্রকরণ** : স্বচ্ছ জলরঙের সঙ্গে সাদা মিশিয়েও তাকে অনচ্ছ করে তোলা যায়। অনেক শিল্পী গুয়াশের রঙের সঙ্গে সাদা মেশানো আবশ্যিক মনে করেন। গুয়াশের রং

Scanned with CamScanner

চরিত্রগতভাবে ভারী হয় ও এটির বাড়তি বডি থাকে যার ফলে এইধরনের রংগুলির ব্যাপ্তি (coverage) অনেক বেশি। গুয়াশের সুবিধা হল এটিকে সহজে চালনা করা যায় এবং তেল রঙের মতো এর সংশোধনী ক্ষমতাও (Corrective power) স্বচ্ছ জলরং-এর থেকে অনেক বেশি। অনেক শিল্পী গুয়াশকে তেল রঙের মতো করে তুলিতে বেশি রং নিয়ে মোটা করে রং চাপান। এই ধরনের কাজ করার সময় ভারী কাগজ বা বোর্ড ব্যবহার করাই শ্রেয়। স্বচ্ছ জলরঙ্গে যেমন highlight রাখার জন্য কাগজের সাদা ছেড়ে দেওয়া হয়। এখানে সরাসরি সাদা রং দিয়ে বা নির্দিষ্ট রঙে সাদা মিশিয়ে highlight দেওয়া যায়। কারণ কৌশলগতভাবে স্বচ্ছ জলরং-এর প্রকরণ ও গুয়াশের প্রকরণ একদম ভিন্ন।

● **উপকরণ :** গুয়াশের রং বর্তমানে বাজারে টিউবে পাওয়া যায়। বর্তমানে কিছু রং নির্মাতা রঙের গুড়োর সঙ্গে স্টার্চ ও অ্যাক্রেলিক পলিমার ইমালশান মিশিয়ে গুয়াশ রং তৈরি করছেন যা আরও নমনীয়। অনেকে পোস্টার কালারে সাদা মিশিয়েও তাকে গুয়াশে পরিণত করে। সাধারণতঃ স্বচ্ছ জলরঙের চেয়ে সামান্য মোটা দানার রঞ্জক, রঙের বাঁধুনি অ্যারোবিক গাম, চক, বেরিয়াম সালফেট মিশিয়ে গুয়াশ রং তৈরি হয়। রঙের বাঁধুনি হিসেবে গাম স্বচ্ছ জলরঙের থেকে গুয়াশে বেশি পরিমাণে ব্যবহার করতে হয়। সাধারণতঃ কোনো বড়ো চিত্রের খসড়া হিসেবে বা ফলিতকলায় গুয়াশ পদ্ধতি ব্যাপক পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। স্বচ্ছ জলরঙে যে তুলি ব্যবহার করা হয় গুয়াশেও একই তুলি ব্যবহার করা হয়।

◆ স্বচ্ছ জলরং :

উচ্চমানে মিহি রঞ্জকের দানার সঙ্গে অ্যারাবিক গাম বাঁধুনি হিসেবে মিশিয়ে জলরং তৈরি হয়। সাধারণত এই ধরনের রং জল মিশিয়ে তরলীকৃত করা হয় বলে একে aquarelle বা watercolour বলা হয় থাকে। বর্তমানে জলরঙের সাপোর্ট হিসেবে কাগজকে ব্যবহার করা হয়। জলরং প্রাচীন মিশরীয়দের কাছেও পরিচিত ছিল এবং মধ্যযুগীয় পুথি অলংকারিকরা ছাগল বা ভেঁড়ার চামড়ার ওপর এই মাধ্যমে ছবি আঁকতেন। বিভিন্ন সময়ে জলরঙের **বাঁধুনি** হিসেবে বিভিন্ন মাধ্যমে ব্যবহৃত হলেও অ্যাকেসিয়া গাছ থেকে প্রাপ্ত অ্যারাবিক গামই সর্বশ্রেষ্ঠ। **ডুরার** (১৪৭১-১৫২৮) এই জলরং মাধ্যমে গাছপালা, জীবজন্তুর বহু স্টাডিমূলক চিত্র অঙ্কন করেছিলেন। হাতির দাঁতের উপর মিনিয়েচারিষ্টরা জলরং ছবি অঙ্কন করেছেন। কিন্তু তার পরের দুই শতকে শিল্পীরা জলরং অপেক্ষা তেলরংকেই বেশি পছন্দ করতেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে ও উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে **J.R.Cozens, J.S. Cotman, J.M.W Turner** প্রভৃতি ব্রিটিশ শিল্পীরা জলরংকে স্বতন্ত্র চিত্র অঙ্কনের মাধ্যম হিসেবে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন। তারা প্রকৃতির আলোছায়া, নিয়ত পরিবর্তনীয় আবহাওয়ার প্রভাবকে

ধরার জন্য জলরংকেই তাঁরা বেছে নিয়েছিলেন। জলরং চিত্রমাধ্যমে হিসেবে কিন্তু মূল ইউরোপীয় শিল্পজগতে গৃহীত হয়নি। মনে করা হত কেবল খসড়া করা ছাড়া জলরং মাধ্যমে আর কোনো ভূমিকা নেই। রোমান্টিক নিসর্গ শিল্পী বিশেষতঃ **টার্নারের** হাতে জলরং স্বতন্ত্র মাধ্যম হিসেবে প্রতিষ্ঠা পায়। ১৮৯২ সালে জলরং চিত্রমাধ্যম হিসেবে স্বীকৃতি পায়।

● **উপকরণ :** ১৯ শতকে বাজারে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে রেডিমেডভাবে জলরং কেক হিসেবে পাওয়া যেত। ১৭৮০ সালে ইউলিয়াম রিভস্ (William Reeves) জলরঙের শুকনো কেক আবিষ্কার করেন। এগুলি চিনামাটির প্যালেটে জল দিয়ে ঘসে ঘসে রং তৈরি করা হত। কিন্তু এই জলরঙের কেকের প্রধান অসুবিধা ছিল যে এগুলি খুব তাড়াতাড়ি শুকিয়ে ঝুরঝুরে হয়ে যেত। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগ থেকে এই জলরঙের কেকে বাঁধুনির সঙ্গে গ্লিসারিন মেশানো শুরু হল। গ্লিসারিন hygroscopic হওয়ার জন্য এর দ্রুত শুকিয়ে যাওয়াজনিত অসুবিধা দূরীভূতই হয়। ১৮৪৬ সালে ধাতুর খোলে অর্ধতরল অবস্থায় রেডিমেড জলরং বাজারে আসে। এর নির্মাতা ছিল **Winsor & Newton** কোম্পানি।

● **জলরঙের তুলি হিসেবে সাধারণ স্যাবেল :** রাউন্ড সাধারণত ডিটেলকাজ করার জন্য ব্যবহৃত হয়। সরু, লম্বা রিগার একদম সরু, ছোট্ট কাজ করার জন্য ব্যবহৃত হয়। ওয়াটার কালারের জন্য সাধারণত **সাইবেরিয়ান সিল্ক** নামক পশু হতে প্রাপ্ত লোম দ্বারা প্রস্তুত তুলি ব্যবহার হয়ে থাকে। জলরঙের ব্রাশের ব্যবহার ও আকার অনুযায়ী তিনভাগে

Scanned with CamScanner

করা হয় (1) **স্যাবেল** (2) **ফ্ল্যাট** ও (3) **রিগার**। জলরং মূলত স্যাবেল ব্রাশ দিয়ে সম্পন্ন করা হয়। জলরঙের বড়ো অংশ ভরাট করা হয় ফ্ল্যাট ব্রাশ নিয়ে। শার্প ডিটেল করার জন্য রিগার ব্রাশ ব্যবহার করা হয়।

◆ **প্রকরণ ও অঙ্কন পদ্ধতি :**

- সাধারণতঃ নিলেন নিয়ে তৈরি একদম ব্লিটিং হীন হ্যান্ডমেড কাগজকে জলরঙের উপযুক্ত বলে মনে করা হয়। কাগজের যে দিকে জলছাপ (watermark) থাকে সেই দিকেই জলরং করা উচিত।
- জলরঙে কাজ করার জন্য মোটা ধরনের কাগজই ব্যবহার করা উচিত যাতে তা বেঁকে জলে ফুলে না যায়। সাধারণতঃ প্রতি রিমের ওজন ২৫০ থেকে ৪০০ পাউন্ড হয় সেই কাগজে জলরঙের কাজ ভালো হয়।
- এই কাগজ যাতে আঁকার সময় কুঁচকে না যায় তাই আঁকার আগেই কাগজকে একটা শক্ত বোর্ডে স্ট্রেচ করে গামটেপ দিয়ে আটকে নিতে হয়।
- সাধারণতঃ স্যাঁতস্যাঁতে ভেজা কাগজে জলরঙে কাজ করা হয়।
- জলরঙে ছবি আঁকতে গেলে সাধারণতঃ স্বচ্ছ রংগুলি ব্যবহার করা হয়।
- এই স্বচ্ছ রংগুলির বৈশিষ্ট্য হল এগুলির পেচের মধ্য দিয়ে ভেতরের রং ফুটে ওঠে। শিল্পীরা সাধারণতঃ স্বচ্ছ জলরঙের এই বৈশিষ্ট্যকেই ব্যবহার করেন।

- তাঁরা রঙের সঙ্গে জল মিশিয়ে রঙের ঘনত্বকে কমিয়ে বাড়িয়ে রঙের টোন তৈরি করেন।
- কখনো শিল্পীরা স্তরে স্তরে রং লাগিয়ে রঙের স্বচ্ছতাকে কাজে লাগিয়ে ছবি নির্মাণ করেন, কখনো একেবারেই রং লাগিয়ে দ্রুত ছবিটিকে শেষ করেন।
- সাধারণতঃ শিল্পীরা জলরং নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়ে ব্যক্তিগত শৈলী গড়ে তোলেন, যেমন টার্নার কখনো বিশেষ একটা নির্দিষ্ট কৌশলের অনুসরণ করতেন না - ছবির প্রয়োজনে রং লাগাতেন, তুলে ফেলতেন, পুনরায় রং লাগাতেন, ঘসে দিতেন, সাদা দিতেন বা হাইলাইট বার করার জন্য সেই অংশের রং তুলে দিতেন। অর্থাৎ ছবির প্রয়োজন মেটানোর জন্য যা প্রয়োজন তাই করতেন, রীতির তোয়াক্কা করতেন না।
- স্বচ্ছ জলরঙে সাধারণতঃ সাদা ব্যবহার করা হয় না। হাইলাইট দেওয়ার জন্য কাগজের সাদাকেই ছেড়ে দেওয়া হয়।
- তেলরঙে যেমন গাঢ় থেকে হাল্কা টোনে যাওয়া হয় তেমনই জলরঙে ঠিক তার বিপরীতভাবে হাল্কা থেকে গাঢ় রঙে যেতে হয়। বর্তমানে শিল্পীদের অন্যতম জনপ্রিয় মাধ্যম হল জলরং।

◆ **জল রঙের সুবিধা :**

- ছবির মধ্যে স্বতন্ত্র নান্দনিক আবেদন জলরঙের মাধ্যমে তৈরি করা যায়, যা অন্য কোনো মাধ্যমে যায় না।
- সহজ সরল ব্যবহারিক পদ্ধতির জন্য সকলে সহজে করতে পারে। শিল্পীদের, শিশুদের সকলের কাছে খুবই জনপ্রিয়।
- তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যায় বলে স্বল্প সময় ছবিটি সম্পূর্ণ করা যায়। তাই—Outdoor Study-এর ক্ষেত্রে জল রং উপযুক্ত।
- অন্যান্য মাধ্যমের তুলনায় জলরঙে খরচ অপেক্ষাকৃত কম। তাই সমস্ত শিক্ষার্থীরা এর ব্যবহার করতে পারে।

★ (খ) তৈলচিত্রের বিবর্তন :

ebook.dascoaching.in

১৫ শতকের পূর্ব পর্যন্ত ইউরোপে এগ টেম্পারাই চিত্রের প্রধানতম মাধ্যম ছিল। **ভাসারীর** মতে চিত্র জগতের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য উদ্ভাবন হল তেলরং মাধ্যমে চিত্রাঙ্কন। তাঁর মতে তৈলচিত্র মাধ্যমের উদ্ভাবক হলেন নেদারল্যান্ডীয় শিল্পী **জ্যান ভ্যান আইক্** (১৩৯০-১৪৪৯)। কিন্তু বর্তমান পন্ডিতেরা মনে করেন তৈল মাধ্যম এর আগেও ছিল, তবে অনেক প্রাথমিক ও অনুন্নত অবস্থায় যা জ্যান ভ্যান আইক্ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে পরিমার্জিত পরিশীলিত ও উন্নত করে তোলে। তেলরং মাধ্যমের বিশেষত্ব হল এখানে রঙের দানার সঙ্গে বিশেষ ধরনের ড্রাই অয়েল মেশানো হয়। অন্যান্য তেল বাইরের আবহাওয়ায় রেখে

Scanned with CamScanner

দিলে শুকিয়ে যায় না কিন্তু ড্রাই অয়েল ধীরে ধীরে শুকিয়ে যায়। **লিসিড ও পপির** তেল - এই ধরনের ড্রাই অয়েল, যা তৈলচিত্র অঙ্কনের জন্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। জ্যান ভ্যান আইক্ সম্ভবত ড্রাই অয়েলের চরিত্র ও সম্ভাবনাকে পূর্ণমাত্রায় বুঝতে পেরে তাঁর তেল রঙে প্রয়োগ করেছিলেন যে কারণে তাঁকে তেল রঙের জনকের মর্যাদা দান করা হয়। তবে অনেক ঐতিহাসিকের মতে জ্যান ভ্যান আইক যে মাধ্যমে কাজ করেছিলেন তা প্রকৃত তৈলচিত্র নয় বরং অয়েল টেম্পারারই একটি ধরণ যা তেলরঙের কাছাকাছি। এই সময় রংকে তরল করার উপাদান হিসেবে তার্পিন তেলকে ব্যবহার করা হত। টেম্পারা থেকে তৈলচিত্র প্রমশঃ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে কারণ টেম্পারা দ্রুত শুকিয়ে যাওয়ার কারণে পরস্পর টোনগুলি মেশানো কষ্টসাধ্য ছিল। তার বদলে হাল্কা থেকে গাঢ় হ্যাচিং লাইন দিয়ে শেডিং দেওয়া হত। কিন্তু তেলরঙে এই অসুবিধা ছিল না। শিল্পী ইচ্ছামত tonal variation তৈরি করতে পারতেন, পরপর রং মেশাতে পারতেন ও সময় নিয়ে অনুপুঙ্খের কাজ করতে পারতেন। এইসব গুণগুলির জন্য তেলরং ক্রমশঃ টেম্পারা থেকে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে, যদিও ১৫ শতকে টেম্পেরা ও তেলরং দুটোই চালু ছিল। এমন বেশ কিছু ছবি পাওয়া গেছে যেখানে প্রাথমিক অঙ্কন টেম্পারাতে করে পরের কাজগুলি তেলরঙে বা এগ অয়েল ইমালসনে করা হয়েছে। **ড্যুরার বা হলবেইন** এই পদ্ধতিতেই অঙ্কন করতেন। পিয়ারে দেলা ফ্রাসেস্কো বা মাইকেলাঞ্জেলোর অসম্পূর্ণ ছবি দেখলে বোধ হয় তাঁরাও এই মিশ্র মাধ্যমেই কাজ করতেন। তবে লিওনার্দো পূর্ণভাবে তেলরঙের সমস্ত সম্ভাবনাকে ব্যবহার করেছিলেন। Chiaroscuro এবং stumato-র লিওনার্দোর চিত্রের বিশেষ ঐশ্বর্য্য।

ষষ্ঠদশ শতকের ভেনেসিয়ান শিল্পী তিশিয়ান সরাসরি ক্যানভাসে খসড়া ছাড়াই ছবি আঁকতেন। প্রয়োজন হলে তা আঁকতে আঁকতেই সংশোধন করে নিতেন। তিনি সেই সময় উপলব্ধ সমস্ত রকম রংই ব্যবহার করতেন। এমনকি আফগানিস্থান থেকে আমদানী করা মহার্ঘ **ল্যাপিস ল্যাজুলী** থেকে নিষ্কাশিত নীলরংও যথেচ্ছাচারে ব্যবহার করেছেন।

এই সময় শিল্পীরা অত্যন্ত পাতলা করে রং চাপাতেন। একটির সঙ্গে অন্যটি মেশানোর বদলে স্তরে স্তরে রং চাপিয়ে tone গড়ে তুললেন। যার জন্য রঙের দ্যুতি ও স্বচ্ছতা ছিল অনেক বেশি। একে impremature বলা হত। সেই সময়কার বিখ্যাত শিল্পীদের অসম্পূর্ণ তৈলচিত্র অনুধাবন করলেই তৎকালীন কর্ম পদ্ধতিটি বোঝা যায়। তিসিয়ান সাদা জেসো গ্রাউন্ডের ওপর কাজ করলেও তিনতোরেত্তো কিন্তু সাদা জেসোর ওপর গাঢ় বাদামী বা কালো রঙে প্রাইমিং করে নিতেন। হাফটোন বা গাঢ় ছায়াচ্ছন্ন অংশগুলিতে এই গাঢ় রঙের গ্রাউন্ড দেখা যেত। ৯৬ শতকের শেষের দিক থেকে সাদা গ্রাউন্ডের বদলে গাঢ় রঙের গ্রাউন্ড তৈরি করে ছবি আঁকা বহুল প্রচলিত হয়ে ওঠে। এর ফলে শিল্পীদের আঁকার ধরণ গেল বদলে। তাঁরা প্রচলিত পদ্ধতিতে হাল্কা থেকে গাঢ় রঙে যাওয়ার বদলে গাঢ় থেকে হাল্কা রঙে অঙ্কনের প্রথা শুরু করলেন। এর ফলে tone-এর বৈচিত্র বাড়ল এবং স্তরে স্তরে স্কাম্বলিং ও গ্লেজিং-এর মাধ্যমে রং লাগানোর ফলে রঙের অনচ্ছতা ও স্বচ্ছতার গুণাগুণও বৃদ্ধি পেল। রেমব্রান্ট এইভাবে গাঢ় রঙের imprimature-র ওপর ছবি আঁকতেন। তবে যেখানে light-এর প্রয়োজন সেখানে সাদা রাখতেন। যাতে highlight বার করা যায়। ভেলাসকেথও রেমব্রান্টের মতো গাঢ় প্রাইমিং ব্যবহার করতেন।

❖ আলাপ্রাইমা :

নিওক্লাসিকাল যুগ পর্যন্ত শিল্পীরা imprimature পদ্ধতিতে semiabsorbent ক্যানভাসের ওপর পাতলা পাতলা glazing করে রং চাপিয়ে তৈল মাধ্যমে ছবি আঁকতেন যদিও বিভিন্ন শিল্পীরা তাঁদের কাজে প্রয়োগ করেছিলেন রোমান্টিজিমের সময় থেকেই তেলরং লাগানোর গেল বদলে। টার্নার বা কনস্টেবলের কাজ ছিল অনেক বেশি পরীক্ষামূলক, অপ্রথাগত। ইম্প্রেশানিস্টদের সময় থেকে imprimatura-র বদলে **ala prima** পদ্ধতি জনপ্রিয় হয়ে উঠতে থাকে। এই পদ্ধতিতে পরতে পরতে পাতলা করে রং লাগানোর বদলে non absorbent ক্যানভাসের ওপর একেবারে গভীর অন্ধকার থেকে ঝকঝকে আলো পর্যন্ত কাজ একসঙ্গে করে ফেলতে হয়। এটি মূলতঃ wet on wet technique। এই পদ্ধতিতে করা কাজ পূর্ব পদ্ধতি অপেক্ষা একদমই ভিন্ন। এই পদ্ধতিতে করা কাজ, সরল ও হৃদয়গ্রাহী হলেও এই পদ্ধতিতে শিল্পীকে তুলি চালনায় যথেষ্ট দক্ষ হতে হয়, তার সঙ্গে জানতে হয় প্রতিটি রঙের গুণাগুণ - না হলেই ছবি নোংরা ও কাদাকাদা হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা বাড়ে। Impressionist-দের আগেও আলা-প্রাইমা পদ্ধতিতে শিল্পীরা কাজ করেছেন, যেমন ডাচ

Scanned with CamScanner

শিল্পী 'হলস্'। ইম্প্রেশানিস্টরা শুধু আলা-প্রাইমা পদ্ধতিতে কাজ করলেন তা নয়, ইম্প্রে
কাজে দেখা গেল ইমপ্যাস্টো। তুলিতে সরাসরি মোটামোটা রং নিয়ে চাপানো
পোস্ট-ইম্প্রেশানিস্ট ভ্যানগঘ তো তুলিতে এত বেশি রং নিতেন যে প্রতিটি তুলির স্ট্রো
এক একটি texture তৈরি করত।

উনবিংশ শতাব্দির শেষার্ধ হতে রঙের ভৌত গুণাবলিগুলি নিয়ে বৈজ্ঞানিক
পরীক্ষানিরীক্ষা আরম্ভ করেন। এই পরীক্ষাজাত তত্ত্বকে কাজে লাগান শিল্পীরা, যেমন স্যু
স্যুরা পাশাপাশি দুটি রঙের ফোঁটাকে এমনভাবে বসাতেন যাতে তা দর্শক হিসেবে ব্যব
করেছেন। এই ধরনের শিল্পীরা হলেন মুঙ্ক, ভ্যানগঘ, গগ্যাঁ, জার্মান এক্সপ্রেশনিস্ট
পরবর্তীকালে দ্য কুনিং ও গোর্কি। এদের রঙের ব্যবহার হত দ্রুত, স্বতঃস্ফূর্ত ও অপ্রথাগ
পিকাসো এবং ব্র্যাক আবার তেল রঙের সঙ্গে যুক্ত করলেন অন্য অপ্রচলিত মাধ্য
পিকাসো তাঁর Still Life with chair caning ছবিটিতে বেতের বুনোট ছাপা oil cloth-এ
ওপর কিছু অংশে তেলরঙে এঁকে তার উপর লিখলেন Jou। এইভাবে ব্রাকও বেশ কি
কাজ করেছিলেন।

বর্তমানে শিল্পীরা অন্যান্য সমস্ত মাধ্যমের মত তৈলমাধ্যম নিয়েও ক্রমাগত পরীক্ষানিরী
চালিয়ে যাচ্ছেন ও কখনো একদম নিজস্ব শৈলী গড়ে তুলছেন।

★ তেলরং অঙ্কনের প্রক্রিয়া ও উপকরণ :

◆ **উপকরণ :** তৈলচিত্র অঙ্কনের উপকরণ হল ক্যানভাস, লিনসিড অয়েল, কাঠের প্যালেট, তার্পিন, হগ হেয়ার ব্রাশ ও রং। তৈলচিত্র অঙ্কনের রঙের বৈশিষ্ট্য হল কালার পিগমেন্টের সঙ্গে বাইন্ডার হিসেবে ড্রাইঅয়েল মেশানো হয়। তৈলচিত্রে ব্যবহৃত ড্রাই ওয়েলগুলি হল লিনসিড, পপিসিড, ওয়ালনাট ও স্যাফাওয়ার।

◆ **ক্যানভাস প্রস্তুতকরণ :** সাধারণত তৈলচিত্র অঙ্কনের জন্য সর্বাপেক্ষা আদর্শ মাধ্য
হল ক্যানভাস। তৈলচিত্রের জন্য ঘন বুনোটের ভারী ক্যানভাস নেওয়াই শ্রেয়। ক্যানভাস
ফ্রেমের থেকে চারদিকে দুই ইঞ্চি বড়ো করে কাটতে হবে। সাধারণত উচ্চমানের সিজন ক
পাইন কাঠ দিয়ে ফ্রেম বানানো হয়। নিম্নমানের কাঠ হলে ফ্রেম বেঁকে যেতে পারে। ফ্রেমে
ওপর ক্যানভাসটিকে টানটান করে আটকে নিতে হয়। সাধারণত কোরা ক্যানভাস
লাগানোর উপযুক্ত নয়। সাইজিং ও প্রাইমিং এর মাধ্যমে ক্যানভাসকে অঙ্কনের উপযু
করে তোলা হয়। প্রথমে ক্যানভাসের ওপর জিলেটিন ও র‍্যাবিট স্কিন গ্লু সাইজ হিসেবে এ
পরত লাগাতে হয়। বর্তমানে শিল্পীরা সাইজ এর বদলে ফেভিকলের আঠা ব্যবহার করে
এরপর তিনস্তরে প্রাইমার লাগানো হয়। প্রতিবার প্রথম লেয়ারটি শোকানোর পর দ্বিতী

লেয়ারটি লাগানো উচিত। পূর্বে প্রাইমার হিসেবে জেসো ব্যবহার করা হত, বর্তমানে অ্যাক্রেলিক প্রাইমার লাগানো হয়।

◆ **অঙ্কন প্রক্রিয়া :**

- প্রথমে ক্যানভাসকে ইজেলের ওপর বসাতে হবে। দাঁড়িয়ে আঁকতে গেলে ইজেলের ওপর বসানোই শ্রেয়।
- এরপর চারকোল বা গ্রাফাইট পেন্সিলে ক্যানভাসের ওপর প্রাথমিক বহিরেখাটি এঁকে নিতে হবে।
- আঁকার পর আস্তে আস্তে স্তরে স্তরে রং লাগাতে হয়।
- তৈলরং ঘন হয় বলে তা লিনসীড তেল বা তার্পিন দিয়ে তরল করতে হয়।
- তেলরং ধীরে ধীরে শোকায় বলে শিল্পীরা টোনাল ভ্যারিয়েশান তৈরি করার সময় পান।
- রং মোটা করে লাগালে তার ওপর রং লাগাতে গেলে সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত, না হলে রং কাদা কাদা হয়ে যায়।
- জলরঙে যেমন আলো থেকে ছায়ায় রং চাপানো হয় তেমন তেলরং ছায়া থেকে আলোয় রং চাপানো হয়।
- অনেক শিল্পীরা স্তরে স্তরে রং না চাপিয়ে আলাপ্রাইমাতে সরাসরি রং চাপাতেও পছন্দ করেন।
- রং পুরোপুরিভাবে শুকিয়ে যাওয়ার পর ছবির ওপর ভার্নিশ লাগানো হয়।

◆ **তৈলচিত্রের সুবিধা ও অসুবিধা :**

- তৈলচিত্র অন্যান্য মাধ্যম অপেক্ষা অনেক দীর্ঘস্থায়ী
- এই মাধ্যমে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম টোনাল ভ্যারিয়েশান আনা যায় বলে চূড়ান্ত রিয়েলিস্টিক ছবি আঁকা যায়।
- তৈলচিত্রের উপকরণগুলি দামী ও ব্যয়সাধ্য বলে তা অনেক সময় অসুবিধাজনক হয়ে ওঠে।
- ভারতীয় আবহাওয়ায় তৈলচিত্র ফাঙ্গাস পড়ে নষ্ট হয়ে যায়।
- শোকাতে দেরি হওয়ার জন্য দ্রুত তৈলচিত্র অঙ্কন করা যায় না।

★ (গ) টেম্পারা (Tempera) :

'Temper' শব্দটি ধাতুবিদ্যা শাস্ত্রে (metallurgy) বহু প্রচলিত শব্দ, যার অর্থ কোনো লৌহখণ্ডকে প্রয়োজন অনুসারে শক্ত বা নমনীয় করা, তার গুণাগুণগুলিকে পরিবর্তন করা, কোনো বিশেষ গুণে বৃদ্ধি ঘটানো বা কমানো। অর্থাৎ যে-কোনো জিনিষকে প্রয়োজনবোধে

Scanned with CamScanner

ইচ্ছানুযায়ী অবস্থায় আনা, পরিমিত করা বা হওয়াকে **টেম্পার করা** বোঝায়। চিত্রকলায় শুকনো রঙের গুড়োকে যথার্থ মাধ্যমের দ্বারা নমনীয় ও ব্যবহারিক গুণ সম্পন্ন করে তোলা এবং জমিতে স্থায়ীভাবে সেটে থাকার ক্ষমতাকে বাড়িয়ে তোলা অর্থাৎ এখানেও রঙের দানার বৈশিষ্ট্যকে প্রয়োজন অনুযায়ী বাড়িয়ে তোলাকেই **টেম্পারা** বলা হয়।

অনেক শিল্পী রঙের দানার সঙ্গে গঁদ, শিরীষ কিংবা তেঁতুলের বিচির আঁঠা মিশিয়ে কাজ করাকেই টেম্পারা বলেন। **নন্দলাল বসু** প্রমুখ টেম্পারা বলতে বোঝেন রঙের দানার সঙ্গে আঁঠা ছাড়াও সাদা রং মেশানো। সাদা রং ও প্রবলভাবে অনচ্ছ হওয়ার কারণে অন্য রঙের সঙ্গে মেশালে তা অন্য রংকে ও অস্বচ্ছ করে তোলে ও তার একটা বডি নির্মাণ করে। এই সাদা মেশানো রং ভারী হওয়ার কারণে তার hiding power ও Covering power পূর্ব অবস্থা অপেক্ষা অনেকাংশে বৃদ্ধি পায়। এই কারণে অনেক শিল্পী সাদা মিশিয়ে রঙের এই জাতীয় গুণগুলিকে বাড়িয়ে দিয়ে ছবি আঁকাকেও টেম্পারা বলেন।

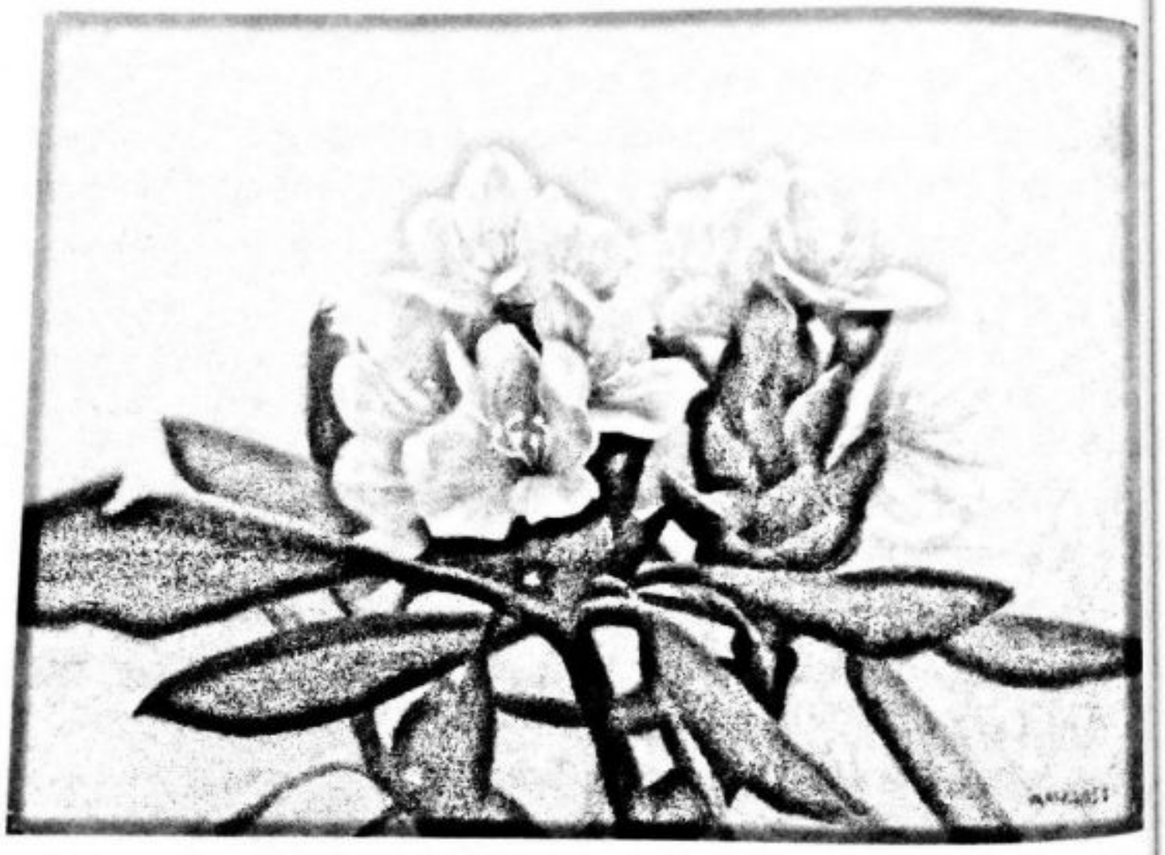

পাশ্চাত্য শিল্পতাত্ত্বিকরা রঙের গুঁড়োর সঙ্গে ইমালশান মিশিয়ে কাজ করাকে প্রকৃত টেম্পারা বলে অভিহিত করেন। ইমালসনের প্রকৃত অর্থ হল তেল ও জলে সুষম মিশ্রণ। রঙের বাঁধুনি হিসেবে ইমালশানের বৈশিষ্ট্য হল এখানে আঁঠা ও তেল এই দুই বাঁধুনির গুণাগুণই পরিলক্ষিত হয়। এটি জল মিশিয়ে পাতলা করা যায় আবার শুকিয়ে গেলে তা তৈল মাধ্যমের মত জল নিরোধক হয়ে যায় অর্থাৎ পুনরায় জলের সংস্পর্শে উঠে যায় না।

সুতরাং ইমালশান মেশানো রঙের গুঁড়োর কার্যকারিতা ও উপযোগিতা আঁঠা বা তেলের বাঁধুনি অপেক্ষা অনেক বেশি। ইমালশান তেল মাধ্যমের মত দীর্ঘ সময় পরে ম্লান বা হলুদ রং হয়ে পড়ে না বা ভবিষ্যতে ফেটে, চিড় ধরে যায় না। আবার ইমালশান জলরঙের মত জলের সংস্পর্শে বা আর্দ্রতার সংস্পর্শে এলে বিনষ্ট হয় না। অর্থাৎ ইমালশান এমন একটি মাধ্যমে যাতে জলরং ও তেলরং উভয়ের ত্রুটিগুলি মুক্ত হয়ে গুণাবলিগুলি প্রকাশিত হয়। তাই আধুনিককালে টেম্পারা কথাটি একমাত্র ইমালশান জাতীয় আঁঠাতে কাজ করাকেই নির্দিষ্ট করে।

◆ **উপকরণ** : সাধারণত প্রকৃতিতে স্বাভাবিকভাবে বেশকিছু natural ইমালসান পাওয়া যায় যেমন ডিমের কুসুম ও দুধ। কৃত্রিম উপায়ে তেল জল মেশানোকে artificial emulsion বলা হয়। যে বস্তুটি তেলকে জলের সঙ্গে মিশতে সাহায্য করে তাকে imulsifier বলা হয়। এই imulsifier বা emulsifying agent তেল বা তৈলাক্ত কোনো পদার্থকে অসংখ্য ছোটো ছোটো কণিকায় ভেঙ্গে দিয়ে জলের সঙ্গে সহাবস্থান করতে সাহায্য করে। প্রাচীনকাল থেকে শিল্পীরা রঙের বাঁধন হিসেবে ডিমের কুসুমকে ব্যবহার করেছে।

সাধারণত টেম্পারার মাধ্যমে অঙ্কনের জন্য কাঠ, কাপড় বা কাগজ যে-কোনো মাধ্যমকে বেছে নেওয়া যেতে পারে। এর ওপর আস্তরণ হিসেবে Gesso ব্যবহার করা হয়। এর ওপর পাতলা এক স্তর Size বা জিলেটিনের দ্রবণ নেওয়া হয় যা Gesso-র শোষণ ক্ষমতাকে পরিমিত করে।

◆ **অঙ্কন প্রক্রিয়া** : টেম্পারা অঙ্কনে সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় ও বহুল প্রচলিত মাধ্যমটি হল ডিমের কুসুম। সাধারণত ছবি আঁকার জন্য টাটকা ডিমের কুসুমই ব্যবহার করা হয়। প্রথমে ডিমটি ভেঙ্গে খুব সাবধানে কুসুমটি সাদা অংশ থেকে পৃথক করে নেওয়া হয়। কুসুমের গায়ে লেগে থাকা সাদা অংশ অপসারিত করার জন্য কিছু প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়। সাদা টিসু পেপারের ওপর গড়িয়ে দিয়ে কুসুমের ত্বককে শুকিয়ে নেওয়া হয় অথবা ক্রমাগত এক হাতের তালু থেকে অন্য হাতের তালুতে নিয়ে কুসুমের ত্বকে লেগে থাকা শ্বেত অংশের চিহ্ন মুছে ফেলা হয়। ডিমের সাদা অংশ থেকে ডিমের কুসুমকে একেবারে পৃথক করে ফেলার পর কুসুমের ওপরের আবরণী ত্বককে ফাটিয়ে তার ভেতকার তরল অংশকে ঢেলে নেওয়া হয়। এই হলুদ তরলটি সরাসরি রঙের বাঁধুনি হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

রঙের দানাকে পরিশুদ্ধ জলের সঙ্গে অত্যন্ত মিহি করে বেটে নেওয়া হয়। এর সঙ্গে সম আয়তনের ডিমের হলুদ অংশ মিশিয়ে নিলে অঙ্কনোপযোগী রং প্রস্তুত হয়ে যায়। ডিম মেশানো রং একদিনের বেশি রাখ যায় না, তাই খেয়াল রাখতে হয় যাতে একদিনের কাজের মতনই রং বানানো হয়। সাধারণতঃ শিল্পীরা সাদা রঙে কাজ করেন বলে তাতে কোনো

Scanned with CamScanner

সংরক্ষক মেশান না, কিন্তু Cennini ডুমুর গাছের রসকে রঙের সঙ্গে সংরক্ষক ও বাঁধুনি হিসেবে মেশানোর নির্দেশ দিয়েছেন। তাঁর মতে এটি শুধু সংরক্ষণের কাজই করে না, তুলি চালানোর ক্ষমতাকেও বৃদ্ধি করে। রঙের ঘনত্বকে শিল্পী প্রয়োজন অনুযায়ী জল মিশিয়ে তরল করে নেন।

◆ **টেম্পারা অঙ্কনের সুবিধা ও অসুবিধা :** টেম্পারা মাধ্যমে অঙ্কনের জন্য ধৈর্য ও দক্ষতার প্রয়োজন হয়। সাধারণত- রেনেসাঁ পূর্বযুগে এই মাধ্যমটির যথেষ্ট প্রসার ঘটেছিল। সঠিকভাবে করা টেম্পেরা অনেকদিন স্থায়ী হয় এবং এর ঔজ্জ্বল্যও দীর্ঘস্থায়ী হয়। আবহাওয়ার আর্দ্রতায় জলরং যেভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়, এটি সেই দোষ থেকে মুক্ত। এটি অপেক্ষাকৃত জলনিরোধক। আবার তেলরঙে যে অধিক চাকচিক্য ও অতিরিক্ত ঔজ্জ্বল্য থাকে তাও এখানে নেই। এই কারণে এই মাধ্যমটি শ্রমসাধ্য ও সময় সাপেক্ষ হলেও শিল্পীদের মধ্যে জনপ্রিয় হয়েছিল। ডিমের কুসুম টেম্পারার সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত মাধ্যম হলেও ডিমের কুসুম ছাড়াও অন্যান্য দ্রব্যও রঙের বাঁধুনি হিসেবে শিল্পীরা ব্যবহার করেছে যেমন- গাম টেম্পারা, কেসিন টেম্পারা, অয়েল টেম্পারা, ওয়াক্স টেম্পারা প্রভৃতি।

উপরোক্ত গুণগুলি থাকা সত্ত্বেও টেম্পারার কিছু সীমাবদ্ধতা আছে। তেলরং উদ্ভাবনের পর দেখা যায় তেলরঙের তুলনামূলক সুবিধার দিকগুলি টেম্পারার থেকে অনেক বেশি। টেম্পারা ও তেলরঙের সার্পেটি ও রঙের দানার চরিত্র ও গুণগতমান একই। কিন্তু রঙের দানার সঙ্গে ডিমের কুসুম মিশিয়ে কাজ করলে রং অপেক্ষাকৃত দ্রুত শুকিয়ে যায় বলে শিল্পী পাশাপাশি রং মেশানোর কাজ করতে পারেন না বরং হ্যাচিং রেখার মাধ্যমে টোনাল ভ্যারিয়েশান আনেন। কিন্তু তেলরং ধীরে শুকোয় ও পাশাপাশি দুটি রঙের মিলে যাওয়ার ক্ষমতাও যথেষ্ট উৎসাহব্যঞ্জক। এই কারণে রেনেসাঁর সময় থেকে শিল্পীরা টেম্পারার বদলে ক্রমশঃ তেলরঙের দিকে ঝোঁকেন।

❖ গাম টেম্পারা :

সাধারণতঃ এখানে রঙের বাঁধুনি হিসেবে গাম আরবিক বা গাম সেনেগাল ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এই গঁদ স্বাভাবিকভাবে নির্দিষ্ট গাছ থেকে সংগ্রহ করে শুকিয়ে রাখা হয়। এই শুকনো গঁদ গরম জলে ভিজিয়ে রাখলে ঘন তরলে পরিণত হয়। এরপর একে ইমালশানে পরিণত করার জন্য এর সঙ্গে স্ট্যান্ড অয়েল ও ড্যামার ভার্নিশ মেশানো হয়। পাঁচ ভাগ গদের সঙ্গে এক ভাগ স্টান্ড অয়েল, একভাগ ড্যামার ভার্নিশ ও চার ভাগের তিন ভাগ গ্লিসারিন মেশানো হয়। পুরো দ্রবণটি ক্রমাগত ঘুটলে বা ঝাঁকালে এগুলি পরস্পর মিশে গিয়ে ঘোলাটে সাদা ইমালসান তৈরি করে। এই বাঁধুনির সঙ্গে রঙের দানা মিশিয়ে রং তৈরি করে ছবি আঁকা হয়। গাম টেম্পারার একটি অসুবিধা হল এটি খুব বেশি জলনিরোধক

বা শক্ত নয়। যার ফলে ওপরের স্তরে রং বসানোর সময় সামান্য তুলির চাপ বাড়লেই নিচের স্তর উঠে আসে।

❖ অয়েল টেম্পারা :

অনেক শিল্প ঐতিহাসিকের মতে অয়েল টেম্পেরার সার্থক রূপায়ন হয়েছিল নেদারল্যান্ডের শিল্পীদের হাতে। সাধারণ তেল ও জলের মিশ্রণে ইমালশান তৈরি করা হয়। এই তেল ও জলের পারস্পরিক অনুপাতের ওপর ইমালশানের প্রকৃতি নির্ভর করে। ডিমের কুসুম প্রভৃতি ইমালশানে দেখি জলের পরিমাণ তেল অপেক্ষা বেশি ও তেলের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কণাগুলি জলের মধ্যে ভাসমান। এই ধরনের ইমালশান জল দিয়ে তরলীকৃত করা হয়। কিন্তু ইমালশানে কখনো কখনো তেল জলের অনুপাতে অনেক বেশি থাকে। এই ধরনের ইমালশানে জলকণিকা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণায় তেলের মধ্যে মিশে থাকে। এই ধরণের ইমালশান জল দিয়ে তরল করা যায় না, তেল দিয়ে তরল করতে হয়। অয়েল টেম্পারায় এই দ্বিতীয় ধরনের ইমালশান রঙের বাঁধুনী হিসেবে ব্যবহৃত হয়। প্রকৃতগতভাবে এগ টেম্পারার থেকে অয়েল টেম্পারা একেবারেই পৃথক। অয়েল টেম্পারায় রঙে তেলের ভাগ বেশি থাকার জন্য শুকোয় দেরিতে। অয়েল টেম্পারার এই বৈশিষ্ট্যকেই কাজে লাগান শিল্পীরা ছোটো ছোটো খুঁটিনাটি কাজ বা শেডিং-এর কাজ এগ টেম্পেরা থেকে অয়েল টেম্পারায় করা সহজ। তিন ভাগ ডিমের কুসুম, ১½ ভাগ জল, ১ ভাগ স্ট্যান্ড অয়েল ও ১ ভাগ ড্যামার ভার্নিশ মিশিয়ে অয়েল টেম্পারার ইমালশান তৈরি করা হয়।

★ (ঙ) অ্যাক্রেলিক পেইন্টিং :

রঙের বাঁধুনি হিসেবে সিন্থেটিক রেসিনকে ব্যবহার করে অ্যাক্রেলিক রং নির্মাণ করা হয়। এই সিন্থেটিক রেসিন কে ইমালসানরূপে মেশানো হয়। এটি oil in water ধর্মী ইমালশান যেখানে জলের ভাগ বেশি তাই অ্যাক্রেলিক রং জলে দ্রবীভূত হয়। এই অ্যাক্রেলিক রেসিন প্লাস্টিক ইন্ডাস্ট্রির অন্যতম উপাদান। রঞ্জকের বাঁধুনি হিসেবে কাজ করানোরর জন্য অ্যাক্রেলিক রেসিনকে পলিমারাইজ করে মেথাক্রিলিক অ্যাসিড মেশানো হয়। এর ফলে অ্যাক্রেলিক রেসিন এক ধরনের দুধের মতো তরলে পরিণত হয় যা শুকিয়ে যাওয়ার পর একেবারে স্বচ্ছ হয়ে যায়।

প্রথমে ১৯৪০ সাল নাগাদ আমেরিকান কোম্পানি বোকার (Bocur) অ্যাক্রেলিক রেসিনকে (Polybutyl Methacrylic) তেলে মিশিয়ে রং বানিয়ে বাজারে ছেড়েছিলেন। ১৯৫০ সাল নাগাদ শিল্পীদের রং হিসেবে অ্যাইক্রলিক রং উপলব্ধ হতে থাকে। Bocur এই রংটি 'Magna' এই Brandname-এ বাজারজাত করে।

Scanned with CamScanner

◆ **অঙ্কন প্রক্রিয়া** : প্রথমদিককার অ্যাক্রিলিক রং এতটাই ঘন ছিল যে মিনারেল স্পিরিট বা তার্পিন মিশিয়ে তাকে আঁকার উপযুক্ত তারল্যে আনা হত। এই রংগুলি তরল করলেও তার ঔজ্জ্বল্য হ্রাস পেত না, কারণ এই রঙে রঞ্জক দানার উপস্থিতি অত্যন্ত বেশি পরিমাণে থাকত। যেহেতু এই অ্যাক্রেলিক রেসিন তার্পিন বা মিনারেল স্পিরিটে দ্রবিভূত হত তাই শুকিয়ে যাওয়ার পরও অ্যাক্রেলিকে অঙ্কিত রঙের পর্দা তার্পিন বা মিনারেল স্পিরিটে নরম হয়ে যেত। এর ফলে শিল্পীরা যখন নীচের রঙের ওপর দ্বিতীয় রঙের স্তর চাপাতেন তখন ওপরের রঙের তার্পিন নীচের রঙকেও নরম করে দিত। এর ফলে রং চটচটে হয়ে উঠত এবং ব্রাশের চাপে তলার স্তর ওপরের রঙের স্তরের সঙ্গে মিশে যাওয়ার সম্ভাবনা বাড়ত। এই কারণে প্রথম দিকে শিল্পীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে মোটামোটা impasto-তে অ্যাক্রেলিক রং লাগিয়ে ছবি অঙ্কনের সময় অসুবিধার সম্মুখীন হতেন। পরে এই অসুবিধা দূরীভূত হয় এবং বর্তমানে যে ধরনের অ্যাক্রেলিক রং বাজারে পাওয়া যায় তাতে জল মিশিয়ে তরলীকৃত করা হয়।

অ্যাক্রেলিক রং নিজে জলে দ্রাব্য নয়, কিন্তু এর ইমালশানের ধরণ অনুযায়ী একে জল মিশিয়ে পাতলা করে নেওয়া যায়। বর্তমান অ্যাক্রেলিকে যে ধরণের ইমালশান ব্যবহার করা হয় তা দুধের মতো অস্বচ্ছ কিন্তু শুকিয়ে যাওয়ার পর তা স্বচ্ছ হয়ে পড়ে। এই কারণে অ্যাক্রেলিক রং ভেজা অবস্থায় অস্বচ্ছ থাকে এবং শুকিয়ে যাওয়ার পর এই অস্বচ্ছতা

দূরীভূত হয়। এর ফলে শিল্পীরা যে রঙের টোন মনে করে চাপান তা শুকিয়ে যাওয়ার পর বদলে যায়। শিল্পীদের অ্যাক্রেলিক রঙের পরিবর্তনটি মাথায় রাখতে হয়। তেলরঙে কিন্তু এই অসুবিধা নেই। শোকানোর পরে পরে তেলরঙের গভীরতা, টোন বা উজ্জ্বলতা কোনো কিছুই হ্রাস পায় না।

◆ **অ্যাক্রেলিকের সুবিধা ও অসুবিধা** : তেলরঙের সঙ্গে অ্যাক্রেলিক রঙের তুলনা করলে দেখা যায় যে দুটি রঙের ক্ষেত্রেই কিছু সুবিধা অসুবিধা আছে। অ্যাক্রেলিক রঙের নমনীয়তা দীর্ঘদিন পরেও হ্রাস না পেলেও তেলরং কিন্তু সময়ের সাথে সাথে তার নমনীয়তা হারিয়ে ক্রমশ শক্ত ও ভঙ্গুর হয়ে যেতে থাকে। ফলে তেলরঙে আঁকা ছবিতে ফাটাফাটা ও কোচকানো দাগ দেখা দেয়। কিন্তু অ্যাক্রেলিক রঙের নমনীয়তা বজায় থাকার জন্য এই ত্রুটিগুলি দেখা যায় না। তেলরং সময়ের সঙ্গে সঙ্গে হলুদ বা কালচে হয়ে গেলেও অ্যাক্রেলিক রঙে তা হয় না। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তেলরঙের স্বচ্ছ হয়ে যাওয়ার প্রবণতা থাকে কিন্তু অ্যাক্রেলিক রঙের ক্ষেত্রে এ সমস্যা নেই। কাজ করার সময় অ্যাক্রেলিক রঙের সবচেয়ে বেশি সুবিধা হল এটির শুকোনোর হার দ্রুত যেখানে তেলরং অত্যন্ত ধীর গতিতে শুকোয়। অ্যাক্রেলিক রঙের পর্দা শুকোনোর পর একদম জল নিরোধক হয়ে যায় এবং শোকানোর অব্যহতি পরেই এর ওপর আবার রং চাপান যায়, কোঁচকানো বা ফাটা দাগ আসার কোনো সম্ভাবনাই থাকে না।

অ্যাক্রেলিক যেহেতু নতুন একটি মাধ্যম তাই এর দীর্ঘ স্থায়ীত্ব নিয়ে সবসময়ই শিল্পীদের মনে দ্বিধা আছে। অনেক ক্ষেত্রেই শিল্পীরা বলেন তাঁরা বহু ক্ষেত্রেই অ্যাক্রেলিক রঙে কাজ করতে গিয়ে অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছেন। বেশির ভাগ সময়ই এই রঙের চরিত্রকে পরিপূর্ণভাবে না জানা ও নিম্নমানের রং ব্যবহার করা অ্যাক্রেলিক রঙের ত্রুটি আসার সম্ভাবনাকে বাড়িয়ে তোলে। ছবির দীর্ঘ স্থায়ীত্বের জন্য ও অ্যাক্রেলিক রঙের ত্রুটিহীন ব্যবহারের জন্য শিল্পীদের সবসময়ই উচিত উত্তম মানের রং ব্যবহার করা। অনেক সময় অ্যাক্রেলিকের সঙ্গে পলি-ভিনাইলকে গলিয়ে ফেলা হয়। এই ভিনাইল ইমালশান মূলতঃ ঘর-বাড়ি রং করার পেইন্টে, কিছু বাচ্ছাদের রঙে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। অনেক শিল্পী ক্যানভাসে প্রাইমার হিসেবে বাড়ি রং করার প্রাইমার ব্যবহার করেন। বাড়ি রং করার প্রাইমারে উপযুক্ত নমমীয়তা নেই যা ছবির জন্য প্রয়োজনীয় এবং ভিনাইল ইমালশানে দীর্ঘস্থায়ীত্ব কম বলে এই ধরণের প্রাইমার ব্যবহার করলে ছবির দীর্ঘস্থায়ীত্ব কমে যায়। এর ফলে এই ত্রুটিপূর্ণ প্রাইমারের জমির ওপর অ্যাক্রেলিক রং দিয়ে ছবি আঁকলে অ্যাক্রেলিক রং নমনীয় হলেও তলার প্রাইমারে অনমনীয়তার জন্য ফাটাফাটা দাগ আসতে পারে ও চকের মত শুকনো হয়ে যেতে পারে। ছবি যখন ধাক্কা খায় তখন তা ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। অনেক সময় শিল্পীরা ভিনাইল ধর্মী রং বা মিডিয়ান অ্যাক্রেলিক রঙের সঙ্গে ব্যবহার করেন। তা

Scanned with CamScanner

কিন্তু উচিত নয়। কারণ এই ধরণের ব্যবহার ছবিকে হলুদ করে দেয় ও এর দীর্ঘস্থায়ীত্ব ক্ষ করে।

অন্য রঙের সঙ্গে যদি তুলনা করা যায়, তাহলে অ্যাক্রেলিক রঙে অসুবিধার চে সুবিধাই বেশি।

ebook.dascoaching.in

★ **(চ) প্যাস্টেল :** রঙীন চক সম্ভত পৃথিবীর প্রাচীনতম জনপ্রিয় অঙ্কন উপাদান, যেখানে রঞ্জককে পূর্ণ বাইন্ডারে মিশিয়ে চাপ দিয়ে স্টিকের আকার দেওয়া হত।

বহু রেনেসাঁ শিল্পী লাল রঙের রঙীন চক ব্যবহার করতে পছন্দ করতেন। লালচে আয়রণ অক্সাইডের সঙ্গে মাটি মিশিয়ে এই সফট চক তৈরি হত। এছাড়া কার্বন ও মাটি মিশিয়ে তৈরি হত কালো চক। হাইলাইট দেওয়ার জন্য সাদা চকও উপলব্ধ ছিল। সাধারণতঃ ক্যালসিয়াম কার্বোনেট বা সোপস্টোন সাদা চক হিসেবে ব্যবহার করা হত। বাদামী বা ধূ রঙের চক পাওয়া গেলেও তা তেমন জনপ্রিয় ছিল না। Cennino Cennine (Late 14th century) এবং Vasari (১৫১১ - ১৫৭৩) প্রাথমিক খসড়ার জন্য হাইড্রাস সিলিকেট অ ম্যাগনেসিয়াম (Soapstone) ব্যবহার করার কথা বলেছেন।

◆ **উপকরণ :** কমর্সিয়াল রঙীন চক ব্যবহার করার আগে সাধারণতঃ শিল্পীরা নিজেরাই এটা তৈরি করে নিতেন। সাধারণত রঙের দানার সঙ্গে গাছ থেকে নিঃসৃত আঠা, দুধ, বিয়ার, গ্লু, মধু প্রভৃতি মিশিয়ে রঙীন চক তৈরি হত। অনেক সময় এর মধ্যে একাধিক বস্তুকে বাইন্ডার হিসেবে রাখা হত। এই বাইন্ডার সবসময় খুব কম পরিমাণে মেশানো উচিত যাতে কেবল চকের আকার দেওয়া যায়। বিভিন্ন রঞ্জক দানা বাইন্ডারের সঙ্গে ভিন্নভাবে ভাবে ক্রিয়া করে এবং সেটা বুঝে শিল্পীরা রঙের স্টিক বানাতেন।

অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত শক্ত চক ব্যবহার করতে পছন্দ করতেন। এছাড়া নরম ভঙ্গুর চকও ব্যবহার করা হত যেগুলি আঙুল দিয়ে ঘষে মিলিয়ে দেওয়া হত। সাদা রঞ্জকের দান দিয়ে হাইলাইট তৈরি করা হত। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বাজারে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে তৈরি চক ও প্যাস্টেল পাওয়া যেতে লাগল। সাধারণতঃ এই সময় থেকে গাম ট্রাগাকান্থ (Tragacanth) প্যাস্টেলের বাইন্ডার হিসেবে ব্যবহার হওয়া শুরু হল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফ্রান্সের বহু শিল্পী যেমন Maurice-Quentin de la Tour (১৭০৪-১৭৮৮), J.B. Perronneau (১৭১৫-১৭৮৩), J. B. Chardin (১৬৯৯-১৭৭৯) প্রভৃতি প্যাস্টেলে বহু উৎকৃষ্ট চিত্র রচনা করেছেন। সাধারণ আকারের কাগজে প্যাস্টেলে আঁকা হত, এছাড়া প্যাস্টেলের জন্য আলাদা করে পিউমিক স্টোন ও মার্বেলের গুড়ো আঠা দিয়ে texture

তৈরি করে তার ওপরে প্যাস্টেলে কাজ করা হত। এইভাবে প্রস্তুত কাগজের অমসৃণ দানা প্যাস্টেলের কাজের জন্য বিশেষ উপযোগী ছিল। উনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠতম প্যাস্টেল শিল্পী ছিলেন **দেগা** (১৮৩৪-১৮৯৭)। তিনি এই মাধ্যমে এতখানিই দক্ষ ছিলেন যে Impua effects-ও তৈরি করতে পারতেন।

সাধারণত জলরং করার কাগজকে প্যাস্টেল মাধ্যমে আঁকার support হিসেবে ব্যবহার করা হয়। কিন্তু শিল্পীরা তাঁদের অভিব্যক্তি প্রকাশের জন্য বিভিন্ন রকম কাগজ ব্যবহার করে থাকেন। কাগজের Texture অনেক অংশে প্যাস্টেলের texture-কে নিয়ন্ত্রণ করে। প্যাস্টেলের জন্য **মিউমিক** স্টোনের গুড়ো লাগানো বিশেষ ধরনের কাগজই ব্যবহার করা হয়।

◆ **অঙ্কন প্রক্রিয়া :** প্যাল্টেলে কিছু সুবিধা উপলব্ধ যার জন্য শিল্পীরা চিরকালই এটি পছন্দ করেছেন। এটি মোটা কাঠির আকারে উপলব্ধ, যার জন্য শিল্পীরা এটিকে ধরে সরাসরি অঙ্কন করেন, কোনোরকম তরলীকৃত করার মাধ্যমের প্রয়োজন হয় না। এই সুবিধার জন্য বাচ্চাদের মধ্যে এটি খুব জনপ্রিয়। প্যাস্টেলের মাধ্যমে সরাসরি কাগজের

Scanned with CamScanner

ওপর আঁচড় টানা যায় ও নানা রকম Texture তৈরি করা যায়। অনেক শিল্পীই খসড়া করার জন্য, out door কাজ করার জন্য প্যাস্টেলকে বেছে নেন। তবে সরাসরি হাতে ধরে কাজ করার জন্য রং প্রস্তুতকারকরা এমন রং ব্যবহার করেন যাতে তা বিষাক্ত না হয়। আর্সেনিক এবং লেড ঘটিত রংগুলি কখনোই প্যাস্টেলে ব্যবহার করা হয় না। প্যাস্টেলে non-toxic রং ব্যবহার করা আবশ্যিক। বিশেষতঃ এর প্রধান ব্যবহারিক বাচ্ছারা বলে প্যাস্টেলে স্কেচিং রং বা বাইন্ডার ব্যবহার করা যায় না।

প্যাস্টেল রঙের আর একটি বড়ো গুণ হল এটির রঞ্জক নিজের চরিত্র প্রায় পরিপূর্ণভাবে অক্ষুণ্ণ রাখতে পারে কারণ এর বাইন্ডার খুব সামান্য পরিমাণে থাকে। কাজেই বাইন্ডারজনিত যে রঞ্জকের চরিত্রের পরিবর্তন ঘটে তা এখানে অনুপস্থিত। প্যাস্টেলের প্রতিটি রং প্রায় পরিপূর্ণভাবে থাকে। তবে প্যাস্টেলে বাইন্ডারের উপস্থিতি খুব কম পরিমাণে থাকার জন্য প্যাস্টেলে অঙ্কিত ছবির রং ঘষা খেয়ে উঠে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এই ত্রুটি রোধ করার জন্য শিল্পীরা fixative ব্যবহার করেন। এছাড়া কাঁচের ফ্রেমে ছবি বাঁধিয়ে রাখলে প্যাস্টেলে অঙ্কিত ছবি ভালো থাকে। বাইন্ডারের চরিত্রের ওপর নির্ভর করে প্যাস্টেল নরম অথবা শক্ত হয়। নরম প্যাস্টেলে তেলের ভাগ বেশি থাকে বলে তা যেভাবে কাজ করে, শুকনো ড্রাই প্যাস্টেল অন্যরকমভাবে কাজ করে। উভয়ের চরিত্র আলাদা হওয়ার জন্য অঙ্কনের চরিত্রও আলাদা হয়। সফট প্যাস্টেলে যেভাবে ঘষে পুরু করে texture তৈরি করা যায়, আবার ড্রাই প্যাস্টেলে ঘষা গুঁড়ো রঙের মতো texture তৈরি করা যায়।

পশ্চিমবঙ্গের বহু শিল্পী প্যাস্টেল নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষা করেছেন। এর মধ্যে বিকাশ ভট্টাচার্য্য, যোগেন চৌধুরী, সুহাস রায়, পরিতোষ সেন, রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

❑ ৪.১.২ স্ট্রোক এবং স্কেচিং (Strokes & Sketching) :

★ স্ট্রোক (Strokes) :

স্কেচ বা ড্রইং-এর মূল উপাদান হল রেখা। কেবলমাত্র রেখার সাহায্যে বস্তু বা অবয়বের মধ্যে ভলিউম (Volume) সৃষ্টি করার জন্য শেড দেওয়া হয়। শেড দেবার জন্য বিভিন্ন প্রকারের স্ট্রোক ব্যবহার করা হয়। বিশেষ বিশেষ স্থানে বিশেষ স্ট্রোকটি বস্তুর রূপ ফুটিয়ে তুলতে সাহায্য করে। তাই পোশাকে একরকমের স্ট্রোক, ত্বকে একরকম স্ট্রোক, চুলে অন্যরকম স্ট্রোক ব্যবহার করা হয়। উপাদানের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে স্ট্রোকের চরিত্র ও প্রকৃতিও বদলে যায়। কলমের ধাতব নিব দ্বারা সৃষ্ট স্ট্রোক আর নরম গ্রাফাইটের পেনসিলের দ্বারা সৃষ্টি স্ট্রোকের প্রকৃতি ভিন্ন ধরনের। এমনকি পেনসিল ধরার ওপরও স্ট্রোকের ধরন বদলে যায়। স্ট্রোকের সঠিক দক্ষ প্রয়োগ একটি ড্রইং স্কেচকে সার্থক করে তোলে।

- **Hatching :**

ছোটো ছোটো লাইন এর মাধ্যমে ছেত্রফলের অংশকে ভরাট করা হয়। সাধারণত দূরের বস্তুর ক্ষেত্রে এমন করা হয়, পেন্সিলে চাপ দিয়ে হাল্কা বা ভারি শেড করা হয় ছায়াকরণ করার জন্য।

- **Cross Hatching :**

এই পদ্ধতিতে প্রথম স্তরের উপরে একটি দ্বিতীয় স্তর, বিপরীত দিকে পুনরাবৃত্তি করা হয়। এই পদ্ধতিতে একটি ছায়াকরণ কৌশল এবং একাধিক স্তর যোগ করা যেতে পারে। পেন্সিলের মাধ্যমে গাঢ় ছায়া যোগ করার ভালো উপায়।

- **Back and Forth Stroke :**

এই পদ্ধতিতে শুধু একই দিকে পেন্সিল আরও দ্রুত গতিতে চলন্ত হয়।

- **Stopping :**

Stopping পেন্সিল অঙ্কন কৌশল হ্যাচিং হিসেবে একই নীতি ব্যবহার করা হয়। কিন্তু লাইন খুব ছোটো ছোটো অনুরূপ হয়।

- **Stipping :**

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিন্দুর সাহায্যে শেড দেওয়া হয়। যেখানে ছায়া গাঢ় হয় সেখানে বিন্দুর সংখ্যা বাড়িয়ে ছায়াকে ঘন করা হয় এবং আলোকে পতিত অংশে বিন্দুর সংখ্যা কমিয়ে দেওয়া হয়।

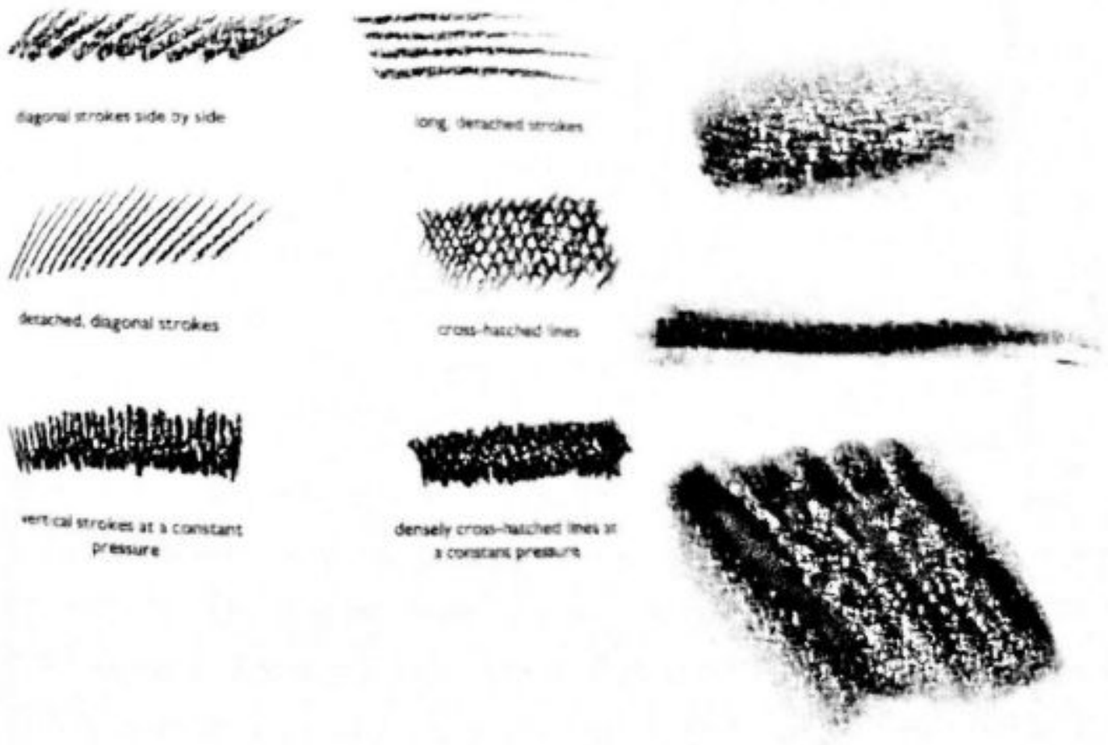

Scanned with CamScanner

★ স্কেচিং (Sketching) :

শিল্প মহাবিদ্যালয়গুলি তাদের শিল্প শিক্ষার ক্ষেত্রে স্কেচকে শিল্প শিক্ষার্থীদের জন্য প্রাথমিক বুনিয়াদী ও আবশ্যিক বলে গণ্য করেন। একজন গাইয়ের কাছে রেওয়াজের যা গুরুত্ব একজন শিল্প শিক্ষার্থীর কাছে স্কেচেরও সেই গুরুত্ব।

- স্কেচ একজন শিল্প শিক্ষার্থীকে কোনো বস্তু বা প্রকৃতির রূপ সম্বন্ধে জ্ঞান প্রদান করে visual memory বাড়ায়।
- কারণ কৌশলের ক্ষেত্রে বিশষত রেখার ব্যবহারে দক্ষ করে তোলে।
- বস্তুর ওপর পতিত আলোছায়া সম্বন্ধে জ্ঞান প্রদান করে।
- রঙের সূক্ষ্ম টোনগুলি সম্বন্ধে সচেতন করে তোলে।
- রঙের ভ্যালু ও স্যাচুরেশান সম্বন্ধে বুঝতে শেখায়।
- স্থাপত্য বা বস্তুর ক্ষেত্রে পরিপ্রেক্ষিত কিভাবে প্রয়োগ করতে হয় তার শিক্ষা করে। এককথায় স্কেচ হল শিল্প শিক্ষার্থীদের অঙ্কন শিক্ষার প্রথম ধাপ।

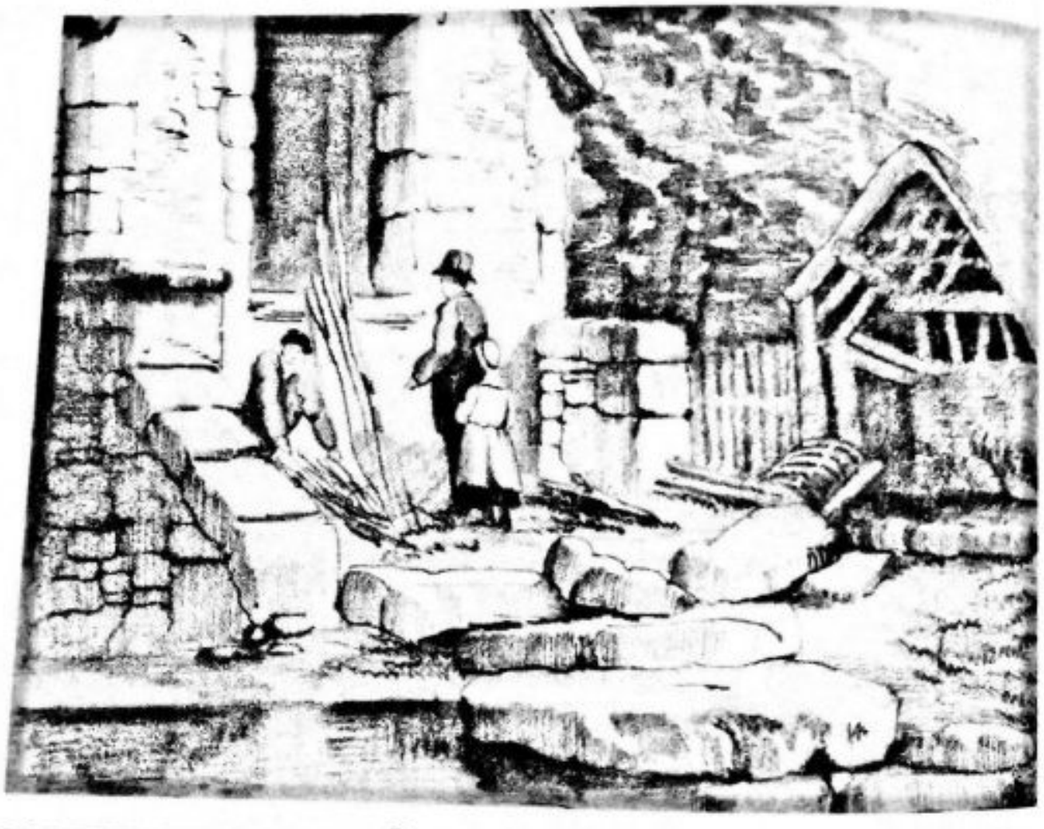

অল্প সময়ের মধ্যে সামান্য কয়েকটি সাংকেতিক রেখার টানে কোনো বস্তু, মানুষ বা বিষয়বস্তুর রূপ, গঠনগত ভঙ্গিমাকে ও বৈশিষ্ট্য তুলে ধরাকে অঙ্কনে স্কেচ বলে। স্কেচ-এর মধ্যে দিয়ে বস্তুর ভঙ্গিমা, গঠন, আয়তন, আকৃতি, বস্তুর গতি, সাদৃশ্য গুণ ফুটে ওঠে। প্রাথমিক স্তরে Free hand Drawing এ বিশেষ জোড় দিতে হবে। তখন মডেল বসিয়ে অঙ্কন করতে হবে। যেমন—ঘনক (Cube), শঙ্কু (Cone), সিলিন্ডার (Sylinder), বর্গাকৃতি পিরামিড

(Squar Pyramid), বর্গাকার প্রিজম (Square Prism) প্রভৃতি এবং আরও বহু রকমের প্রিজম ও জিনিসপত্র। চিত্রবিদ্যায় প্রত্যেকটি বিষয় একে অপরের অনুপূরক চিত্র শিক্ষার প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার্থীদের নীরস রেখাচিত্রের মধ্যে আবদ্ধ করে রাখা কষ্টসাধ্য হয়। তাই Free hand Drawing-এর উপর রং করতে হবে।

একজন সাধারণ মানুষের চোখ সাধারণত অজস্র রূপে দেখে, কিন্তু সে এই রূপগুলিকে বিস্তারিত ও নিখুঁতভাবে দেখে না। একজন শিল্প শিক্ষার্থী অবিরত স্কেচ করার মাধ্যমে বিভিন্ন বস্তু ও অবয়বকে নিখুঁত ভাবে পর্যবেক্ষণের সাহায্যে আঁকার অভ্যাস গড়ে তোলেন। একটি পূর্ণাঙ্গ ছবির জন্য রেফারেন্স হিসেবে বহু খসড়া স্কেচ করার প্রয়োজন হয়। যে কোনো বিখ্যাত শিল্পীর স্কেচ খাতা খুললেই একটি পূর্ণাঙ্গ ছবি নির্মাণের পেছনে কত যে স্কেচ, কাটাকুটি ও পরিবর্তন, ঘসামাজা থাকে তা পরিলক্ষিত হয়। লিওনার্দো হাতে গোনা মাত্র কয়েকটি ছবি এঁকেছেন কিন্তু অসংখ্য খসড়া স্কেচ করেছেন। এই কারণে বিদ্যালয়ে শিল্প শিক্ষার সিলেবাসে স্কেচকে অন্তর্ভুক্ত করা অত্যন্ত আবশ্যক।

★ চারকোল (Charcoal) :

চারকোল দিয়ে অঙ্কনের শিল্প ইতিহাসে সুপ্রাচীন প্রাগৈতিহাসিক গুহাচিত্রগুলিতেও আদিম শিল্পীরা কালো রঙের উৎস হিসেবে চারকোল ব্যবহার করেছেন। শুধু ইউরোপ নয় ভারতবর্ষেও শিল্পীরা কালো রঙের ক্ষেত্রে চারকোলই ব্যবহার করেছেন। এখনও পটুয়ারা ভুষো কালি দিয়ে বা চাল পুড়িয়ে কালো রং বানান। বর্তমানে তিন ধরনের চারকোল পাওয়া যায়— (১) ভাইন চারকোল, (২) গুড়ো চারকোল ও (৩) কমপ্রেসড চারকোল।

(১) **ভাইন চারকোল :** আঙ্গুর লতার ডাল বা অন্য কোনো গাছের সরু ডাল বায়ু রোধিত চুল্লিতে পোড়ালে তাকে ভাইন (vine) চারকোল বলা হয়। ভাইন চারকোলের দাগ অপেক্ষাকৃত হাল্কা এবং সহজে মোছা যায় বলে শিল্পীরা এটিকে প্রাথমিক স্কেচ করার কাজে ব্যবহার করেন।

(২) **চারকোল পাউডার :** চারকোল পাউডার সাধারণত চিত্রে বিশেষ স্মাজি এফেক্ট তৈরির করার জন্য ব্যবহার করা হয়। এছাড়া ছবি ট্রান্সফার করার জন্য চারকোল গুঁড়ো ব্যবহার করা হয়।

(৩) **কমপ্রেসড চারকোল :** চারকোলের সঙ্গে ওয়াক্স বাইন্ডার বা গ্লু মিশিয়ে চারকোলকে পেনসিল বা স্টিকের আকার দেওয়া হয়। কমপ্রেসড চারকোল পেনসিলের গ্রাফাইট পেনসিলের মতোই অনেকগুলি ধরন আছে যা তার শক্ত ও নমনীয়তার ওপর নির্ভরশীল। চারকোলের ক্ষেত্রে চারকোল যত শক্ত হয় তত তার দাগ হাল্কা হয় ও নমনীয় চারকোলের দাগ গাঢ় হয়। HB নম্বরের চারকোল পেন্সিল সবচেয়ে শক্ত ও হাল্কা দাগ সম্পন্ন। পেন্সিলের B নং যত বেশি হয় তত চারকোল নমনীয় হয় যেমন 6B।

Scanned with CamScanner

◆ **চারকোল দিয়ে অঙ্কন প্রক্রিয়া :**

- চারকোলের জন্য সামান্য গ্রেণযুক্ত কাগজ নির্বাচন করাই শ্রেয়।
- হাল্কা দাগের জন্য ভাইন চারকোল ব্যবহার করা যায়। প্রাথমিক স্কেচ ভাইন চারকোল দিয়ে করলে তা সহজে মুছে সংশোধন করা যায়।
- চারকোল স্মাজ করার জন্য পেপার বা কোনো stump ব্যবহার করা হয়।
- চারকোল খুব দ্রুত গুড়ো হয়ে কাগজ নোংরা করে দেয় বলে সাবধানে কাজ করতে হয়।
- চারকোল মোছার জন্য নিডেড (Kneeded) রবার ব্যবহার করতে হয়।
- হাইলাইট বার করার জন্য নিডেড ইরেজার দিয়ে মুছে দাগ হাল্কা করে নেওয়া হয়।
- আঁকা শেষ হয়ে গেলে ফিক্সেটিভ স্প্রে করে দিলে আর আঁকাটি নষ্ট হওয়ার ভয় থাকে না।

■ পঞ্চম শ্রেণির জন্য স্কেচ :

◆ **উপকরণ :** প্লাস্টিকের ফুল ও পাতা, ফুলদানী, টেবিল ক্লথ, পেন্সিল, ইরেজার, কাগজ আটকানোর বোর্ড ক্লিপ, বোর্ড, আঁকার কাগজ।

◆ **প্রক্রিয়া :** কোনো কিছুকে সামনে দেখে যে চিত্র নির্মিত হয় তাকেই স্টিল লাইফ বলে। প্রথমদিকে সহজ স্টিল লাইভ (Still Live) আঁকার জন্য নির্বাচন করা উচিত। স্টিল লাইফে বস্তুগুলি যেহেতু স্থির থাকে তাই তার আকৃতি ও রূপ শিল্পশিক্ষার্থীরা সহজে অনুধাবন করতে পারে। প্রথমে ছাত্রছাত্রীরা বস্তুগুলির মূলগড়ন ও পারস্পরিক অনুপাতগুলির সম্বন্ধ অনুধাবন করে তা পেন্সিলে আঁকার চেষ্টা করবে। কিভাবে স্কেচ করতে হবে বা তার নিয়ম কি তা শিল্পশিক্ষক প্রাথমিকভাবে ছাত্রছাত্রীদের বুঝিয়ে দেবেন। এরপর ধীরে ধীরে ছাত্রছাত্রীরা সামনে সাজানো স্টিল লাইফ আঁকবে। প্রথমদিকে কেবল বস্তুর আঁকার ও অনুপাতের দিকেই জোর দেওয়া উচিত। ভুল হলে বারবার করে মুছে ঠিক করে নেবে।

■ ষষ্ঠ শ্রেণির জন্য স্কেচ :

পঞ্চম শ্রেণির জন্য যে স্টিললাইভটি আঁকানো হয়েছিল ষষ্ঠ শ্রেণিতেও সেই স্টিল লাইফটি আঁকানো হবে কারণ কোনো স্থির বস্তু দেখে কিভাবে আঁকতে হয় তার প্রাথমিক স্থান পঞ্চম শ্রেণিতে পেলেও কিভাবে রং দিতে হয় তা শেখা হয়নি যা ষষ্ঠ শ্রেণিতে শেখা হবে। ছাত্রছাত্রীরা পেন্সিল দিয়ে স্টিল লাইফটি এঁকে তার ওপর অয়েল প্যাস্টেল দিয়ে রং করবে। ফুল পাতার রং, ফুলদানীর রং, টেবিল ক্লথ সমস্ত মিলিয়ে মিলিয়ে করতে হবে। আলো ছায়ার ফলে রঙের যে পরিবর্তন তা শিল্প শিক্ষকের কাছে ভালোভাবে বুঝে নিয়ে স্টিললাইফটি দেখে দেখে রং করতে হবে। এর ফলে ছাত্রছাত্রীদেরও বাস্তব রং এবং রঙের টোনগুলি সম্বন্ধে জ্ঞান বাড়বে।

■ সপ্তম শ্রেণির জন্য স্কেচ :

◆ **উপকরণ :** বিভিন্ন গড়নের, বিভিন্ন রঙের সব্জি যেমন—বেগুন, টমেটো, বাঁধাকপি বা লাউ, আলু, কাগজ, বোর্ড, বোর্ডক্লিপ, পেন্সিল ইরেজার, অয়েল প্যাস্টেল ও ড্রাই প্যাস্টেল প্রভৃতি।

◆ **প্রক্রিয়া :** এমনভাবে সব্জিগুলিকে সাজাতে হবে যাতে সব্জিগুলির রং ও আকার সুন্দরভাবে বোঝা যায়। প্রতিটি সব্জির সারফেস টেক্সচার এবং রঙের ঔজ্জ্বল্য পৃথক পৃথক। যেমন বেগুনের ত্বক অত্যন্ত উজ্জ্বল ও মসৃণ, বাঁধাকপির রং ফ্যাকাসে ও নরম, আলুর খোসা খসখসে, নিষ্প্রভ। ছাত্রছাত্রীরা প্রতিটি বস্তুর ত্বকের রঙের ও চরিত্রের যে বিশেষ বৈশিষ্ট্য সেগুলিকে বোঝার চেষ্টা করবে। ছাত্রছাত্রীরা এইভাবে বাস্তব বস্তু অঙ্কনের মাধ্যমে রঙের টোনের সূক্ষ্ম তারতম্য, আলো বিচ্ছুরণ করার ক্ষমতাকে প্রকাশ করা শিখতে পারবে।

■ অষ্টম শ্রেণির জন্য স্কেচ :

◆ **উপকরণ :** একটি স্টীলের জলের জগ, একটি স্টীলের গ্লাস, পেনসিল (2B, 3B, 4B), ইরেজার, কার্টিস পেপার, বোর্ড, বোর্ডক্লীপ, ফেভিকল, ফ্ল্যাট ব্রাশ (1″)।

প্রক্রিয়া : স্টীলের বাসন দুটি মূলত সিলিন্ড্রিকাল বলে নির্বাচন করা হয়েছে যাতে আলো-ছায়ার মাধ্যমে তার গড়নটি ভালোভাবে ফোটানো যায়। জগ ও গ্লাস সমদ্বিমাত্রিক হওয়ার কারণে খেয়াল রাখতে হবে যাতে তার দুই পাশ সমমাপের হয়। কাগজের ওপর প্রাথমিক রেখাচিত্র অঙ্কন করার পর আস্তে আস্তে পেনসিলে স্ট্রোক দিয়ে দিয়ে শেড দিতে হবে। শেড দেওয়ার গাঢ়ত্ব অনুযায়ী পেন্সিলের নম্বর বাছতে হবে। খেয়াল রাখতে হবে হাতের ঘষায় যেন কাগজ নোংরা না হয়ে যায়। হাতের তলায় একটি আলাদা সাদা কাগজ রেখে দিলে এই অসুবিধাটি থাকে না। আঁকা সমাপ্ত হওয়ার পর বাড়তি গ্রাফাইটের দাগ ইরেজার দিয়ে পরিষ্কার করে মুছে নিতে হবে। এবার একটি বাটিতে জলের মতো পাতলা করে ফেভিকল গুলে ১ ইঞ্চি মাপের ফ্ল্যাট ব্রাশ দিয়ে কাগজের ওপর প্রলেপ দিলেই তা শুকিয়ে গিয়ে আঁকাটির ওপর স্বচ্ছ সুরক্ষাকারী আবরণ তৈরি করে। না হলে পেনসিলের দাগগুলি ঘষা খেয়ে খারাপ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

■ নবম শ্রেণির জন্য স্কেচ :

◆ **উপকরণ :** বিভিন্ন আকারের বই, চতুষ্কোণ বাক্স, কাগজ-পেনসিল, ইরেজার, বোর্ড ও বোর্ড ক্লিপ।

Scanned with CamScanner

◆ **প্রক্রিয়া** : বইগুলি ও বাক্স নানা অভিমুখে এমনভাবে সাজাতে হবে যাতে তাদের আকৃতির মাধ্যমে রৈখিক পরিপ্রেক্ষিত পরিলক্ষিত হয়। শিল্পশিক্ষক ছাত্রছাত্রীদের রৈখিক পরিপ্রেক্ষিরতের সূত্রগুলি ছবি অঙ্কনের মাধ্যমে বুঝিয়ে দেবেন। এবার ছাত্রছাত্রীরা রৈখিক পরিপ্রেক্ষিতে সূত্র ধরে বইগুলি ও বাক্সটি আঁকবে। প্রথমদিকে ছাত্রছাত্রীদের কাছে পরিপ্রেক্ষিতের সূত্র অনুধাবন করা শক্ত মনে হলেও বাস্তব বস্তু স্কেচ করার মাধ্যমে পরিপ্রেক্ষিতের ব্যবহার কিভাবে হয় তা বোঝা সহজ হয়ে যাবে। স্কেচ করার জন্য পরিপ্রেক্ষিতের সূত্রগুলি জানা আবশ্যিক কারণ পরিপ্রেক্ষিতের জ্ঞান না থাকলে বাস্তব বস্তু বিশেষত স্থাপত্য অঙ্কণ করা যায় না।

■ **দশম শ্রেণির জন্য স্কেচ :**

◆ **উপকরণ** : একটি চেয়ার, মডেল, কাগজ, 3Bপেন্সিল, ইরেজার বোর্ড বোর্ডক্লিপ।

◆ **প্রক্রিয়া** : একটি চেয়ারে কোনো মডেলকে বসাতে হবে। যে-কোনো ছাত্রছাত্রী মডেল হতে পারে। মডেল চেয়ারে আরাম করে বসবে। তাতে মডেলের সহজ ভাবটি ফুটে উঠবে। এতদিন ছাত্র-ছাত্রীরা স্থির বস্তুর অঙ্কনের মাধ্যমে কী করে নানা ভাবে স্কেচ করতে হয় শিখেছে। এইবার অবয়ব স্কেচ করা শিখবে। অবয়ব স্কেচ করারও একটি রীতি আছে যা শ্রেণি শিক্ষক ছাত্র-ছাত্রীদের শিখিয়ে দেবে। স্কেচের উদ্দেশ্য হল বস্তু অবয়বের প্রাথমিক গড়ন ও ছন্দটিকে সঠিকভাবে অঙ্কন করা। কেবলমাত্র রেখার মাধ্যমে স্কেচ করতে হবে। মডেলের বসার ভঙ্গীমা ও দেহের অঙ্গের পারস্পরিক অনুপাতগুলিকে ধরবার চেষ্টা করতে হবে।

❑ ৪.১.৩ কার্যাদি সাধনের উপায় ও পরিপ্রেক্ষিত (Understanding of Various means and Perspectives) :

★ চিত্রাঙ্কন (Drawing) :

"গ্রাম ছাড়া ঐ রাঙা মাটির পথ
আমার মন ভুলায় রে।
ওরে—কার পানে মন হাত বাড়িয়ে
লুটিয়ে যায় ধূলায় রে॥
ও যে—আমায় ঘরের বাহির করে,
পায়ে পায়ে পায়ে ধরে—
কেড়ে আমায় নিয়ে যায় রে

যায় রে কোন্ চুলায় রে॥
ও সে—কোন বাঁকে কি ধন দেখাবে,
কোন খানে কি দায় ঠেকাবে
কোথায় গিয়ে শেষ মেলে যে
ভেবেই না কুলায় রে॥"

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবি ঠাকুরের এই গানটির ভাষায় মধ্যেই এক অনবদ্য প্রকৃতির চিত্র ফুটে ওঠে পাঠকের মনে। এবার এই গানটিকে কোনো চিত্রকর কীভাবে তার তুলির পেলব, স্নিগ্ধ ছোঁয়ায় ক্যানভাসে প্রকাশ করতে পারে তা নিম্নে আলোচিত হল।

শিক্ষার্থী সর্বপ্রথম রেখা অঙ্কনের মাধ্যমে সব বস্তুর আকৃতি বিশুদ্ধভাবে আঁকতে শেখে। তার পর গানটির পরিপ্রেক্ষিত ও তার আলোছায়া প্রভৃতির নিখুঁত তথ্য আয়ত্ত করে। পরে ঘরবাড়ি, মানুষ পশুপাখি, জীবজন্তু, কীটপতঙ্গ, গাছ, গাছালি, মেঠো আম ইত্যাদি মনের কাল্পনিক ছেঁয়ায় তা চিত্রে প্রকাশ করবে।

ধৈর্য, সহিষ্ণুতা, একাগ্রতা, নিষ্ঠা ও আত্মপ্রত্যয় ছাড়া শিল্পচর্চা চলে না। ছবি আঁকার প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয় ড্রয়িং-এর মাধ্যমে। ড্রয়িং বস্তুর সীমারেখা স্পষ্ট করে দেখায়। একসঙ্গে বা পাশাপাশি রাখা কতকগুলো বস্তুর আকার, আকৃতি ও গড়নের প্রত্যেককে পৃথক করে দেয়। শিল্পী ড্রয়িং-এর রং, আলো, ছায়া, ঘনত্ব স্থান রেখার মাধ্যমে সমগ্র ডিজাইনের বৈশিষ্ট্যগুলিকে ফুটিয়ে তোলে।

ছবি আঁকার ক্ষেত্রে রেখা রূপের অন্যতম অবলম্বন। রেখা হল মানুষের একরকম কল্পনা। শিল্পীর ভাবনা ও প্রেরণার মধ্যে সেতুবন্ধ রচনা করে রেখা। রেখার গুণে বস্তুর নিজস্ব ধর্ম, আয়তন, ওজন, কঠিন, নরম, হালকা, জড়, গতিশীল সবই দেখা যায়। ভারতীয় চিত্রকলায় যেমন অজন্তা গুহাচিত্র, মুঘল চিত্রে, রাজপুত চিত্রে রেখার ব্যবহার আছে। নন্দলাল ও যামিনী রায়ের চিত্রে রেখার সার্থক ব্যবহার দেখা যায়। চিন ও জাপানের শিল্পীর কালিরেখার মাধ্যমে সুন্দর চিত্র অঙ্কন করেছেন। রেখা যখন কোনো দিক পরিবর্তন না করে একই বিন্দু গতিপথের দিকে যায় তখন তাকে **সরলরেখা** বলে। সরলরেখার মাধ্যমে মোটা দাগে দেহের ভাব কোমলতা—শিথিলতা বোঝায় এবং সরল লাইনে বস্তুর লঘুতা ও দৃঢ়তা বোঝায়। সরলরেখার মাধ্যমে জ্যামিতিক অঙ্কন ঘরবাড়ির ছবি আঁকতে দেখা যায়। সরলরেখার গতি সহজ ও সাবলীল রেখা যখন যে বিন্দুতে চলাচলের সময় বারে বারে দিক পরিবর্তন করতে থাকে তাকে **বক্ররেখা** বলে। বক্ররেখার সাহায্যে ছবিতে অঙ্গ-পতঙ্গ খাঁজ, জামাকাপড় ভাঁজ, অলঙ্কার প্রভৃতি প্রকাশ করা যায়। রাজস্থান, মোগল, কাংড়া, অজন্তা প্রভৃতি চিত্রে বক্ররেখার নিদর্শন পাওয়া যায়। চক্ররেখার সুষম গতি শিল্পকে সুন্দর করে তোলে বক্ররেখা ধীর গতি সম্পন্ন।

ebook.dascoaching.in

Scanned with CamScanner

অল্প সময়ের মধ্যে সামান্য কয়েকটি সংকেতিক রেখার টানে কোনো বস্তু, মানুষ বা বিষয়বস্তুর রূপ গঠনগত ভঙ্গিমাকে ও বৈশিষ্ট্য তুলে ধরাকে অঙ্কনে স্কেচ বলে। স্কেচ-এর মধ্যে দিয়ে বস্তুর ভঙ্গিমা, গঠন, আয়তন, আকৃতি, বস্তুর গতি, সাদৃশ্য গুণ ফুটে ওঠে। প্রাথমিক স্তরে Free hand Drawing বিশেষ বিশেষ জোর দিতে হবে। তখন মডেল বসিয়ে অঙ্কন করতে হবে। যেমন—ঘনক (Cube), শঙ্কু (Cone), সিলিন্ডার (Sylinder), বর্গাকৃতি পিরামিড (Squar Pyramid), বর্গাকার প্রিজম (Square Prism) প্রভৃতি এবং আরও বহু রকমের প্রিজম ও জিনিসপত্র। চিত্রবিদ্যা প্রত্যেকটি বিষয় একে অপরের অনুপূরক চিত্র শিক্ষার প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার্থীদের নীরস রেখাচিত্রের মধ্যে আবদ্ধ করে রাখা কষ্টসাধ্য হয়। তাই Free hand Drawing-এর উপর রং করতে হবে।

★ আলো এবং ছায়া (Light & shade) :

ইতালীয় ভাষায় আলো-ছায়াকে বলা হয় **কিয়ারোসক্যুরে** (Chiarosceero)। কিয়ারোসক্যুরে **রেনেসাঁস** যুগে সর্বাপেক্ষা সুন্দরভাবে চিত্রশিল্পে প্রযুক্ত হয়েছিল। রেনেসা যুগের শিল্পীরা চেয়েছিলেন যেমন তার জগৎকে দেখছেন সেভাবেই ছবিতে আঁকতে। তাঁরা লক্ষ্য করেছিলেন বস্তুর ওপর আলো পড়লে বস্তুর উত্তল অংশে আলো সর্বাপেক্ষা বেশি পড়ে ও সেই অংশটি উজ্জ্বল ও চকচকে দেখায় এবং অবতল অংশে আলো কম পৌছায় বলে সেই অংশটি গাঢ় রঙের লাগে। শিল্পীরা ছবি আঁকতে গিয়ে রং ও আলোর এই চরিত্রটি কাজে লাগিয়েছিলেন। তাঁরা আলোকসূত্র রেখেছিলেন একদিকে। ফলে বস্তুর ওপর আলো একধার দিয়ে পড়ার জন্য অন্য ধারটি আলোহীন ছায়াছন্ন দেখাতো। এর ফলে বস্তুর গড়নটি পরিপূর্ণভাবে ফুটে উঠত। একটি লাল রঙের বলের একদিকে আলো পড়লে অপর পার্শ্বের গোলাকার দিকে ছায়া পড়বে। ফলে যে অংশটিকে আলো পড়েছে বলের সেই অংশটির লাল রং ফ্যাকাসে ও সাদাটে লাগবে ও ছায়াময় অংশটিকে লালরং গাঢ় ও কালচে লাগবে। এইভাবে রেনেসাঁ শিল্পীরা বস্তুর গাত্র রঙের সঙ্গে সাদা মিশিয়ে রংকে হাল্কা করে বস্তুর উত্তলতা বোঝাতেন ও রঙেরসঙ্গে কালো মিশিয়ে রংকে গাঢ় করে বস্তুর অবতল বোঝাতেন। রঙের সাথে সাদা মেশানোকে বলে টিন্টিং (Tinting) ও কালো মেশানোকে বলে সেডিং (Shading)। লিওনার্দো এই আলো ও ছায়ার বৈপরীত্য যাতে কাটাকাটা না লাগে তার জন্য আলো ও ছায়াময় অংশের প্রান্ত ঝাপসা ও নরম করে দিলেন যাকে বলা হয় **stumato**.

রেনেসা যুগে শিল্পীরা নিয়ন্ত্রিত আলো ছায়া ব্যবহার করতেন। ব্যারোক যুগের শিল্পীরা ড্রামাটিক স্পট লাইট ও গাঢ় ছায়া ব্যবহার করেছিলেন যা রেমব্রান্টের ছবিতে দেখতে পাই। ইম্প্রেশানিষ্ট ছবিতে রঙের ওপর আলোর ক্ষণস্থায়ী প্রভাব ধরতে চেয়েছিলেন এবং ছায়াকে আলোর অনুপস্থিতি জ্ঞান করে সেখানে বস্তুর রঙের কম্প্লিমেন্টারী রং ব্যবহার করেছিলেন।

★ কম্পোজিশান (Composition) :

চিত্রের সীমানার মধ্যে বস্তুগুলিকে শৈল্পিকভাবে সাজানোটি হল কম্পোজিশান। কম্পোজিশানকে সুন্দর করে তোলার জন্য শিল্পীরা কিছু নিয়ম মেনে চলেন। কম্পোজিশান নির্মানের ধরনগুলি হল—

(১) **পিরামিড** : এখানে ছবিতে ত্রিভুজ বা পিরামিডের আকারের মধ্যে কম্পোজিশানকে সাজানো হয়। লিওনার্দোর বেশিরভাগ ছবিতে পিরামিড কম্পোজিশান পরিলক্ষিত হয়।

(২) **রেডিয়াল** : রেডিয়াল কম্পোজিশান দেখতে সাইকেলের স্পোকের মত যেখানে বিষয়গুলি কেন্দ্র হতে বাইরেরর দিকে ছিটকে যাচ্ছে। ব্যারোক যুগে রেডিয়াল কম্পোজিশান অত্যন্ত জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল।

(৩) **তীর্যক বা ডায়াগোনাল** : চিত্রপটে কোনাকুনিভাবে বিষয়বস্তুকে আঁকা হয়। 'দ্য নেবেড মাজা' এইধরনের কম্পোজিশানের বিশিষ্ট উদাহরণ।

(৪) **গোল্ডেন সেকসান** : গ্রীকযুগে আকারের একটি আদর্শ অনুপাত নির্ধারণ করা হয়েছিল যাকে গোল্ডেন সেকসান বলা হয়। রেনেসার যুগে বহু আর্টিষ্টেরা চিত্রে গোল্ডেন সেকসানের অনুপাতকে অনুসরণ করে কম্পোজিসান রচনা করেছিলেন।

(৫) **প্যাটার্ন** : চিত্রে যেখানে একইধরনের আকারকে বারবার ব্যবহার করা হয় তাকে **প্যাটার্ন** কম্পোজিসান বলা হয়। জিয়োগোর 'দ্য বিট্রেয়াল অফ ক্রাইস্ট' ছবিতে আমরা প্যাটার্ন কম্পোজিসান দেখতে পাই।

(৬) **স্টালইয়ার্ড** : এই ধরনের কম্পোজিশানে শিল্পীর ছবির দুইদিকে সমান ভার স্থাপন করেন। জিয়োগোর বেশিরভাগ ছবি স্টালইয়ার্ড কম্পোজিশান।

(৭) **ত্রি-স্পট** : এই ধরনের ছবিতে তিনটি জায়গার বিষয়বস্তু সাজানো হয়। নিসর্গচিত্রে এই ধরনের কম্পোজিশান দেখতে পাই।

(৮) **গ্রুপ ম্যাস** : গ্রুপ ম্যাস কম্পোজিশানে একটি গ্রুপে অনেক ধরনের আকারকে একত্রিত করা হয়। সাধারণতঃ স্টীল লাইফে এ ধরনের গ্রুপ ম্যাস কম্পোজিশান দেখা যায়।

উপরোক্ত ধরনগুলি ছাড়াও আরো অনেক কম্পোজিশান নির্মাণের রীতি দেখা যায়। আকারগতভাবে কম্পোজিশান সাজানো হলেও রং কম্পোজিশান নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ অংশগ্রহন করে। যেমন রেমব্রান্টের ছবি, ক্যান্দিনিস্কির ছবি।

কম্পোজিসান হল ছবি নির্মাণের অন্যতম প্রধান অঙ্গ। কেবল সেপ বা ফর্ম নয়, রং টেক্সচার রেখা এই সবগুলির শৈল্পিক ব্যবহারেই একটি সুন্দর কম্পোজিশান গড়ে ওঠে।

Scanned with CamScanner

★ পরিপ্রেক্ষিত (Perspective) :

নিকটের ও দূরের বস্তু বা তলের মধ্যে সমন্বয় নির্ণয় করে চিত্রে রূপায়িত করাকে বলা হয় পরিপ্রেক্ষিত। পরিপ্রেক্ষিতের সাধারণ অর্থ হল প্রকৃতিতে বিভিন্ন বস্তু সমূহের মধ্যে যে পারস্পরিক সম্পর্ক এবং তাদের পরস্পরের মধ্যে যে আনুপাতিক দূরত্ব, গভীরতা, নৈকট্য বর্তমান তা নির্ণয় করা। পরিপ্রেক্ষিত শিল্পীর উদ্দেশ্য ও দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে দেখলে দুটি রীতিতে ভাগ করা যায়। নির্দিষ্ট আবহাওয়ায় কোনো স্থান থেকে কিছু দেখলে তা তার কিছুটা স্বাভাবিক কিছুটা আংশিক দেখা যায়। অর্থাৎ সম্পূর্ণ দেখা যায় না, একে বলে **প্রত্যক্ষজ** পরিপ্রেক্ষিত। এক নজরে বস্তুকে যতটা দেখা যায় ততটা এখানে আঁকা হয়। পারিপার্শ্বিক পরিবেশ ও দূরত্বের উপর নির্ভর করে শিল্পী সেই মত তার রূপ অঙ্কন করে।

প্রত্যক্ষ রীতিতে দুটি ভাগ করা যায় **রৈখিক** (লিনিয়ার) ও **বায়বীয়** (এরিয়াল) পরিপ্রেক্ষিত। একটি নির্দিষ্ট স্থান থেকে দেখলে দূরত্বের জন্য বস্তুকে ক্রমশ ছোটো দেখায়, একে **রৈখিক** পরিপ্রেক্ষিত বলে। অন্যদিকে যেমন, রেল গাড়ির দুই লাইন দূরে যেতে যেতে ক্রমশ পরস্পর কাছে সরে আসে, দূরের কোনও জিনিস দেখলে তখন সেই জিনিস ঝাপসা দেখায়। কারণ দূরত্বের সাথে বর্ণ গভীরতা সাধারণত হ্রাস পায়। বায়ুমণ্ডলের উপর নির্ভর করে বস্তুর রং ও বর্ণ গভীরতা। ছবি অঙ্কনের ক্ষেত্রে শিল্পী এই বৈশিষ্ট্যকে চিত্রে প্রয়োগ করেন। একে বলে **বায়বীয় (এরিয়াল)** পরিপ্রেক্ষিত।

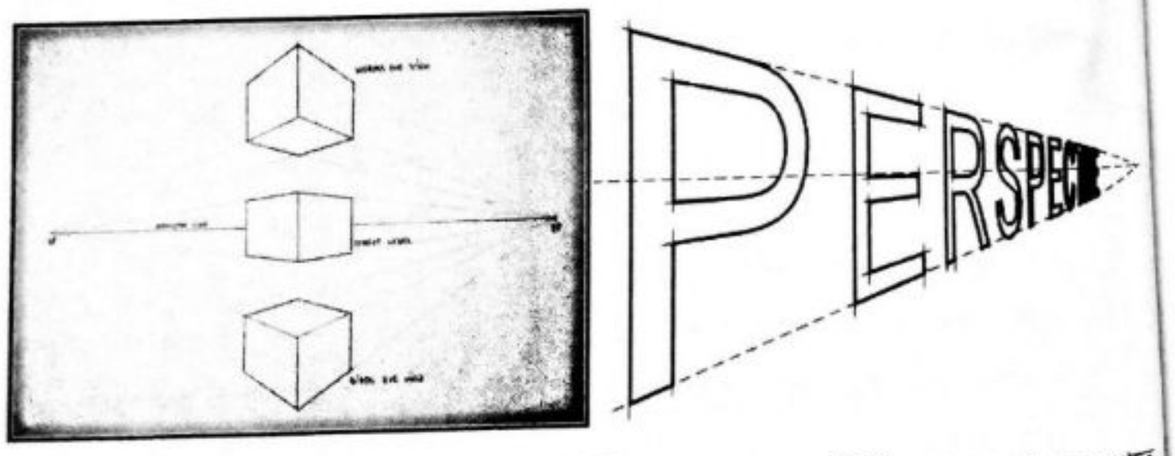

বস্তুর আকৃতিকে জানতে গেলে তাকে বিভিন্ন স্থান থেকে বিভিন্ন বায়ু প্রবাহে দেখতে হয় এবং পূর্ব অভিজ্ঞতার তথ্যগুলিকে মেলাতে হয়। এর উপর নির্ভর করে যে পরিপ্রেক্ষিত গড়ে ওঠে তাকে ধারণা **প্রসূত কাল্পনিক পরিপ্রেক্ষিত** রীতি বলে। শিশুরা ছবি অঙ্কনের সময় এই পরিপ্রেক্ষিতকে অনুসরণ করে। পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইতালীতে ব্রুনেলশ্চি এই পরিপ্রেক্ষিত বিদ্যার ধারণা দিয়েছিলেন এবং পরবর্তীকালে পউলোউচ্চিলো এবং পিয়ারো ফ্রানসেসকা পরিপ্রেক্ষিত বিদ্যার প্রকৃত রহস্য ব্যাখ্যা করেছিলেন। চিত্রকলার ভিত্তি হল

পরিপ্রেক্ষিত। পরিপ্রেক্ষিত জ্ঞানের উপর চিত্রের সার্থকতা নির্ভর করে। একই আয়তন, একই রঙের একাধিক বস্তুর মধ্যে যেটি সবচেয়ে দূরে থাকবে সেটিই সবচেয়ে ছোট এবং সবচেয়ে ফিকে রঙের দেখাবে। সমান গভীর একাধিক ছায়ার মধ্যে যেটি চোখের সবচেয়ে কাছে থাকবে সেটি সবচেয়ে অগভীর দেখাবে।

পরিপ্রেক্ষিত ড্রয়িং-এর ক্ষেত্রে বিশেষ কতকগুলি বিষয় মনে রাখতে হবে যথা—

(1) **ভ্যানিশিং পয়েন্ট (Vanishing Point)** : সব সমান্তরাল সরলরেখা সর্বদা একটি দিকে একই বিন্দুতে মিলিত হওয়ার জন্য ধাবিত হয়, যে বিন্দুটি দিগন্তরেখার (Horizon) উপর অবস্থান করে। উক্ত বিন্দুকে বিলীয়মান বিন্দু (Vanishing Point) বলা হয়।

(2) **আই লেভেল (eye level)** : দর্শকের চোখের সোজা যদি একটি কাল্পনিক লাইন টানা হয় তাকে eye level বলে। বস্তুর অবস্থান eye level এর অবস্থান থেকে বোঝা যায় উপরে আছে না নীচে আছে।

(3) **হরাইজন্টাল লাইন (Horizontal Line)** : স্থল বা জল যেখানে শেষ হচ্ছে এবং আকাশ শুরু হচ্ছে সেই লাইনকে বলা হয় দিগন্ত রেখা বা Horizontol Line.

(4) **ভারটিক্যাল লাইন (Vertical Line)** : এই লাইন হরাইজন্টাল লাইনের বিপরীত লাইন অর্থাৎ উপর থেকে নীচের দিকে যে সোজা লাইন তাকে ভারটিক্যাল লাইন বলে।

পরিপ্রেক্ষিত কে তিন ভাগে ভাগ করা যায়—

যেগুলি হল—(1) One point perspective (2) Two Point Perspective (3) Three Point Perspective.

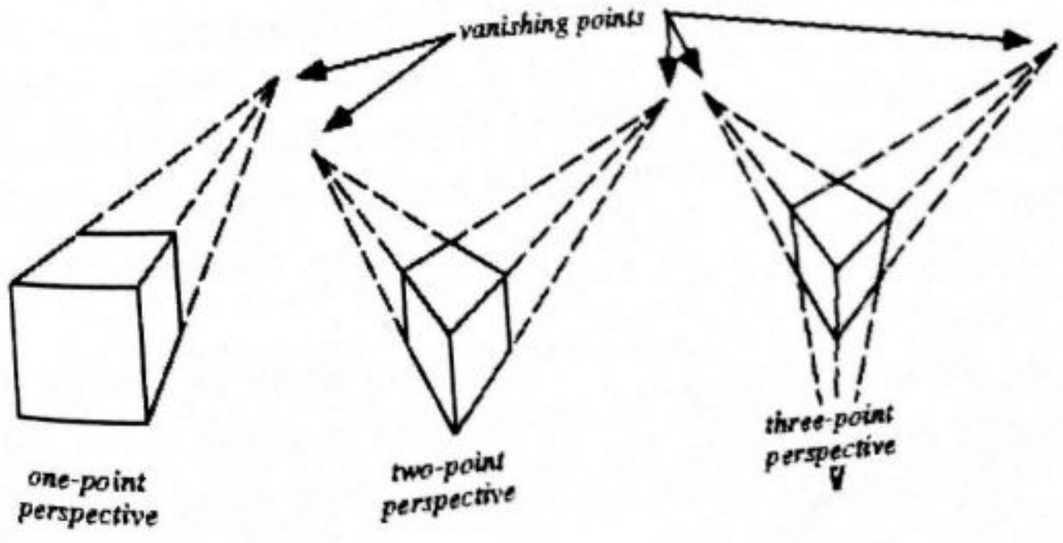

Scanned with CamScanner

(1) One point perspective :

নির্দিষ্ট স্থান থেকে যদি পথের দুধার বা রেলগাড়ির দুই লাইন দেখা হয়, তাহলে দেখা যায় যে পথের দুধার বা রেলগাড়ির দুই লাইন দূরে যেতে যেতে ক্রমে পরস্পর কাছে সরে আসছে এবং শেষে একটা ভ্যানিশিং পয়েন্টে মিলিত হচ্ছে। একে One Point Perspective বলে।

(2) Two Point Perspective :

যে কোনো বড় বাড়ির একটা কর্ণার থেকে দেখলে পাঁচিলের দুটো দিক একসঙ্গে দেখা যায়। এক্ষেত্রে দুটি ভ্যানিশিং পয়েন্ট হরাইজন্টাল লাইনে মিলিত হচ্ছে। একে Two Point Perspective বলে।

3. Three Point Perspective :

বার্ডস আই ভিউ থেকে কোনও বাড়ি দেখলে তিনটি তল দেখা যায়। অর্থাৎ তিনটি ভ্যানিশিং পয়েন্ট দেখা যায়। একে Three Point Perspective বলে।

◎ ৪.২ বিভিন্ন শৈলীর চিত্র— ওয়ারলি চিত্র, মধুবনি চিত্র, গ্লাস চিত্র, ফেব্রিক চিত্র ও অন্যান্য শৈলীর চিত্র (Different forms of painting– Worli art, Madhubani art, Glass painting, Fabric painting and various forms of painting) :

❑ ৪.২.১ ওয়ারলি লেখচিত্র (Worli art) :

মহারাষ্ট্রে পশ্চিমঘাট পর্বতমালায় নাসিক ও ধুলে অঞ্চলে এই ওয়ারলি উপজাতিদের বাস। এছাড়া গোয়া, দমন, দিউতে এদের দেখা মেলে। ওয়ারলি শব্দটি এসেছে ওয়ারল থেকে যার অর্থ জমির একটি টুকরো বা ক্ষেত্র। ওয়ারলি আদিবাসীরা নিজস্ব ধর্মবিশ্বাস ও সংস্কৃতি পালন করে। যদিও বর্তমানে তার মধ্যে আধুনিকতার ছোঁয়া লেগেছে।

সাধারণত বাড়ির দেয়ালের ওপর বা আঙিনায় বাড়ির মহিলারা চালের গুড়ো জল মিশিয়ে সাদা তরল রং তৈরি করে ছবি আঁকেন। সরু বাঁশের কাঠি, নরম বাহারু গাছের ডাল খড়ের কাঠিকে তাঁরা তুলি হিসাবে ব্যবহার করেন। সাধারণত বাড়ির আঙিনা বা দেয়াল গোবর মাটি দিয়ে মসৃণ করে লেপে তার ওপর ছবি আঁকা হলেও কখনও কখনও স্থানীয়ভাবে প্রাপ্ত কালচে লাল রঙের মাটি বা গেরু মাটির ওপর সাদা রং আরো সুন্দরভাবে ফুটে ওঠে। ওয়ারলি আদিবাসীরা মনে করেন এই চিত্র রচনার মধ্যে একটি শুভ মাঙ্গলিক ক্ষমতা আছে যা অশুভ শক্তিকে বিতাড়ন করে।

ঐতিহ্যবাহী ওয়ারলি চিত্রের কেন্দ্রে একটি চতুষ্কোণ ক্ষেত্র অঙ্কিত হয়, যাকে দেবচক বলা হয়। 'চক' শব্দটির অর্থ চৌকো। দেবচকের মধ্যে অঙ্কিত হয় ভূমিদেবী পালঘাট। তার সঙ্গে আঁকা হয় চাঁদ, সূর্য, চিরুনি, সিড়ি, তোরপা (বীন জাতীয় বাদ্যযন্ত্র যা ওয়ারলি

আদিবাসীরা বানায় ও বাজায়) ও জঙ্গালি (তারের বাদ্যযন্ত্র), এছাড়াও দেবচকে আঁকা হয় অশ্বারোহী এক দেবতা যার পাঁচটি মাথা।

বিবাহ উপলক্ষ্যে ওয়ারলি আদিবাসীরা বাড়ির দেয়ালে আঁকেন **'লগ্নচক'**। বাড়ির মহিলারা বর ও কনেকে স্বাগত জানানোর জন্য যে ছবি আঁকেন তাতে ফুটে ওঠে বর, কনে ও বরের বোন ঘোড়ার ওপর বসে। তাদের ঘিরে নাচ হচ্ছে গান হচ্ছে, বাদ্যযন্ত্র বাজছে। লগ্নচকের চিত্রে ফুটে ওঠে বিবাহের আনন্দদায়ক উৎসবমুখর পরিবেশ। কেবলমাত্র কনের বাড়িতে আঁকা হয় **'কল্প'** নামক টক যা কৌমার্যের প্রতীক। বিবাহ ও কৌমার্যের সঙ্গে সম্পর্কিত চিহ্নগুলি এখানে অঙ্কিত হয়। অবয়বগুলিকে লাল, হলুদ ও কমলা দিয়ে রঞ্জিত করা হয়।

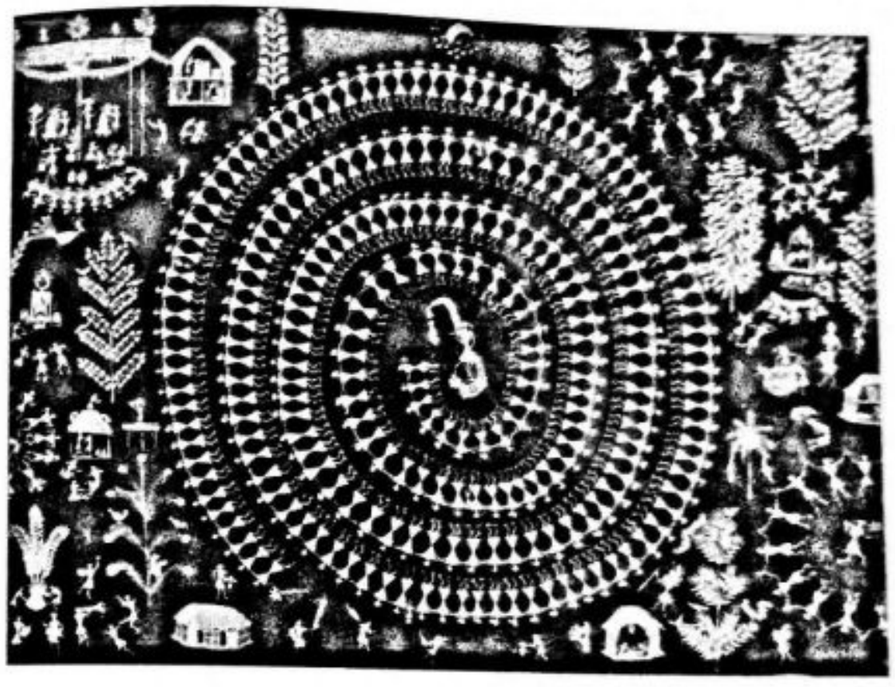

ধান ঝাড়াই করে নতুন চাল ঘরে উঠলে সেই নতুন চাল পেষাই করে মিহি গুঁড়ো করে তার সঙ্গে জল মিশিয়ে একটি থকথকে মিশ্রণ তৈরি করা হয়। বাড়ির নারীরা গৃহের বর্হিদেয়ালে চাল রাখার পাত্রে, রুটি রাখার ঝুড়িতে, 'মরাইতে, রান্নাঘরের দেয়ালে ওই চালের গুড়োর মিশ্রণে হাতের মুঠি ডুবিয়ে ছাপ দেন। অনেকখানি ক্ষেত্র জুড়ে তারা সারি সারি মুঠির ছাপ দেন যেন এই বহুসংখ্যক মুঠির ছাপ তাদের গৃহে সমৃদ্ধি বজায় রাখবে। প্রতিটি মুঠি যেন মুঠিভর্তি শষ্যের প্রতীক। অনেকগুলি মুঠি অনেক শষ্য; তথা সমৃদ্ধি নিয়ে আসবে।

ঐতিহাসিকরা ওয়ারলি চিত্রের সঙ্গে ভারতীয় প্রাগৈতিহাসিক গুহাচিত্রের শৈলীগত সাদৃশ্য খুঁজে পান। নৃত্তবিদরা মনে করেন ওয়ারলিরা মূলত ছিলেন শিকারি। তাই তাঁদের ছবির বিষয়ও ছিল **শিকার ও প্রকৃতি**। ক্রমশ তাঁরা কৃষিকাজ শুরু করলে কৃষিনির্ভর সমাজই ওয়ারলির চিত্রে প্রতিফলিত হতে থাকে। ওয়ারলি দেয়াল চিত্রে তাঁদের দৈনন্দিন জীবনযাপন, ঘর-গৃহস্থালী, নৃত্যগীত, উৎসব, দেবদেবী, ধর্মীয় আচার সবই স্থান পেয়েছে। তাই ওয়ারলি আদিবাসীদের

Scanned with CamScanner

জীবনযাপন রীতি যেমন বদলেছে তেমনি তাঁদের চিত্রের ধরনটিও বদলেছে, যেমন—পূর্বেকার শিকারি জীবনের পশুর দল এখন আর অঙ্কিত হয় না। তার বদলে ধান্য বা অন্যান্য শষ্যক্ষেত স্থান পায় ছবিতে। বর্তমানে কৃষি ও গ্রামীণ সমাজের সঙ্গে সম্পর্কিত প্রাণীগুলি যেমন—গরু, বলদ, সাপ, ময়ূর, বাঁদর, পাখি, ইঁদুর প্রভৃতি অঙ্কিত হয় ওয়ারলি দেয়ালে। ওয়ারলি আদিবাসী সমাজেও লেগেছে আধুনিকতার ছোঁয়া। তারই ফলস্বরূপ শিল্পীর হাতের ছোঁয়ায় দেয়ালের ওপর চিত্রিত হয় সাইকেল চালানো আদিবাসী যুবক বা শহরে আধুনিক যানবাহন।

ওয়ারলি চিত্রের মূল ইউনিটগুলি হল গোলাকার, ত্রিভুজ ও চতুষ্কোণ। গোলাকার চন্দ্র ও সূর্যের প্রতীক; ত্রিভুজ পাহাড়ের ও গাছের আকৃতির প্রতীক, চৌকো ভূমিক্ষেত্রের প্রতীক। ওয়ারলি দেয়ালচিত্রের বিশেষ হলমার্ক হল দুটি ত্রিভুজের সাহায্যে অবয়ব অঙ্কন। দুটি উল্টোনো ত্রিভুজের মাধ্যমে মানুষের অবয়বের দেহকাণ্ড, একটি সরল বৃত্তের সাহায্যে মস্তক ও সরু সরু লতানে রেখার সাহায্যে হাত পা আঁকা হয়। অত্যন্ত সরল জ্যামিতিক আকার দিয়ে দেহাবয়ব নির্মিত হলেও ওয়ারলি শিল্পীরা তার মধ্যেই বিভিন্ন ভঙ্গীমা অঙ্কন করেছেন। একইভাবে সরল জ্যামিতিক আকারের সাহায্যে ওয়ারলি শিল্পীরা পশু, পাখি, গাছপালা, ঘরবাড়ি, শষ্যক্ষেত অঙ্কন করেছেন।

ওয়ারলি চিত্রের লৌকিক সরলতার জন্য ছাত্রছাত্রীরা অত্যন্ত সহজে ওয়ারলি চিত্র অনুসরণ করে বিভিন্ন বস্তু অঙ্কন করতে পারে। ছাত্রছাত্রীরা বয়সানুসারে কোন বস্তুর ওপর ওয়ারলি চিত্র অঙ্কন করবে তা বেছে নিতে পারে। **পঞ্চম শ্রেণির** ছাত্রছত্রীরা মাটির ফুলদানির ওপর নৃত্যরত ওয়ারলি ফিগার আঁকতে পারে; **ষষ্ঠ শ্রেণির** ছাত্রছাত্রীরা মাটির সরার উত্তল অংশের ওপর ওয়ারলি ছবি আঁকতে পারে; **সপ্তম শ্রেণির** ছাত্রছাত্রীরা ওয়ারলি ছবি দিয়ে সুদৃশ্য কাচ ও খাম বানাতে পারে; **অষ্টম শ্রেণির** ছাত্রছাত্রীরা ওয়ারলি ছবি এঁকে ক্যালেন্ডার বানাতে পারে; **নবম শ্রেণির** ছাত্রছাত্রীরা ওয়ারলি চিত্রকলা তাদের পোষাকে ফুটিয়ে তুলতে পারে, **দশম শ্রেণির** ছাত্রাছাত্রীরা মিলিতভাবে তাদের বিদ্যালয়ের প্রাচীর ওয়ারলি চিত্রকলা দিয়ে সুশোভিত করতে পারে, যেভাবে ওয়ারলি আদিবাসীরা তাদের গৃহের দেয়ালে ওয়ারলি চিত্র দ্বারা মনোহর করে তোলে।

এইভাবে বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা বিভিন্ন জিনিসের ওপর ওয়ারলি চিত্রকলা অঙ্কন করে তাদের প্রিয়জনদের উপহার দিতে পারে। এতে তার নিজেরও শিল্পসৌন্দর্য বোধ বিকশিত হবে এবং ভারতীয় ঐতিহ্যবাহী লোকশিল্পের সঙ্গে পরিচিত হবে। এছাড়া প্রিয়জনেরাও একটি হাতে নির্মিত উপহার সামগ্রী পেয়ে অত্যন্ত প্রীত হবে।

❑ ৪.২.২ মধুবনী চিত্রকলা (Madhubani art) :

মহাকাব্যের রাজা জনকের রাজ্য মিথিলা বর্তমান নেপালে ও বিহারের উত্তর প্রান্তসীমা জুড়ে অবস্থিত ছিল। মিথিলার একটি গ্রাম মধুবনে যে বিশেষ ধরনের চিত্র গড়ে উঠেছিল তাই

মধুবনী চিত্র নামে পরিচিত। মধুবনী গ্রামের মহিলারা গ্রামের বাড়ির দেয়ালে বিশেষ উৎসব, বিবাহ, নতুন শিশুর আগমন উপলক্ষ্যে ছবি আঁকেন। বিশেষত মধুবন গ্রামে বিবাহকে উপলক্ষ্য করে মহিলারা যে চিত্র অঙ্কন করেন তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। লোকশ্রুতি অনুসারে মহারাজা জনক তাঁর প্রিয়তমা কন্যা সীতার বিবাহের পূর্বে তার রাজ্যবাসীদের আদেশ করেন যে সীতার বিবাহের জন্য সারা রাজ্য যেন সুন্দর চিত্র দ্বারা সুশোভিত করা হয়। সেই থেকে মধুবন চিত্রকলার জন্ম। মধুবনী চিত্রকলাকে অনেকে মিথিলা চিত্রকলাও বলেন।

ebook.dascoaching.in

Scanned with CamScanner

মধুবনী চিত্রকলা মূলত অঙ্কন করেন **ব্রাহ্মণ, কায়স্থ** প্রভৃতি উচ্চবংশীয় মহিলারা। এছাড়া দুসবিরাও কিছু পরিমাণ চিত্র রচনা করেন যেখানে তাঁরা তাঁদের লোককথা ফুটিয়ে তোলেন। মধুবনী চিত্রের বিষয় হল রাম-সীতা, রাধা-কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, চন্দ্র, সূর্য ও অন্যান্য দেব-দেবী। মিথিলা অঞ্চলের রীতি অনুযায়ী বিবাহের বাসরঘরটিতে পদ্মফুল, বাঁশগাছ, মাছ, পাখি, মিলনরত সাপ প্রভৃতি মোটিফ অঙ্কন করে সুসজ্জিত করা হয়। এই মোটিফগুলি মূলত প্রজনন ও উর্ব্বরা শক্তির প্রতীক। এই ঘরটিকে স্থানীয় ভাষায় **কোহবার** ঘর বলা হয়। এই সুসজ্জিত কোহবার ঘরে নববিবাহিত বর ও কনে তিনরাত্রি মিলন বিরহিত ভাবে বাস করে ও চতুর্থরাতে মিলিত হয়।

মধুবনী চিত্রকলা সম্পূর্ণরূপে গ্রামীণ ও লোকশিল্প। লোকশিল্পের বলিষ্ঠতা, সাবলীলতা ও সারল্য মধুবনী শিল্পের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। গোবর দিয়ে দেয়াল নিকিয়ে নেওয়ার পর দেয়ালের ওপর আঁকা হয়। নীল গাছ থেকে নীল রং, চালের গুঁড়ো থেকে সাদা রং, ভুষোকালি থেকে কালো রং, শিমপাতা থেকে সবুজ রং, হলুদ থেকে হলদে রং তৈরি করে নেওয়া হয়। সাধারণত মধুবনী চিত্রকলায় পাঁচটি ধরন দেখতে পাওয়া যায়—ভরনি, কাচনি, তান্ত্রিক, নেপালি, গোবর। প্রথম তিনটি ধরন (ভরনি, কাচনি, তান্ত্রিক) কেবলমাত্র উচ্চবংশীয় ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ দ্বারাই অঙ্কিত হয়। এঁরা কেবলমাত্র দেবদেবীর ছবি আঁকেন।

শেষোক্ত ধরন দুটি নিম্নবর্ণের মহিলারা অঙ্কন করেন যেখানে দেবদেবী ছাড়াও তাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার দৃশ্যাবলী স্থান পেয়েছে। মধুবনী চিত্রকলার বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল ডবল কন্ট্যুর রেখা। এই দুই সমান্তরাল রেখার মধ্যবর্তী অংশটি আবার কুচি কুচি কোণাচে রেখা দ্বারা ভরাট করা হয়েছে। এই বিশেষ ধরনের ডবল কন্ট্যুর রেখা মধুবনী চিত্রকলা ছাড়া আর অন্য কোনো চিত্রকলায় দেখা যায় না।

১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দের আগে বর্হিজগতের কাছে মধুবনী চিত্রকলা অপরিচিত ছিল। ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে ভারত-নেপাল সীমান্তে একটি ভয়ংকর ভূমিকম্পের ফলে এই অঞ্চলটি বিপুলভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। মধুবনী জেলায় সেই সময় উইলিয়াম আর্চার ব্রিটিশ কলোনিয়াল অফিসার হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি ক্ষতিগ্রস্থ জেলাটি পরিদর্শন করতে এসে মধুবনী চিত্রকলার সন্ধান পান। তিনি এই দেয়াল চিত্রগুলি দেখে অভিভূত হয়ে যান ও কতকগুলি ছবি তোলেন। এই ছবিগুলি মধুবনী চিত্রের সর্বাপেক্ষা পুরাতন আলোকচিত্র। 1949 খ্রিস্টাব্দে তিনি মধুবনী চিত্রকলা সম্বন্ধে মার্গ পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ লেখেন যা মধুবনী চিত্রকলাকে জনসাধারণের সামনে তুলে ধরেন। তিনি মধুবনী চিত্রকলার সঙ্গে আধুনিক পাশ্চাত্য চিত্রকর মিরো, পিকাশো, মাতিস প্রভৃতির চিত্রকলার সাদৃশ্য খুঁজে পান। 1966 থেকে 1968 খ্রিস্টাব্দ অবধি এই অঞ্চলটিতে বৃষ্টির অভাবে তীব্র খরা দেখা যায়। এই অঞ্চলের কৃষি অর্থনীতি সম্পূর্ণভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। তখন ভারতীয় হ্যান্ডিক্রাফ্ট বোর্ডের অধিকর্তা পুপুল জয়কার বোম্বের একজন শিল্পী শ্রী ভাস্কর কুলকার্নিকে মিথিলায় পাঠান, যাতে মধুবনীর মহিলারা

দেয়ালে যে ছবি আঁকেন তা কাগজে এঁকে বিক্রি করতে পারে। এইভাবে পুপুল জয়কারের প্ররোচনায় মধুবনে মধুবনী চিত্রকলার এক নতুন অধ্যায় শুরু হয়। 1975 খ্রিস্টাব্দে মধুবনীর কাছে জিৎওয়ারপুর গ্রামের জগদম্বা দেবী পদ্মশ্রী পুরস্কার প্রাপ্ত হন। 1981 খ্রিস্টাব্দে সীতাদেবী ও 1990 খ্রিস্টাব্দে গঙ্গাদেবী পদ্মশ্রী পুরস্কার লাভ করেন। এইভাবে মিথিলার প্রত্যন্ত গ্রামের একান্ত মহিলা দ্বারা অঙ্কিত দেয়ালচিত্র সারা জগৎবাসীর কাছে সমাদৃত হয়ে ওঠে।

পঞ্চম শ্রেণির ছাত্রছাত্রীরা মধুবনী চিত্রের সাহায্যে কার্ড বানাতে পারে, ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্রছাত্রীরা মধুবনী চিত্রকলার সাহায্যে পেপার ব্যাগ বানাতে পারে, সপ্তম শ্রেণির ছাত্রছাত্রীরা কাপড়ের ব্যাগের ওপর মধুবনী চিত্র ফেব্রিক পেন্ট করতে পারে, অষ্টম শ্রেণির ছাত্রছাত্রীরা মধুবনী চিত্রের সাহায্যে ওয়াল হ্যাঙ্গিং করতে পারে, নবম ও দশম শ্রেণির ছাত্রছাত্রীরা মধুবনী চিত্রের সাহায্যে শ্রেণিকক্ষের দেয়াল সুসজ্জিত করতে পারে।

❑ ৪.২.৩ গ্লাস পেন্টিং (Glass painting) :

◆ **উপকরণ** : কাঁচের টুকরো, তুলো, অ্যালকোহল বা নেলপালিশ রিমুভার, কাগজের ওপর আঁকা নকশা, মাস্কিং টেপ, গ্লাস পেন্ট করা রং, তুলি, রং গোলার প্যালেট।

◆ **প্রক্রিয়া** :

প্রথমে যার ওপর আঁকা হবে সেই রকম একটা কাঁচের পাত্র বা কাঁচের টুকরো নিতে হবে। তবে কাঁচের টুকরোর বদলে আঁকার জন্য স্বচ্ছ পাতলা এ্যাক্রেলিক সিট নেওয়া যায়। এটি কাঁচের মতো ভঙ্গুর নয় বলে ভেঙে যাওয়ার ভয় নেই। প্রথমে কাঁচের উপরিতলকে ভালো করে সাবধানে জল দিয়ে ধুয়ে নিতে হবে। আপাতদৃষ্টিতে কাঁচের দ্রব্যটি পরিষ্কার দেখলেও গ্লাসে লাগা অদৃশ্য তেল-ময়লা সাবান জলে না ধুলে গ্লাসের ওপর রং ধুতে অসুবিধে হয়। এবার কী নকশা আঁকা হবে তা ঠিক করে নিতে হবে। সাধারণত কাঁচের আকার অনুযায়ী নকশা বেছে নেওয়া উচিত। নকশাটি কেবল Outline দিয়ে আঁকতে হবে। এবার নকশা আঁকা কাগজটি কাঁচের পিছনে টেপ দিয়ে আটকে নিতে হবে। কাগজে আঁকা নকশাটি কাঁচের তলা দিয়ে ফুটে উঠবে এবং তার ওপর মূল নকশাটি আঁকতে সুবিধে হবে। এবার কাঁচের যে তলের ওপর আঁকা হবে সেই তলটি পুনরায় অ্যালকোহল দিয়ে পরিষ্কার করে নিতে হবে। এরপর আঁকার পালা। গ্লাস পেন্ট শুরু করা হয় লাইনার দিয়ে। লাইনার সাধারণত কালো রঙের পাওয়া গেলেও সোনালী ও রুপালী রঙের লাইনারও পাওয়া যায়। ডানহাতি হলে বাঁদিক থেকে আঁকা শুরু করতে হয় ও বামহাতি হলে ডানদিক থেকে আঁকা শুরু করতে হয়। তাহলে আঁকা হাত লেগে ধেবড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। লাইনার ঢাকনা খুলে টিউব থেকে রঙের প্রথম অংশটি বার করে ফেলে দিতে হয়, কারণ মুখের কাছে রঙের

Scanned with CamScanner

অংশটি অনেক সময় শুকিয়ে ড্যালা হয়ে থাকে বলে তা ধেবড়ে যায়। এবার নকশার কে
ধরে ধরে লাইনার দিয়ে কালো রেখা কাঁচের ওপর আঁকতে হবে। খেয়াল রাখতে হ
লাইনারের টিউবটি সমানভাবে চাপ দিয়ে টিপে রং লাগাতে হয়, না হলে চাপের তারত
হলে রেখার স্থূলত্ব বদলে যায়, সমমাপের হয় না। অত্যন্ত সাবধানে রেখাটি আঁকতে হ
কোথাও কোনো ভুল হলে ছুরির ডগা দিয়ে কালো রেখার ভুল অংশ কাঁচের ওপর থে
মুছে ফেলে পুনরায় সংশোধন করে রেখাটি আঁকতে হবে। লাইনারের রং মোটা বলে
শুকোতে দেরি হয়। সাধারণত লাইনারের রং শুকোতে 6 থেকে 8 ঘণ্টা লাগে। তা
তাড়াতাড়ি শুকোনোর জন্য হেয়ার ড্রায়ার ব্যবহার করা যায়। লাইনার শুকিয়ে যাওয়ার প
নকশার ভেতরে রং ভরতে হবে। সরাসরি রঙের পাত্র থেকেও নকশার রং ভরা যা
আবার প্যালেটে তরল রং নিয়ে ব্রাশ দিয়ে রং ভরা যায়। অনেকসময় রঙের মধ্যে হাওয়
বুদবুদ ঢুকে যায়। হাওয়ার বুদবুদটিকে সরু পিন দিয়ে ফাটিয়ে দিতে হয়, না হলে রঙে

মধ্যে বুদবুদের দাগ হয়ে যায়। রং একটু ভারী করে লাগালে রং সমানভাবে ছড়িয়ে পড়ে
তুলির দাগ পড়ে না। প্রত্যেকবার ব্রাশ দিয়ে রং লাগানোর পর ব্রাশ ধুয়ে মুছে নিতে হয়।
ভেজা ব্রাশ দিয়ে গ্লাস পেন্ট লাগালে ব্রাশের আঁচড়ের দাগ আসার সম্ভাবনা থাকে। গ্লাসপেন্ট
শুকিয়ে গেলে তার সেড ১ বা ২ মাত্র কমে যায়। তাই সেইভাবে রং লাগাতে হয় যাতে
শুখিয়ে গিয়ে ঠিক শেডটি পাওয়া যায়। প্রথম রঙের স্তরটি পুরোপুরি শুকিয়ে যাবার পরই
দ্বিতীয় রঙের স্তরটি লাগানো যায়। কাঁচা রঙের ওপড় তুলি চালালে তুলিতে কাঁচা রং লেগে
যায়। আঁকা শেষ হয়ে গেলে এবার রং পুরোপুরি শুকোতে হবে। শুকোনোর সময় কাচের
পাত্রটিকে খুব সাবধানে রাখতে হয়। কারণ গ্লাস পেন্ট শুকাতে অনেক সময় লাগে বলে

চটচটে রঙে ধুলো, ময়লা আটকে যাবার সম্ভাবনা থাকে। রং শুকিয়ে গেলে কাঁচের নীচের
তল থেকে নকশা আঁক কাগজটি বার করে নিতে হবে। তবে অনেকে কাঁচের স্বচ্ছতার বদলে
নীচের তলে সাদা রং করে দিতে পছন্দ করে, যাতে নকশাটি সাদার বিপরীতে উজ্জ্বল হয়ে
ফুটে ওঠে। কাঁচের ওপর আঁকার সময় ময়লা হয়ে গেলে জলে ভেজা স্পঞ্জ দিয়ে আলতো
করে মুছে নিতে হবে। গ্লাস পেন্ট করা কাঁচ জলের ভেতর বেশিক্ষণ না রাখাই শ্রেয়, কারণ
জলের কণা কাঁচ ও রঙের স্তরের মধ্যে ঢুকে রংকে নষ্ট করে দিতে পারে।

কাঁচ যেহেতু ভঙ্গুর তাই নীচু ক্লাসের ছাত্রাছাত্রীদের গ্লাস পেন্টিং করতে না দেওয়াই
উচিত। ক্লাস সেভেনের ছাত্রাছাত্রীরা বাড়িতে পড়ে থাকা গ্লাস, কাঁচের পাত্র বা কাঁচের শিশির
ওপর গ্লাস পেন্টিং করতে পারে। এইভাবে বাড়িতে পড়ে থাকা অপ্রয়োজনীয় বস্তুকে সুন্দর
করে তুললে ছোটো থেকে সৌন্দর্যের প্রতি আকর্ষণ তৈরি হয়। অষ্টম শ্রেণির ছাত্র ছাত্রীরা
বড়ো কাচের প্লেটের ওপর আঁকলে তা অত্যন্ত সুন্দর দেখাবে। এই চিত্রিত প্লেট তারা
সাজিয়ে রাখতে পারে বা উপহারও দিয়ে প্রশংসিত হতে পারে। নবম শ্রেণির ছাত্রছাত্রীরা
কাঁচের টুকরোর ওপর বিভিন্ন ধরনের চিত্র রচনা করতে পারে। যেহেতু আগের দুটি শ্রেণিতে
তারা গ্লাস পেন্টিং-এর সঙ্গে পরিচিত হয়েছে তাই এই শ্রেণিতে তারা জটিল কোনো নকশা
বা ল্যান্ডস্কেপ কাচের প্যানেলের ওপর আঁকতে পারে। টেক্সচার নিয়ে নানা ধরনের
পরীক্ষা-নিরীক্ষাও করতে পারে। দশম শ্রেণির ছাত্রছাত্রীরা আয়নার পাশে ছবি আঁকতে
পারে। বাজার থেকে সাধারণ হাত-আয়না কিনে, তার ওপর বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে ছবি আঁকলে
তা সাধারণ হাত-আয়না থেকে বদলে সুদৃশ্য শিল্পবস্তুতে পরিণত হবে। কাঁচ যেহেতু অত্যন্ত
ভঙ্গুর তাই ছাত্রছাত্রীরা যেন অত্যন্ত সাবধানে গ্লাসপেন্টিং করে ও শ্রেণিশিক্ষিকাও এ বিষয়ে
যেন সতর্ক দৃষ্টি রাখেন।

Scanned with CamScanner

এই প্রকল্পটি সম্পাদনের জন্য তিনঘণ্টা নির্ধারণ করা হয়েছে। কাজেই ছাত্রছাত্রীরা এমন নক্সা নির্বাচন করে যা তিনঘণ্টার মধ্যে আঁকা সম্ভব।

★ গ্লাস পেন্টিং-এর প্রকল্প সম্পাদনের জন্য সময়সীমার বিভাজন :

সাদা কগজের খসড়া নক্সা আঁকতে ২৫ মিনিট লাগবে। খসড়া কাগজটিকে কাচের পেছনে টেপ দিয়ে লাগাতে ৫ মিনিট। এবার কাঁচের ওপর লাইনার দিয়ে নকশার বহিরেখা টানতে হবে। লাইনার দিয়ে কালো রেখা টানতে আধঘণ্টা লাগবে। লাইনার শুকোনোর জন্য ৪৫ থেকে ৬০ মিনিট সময় দেওয়া উচিত। এরপরের একঘণ্টা লাইনারের ভেতরে রং ভরতে লাগবে। এইভাবে ৩ ঘণ্টার মধ্যে গ্লাসপেন্টিংটি সমাপ্ত হয়ে যাবে।

সাদা কগজে খসড়া নক্সা অঙ্কন	২৫ মিনিট
কাচের পেছনে খসড়া নক্সা আটকানো	৫ মিনিট
লাইনার দিয়ে অঙ্কন	৩০ মিনিট
লাইনার শুকোনোর সময়	১ ঘণ্টা
নকশায় রং ভরা	১ ঘণ্টা
	মোট সময়-৩ ঘণ্টা

❑ ৪.২.৪ ফেব্রিক (Fabric painting) :

ভারতীয় উপমহাদেশে বস্ত্রনকশা করণের ইতিহাস সুপ্রাচীন। দুই হাজার বৎসর পূর্বেই ভারতে বস্ত্র রঞ্জনের জন্য রাগবন্ধকের ব্যবহার করা হয়েছে যা রঞ্জকের বর্ণকে দীর্ঘস্থায়ী করে বর্ণের উজ্জ্বলকে বজায় রাখে। অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্ব পর্য্যন্ত করণ কৌশল ও নকশার দি থেকে ভারতীয় বস্ত্র পাশ্চাত্য বস্ত্রের থেকে যে উৎকৃষ্ট ছিল তা অধিকাংশ শিল্প ঐতিহাসিকরা মেনে নিয়েছেন।

প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্যের ফলে সিন্ধু সভ্যতায় পাওয়া গিয়েছিল একটি রঙিন বস্ত্রখণ্ড থেকে অনুমান করা যায় যে সেই সময়ও বস্ত্ররঞ্জনের প্রক্রিয়াটি জানা ছিল। রঞ্জনকর্ম অর্থকারী শিল্প হিসেবে ভারতবর্ষেই প্রথম প্রতিষ্ঠা লাভ করে। মেসোপটেমিয়ার সহিত সিন্ধু উপত্যকার সমুদ্র বাণিজ্যের মূল পণ্য ছিল রঞ্জিত কার্পাস বস্ত্র। মেসোপটেমিয়ায় যে সিন্দোন বস্ত্রের কথা জানা যায় তা সম্ভবত সিন্ধুতে প্রস্তুত বস্ত্র। মহেঞ্জোদারো হতে প্রাপ্ত পুরোহিতে ভাস্কর্যের অঙ্গে দেখা যায় ত্রিপত্র নকশা শোভিত বস্ত্রখণ্ড। ভাস্কর্যের অসুবিধা এই আমরা বুঝতে পারি না নকশার রং কি ছিল, কি বা তার প্রকৃতি। অজন্তা গুহচিত্র আমাদে অনেক কৌতুহলের নিরসন ঘটায়। অজন্তা চিত্রে দেখা যায় সমসাময়িক বস্ত্রের কি অপূ

সম্ভার। এত বৈচিত্র্যময়, এত মনোহরী, এত দাম্য, মহাজন জাতক চিত্রে দেখি নর্তকীর পোশাক। তার উর্ধ্বাঙ্গে বাঁধনির নকশা করা বুটিদার লম্বা হাতা ব্লাউস ও নীচে ছাপা অর্ধোবাস। স্বয়ং মহাজন জাতক পরেছেন ইকাত পদ্ধতিতে নির্মিত অধোবাস। অজন্তা চিত্র আমাদের সামনে সেকালের নকশা শোভিত বস্ত্রের এক বৈচিত্রময় সম্ভার উন্মুক্ত করে দেয়।

ভারতবর্ষে মাত্র কিছু অঞ্চল বস্ত্র রঞ্জন শিল্পের জন্য বিখ্যাত। এর কারণ নির্ণয়ে গিয়ে পুপুল জয়কার লিখেছিলেন প্রাকৃতিক উদ্ভিদ, মৃত্তিকা ও অন্যান্য উপাদানগুলি যা হতে রঞ্জক নিষ্কাশিত হয় তার উপস্থিতি ও সেই অঞ্চলের মানুষের রঙের প্রতি আকর্ষণ একটি অঞ্চলকে বস্ত্র রঞ্জনের কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলে।

এছাড়া সেই বিশেষ স্থানের জল, আবহাওয়া, বস্ত্র রঞ্জনের উৎকর্ষতার কারণ হিসেবে কাজ করত। অর্থাৎ একটি স্থানে এমনভাবে প্রাকৃতিক সম্পদ জমা হত ও অন্যান্য শর্তগুলি পূর্ণ হত যা সেই স্থানটিকে বস্ত্র রঞ্জনের জন্য প্রসিদ্ধ করে তুলত।

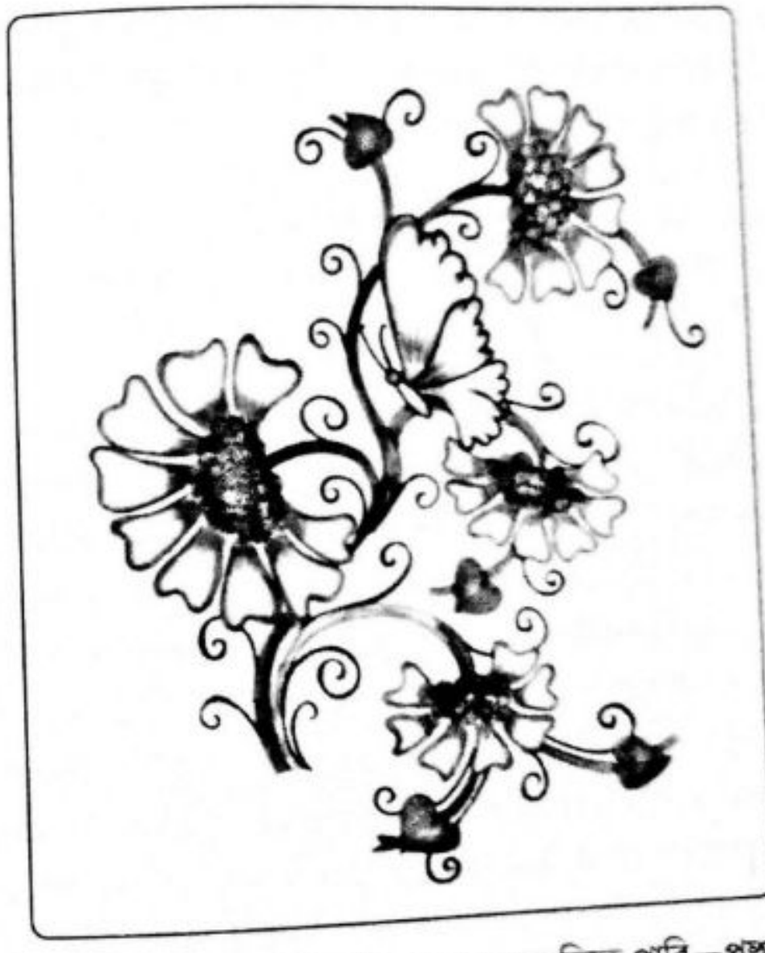

উদ্ভিদ রঞ্জককে আমরা কয়েকটি শ্রেণিতে ভাগ করে নিতে পারি—পুষ্পজাত, বৃক্ষজাত, মূলজাত ও জীবদেহজাত। পুষ্পজাত রঞ্জকের মধ্যে কুসুম ফুল ও কুমকুম ফুল ছিল শ্রেষ্ঠ রঞ্জক। এছাড়া নিকৃষ্ট শ্রেণির রঞ্জকের মধ্যে পড়ে তুণ ফুল, পাটোয়া, জাতি, শিউলি ফুল,

Scanned with CamScanner

ধাই ফুল প্রভৃতি থেকে প্রাপ্ত রংগুলি। ফলজাত রঞ্জক দ্রব্যের মধ্যে হরিতকী এবং ফলধাত্রী মধ্যে ডালিম খোসা, পেঁয়াজ খোসা প্রভৃতি ব্যবহৃত হত। বৃক্ষজাত রঞ্জক দ্রব্যের ম ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ উপাদান হল নীল। মিশরীয় শবাধারে ভারতীয় নীলে রঞ্জিত বস্ত্র খ নিদর্শন মেলে। এছাড়া বকম কাঠ, কাঁঠাল কাজ ও রক্ত চন্দন কাঠ হতে রঞ্জক দ্রব্য নির্ম করা হত। মূলজাত রঞ্জকের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হল মঞ্জিষ্ঠা যা রেশমতন্তু ও কার্পাস তন্তু উভয় রঞ্জিত করতে সক্ষম। এত দীর্ঘস্থায়ী ও পাকা উজ্জ্বল লাল বর্ণ আর অন্য কোনো কিছু হ পাওয়া যায় না। মঞ্জিষ্ঠাতে অ্যালিজারিন (Alizarin) নামক রাসায়নিক উপাদান আছে লাল রং তৈরি করে। এছাড়াও তুরবুলি ও আলোর মূল হতে লাল রং পাওয়া তবে মঞ্জিষ্ঠা হতে প্রাপ্ত লাল রঙের মতো এত উজ্জ্বল নয়। জীবদেহজাত রঞ্জকের মধ্যে সবচে জনপ্রিয় ছিল লক্ষাজাত অলক্তক। তবে এটি তেমন উৎকৃষ্ট শ্রেণির রঞ্জক নয়। কোচি দ্বারাও সুন্দর লাল রং করা যায়। ভারতবর্ষে কোচিনীলের ব্যবহার পুরাতন কাল থে ককস ক্যাক্টাই নামক এই পোকাটি থেকে প্রাপ্ত রঙের উল্লেখ আমরা দ্বাদশ শতাব্দী লিখিত গ্রন্থ 'রসার্ণব'-এ পাওয়া যায়। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে 'রত্ন সমুদয়' নামক গ্রন্থে ইন্দ্রগো নামে কোচিনীলের উল্লেখ আছে।

◆ **উপকরণ :** সাদা বা হাল্কা রঙের সুতির কাপড় ১, ২, ৩, ৪ নং তুলি, কার্বন পেপার, পেনসিল, নানা ধরনের ফেব্রিক রং, কাপড় আটকানোর ফ্রেম প্রভৃতি।

◆ **প্রক্রিয়া :**

প্রথমে সুতির কাপড়টিকে ভালো করে কেচে কাপড়ে উপস্থিত মাড়ের অংশটি ধু ফেলতে হবে। এরপর কাপড়টি শুকিয়ে গেলে ভালো করে ইস্ত্রি করে কাপড়ের কোঁচকা ভাঁজগুলিকে মসৃণ করে নিতে হবে। এরপর কাপড়ের যেখানে নক্সা আঁকা হবে সেখা কার্বন পেপার বসিয়ে নক্সাটি কাপড়ের ওপর ট্রেস করে নিতে হবে। লক্ষ রাখতে হবে কা পেপারের দাগ যেন কাপড়কে ময়লা না করে দেয়। তাই খুব সাবধানে আলতো হাতে ট্রে করাই উচিত। এরপর কাপড়ের ওপর নক্সা আঁকা অংশটি এমব্রয়ডারি ফ্রেমে টানটান ক আটকাতে হবে। আটকানোর পর শুরু হয় রং করা কাজ। বর্তমানে দামি কোম্পানির ফেব্রি রংগুলিতে মিডিয়াম বা বাইন্ডার আলাদা করে মেশাতে হয় না, কেবল সোনালী বা রূপা রংগুলি গুড়ো অবস্থায় থাকলে তা মেশানোর জন্য বিশেষ বাইন্ডার পাওয়া যায়। এ ধরনের রংগুলি যতগুলি লাগবে ততটুকুই বারেবারে বাইন্ডারে গোলা উচিত। রং গুলে রা উচিত নয়। বেশিক্ষণ ধরে গোলা থাকলে হাওয়ার সংস্পর্শে এসে এই রংগুলি তার ঔজ্জ্ব হারিয়ে ফেলে। সাধারণ ফ্রেব্রিক রংগুলি সরাসরি শিশি থেকে নিয়ে আঁকা যায়। তবে দু রং মিশিয়ে তৃতীয় রং তৈরির প্রয়োজন হলে একেবারে প্রয়োজনীয় রং তৈরি করে তা ব

নিরোধক শিশিতে ঢাকনা আটকে রাখতে হবে। ফেব্রিক রং ঢাকনা খোলা অবস্থায় কখনোই রাখতে নেই, তাহলে তা শুকিয়ে যায়। আর ব্যবহার করা যায় না।

কাপড়ের ওপর নক্সা অনুযায়ী রং নির্বাচন করতে হয়। খেয়াল রাখতে হয় যাতে রংগুলি পরস্পরের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়ে দৃষ্টি মনোহর হয়ে ওঠে। হাল্কা রঙের কাপড়ের ওপর গাঢ় রং ও গাঢ় রঙের কাপড়ের ওপর হাল্কা ধরনের রংগুলি ভালো ফুটে ওঠে। একটি বড়ো পাত্রে জল নিয়ে তাতে তুলি ভিজিয়ে তুলিতে রং নিয়ে নক্সাগুলি ভরাট করতে হবে। সরু-সূক্ষ্ম নক্সার জন্য সরু তুলি ব্যবহার করতে হয় ও বড়ো নক্সার জন্য মোটা তুলি ব্যবহার করতে হয়। ফেব্রিক নক্সা আঁকার জন্য সঠিক তুলি নির্বাচন অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, না হলে নক্সার ফিনিসিং ঠিক হয় না। প্রত্যেকবার রং লাগানো শেষ হবার পর তুলিটিকে ভালোভাবে জলে ধুয়ে রাখতে হবে। তুলিতে রঙের অবশেষ লেগে থাকলে তা শুকিয়ে গিয়ে তুলিটিকে শক্ত করে দেবে এবং সেই তুলিটি নষ্ট হয়ে যায়, আর ব্যবহার করা যায় না। রং করা শেষ হয়ে যাওয়ার পর রঙের শিশিতে কয়েক ফোটা পরিষ্কার জল দিয়ে ভালোভাবে ঢাকনা বন্ধ করে রাখতে হবে। এইভাবে রাখলে ফেব্রিকও অনেকদিন ভালো থাকে, শুকিয়ে গিয়ে নষ্ট হয়ে যায় না। ফেব্রিক রং একবার শুকিয়ে গেলে আর তা ব্যবহারযোগ্য থাকে না।

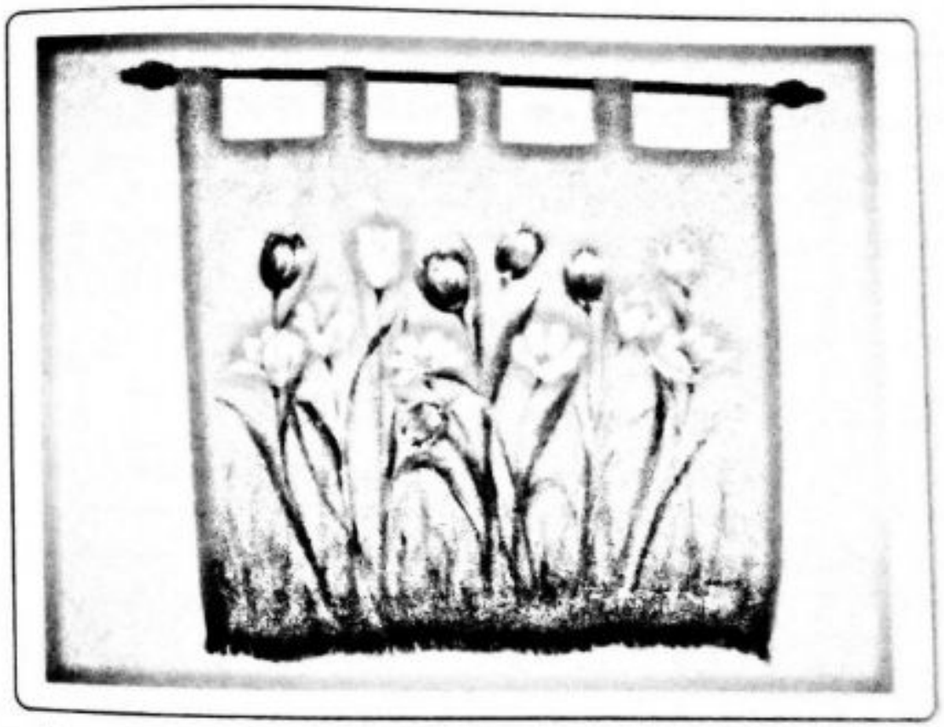

নক্সা আঁকা কাপড় খুব সাবধানে রাখা উচিত। রং ভেজা থাকা অবস্থায় তার ওপর হাত পড়লে রং ধেবড়ে যায়। রং শুকিয়ে যাবার ২৪ ঘণ্টা পরে ইস্ত্রি করলে রঙের স্থায়ীত্ব বৃদ্ধি পায়। বর্তমানে নানা ধরনের ফেব্রিক রং পাওয়া যায়। পপ-আপ ফেব্রিক রং দিয়ে আঁকলে তা একটু ফুলে গিয়ে কাপড় থেকে উঠে আসে যা খুব সুন্দর লাগে। লাইনার দিয়ে সরু রেখা টানা যায়, সূক্ষ্ম রেখা ও সীমারেখা টানার জন্য লাইনার অত্যন্ত উপযোগী। পপ-আপ বা

Scanned with CamScanner

লাইনার ফেব্রিক রং শুকোতে একটু দেরি হয়। এছাড়া ফেব্রিক পেন নানা রঙে পাওয়া যায়। এগুলি পেনের মতো সরাসরি ভাবে আঁকা যায় বলে বাচ্চারা খুব সহজে ব্যবহার করতে পারে।

পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের জন্য ছোটো রুমালের ওপর সরল নক্সায় ফেব্রিক পেন্ট করানো যেতে পারে। তারা দোকান থেকে সরাসরি সাদা সুতির পাতলা রুমাল কিনে নিয়ে তার ওপর রং করতে পারে। সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণির ছাত্রছাত্রীরা বড়ো টেবিল ক্লথের ওপর চারকোণে ও মাঝখানে নক্সা এঁকে ফেব্রিক রং দিয়ে ভরাট করতে পারে। নবম ও দশম শ্রেণির ছাত্রছাত্রীরা নিজের জামা বা সুতির গেঞ্জির গায়ে আঁকতে পারে। জামার ওপর আঁকতে গেলে লক্ষ রাখতে হয় যাতে রং তলার কাপড়ে লেগে না যায়। তার জন্য কাপড়ের দুটি স্তরের মাঝখানে একটি প্লাস্টিক রেখে নক্সাটিকে ফ্রেমে আটকে রং করলে এই ভয় থাকে না। ছাত্রছাত্রীরা তাদের জামার ওপর ফেব্রিক পেন দিয়ে নানারকম গ্রাফিকও লিখতে ও আঁকলেও ভালো লাগবে। এইভাবে ছাত্রছাত্রীরা নিজের পছন্দ মতো পোশাক, গেঞ্জি, ব্যাগ, রুমাল, ওড়না প্রভৃতিতে অঙ্কন করে সুসজ্জিত করতে পারে। ফেব্রিক পেন্টিং-এর অর্থনৈতিক মূল্য থাকার কারণে ছাত্রছাত্রীরা ফেব্রিক পেন্ট শিখে রাখলে তা তাদের কাজে লাগবে।

এই প্রকল্পটি সমাপ্ত করার জন্য ৩ ঘণ্টা বরাদ্দ করা হয়েছে। কাপড়ের ওপর নক্সাটি ট্রেস করার জন্য ২০ মিনিট লাগবে। বড়ো নক্সা হলে ৩০ মিনিট লাগতে পারে। নক্সাটিকে ফ্রেমে আটকানোর জন্য ৫ মিনিট যথেষ্ট। নক্সাটি অঙ্কনের জন্য গড়ে ২$^{১}/_{২}$ ঘণ্টা লাগবে।

কাপড়ের ওপর নক্সা ট্রেস করা	২০-৩০ মিনিট
কাপড়টিকে ফ্রেমে আটকানো	৫ মিনিট
নক্সা অঙ্কন	২.২৫-২.৩৫ ঘণ্টা
	মোট সময়-৩ ঘণ্টা

❑ ৪.২.৫ অন্যান্য শৈলীর চিত্র (Various forms of painting) :

★ পাল পুঁথিচিত্র :

ebook.dascoaching.in

গৌড়ে শশাংকের মৃত্যুর পর বাংলায় এক অরাজক অবস্থার সৃষ্টি হয় যাকে ঐতিহাসিকরা মাৎসন্যায় বলে অভিহিত করেন। গোপাল বাংলায় আবার সুশাসন ফিরিয়ে আনেন এবং পাল বংশের সূচনা হয়। এই পাল রাজারা ছিলেন বৌদ্ধধর্মাবলম্বী এবং তাঁদের অনুগ্রহে বৌদ্ধ শিল্প ও সংস্কৃতি বিশেষ প্রসারলাভ করে যা বাংলার শিল্প ইতিহাসে বিশিষ্ট স্থান

অধিকার করে আছে। তিব্বতীয় ইতিহাসকার লামা তারানাথ বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস সম্বন্ধে ১৬০৮ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ একটি বিখ্যাত গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থের একটি অংশে তারানাথ পাল যুগের চিত্রকলা সম্বন্ধে উল্লেখ করেছেন, যেখানে তিনি ধীমান ও বিতপাল নামক দুজন দক্ষ প্রতিভাধর শিল্পীর প্রশংসা করেছেন।

পালযুগের চিত্রকলা কোনো স্বতন্ত্রভাবে অঙ্কিত চিত্র নয়, পুঁথির অলংকরণ হিসেবে নির্মিত হয়েছিল এই পুঁথিগুলি মূলত বৌদ্ধধর্ম বিষয়ক পুঁথি ও তার অনুলিপি। পালযুগের চিত্রিত পুঁথিগুলি অধিকাংশই হল প্রামান্য মহাযান গ্রন্থ অষ্টসহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতার প্রতিলিপি। এছাড়া আছে বৌদ্ধ বজ্রযান মতের পঞ্চরক্ষা, কারন্ডব্যূহ, কালচক্রযান প্রভৃতি গ্রন্থের প্রতিলিপি। পুঁথি নির্বিশেষে চিত্রের বিষয় হল লুম্বিনী বনে বুদ্ধের জন্ম, বুদ্ধগয়ায় বোধিলাভ, সারনাথে ধর্মচক্র প্রবর্তন, কুশীনগরে মহাপরিনির্বাণ, শ্রাবস্তিনগরে অলৌকিক ক্রিয়া প্রদর্শন, সঙ্কাশ্যে স্বর্গাবতরণ, রাজগৃহে নলগিরি বশ, বৈশালীর আম্রবনে বাঁদরের মধুদান গ্রহণ এবং তন্ত্রযান ও বজ্রযান সম্মত দেবদেবীর প্রতিকৃতি। দেবদেবীদের মধ্যে প্রাধান্য পেয়েছেন তারা, প্রজ্ঞাপারমিতা, লোকনাথ, মৈত্রেয়, মহাকাল, বজ্রপানি, বসুধারা, বজ্রসত্ত্ব, মঞ্জু ঘোষ প্রভৃতি।

এই পুঁথিগুলি দান পুষ্পিকা থেকে জানা যায় যে পুঁথিগুলির নির্বাহক ছিলেন মহাযানপন্থী বৌদ্ধ স্থবির এবং উপাসক ভিক্ষুরা। পুঁথির পুষ্পিকায় সর্বক্ষেত্রেই দাতার নাম পাওয়া যায়। বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বিভিন্ন দাতারা এসে বিশিষ্ট বৌদ্ধ ধর্মস্থানগুলিতে পুঁথি দান করতেন পুণ্য লাভের আশায়। যে কোনো ধর্মানুষ্ঠানে এই পুঁথির পাঠ ও আবৃত্তি পুণ্যার্জনের অঙ্গ হিসাবে বৌদ্ধধর্মে গণ্য হত এবং এই গ্রন্থের প্রতিলিপিকরণও যে একটি বিশেষ পুণ্যকর্ম তা বৌদ্ধধর্মে প্রচলিত ধারণা ছিল। এই সময় বৌদ্ধধর্মে এই চিত্রিত গ্রন্থগুলির ধর্মীয় গুরুত্ব এতো বৃদ্ধি পায় যে বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদের মধ্যে এই বিশ্বাস দৃঢ় হয়ে ওঠে যে এই ধরনের গ্রন্থের অনুলিপি দান, পূজন প্রভৃতি জ্ঞান ও পুণ্যলাভের সহায়ক। পালযুগে বৌদ্ধ পুঁথিকে আশ্রয় করে অলংকরণ হিসেবে যে বিশেষ ধরনের চিত্রকলা বিকশিত হয়ে ওঠে তা পালযুগীয় পুঁথিচিত্র নামে অভিহিত হয়। পাল রাজার বৌদ্ধধর্মাবলম্বী হওয়ায় বৌদ্ধধর্ম এইসময় প্রবলভাবে বিকশিত হয়েছিল যা পাল পুঁথিচিত্র বিকাশে অনুকূল ছিল। পাল চিত্রকলার বিকাশ ঘটেছিল পাল রাজাদের রাজত্বসীমার মধ্যে অর্থাৎ বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ, পূর্ববঙ্গ এবং এদের পার্শ্বস্থ সীমাগুলিতে। এই জন্য পালচিত্রকলাকে অনেক শিল্প ঐতিহাসিকগণ এর জন্মস্থান অনুযায়ী পূর্বভারতের পুঁথিচিত্র হিসেবে অভিহিত করে থাকেন।

এই চিত্রগুলি পুঁথির অলংকরণ হিসেবে অঙ্কিত হলেও পুঁথির অলংকরণের বৈশিষ্ট্য অনুপস্থিত। সাধারণত গ্রন্থ অন্তর্গত চিত্রগুলি ক্ষুদ্রায়তন চিত্রের বৈশিষ্ট্য বহন করে যেমন, জমজমাট কম্পোজিশন, ঘন কারুকার্যের বিন্যাস, নিখুঁত অনুপুঙ্খ দক্ষ কুশলী রেখা, সূক্ষ্মতা প্রভৃতি। কিন্তু পাল পুঁথিচিত্রের কম্পোজিশন অনুচিত্রর বদলে বড় পটের কম্পোজিশন অর্থাৎ দেওয়াল চিত্রের কাছাকাছি। রেখার ডৌল ও বিস্তার, রঙের মন্ডন ও বিন্যাস,

Scanned with CamScanner

রচনাগত কাঠামো যেন দেওয়াল চিত্রের উপযোগী। ফলে পাল পুঁথি চিত্রের রচনাগত কাঠামো অনুচিত্রের বদলে যেন বড় চিত্রের খসরা।

পালযুগের পুঁথিচিত্র মূলত পাল রাজত্বকালে বিকশিত হয়েছিল। অধিকাংশ পুঁথিতেই বিভিন্ন পাল রাজাদের নামাঙ্কিত তারিখ দেখা যায়। খ্রিস্ট্রিয় দশম শতকের শেষভাগ থেকে দ্বাদশ শতকের শেষভাগ অবধি কম করে ২৫ খানি তারিখযুক্ত চিত্রিত পুঁথি পাওয়া গেছে। প্রচুর তারিখবিহীন পুঁথিও পাওয়া যায়। নবম শতাব্দীর প্রথম থেকে দশম শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত পাল পুঁথিচিত্রের সেরকম কোনো নিদর্শন পাওয়া যায়নি। সরসীকুমার সরস্বতী 'পাল যুগের চিত্রকলা' গ্রন্থে এই যুগের চিত্রকলাকে তিনভাগে ভাগ করেছেন। (১) তারিখসহ চিত্রযুক্ত পূর্ববঙ্গীয় পুঁথি, (২) তারিখবিহীন চিত্রসহ পূর্বভারতীয় পুঁথি এবং (৩) তারিখ ও চিত্রসহ নেপালি পুঁথি। নেপালি পুঁথিকে এই চিত্রধারার অন্তর্ভুক্ত করা হয় কারণ রাজনৈতিক পটভূমিকা পরিবর্তনের কারণে বহু পুঁথি রক্ষা করার জন্য নেপালে নিয়ে যাওয়া হয়। এইজন্য নেপালে পূর্বভারতীয় চিত্রশৈলীর সম্প্রসারিত রূপ দেখতে পাওয়া যায়।

পাল পুঁথিচিত্র তালপাতার উপর আঁকা হত এবং দু'ধরনের তালপাতার ব্যবহার হত। (১) শ্রীতাড় এবং (২) খরতাড়। এরমধ্যে শ্রীতাড় অপেক্ষাকৃত নমনীয়, কতকাংশে সম্প্রসারণশীল এবং পাতলা। খরতাড় ঈষৎ পুরু, দৈর্ঘ্য কম এবং ভঙ্গুর। এইজন্য শ্রীতাড়কে পুঁথি লেখার মাধ্যম হিসেবে বেছে নেওয়া হত। তালপাতার উপর আঁকার জন্য তালপাতার আকার অনুযায়ী এই পুঁথিগুলি দৈর্ঘ্যের দিকে বেশি এবং প্রস্থে সরু হত। লেখা এবং আঁকার জন্য তালপাতাকে বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রস্তুত করে নেওয়া হত। পুঁথির পাতাগুলির দৈর্ঘ্য প্রস্থের অনুপাতে অনেক বেশি হওয়াতে পাতাগুলির দুপাশে দুটি ছিদ্র রাখা হত। প্রত্যেকটি পাতা ওপর ওপর ছিদ্র বরাবর সাজিয়ে সুতো গলিয়ে দিয়ে শক্তভাবে বাঁধা হত। পুঁথিগুলিকে দীর্ঘস্থায়ী ও রক্ষা করার জন্য দুটি কাঠের পাটার মধ্যে রাখা হত। এই কাঠের পাটার উপরও চিত্রাঙ্কণ করা হত তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তা বিনষ্ট হয়ে যেত। বিভিন্ন শিল্পশাস্ত্র থেকে জানতে পারা যায় যে, রং তৈরি হত বিভিন্ন প্রাকৃতিক উপাদান থেকে। যেমন—সাদা রং-সাদা খড়ি মাটি এবং ঝিনুক পোড়া থেকে হলুদ-হরিতাল থেকে, সবুজ-নীল ও হলুদের সংমিশ্রণে এবং নীল গাছ থেকে নীল পাওয়া যেত। জৈন পুঁথিচিত্রে নীল রং হিসেবে ল্যাপিজ লাজুলি পাথরকে ব্যবহার করা হলেও পাল পুঁথিচিত্রে এই রংটি ব্যবহার করা হয়নি।

পুঁথির অংশ হিসেবে চিত্রের আবির্ভাব। একটি চিত্রিত পাতায় তিনখানি চিত্রিত ফলক দেখা যায়। একটি কেন্দ্রস্থলে এবং দুপাশে দুটি। কোন কোন পত্রে মাত্র একটি চিত্র আছে যা ঠিক পাতার মধ্যস্থলে অঙ্কিত। আবার কয়েকটি পাতার দুপাশে দুটি চিত্র থাকে। চিত্রফলকগুলির মাপ সাধারণত ৬ × ৭ সেমি। সাধারণত পুঁথিকররা চিত্রের জায়গাটি খালি রেখে দিয়ে পুঁথিটি লিখতেন এবং শেষ হলে চিত্রকররা পুঁথির বিষয়ের সঙ্গে মানানসই ভাবে চিত্রগুলি আঁকতেন।

পালযুগীয় চিত্রকলায় মার্গ চিত্ররীতির প্রাধান্য থাকলেও মধ্যযুগীয় রীতির অনুপ্রবেশ ঘটেছিল। দ্বাদশ শতকের অন্তকাল পর্যন্ত মার্গরীতি ও মধ্যযুগীয় রীতির দ্বন্দ্ব থেকেই গেছে। প্রথম মহীপালের ষষ্ঠ রাজ্যাঙ্কে (6th dynasty) একটি অষ্ট সহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতার প্রতিলিপিতে একটি চিত্রে লুম্বিনি বনে ভগবান বুদ্ধের জন্মকাহিনি বর্ণিত আছে। স্টেলা ক্রামরিশ এই চিত্রটি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে লক্ষ্য করেছিলেন ছবির অন্যান্য অংশে রঙের মধ্যে বর্তনা গুণ থাকলেও মায়াদেবীর ভগিনীর ক্ষেত্রে রঙের বর্তনা কম। সরসী কুমার সরস্বতী এই রঙের বর্তনার অভাব থেকে মধ্যযুগীয় শিল্পাদর্শের সূচনা হয়েছে এরূপ মত পোষণ করেন। নয়পালদেব ছিলেন প্রথম মহীপালর পুত্র। তাঁর সময় যে দুটি পুঁথি পাওয়া গেছে সে দুটি আবার সম্পূর্ণরূপে মাগরীতিব, পূর্বেকার মধ্যযুগীয় শিল্পরীতির আভাষ কোনভাবেই এখানে দেখা যায় না। কিন্তু দ্বিতীয় মহাপালদেবের সময় আবার মধ্যযুগীয় রীতির অনুপ্রবেশ ঘটে। রং সমতলীয়, বর্তনাহীন, রেখা কঠিন, ভঙ্গুর, কুটিল ও বিচ্ছিন্ন রেখার সমাবেশ গঠিত। পার্শ্বগত দৃষ্টিতে মুখাবয়ব অঙ্কিত হলেও দুটি চোখই আঁকা হয়েছে, একটি চোখ দেহগণ্ডীর বাইরে উদগত। এই সময় মার্গ রীতিকে সরিয়ে মধ্যযুগীয় রীতির প্রভাব স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কিন্তু তার পরবর্তীকালে দ্বিতীয় মহীপালদেবের ভ্রাতা রামপালদেবের সময় আবার পূর্ণমাত্রায় মার্গ রীতির আবির্ভাব ঘটে। রামপালদেবের পর হতে মুসলমান শাসন পর্যন্ত পালযুগের চিত্রকলা মার্গ রীতি থেকে একেবারে বিচ্যুত না হলেও মধ্যযুগীয় শিল্পরীতি প্রবল ছিল।

শৈলীগত বিচারে পালযুগীয় চিত্রকলাকে তিনটি মূল পর্বে ভাগ করা যায়। (১) আদিপর্ব, (২) মধ্যপর্ব এবং (৩) অন্তপর্ব। খিস্ট্রিয় নবম শতাব্দীর প্রথম থেকে দশম শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত সময়কালকে (২০০ বছর) আদিপর্ব বলা হয়। যেখানে পালযুগীয় চিত্রকলা শুদ্ধ মাগরীতিকে অনুসরণ করে চিত্রিত হয়েছিল। প্রথম মহীপালদেবের সময় থেকে রামপালদেবের কাল পর্যন্ত মধ্যপর্ব বলে অভিহিত যেখানে মার্গ ও মধ্যযুগীয় রীতির দোলাচাল দেখা যায়। দ্বাদশ শতকের দ্বিতীয় পর্ব হতে এই চিত্রকলার অন্তপর্ব চিহ্নিত করা হয়। এই সময় মাগরীতি তার অস্তিত্ব ক্ষীণভাবে টিকিয়ে রাখলেও মধ্য যুগীয় চিত্ররীতি প্রবল হয়ে ওঠে।

মহম্মদ ঘোরী ভারত আক্রমণ করার সময় তাঁর সুযোগ্য সেনানায়ক বাংলা আক্রমণ করেন। বাংলায় সেই সময় লক্ষণ সেন রাজত্ব করছিলেন যিনি কোন প্রতিরোধহীনভাবে পলায়ন করেন। এই সময় বাংলার বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদের একটি অংশ তাঁদের ধর্মকে রক্ষা করার জন্য পালিয়ে নেপালে চলে যান এবং সঙ্গে করে বহু মূল্যবান পুঁথি নিয়ে যান। নেপালে বৌদ্ধধর্ম যাওয়ার পর এখানেও বৌদ্ধধর্মাশ্রিত পুঁথি চিত্রণের ও লিখনের ধারা প্রচলিত হয় যা পাল পুঁথিচিত্রেরই সম্প্রসারিত রূপ। বাংলায় পাল পুঁথি চিত্রের সমাপ্তি ঘটলে তার একটি ধারা নেপালে পুষ্ট হয়।

Scanned with CamScanner

★ দশাবতার তাস :

বর্তমানে যে চার রঙের (রুইতন, হরতন, ইস্কাবন, চিড়িতন) তাস খেলা হয় তা এদেশে পর্তুগীজরা নিয়ে এসেছিল। তার পূর্বেও এ দেশে তাস খেলার রেওয়াজ ছিল। ইউরোপীয় তাস আসার পূর্বে বাংলায় দশাবতার তাস প্রচলিত ছিল। বর্তমানে এই দশাবতার তাস কেবলমাত্র বিষ্ণুপুরেই তৈরি হয়। ফৌজদার পদবীধারী সূত্রধররা দশাবতার তাস অঙ্কন করে। এঁরা কবে থেকে দশাবতার তাস অঙ্কন করা আরম্ভ করেছিল তা সুনিশ্চিত করে বলা যায় না। তবে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী লিখেছিলেন যে সম্ভবত পালযুগে বাংলায় তাস খেলা প্রচলিত হয়েছিল।

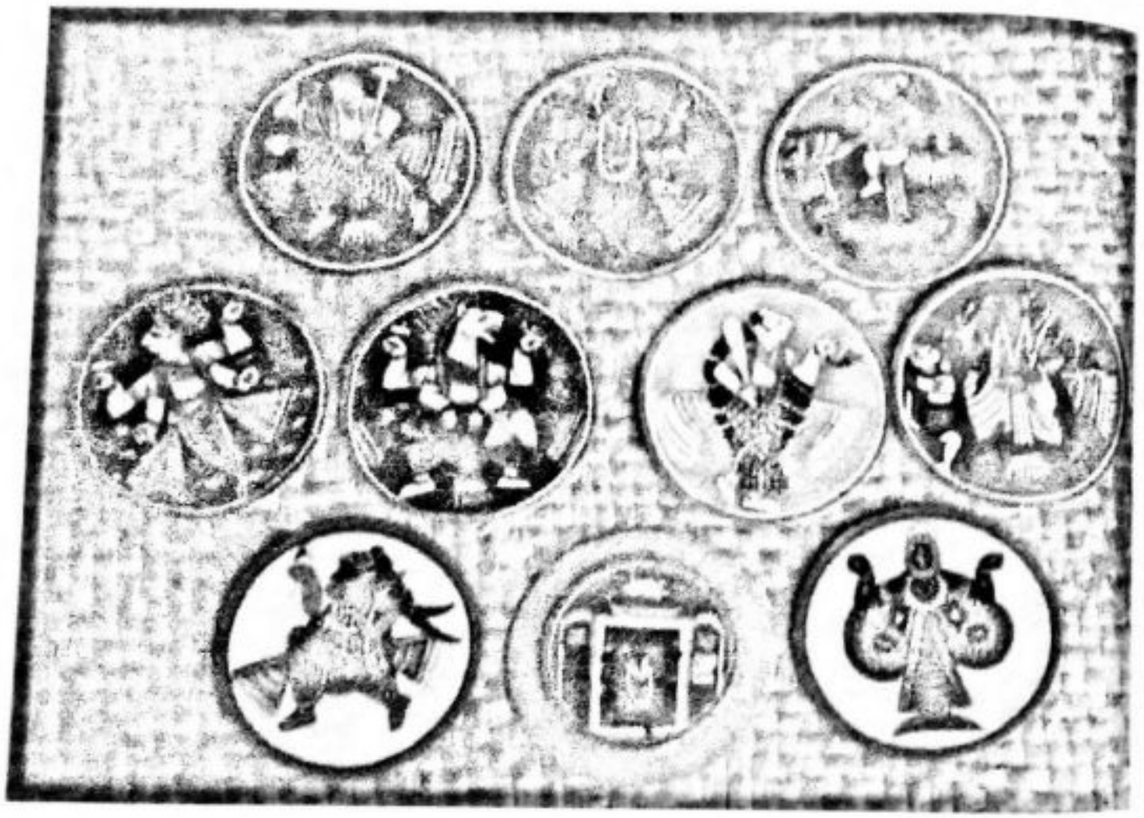

দশাবতার তাসে দশটি রং আছে যা দশঅবতারের ওপর আবরিত। এই দশ অবতার হলেন মৎস্যাবতার, কূর্মাবতার, বরাহাবতার, নৃসিংহাবতার, বামনাবতার, পরশুরামাবতার, রামাবতার, বলরামাবতার, বুদ্ধাবতার, কল্কিঅবতার। এখানে জগন্নাথের পরিবর্তে বুদ্ধদেব দশঅবতার মণ্ডলীতে স্থান পাওয়াতে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন তা পালযুগীয় মহাযান বৌদ্ধধর্মের প্রভাবের ফলে ঘটেছিল। মৎস্য অবতারে তাসের রং হল কালো ও প্রতীক হল কচ্ছপ, বরাহঅবতার তাসের রং হল সবুজ ও প্রতীক হল শঙ্খ। নৃসিংহ অবতার তাসের রং হল ধূসর ও প্রতীক হল চক্র। বামন অবতার তাসের রং হল নীল ও প্রতীক হল কমণ্ডলু। পরশুরাম অবতার তাসের রং হল সাদা ও প্রতীক হল কুঠার। রামঅবতার তাসের রং হল

লাল ও প্রতীক হল বাণ। বলরাম অবতার তাসের রং হল হাল্কা সবুজ ও প্রতীক হল গদা। বুদ্ধ অবতার তাসের রং হল হলুদ ও প্রতীক হল পদ্ম। কল্কি অবতার তাসের রং হল সিঁদুরে লাল ও প্রতীক হল খড়্গ। প্রতিটি রঙের তাসে ১২টি করে তাস থাকে অর্থাৎ মোট তাসের সংখ্যা হল ১২০টি। প্রতিটি রঙের তাসে সবচেয়ে বড় হল রাজা ও তার নীচে হল মন্ত্রী বা উজির তাস। রাজা একটি স্থাপত্য ফ্রেমের মধ্যে অঙ্কিত যা তাঁর পদাধিকার ও রাজকীয়ত্বকে সূচিত করে। এরপরের তাসগুলি এক থেকে দশ নম্বর অবধি, যা এক্কা, দোক্কা, তেক্কা, চৌকা, প্রজ্জা, ছক্কা, সত্তা, আটা, নক্কা, দশ নামে পরিচিত। প্রতিটি রঙের তাসে তার নম্বর অনুযায়ী নির্দিষ্ট প্রতীক অঙ্কিত থাকে যেমন—মৎস্য অবতার তাসের এক্কায় আঁকা থাকে একটি মাছ প্রতীক। এইভাবে দোক্কায় দুটি মাছ, তেক্কায় তিনটি মাছ, চৌকায় চারটি মাছ আঁকা থাকে। এইভাবে প্রতিটি রঙের দশটি তাস তার নম্বর অনুযায়ী ৩৩টি সংখ্যক প্রতীক চিহ্নিত থাকে এই তাসগুলিকে ফোঁটা বলা হয়।

দশবতার তাসের প্রতিটি অবয়ব ও মোটিফের রং ও আকার নির্দিষ্ট অঙ্কন শৈলীতে লোকশিল্পের আঙ্গিক স্পষ্ট। রং অত্যন্ত উজ্জ্বল ও পরস্পর বিরোধী। সূক্ষ্ম আলংকারিক রেখায় বস্ত্র, অলংকারের নক্সাগুলি আঁকা হয়।

তাস তৈরি করার প্রক্রিয়াটি সরল হলেও সময়সাপেক্ষ। পুরনো কাপড় তেঁতুলবীজের আঠা দিয়ে কয়েক স্তরে জুড়ে নেওয়া হয়। শুকানোর পর স্তরে স্তরে জোড়া কাপড়টি পীচবোর্ডের মতো শক্ত ও কড়া হয়ে যায়। এবার এই শক্ত কাপড়ের প্রতিটি থেকে ৪ ইঞ্চি ব্যাস বিশিষ্ট গোলাকার তাস কেটে নেওয়া হয়। তার ওপর সাদা খড়িমাটির প্রলেপ দিলে তাসের জমি আঁকার জন্য প্রস্তুত। এরপর তাসের ওপর আঁকা হয়। সাধারণত স্থানীয় ভাবে প্রাপ্ত প্রাকৃতিক রংই তাস আঁকার কাজে ব্যবহার করা হয়। আঁকা শেষ হওয়ার পর তাসগুলি পেছনে গালার প্রলেপ দেওয়া হয়। বর্তমানে গালা দুর্মূল্য হয়ে ওঠাতে গালার স্থানে মেটেসিঁদুর ব্যবহার করা হয়। যেহেতু তাস খেলার সময় তাসগুলি হাতে হাতে ঘসা খায় তাই তাসগুলিকে সুরক্ষিত করার জন্য তাসের ওপর বার্নিসের একটি পাতলা প্রলেপ দেওয়া হয়।

দশাবতার তাস ছাড়াও বিষ্ণুপরের ফৌজদাররা নক্সা খেলার তাস তৈরি করেন। এখানে মোট ৪৮ খানি তাস থাকে। এক থেকে দশ পর্যন্ত নম্বরের তাস। তারপরে অশ্বারোহী রাজা ও কুস্তী আরোহী রাজা। টেক্কাতে আঁকা হয় পরী, দুরিতে মল্লযুদ্ধ, তিরিতে তিনটি পাতা, চৌকোতে চারটি করে শঙ্খ, পঞ্জাতে পাঁচটি পানিফলের পাতা, ছক্কাতে দুটি আসন, সাতাতে সাতটি তরবারি, আটাতে আটটি বকুল ফল, নহলাতে নটি ফোটা ফুল, দহলাতে দশটি কুল। প্রতিটি তাস চারটি করে আঁকা হয়। এই তাসগুলি আঁকার প্রক্রিয়াও দশাবতার তাসের মতোই উড়িষ্যায় দশাবতার তাস গঞ্জিফা নামে পরিচিত।

Scanned with CamScanner

★ পাটাচিত্র :

কাগজ আসার পূর্বে এ দেশে মূলত ভূর্জপত্র ও তালপাতার ওপর পুঁথি লেখা হত। পুঁথিগুলিকে সুরক্ষিত করার জন্য পুঁথির থেকে বড় মাপের দুটি কাঠের পাটা পুঁথির ওপরে ও নীচে রেখে পুঁথিটিকে বেঁধে রাখা হত। পুঁথি কিভাবে বাঁধলে তা দীর্ঘস্থায়ী হবে তারও একটি নিয়ম ছিল। এই পাটাগুলি কখনো কখনো চিত্রিত করা হত। বাংলায় পুঁথির পাটার ওপর অঙ্কনের একটি সমৃদ্ধশালী ধারা গড়ে উঠেছিল। পালযুগে বৌদ্ধধর্মকে আশ্রয় করে বহু তালপাতার পুঁথি অঙ্কিত ও চিত্রিত হয়েছিল। এই পুঁথিগুলির ওপরের পাটার ওপরও বৌদ্ধদের দেবদেবীর ছবি অঙ্কিত হত যা পবিত্র বলে মান্য করা হত। তাই এগুলিকেও পূজা অর্চনা করার জন্য অনেক সময় এই পাটচিত্রগুলি নষ্ট হয়ে গেছে। এখনও পর্যন্ত বাংলার পাটাচিত্র অঙ্কনের প্রাচীনতম নিদর্শনটি পাল যুগ হতেই পাওয়া গেছে। মহীপাল দেবের আমলে ৯৮৬ খ্রিস্টাব্দে অঙ্কিত অষ্টসহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা পুঁথির পাটাচিত্রগুলি প্রাচীনতম নিদর্শন হিসেবে গণ্য করা হয়।

পালযুগে পাটাচিত্রের যে সমৃদ্ধ ধারাটি পরিলক্ষিত হয় পালবংশের পতনের পর সেই ধারাটি ক্ষীণ হয়ে আসে যা পরবর্তীকালে বিষ্ণুপুরে নবজীবন লাভ করে। বিষ্ণুপুরে অঙ্কিত পাটাচিত্রের প্রাচীনতম নিদর্শনটি হল ১৪৯৯ খ্রিস্টাব্দে অঙ্কিত বিষ্ণুপুরাণ। এখানে পাটার ওপর বামন থেকে কল্কি পর্যন্ত বিষ্ণুর ছয় অবতারকে সারিবদ্ধভাবে অঙ্কন করা হয়েছে। অঙ্কন রীতিতে মধ্যযুগীয় রীতির ছাপ স্পষ্ট যা পালযুগের শেষের দিকের চিত্রকলাতেও পরিলক্ষিত হয়েছে। অবতারের দৃশ্যে উড়িষ্যার পটচিত্রের প্রভাব দেখা গেলেও রাসমণ্ডল-এর পাটচিত্রের রাজস্থানীর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। বিষ্ণুপুরের রাজ পরিবার বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার পর পাটাচিত্রণের ধারাটি পুনরায় সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। এই সময়ে দুটি ফর্ম্যাটে পাটাচিত্র অঙ্কণ করা হয়েছে। প্রথম ধরনের পাটাচিত্রে কেবলমাত্র পাড়ের মতো সারিবদ্ধ বৈচিত্র্যময় নক্সা অঙ্কিত। দ্বিতীয় ধরনে পাটাচিত্র পাটার চারপাশ ঘিরে পাড়ের অলংকরণ আঁকা থাকে ও তার মাঝের অংশটুকুতে অবয়বমূলক কম্পোজিশান আঁকা থাকে।

শৈলীগত বিচারে বাংলায় পাটাচিত্রের ওপর উড়িষ্যার রীতি অঙ্কনকে তিনটি ধারায় ভাগ করা যায়। উড়িষ্যা রীতি প্রভাবন্বিত ধারা, রাজস্থানী রীতি প্রভাবান্বিত ধারা, দেশজ বঙ্গরীতি। বিষ্ণুপুরের যোগেশচন্দ্র পুরাকৃতি ভবনে যে পাটাচিত্রগুলি রক্ষিত আছে তার মধ্যে বেশ কিছু পাটাচিত্রে রাজস্থানী চিত্রশৈলীর প্রভাব পাওয়া যায়। সম্ভবত বিষ্ণুপুর মল্লরাজাদের রাজধানী হওয়ার কারণে রাজস্থানীর বনিকরা এখানে বাণিজ্য সূত্রে আসেন এবং তাদের সাথেই আসে রাজস্থানী চিত্রশৈলী। এই সময়ে বিষ্ণুপুর ও বাঁকুড়া অঞ্চলে যে পাটাচিত্রের ধারা গড়ে উঠেছিল সেখানে রাজস্থানী শিল্পরীতির প্রভাব দেখা যায়। বাংলার দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চলটি নানা সময় উড়িষ্যা রাজের অধীনে ছিল। বাংলার প্রতিবেশি রাজ্য উড়িষ্যার শিল্পরীতির

প্রভাব মেদিনীপুরে বিশেষ ভাবে পরিলক্ষিত হয়। উড়িষ্যায় পটচিত্রের ঐতিহ্য অত্যন্ত সমৃদ্ধশালী হওয়ার জন্য স্বভাবতই উড়িষ্যার চিত্রশৈলীর প্রভাব এখানে পড়েছিল।

সাধারণত: পাটাচিত্রের বিষয়বস্তু হল শ্রীকৃষ্ণের গোপীবৃন্দ সহ রাসনৃত্য বা রাসমণ্ডল, তাম্বুললীলা, রামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেক, মধুরালীলা, শ্রীকৃষ্ণের মথুরাযাত্রা, শ্রী গৌরাঙ্গের সংকীর্তন, বিষ্ণুর দশাবতার, কালী, শিব-দুর্গা প্রভৃতি। এছাড়া দু-একটি পটচিত্রে বৈষ্ণবভক্ত হিসেবে স্থানীয় শ্রেষ্ঠী ও ভূস্বামীদেরও চিত্রিত করা হয়েছে। সাধারণত: কাঠের পাটাগুলি পুঁথির মাপের থেকে সামান্য বড় নেওয়া হয়। $\frac{1}{2}$ ইঞ্চি থেকে $\frac{1}{4}$ ইঞ্চি মাপের পাটাগুলি মসৃণ করে বেছে নিয়ে তার ওপর সাদা রঙের প্রলেপ দিয়ে জমি তৈরি করে নেওয়া হত। কখনো কখনো কাঠের ওপর কাপড় মাউন্ট করে নিয়েও তার ওপর আঁকা হয়েছে।

ইউরোপীয়রা এদেশে মুদ্রণ শিল্প নিয়ে আসার পর হাতেলেখা পুঁথির কদর কমতে থাকে। হাতে লেখা পুঁথির জায়াগায় মুদ্রণজাত পুস্তক ক্রমশ জনপ্রিয়তা লাভ করতে থাকে। এর ফলে ক্রমশ পুঁথি লিখন ও চিত্রণের ধারটি অবলুপ্ত হয়ে যায়। এইভাবে পুঁথির পাটচিত্রণের সমৃদ্ধ ধারাটির সমাপ্তি ঘটে।

★ পটচিত্র :

বর্তমানে পট শব্দটি দ্বারা চিত্র বোঝায়। পট শব্দটি সম্ভবত সংস্কৃত শব্দ পট্ট হতে আগত ও যার অর্থ বস্ত্র। বস্ত্রের উপর অঙ্কিত চিত্রই পট নামে পরবর্তীকালে পরিচিত হয়েছে। পটের প্রাচীনত্ব ও সময়কাল নির্ণয় এখনও অমিমাংসিত। দীনেশচন্দ্র সেনের 'বৃহৎবঙ্গ' গ্রন্থে পাই, 'আমরা বুদ্ধের সময় হইতে একদল লোকের সাক্ষাত পাই যাহাদের ব্যবসা ছিল ছবি দেখাইয়া লোকের মধ্যে শিক্ষা প্রচার করা। ইহাদের উপাধি ছিল মস্করী। বুদ্ধ ও মহাবীরের সমসাময়িক জৈন ধর্মের আজীবক সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা গোশাল শঙ্খলীপুত্র নামে পরিচিত, কারণ তার পটুয়া পিতা দেবদেবীর ছবি এঁকে ফিরি বেড়াতেন। সপ্তম-অষ্টম শতাব্দীতে রচিত বিশাখদত্তের 'মুদ্রারাক্ষস' ও বাণভট্টের 'হর্ষচরিত'—উভয় গ্রন্থেই যমপট ও পটুয়াদের উল্লেখ আছে। সারা ভারতবর্ষ জুড়ে প্রাচীনকাল হতে পটের প্রচলন ছিল তার উত্তরাধিকার এখনও বঙ্গদেশে বর্তমান।

পট মূলত একধরনের 'পাবলিক আর্ট', নিছক লোক শিল্প নয়। এর audio-visual narrative চরিত্রটি লোকশিক্ষা বা জনসচেতনার জন্যেই আদিকাল হতে ব্যবহৃত হয়েছে। পটুয়ারা গ্রামে গ্রামে দূর দূরান্তে ঘুরে ঘুরে পট দেখিয়ে, গান শুনিয়ে লোকেদের মনোরঞ্জন করতেন। এটাই ছিল তাদের বৃত্তি। লোকজীবনকে নৈতিক ও সামাজিক আদর্শের প্রতি উদ্বুদ্ধ করাও ছিল পটুয়াদের উদ্দেশ্য। পটের মাধ্যমে সামাজিক জীবনের নীতি, নৈতিকতা, ধর্ম-অধর্মের বিচার সাধারণ জনজীবনে সঞ্চার করতেন। ডা. প্রদ্যোত ঘোষ তাই পটুয়াদের গণশিক্ষক (mass educator) বলেছেন।

Scanned with CamScanner

পশ্চিমবাংলায় বীরভূম, বাঁকুড়া, বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ, হাওড়া, হুগলি, পুরুলিয়া, মেদিনীপুর ও পূর্ববাংলারয় ঢাকা, কুমিল্লা, শ্রীহট্টের পটুয়ারা অঙ্কনের জন্য বিখ্যাত। ড. আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতে মেদিনীপুরের দক্ষিণ পশ্চিমে অর্থাৎ তমলুক অঞ্চলেই পটচিত্রের প্রথম উদ্ভব ও বিকাশ ঘটেছে এবং পরবর্তী বাঁকুড়া, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি অঞ্চলে এর প্রসার ঘটেছে। আকারানুযায়ী পটকে দুই ভাগে ভাগ করা হয় জড়ানো বা দীঘল পট ও চৌকো পট। লম্বা আকারের দীঘল পটের ক্ষেত্রকে কতগুলো চতুষ্কোণ অঞ্চলে ভাগ করে নেওয়া হয়। পটুয়ারা কাহিনীর প্রধান প্রধান ঘটনাগুলিকে ওপর থেকে নীচে পরপর চতুষ্কোন ক্ষেত্রগুলিতে অঙ্কন করেন—অনেকটা কমিক স্ট্রীপের মতো। পুরো পটটি পটের দু-প্রান্তে আটকানো লাঠির চারপাশে জড়ানো থাকে। পটুয়ারা গানের মাধ্যমে কাহিনি বিবৃত করেন ও গান অনুসারে পট ক্রমশ খুলতে থাকেন ও অন্য অংশ জড়াতে থাকেন। জড়ানো পটের গান ও ছবি পরস্পর পরিপূরক। পটের গানের কাজ হল ছবির অর্থ ও প্রসঙ্গ পরিস্ফুট করা। অনেক সময় গানের খুঁটিনাটি কথা ছবিতে থাকে না, মূল ঘটনাটি কেবল থাকে। জড়ানো পট যেহেতু একাধিক ছবির প্যানেল থাকে, তাই দুটি চিত্র পৃথক করার জন্য একটি নক্সা কাটা পাড় থাকে যাকে বাব বলা হয়। আবার পুরো পটটির সীমানা ঘিরে আর একটি চিত্রিত পাড় থাকে যেটি পুরো পটটির সীমা নির্দিষ্ট করে দিয়ে পটটিতে অঙ্কিত একাধিক চিত্রিত ক্ষেত্রকে একত্রীভূত করে এবং একতা প্রদান করে। বর্তমানে পটুয়ারা অনেক ক্ষেত্রেই পট ঘিরে দুটি নক্সাকাটা পাড় অঙ্কন করছে।

দীঘল পটে মূলত কাহিনিভিত্তিক পৌরানিক বিষয় অঙ্কিত থাকে, যেমন দুর্গার শাঁখা পরা, গঙ্গা-দুর্গা কলহ, দুর্গাপটে অসুর বধের পালা, জগন্নাথ লীলা, বিষ্ণুপুরের মদনমোহন কাহিনি, শিব-পার্ব্বতীর লীলা, সতীর দেহত্যাগ, মনসা পট, বেহুলা-লক্ষীন্দর, কমলে-কামিনী প্রভৃতি। এছাড়া রামের বনবাস, তাড়কা বধ, সীতাহরণ, সেতুবন্ধন, লক্ষ্মণের শক্তিশেল, কৃষ্ণজন্ম, কালিয়দমন, বস্ত্রহরণ, ননীচুরি, কৃষ্ণলীলা প্রভৃতি। এছাড়াও পটে সামাজিক বিষয় স্থান পেয়েছে। যেমন ক্ষুদিরাম পট, ফাঁসি পট, স্বাধীনতা পট, লাদেন পট প্রভৃতি।

চৌকো পট মূলত আয়তকার হয়। গাজীপট, কালিঘাট পট ও চক্ষু দানপট চৌকোপটের উল্লেখযোগ্য উদাহরণ। সাধারণত চৌকো পটের সঙ্গে গান সংযুক্ত থাকে না। কালীঘাট মন্দিরের পাশে কালীঘাট পট আঁকা হত যা তীর্থযাত্রীরা স্মারক হিসেবে কম দামে কিনে নিয়ে যেতেন। কালিঘাট পটের বৈশিষ্ট্য হল ধর্মীয় বিষয়গুলি ছাড়াও তার সামাজিক বিষয়গুলি। সমকালীন এলোকেশি মোহান্ত সম্বাদ, পটের বিবি, বাবুদের রক্ষিতাগৃহে গমন, কালীঘাট পটে অঙ্কিত হয়েছে। দক্ষিণবঙ্গ ও পূর্ববঙ্গে ব্যাঘ্রারোহী মুসলমান ধর্মপ্রচারকের ছবি আঁকা পটকে গাজীর পট বলা হয়। অনেকে মনে করে দক্ষিণবঙ্গের লোক দেবতা বড় খাঁ গাজীকে গাজী পটে আকা হয়েছে। ইনি বর্ণবিধি বা দক্ষিণ রায়ের মতো জঙ্গলে বাঘদের অধিষ্ঠাতা দেবতা মনে মানা হয়। পূর্ববঙ্গে যশোর, খুলনা, শ্রীহট্ট ও মৈমনসিংহে গাজীর পট আঁকার চলন আছে। সাঁওতাল অধ্যুষিত অঞ্চলে চক্ষুদান পটের সন্ধান মেলে। সাঁওতাল সমাজে কেউ মারা গেলে যাদব পটুয়ারা তাঁর প্রতিকৃতি পটে আঁকেন কিন্তু তাঁর চোখের মানটি আঁকেন না। মৃতের পরিবারের কাছে সেই মনিহীন মৃত্যুর্ব্যাগের প্রতিকৃতি দেখিয়ে যাদব পটুয়া বলেন মনিহীন অবস্থায় স্বর্গে গিয়ে সেই মৃত ব্যক্তি অত্যন্ত কষ্টে আছেন। যাদের পটুয়া তার পরিবারকে বলে সে যদি ছবিতে মনি এঁকে দেয় তাহলে সেই মৃত ব্যক্তিও স্বর্গে চক্ষু ফিরে পাবেন। কিছু অর্থে বিনিময় পটুয়া প্রতিকৃতির চোখের জায়গায় মনি এঁকে দেয় এবং বলে মৃত ব্যক্তি তার চোখ ফিরে পেয়ে আনন্দ করছে। সাঁওতালরা এই পটকে অনেক সময় যাদুপটও বলেন কারণ তাঁরা মনে করে পটুয়ারা যাদুর মাধ্যমে ছবি এঁকে চক্ষুদান করছেন।

◆ **অঙ্কন প্রক্রিয়া :** প্রখ্যাত লোকশিল্প গবেষক তারাপদ সাঁতরার লেখায় পাই; পট প্রথম দিকে তালপাতার ওপর আঁকা হলে তারপরে কাপড়ের ওপর আঁকা হত যাকে কাঁথা পট বলা হয়। পরবর্তীকালে হাতে তৈরি তুলোট কাগজের ওপর পট আঁকা শুরু হলেও বর্তমানে বাজার চলিত কার্টিজ বা আর্ট পেপারের ওপর পট আঁকা হয়। জড়ানো পটের লম্বাটে আকারের জন্য বাজার চলতি কাগজ, আঠা দিয়ে জুড়ে জুড়ে নির্দিষ্ট আকার দেওয়া হয়। যেহেতু পট বারবার জড়ানো ও খোলা হয় তাই দ্রুত পট নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই পটকে টেকসই করার জন্য পুরনো কাগজের ওপর কাগজটিকে মাউন্ট করা হয়। পটের দুইদিকে দুটি বাঁশের কঞ্চি লাগিয়ে দেওয়া হয় যাতে পটটি গুটিয়ে রাখা যায়।

Scanned with CamScanner

পটুয়ারা সাধারণত স্থানীয়ভাবে উপলব্ধ প্রাকৃতিক রং দিয়েই ছবি আঁকেন। এরফলে স্থানভেদে পটুয়াদের ব্যবহৃত রঙের উপাদানও বদলে যায়। সাধারণত পাকা তেলাকুচো ফল হতে লাল রং, পাকা টেপি ফল ও ঘুসুংটি মাটি হতে নীল রং, কাঁচা হলুদ থেকে হলুদ রং, নিমপাতা ও কাঁচা হলুদ মিশিয়ে সবুজ রং, চাল পুড়িয়ে গুড়ো করে কালো রং, পুঁই শাকের লাল ফলের সঙ্গে বেলের আঠা মিশিয়ে বেগুলি রং, চুনের সঙ্গে কাঁচা হলুদ ও বেলের আঠা মিশিয়ে গেরুয়া রং তৈরি করা হয়। সাধারণত পটুয়ারা বেলের আঠা বা তেঁতুলবীজের আঠা ব্যবহার করেন। বহুকাল পূর্বে পটুয়ারা আতপ চালের আঠাও ব্যবহার করতেন। বর্তমানে অনেক পটুয়াই বাজারে উপলব্ধ কালার বা অ্যাক্রোলিক কালার ব্যবহার করছেন। ঠিক একইভাবে তুলির ক্ষেত্রে বর্তমানে পটুয়ারা বাজারে উপলব্ধ তুলি ব্যবহার করা পছন্দ করেন, যদিও পূর্বে পটুয়ারা নিজেরা ছাগলের ঘাড়ের লোম বা কাঠবেড়ালির লেজের লোম দিয়ে প্রয়োজন মতো তুলি তৈরি করে নিতেন। যুগের প্রয়োজনে পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মেলাতে গিয়ে পটুয়ারা বদলে ফেলছেন তাদের উপকরণ, বিষয় ও শৈলী।

★ কলকাতার আঠারো উনিশ শতকের চিত্রকলা :

- আঠারো শতকের শেষে কলকাতা কার্যত ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী হওয়ায় ও কলকাতায় ব্যবসা বাণিজ্যের কারণে পুঁজিবিকাশের ফলে জীবিকার সুযোগের দরুণ নানা বৃত্তির ভাগ্যান্বেষীদের সঙ্গে অবক্ষয়ী পাটনা ও মুর্শিদাবাদ দরবারের উত্তর ভারতীয় চিত্রকরেরা পৃষ্ঠপোষকের খোঁজে কলকাতায় এসেছিলেন। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কাজে আসা বিদেশিদের পৃষ্টপোষকতায় এই অবাঙ্গালি চিত্রকরেরাই কলকাতায় চিত্রকলার সূত্রপাত করেছিলেন।
- কোম্পানি আমলে পৃষ্ঠপোষকদের চাহিদায় এই চিত্রকরেরা ক্যামেরাহীন যুগে যে স্বভাবধর্মী (ন্যাচারিলিষ্টিক) ছবি এঁকেছিলেন, তাকে উইলিয়াম আর্চার কোম্পানি পেইন্টিং বলেছেন। তাঁর মতে য়োরোপীয় চিত্রকলার প্রভাবেই এই স্বভাবধর্মী চিত্রকলা বিকশিত হয়েছিল। এই দাবি ঠিক নয়। জাহাঙ্গিরের আগ্রহে মুঘল দরবারের চিত্রকরদের দ্বারা যে স্বভাবধর্মী চিত্রকলার সূত্রপাত হয়েছিল, কলকাতার সেই চিত্রকরদের ছবিতে সেই অঙ্কন পদ্ধতি, মাধ্যম ও শৈলীরই প্রসারণ দেখা দিয়েছিল। এই ছবির স্বভাবধর্মিতা ছিল য়োরোপীয় স্বভাবধর্মী চিত্রকলা থেকে স্বতন্ত্র।
- সমকালে ভাগ্যান্বেষী চিত্রকরেরা কলকাতায় ব্যবসা করলেও এই ভারতীয় চিত্রকরেরা অতি সামান্য মজুরিতে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে আঁকতেন বলে সরকারি সর্বেক্ষণ দপ্তরের জন্যও এঁদের দিয়ে ন্যাচারাল হিস্ট্রি পেইন্টিং করানো হত। সে সময় এ দেশে জীবিকা হিসেবে চিত্রকরবৃত্তির সামাজিক মর্যাদা ছিল না, এই চিত্রকরেরাও শ্রমজীবির

বেশি সম্মান পাননি। আর্থিক কারণে তাঁরা কখনো সওয়ারি গাড়ির গায়ে নক্সা আঁকতেও বাধ্য হতেন। এই কোম্পানি চিত্রকলা উনিশ শতকের মাঝামাঝি অবধি অব্যাহত ছিল।

- ক্রম প্রসারিত ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থায় চাকরির সুযোগ বৃদ্ধির ফলে বিভিন্ন বৃত্তিতে দক্ষ কর্মী তৈরির লক্ষে যে সব প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয় সেটিই এদেশের প্রথম আঁক শেখার প্রতিষ্ঠান। ১৮৫৪-তে তৈরি হয় ক্যালকাটা স্কুল অফ ইন্ডাস্ট্রিয়াল আর্ট। এটিই পরবর্তীকালে সরকারি আর্ট স্কুলে রূপান্তরিত হয়। এই দুটি প্রতিষ্ঠানেই চিত্রাঙ্কনকে কারিগরি কাজের সহায়কবিদ্যা হিসেবে শেখানো হত। আর্ট স্কুলে পাশ্চাত্য পদ্ধতির চিত্রাঙ্কন শিক্ষা প্রবর্তনের দরুন ও সর্বেক্ষণ দপ্তরগুলির চিত্রকলার চাহিদা এই স্কুলে প্রশিক্ষিত ছাত্রেরা মেটানোর ফলে উনিশ শতকের মাঝামাঝি কোম্পানি চিত্রকলার কৌলিক চিত্রকরদের চাহিদা কমে আসে ও এই ধারা বন্ধ হয়ে যায়।
- কোম্পানি পেইন্টিং-এর সমকালে উনিশ শতকের গোড়ায় কলকাতায় উত্তরে ও দক্ষিণে প্রায় এক সঙ্গে দুটি বিশিষ্ট চিত্রশৈলী বিকশিত হয়। এর একটি কালিঘাটের পট, অপরটি বটতলার ছাপা ছবি। এদেশে বিশিষ্ট মন্দির ঘিরে জমায়েত বাজারে কোন একটি বিশেষ স্মারক শিল্প গড়ে উঠতে দেখা গেছে। কালিঘাট পট তেমনি স্মারক শিল্প হিসেবে উদ্‌গত হয়েছিল। কালিঘাটের মন্দির বাজারে পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন গ্রাম থেকে সমবেত কৌলিক পটুয়া ও মূর্তিকাররা পুতুল ও মরশুমি মূর্তি গড়ার অবসরে পট আঁকতেন। পয়সা-পয়সা দামে বিকোবার জন্য তাঁর চটজলদি আঁকার একটি পদ্ধতি তৈরি করেছিলন। গোড়ায় তাঁরা দেবদেবীর ছবি আঁকলেও ১৮৭৪ এর পর থেকে তাঁরা সামাজিক বিষয় আঁকতে থাকেন ও এভাবে প্রত্যক্ষ সামাজিক সমস্যাকে শিল্পের অঙ্গীভূত করেন। বাংলার কৌলিক বৃত্তিজীবি পটুয়ারা ছবি দেখিয়ে গান গেয়ে জীবিকা নির্বাহের জন্য জড়ানো পট আঁকতেন। কালিঘাটে তাঁরা বিক্রির জন্য চৌকো পট আঁকা শুরু করেন। দোকানে ছবি সাজিয়ে তাঁরা সরাসরি ধর্মার্থী ক্রেতাদের কাছে বিক্রি করতেন।
- আঠারো শ ষোলোতে কাঠখোদাই ও ধাতুখোদাই সহ ছাপা 'অন্নদামঙ্গল' থেকেই বাংলায় সচিত্রিত গ্রন্থ প্রকাশের সূত্রপাত। ক্রমে বই সচিত্রণের কাজ জোরদার হয়ে ওঠে। বইতে ছাপার জন্য ছবিতে অঙ্কণদক্ষতার চেয়ে তক্ষণদক্ষতা বেশি জরুরি ছিল। তখনও এদেশে জীবিকার ব্যাপার ছিল প্রবল কৌলিকবৃত্তি নির্ভর। চিত্রকরবৃত্তি ভদ্রলোকের বৃত্তি বিবেচিত হত না। তাই পেশাদার চিত্রকরের অভাবে এই কাজে তক্ষণে পটু কৌলিক বৃত্তিজীবিরাই এগিয়ে আসেন। বইয়ের বাজার তখন ছিল উত্তর কলকাতার গরানহাটা সন্নিহিত বটতলা অঞ্চলে। স্বাভাবিকভাবেই কাঠখোদাই ও ধাতুখোদাই ব্যবসা এখানেই গড়ে এবং নাম হয় বটতলার ছাপাছবি। ক্রমে এই শিল্পীরা বইয়ের ছবি ছাড়াও ব্রডশিট প্রিন্টস্ করতে থাকেন। বহুক্ষেত্রেই কালিঘাটের পটুয়ারা

Scanned with CamScanner

ও বটতলার খোদইকাররা একই ছক ব্যবহার করতেন। কালিঘাটের পট ও বটতলার ছাপাছবি কোনো নির্দিষ্ট পৃষ্ঠপোষকের নির্দেশে কিংবা বিত্তবানের চাহিদায় আঁকা হয়নি। এই ছবির শিল্পীরা স্বাধীনভাবে শিল্প রচনা করতেন সরাসরি সাধারণ মানুষের কাছে সস্তা দামে পৌঁছে দেওয়ার জন্য। এই ছবিই এদেশের প্রথম পাবলিক আর্ট। চেহারায় লোকশিল্প হলেও এই দুটি শৈলীর ছবিতে লোকশিল্পের প্রথা ভেঙ্গে সরাসরি ঘটমান বর্তমান সম্পর্কে মন্তব্য হতে দেখা গেছে।

- কোম্পানি শিল্পকলার চিত্রকররা ছিলেন বহিরাগত। ওঁদের ছবিতে মুখল পরম্পরার দরবারি অনুশীলন ও নাগরিক ছাপ স্পষ্ট ছিল। দরবারে যেমন তাঁরা পৃষ্ঠপোষকদের মর্জিতে আঁকতেন কোম্পানি আমলেও তাঁরা নির্দিষ্ট পৃষ্ঠপোষকদের বরাতে আঁকতেন। পক্ষান্তরে কালিঘাট ও বটতলার শিল্পীরা ছিলেন বাংলারই মানুষ। লোকচিত্রকলার আদল তাঁদের কাজে ছিল স্পষ্ট এবং কোনো নির্দিষ্ট পৃষ্ঠপোষকদের মর্জিতে তাঁরা চিত্র চর্চা করতেন না।
- কালিঘাট ও বটতলার চিত্রকলা উনিশ শতকের শেষে ও এই শতকের গোড়ায় য়োরোপে অত্যন্ত সমাদরের সঙ্গে গৃহীত হলেও এ দেশে এই চিত্রকলা দীর্ঘকাল নিম্নবর্গের চিত্রকলা হিসেবে শিক্ষিত মানুষের অনাদর পেয়েছিল। পশ্চিমি বহু খ্যাতনামা আধুনিক চিত্রকরের কাজে এই চিত্রকলার প্রভাবও লক্ষ্য করা গেছে। আধুনিক চিত্রকলার বহু গুণাবলি এই নিম্নবর্গের শিল্পীদের কাজে স্বাভাবিকভাবেই প্রকাশিত হয়েছিল।
- আঠারো-উনিশ শতকে কলকাতায় বিকশিত এই তিনটি চিত্রকলার সূত্রপাতে ছিলেন সমাজের নিম্নবর্গের মানুষেরা, যাঁরা সামাজিক সম্মান ও উপযুক্ত পারিশ্রমিক থেকে বঞ্চিত ছিলেন। দেশে ও বিদেশে ছাপা শস্তাদামের বর্ণাঢ্য চটকদার ওলিয়োগ্রাফের সঙ্গে অসম প্রতিযোগিতায় কালিঘাটের পট ও বটতলার ছাপা ছবি ক্রমে বাজার খোয়াতে থাকে। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে এই দুটি ছবি লুপ্ত হয়। সামাজিক রুচির পরিবর্তন এর জন্য বহুলাংশে দায়ি।
- ঔপনিবেশিক শাসনের ছত্রছায়ায় কৌলিক বৃত্তিনির্ভরতা শিথিল হতে থাকে ও বিভিন্ন বৃত্তিতে চাকরির সুযোগ বাড়তে থাকে। আর্ট স্কুল পরম্পরায় এবং য়োরোপীয়দের কাছে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ভদ্র ঘরের উচ্চবর্গের সন্তানেরা চিত্রকলা নির্ভর চাকরিতে যোগ দিতে থাকেন। এরফলে ক্রমে যেমন—চিত্রকলা সামাজিক মর্যাদা পেতে থাকে সেই চিত্রকলার জীবিকার ব্যাপার নিম্নবর্গের কৌলিক বৃত্তিনির্ভর কিংবা স্বশিক্ষিত মানুষদের হাত থেকে উচ্চবর্গের প্রশিক্ষিত মানুষদের হাতে হস্তান্তরিত হতে থাকে। উনিশ শতকের শেষে ও বিশ শতকের গোড়ায় সংস্কৃতির এই হস্তান্তকরণ সম্পূর্ণ হয়। আঠারো-উনিশ শতকে কলকাতার চিত্রকলা নিম্নবর্গের মানুষের হাতে উদ্‌গত ও বিকশিত হলেও বিশ শতকের গোড়ায় কলকাতার চিত্রকলা উচ্চবর্গের সংস্কৃতি হয়ে

ওঠে। চেহারায় ও ভাবনায় এই বিশ শতকের চিত্রকলা ছিল পূর্বতন চিত্রকলা থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এবং এই চিত্রকলার আবেদনও ছিল স্পষ্টত উচ্চবর্গের শিক্ষিত মানুষদের কাছেই।

★ কোম্পানি চিত্রকলা :

- **মুর্শিদাবাদ :** বাংলার জমিতে কোম্পানি শৈলির প্রথম দেখা গিয়েছিল—মুর্শিদাবাদ শহরে, কারণ মুর্শিদাবাদ ছিল তৎকালীন বাংলার রাজধানী। ১৭৭৬ সালে ইংরেজরা তৎকালীন নবাবকে ক্ষমতাচ্যুত করে মুর্শিদাবাদে রাজনৈতিক অধিকার কায়েম করে। এই অবস্থায় মুর্শিদাবাদের শিল্পীরা নতুন ইংরেজ পৃষ্ঠপোষকদের ছত্রছায়ায় নতুন বিষয় নিয়ে, নতুনভাবে ছবি আঁকতে শুরু করে। যেহেতু মুর্শিদাবাদের শিল্পীরা মুঘল আঞ্চলিক শৈলিতে আঁকতে অভ্যস্ত ছিলেন, সেই জন্য তারা প্রথমদিকে পুরাতন শৈলীতেই কাজ করতেন। পরবর্তীকালে তারা ক্রমশ: পাশ্চাত্য রীতির দিকে ঝোঁকেন। গুয়াশের বদলে স্বচ্ছ জল রঙের মাধ্যমে ছবি আঁকা শুরু হয় এবং শেডিং-এর ব্যবহারও বাড়তে থাকে।

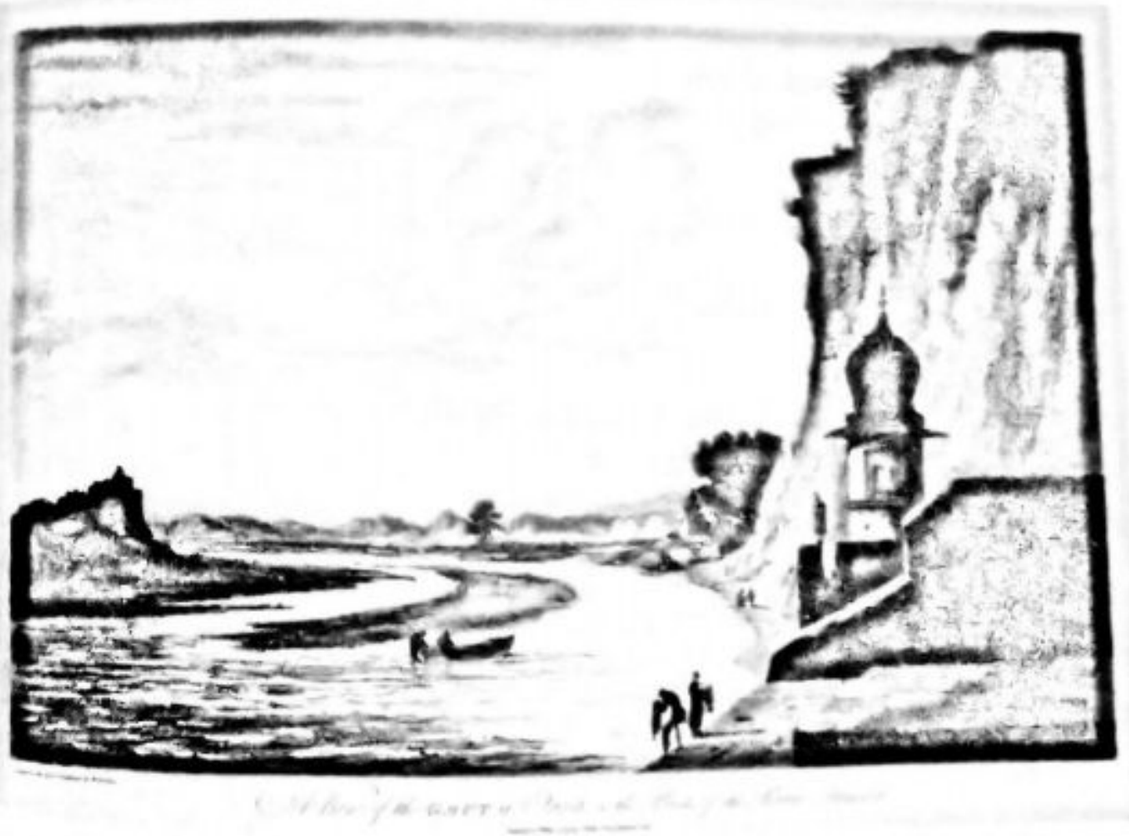

মুঘল পেন্টিং-এ ক্ষুদ্র পরিসরের পটের মধ্যে জমজমাট কম্পোজিশনের বদলে বড় আকারের ছবি আঁকার চল বাড়তে থাকে। কম্পোজিশনে পূর্বেকার জমজমাট অবয়বের আধিক্য কমে গিয়ে কিছু সীমাবদ্ধ অবয়বের মাধ্যমে কম্পোজিশন আঁকা শুরু হয় এবং অবয়বগুলির দেহয়ের ঘিরে কালো কট্যার লাইনের ব্যবহার শুরু হয় অর্থাৎ এই সময়কার

Scanned with CamScanner

ছবি, মুর্শিদাবাদ শৈলী এবং ইউরোপীয় শৈলীর মিশ্রজাত চিত্রকলা হিসেবে গড়ে উঠেছিল।

ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আমলে ইংরেজরা যে সমস্ত খেটে খাওয়া মানুষের সংস্পর্শে আসতেন, তাদের ছবি আঁকতেন, যেমন—হুকো বরদার, নাপিত, ধোপা, মুচি, ভিস্তিওয়ালা, কুমোর, রাজমিস্ত্রি প্রভৃতি বিভিন্ন বৃত্তিতে নিযুক্ত মানুষের ছবি আঁকা হত। এদেশের ইংরেজরা যা কিছু কৌতুহলোদ্দিপক বলে মনে করতেন তাই তারা আঁকতেন, যেমন—এদেশের মানুষের পোষাক-আশাক, হাটবাজার, নানারকম উৎসব অনুষ্ঠান, যানবাহন, হিন্দুদেবদেবী প্রভৃতি। সেই সময়কার বিশিষ্ট্য শল্য চিকিৎসক উইলিয়াম ফুলাটনের সংগ্রহে এই ধরনের বেশ কিছু ছবি ছিল যা বর্তমানে 'ভিক্টোরিয়া অ্যালবার্ট মিউজিয়াম' (ইংল্যান্ড)-এ রয়েছে।

মুর্শিদাবাদে কাগজ ছাড়াও অভ্রের পাতের ওপর ছবি আঁকা হত। এই সময় অভ্রের পাতের ওপর ইংরেজদের বিভিন্ন প্রতিকৃতি অঙ্কনের চল বেড়েছিল। এছাড়া শোভাযাত্রা ব উৎসবের ছবিও এই পাতের ওপর আঁকা হত। ইংরেজরা বাংলার রাজধানী মুর্শিদাবাদ থেকে স্থানান্তরিত করে কলকাতায় নিয়ে আসেন। এরফলে কোম্পানি চিত্রকলায় কলকাতা পর্ব শুরু হয়।

● **কলকাতা :** ইংরেজরা ভারতবর্ষকে নিজেদের উপনিবেশ হিসেবে অধিকারভুক্ত করার পর প্রশাসনিক কাজের প্রয়োজনে বহু শিল্পীর প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। যেমন—জমি জরিপ করার জন্য, বাস্তু বা স্থাপত্য কাজের নক্সা করার জন্য, আর্কিওলজিকাল সার্ভ অফ ইন্ডিয়া, জিওলজিকাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া, বোটানিকাল গার্ডেন, মেডিকাল কলেজ প্রভৃতি স্থানে প্রচুর পরিমাণ শিল্পীর দরকার হয়ে উঠেছিল। এই সমস্ত কাজগুলির ক্ষেত্রে যদি বিদেশ থেকে প্রশিক্ষিত শিল্পী আনতে হত, তা হলে তা যথেষ্ট ব্যয়সাপেক্ষ হয়ে উঠত। তাই এই সমস্ত কাজের জন্য ইংরেজরা দেশি শিল্পীদের নিজেদের প্রয়োজন মতো শিক্ষিত করে নিয়ে ছিলেন। শিবপুরের বোটানিকাল গার্ডেনে লতাপাতা, ফুল, ফট, বৃক্ষের ছবি আঁকার জন্য দেশি শিল্পীদের নিয়োগ করা হয়েছিল। এই সমস্ত দলিলি করণের জন্য বাস্তবভিত্তিক ছবি আঁকতে দেশি শিল্পীদের কোনও অসুবিধা হয়নি, কারণ মুঘল শিল্পীদের মধ্যে পশু, পাখির বাস্তব চিত্রণের ধারা প্রচলিত ছিল। এইভাবে চিকিৎসাশাস্ত্রে প্রয়োজনীয় ছবি, পশুশালার পশু, পাখির ছবি, ভারতের প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় স্থাপত্যের ছবি, এই সমস্ত কিছুই দেশি শিল্পীরা অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে করেছিলেন। সুপ্রিম কোর্টের তৎকালীন প্রধান বিচারপতি স্যার এলিজা ইম্পের পত্নী ভারতে বহু পুঁথি ও চিত্র ছাড়াও বিভিন্ন পশু, পাখির সংগ্রহশালা গড়ে তুলেছিলেন। শ্রীমতি ইম্পে এই ছবি আঁকার জন্য তিনজন পাটনার শিল্পী নিযুক্ত করেন। এরা হলেন—জৈনুদ্দিন, ভবানী দাস ও রাম দাস।

ebook.dascoaching.in

এদের আঁকা পশু পাখির চিত্রগুলি অত্যন্ত নিখুঁত ও বাস্তবসম্মতভাবে আঁকা। মুঘল পরম্পরায় নিখুঁত পর্যবেক্ষণ এবং ডিটেলের কাজের সঙ্গে ব্রিটিশ ধারার মিলন ঘটেছিল। এই সব দেশি শিল্পীরা হোয়াইটম্যান কাগজের ওপর ব্রিটিশ রীতির স্বচ্ছ রঙের কাজ করতেন। প্রথমদিককার কোম্পানি শৈলির দেশি শিল্পীদের মধ্যে জৈনুদ্দিন বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

এই সমস্ত দেশি শিল্পীদের বিদেশি শিল্পীরা তাদের সহকারি হিসেবে নিতেন এবং তাদের নিজেদের প্রয়োজন মতো শিক্ষিত করিয়ে নিতেন। যেমন—ড্যানিয়েল, এনগ্রেভিং পদ্ধতিতে কাজ করার জন্য দেশি শিল্পীদের সাহায্য নিয়েছিলেন। পৃষ্ঠপোষকদের রুচি এবং চাহিদাকে তৃপ্ত করার জন্য দেশি শিল্পীরা নিজেদের ছবির বিষয় এবং প্রকরণ বদলে ফেলেছিলেন। বহু ছবি পাওয়া যায় যা দেখে মনে হয় যেন দেশি ছবি এবং বিদেশি ছবির মিশ্রণ যা 'ভাচ বেঙ্গল স্কুল' নামে খ্যাত। এখানে দেখা যায় বিভিন্ন পটের বা ধর্মীয় ছবির গড়নকে অক্ষুন্ন রেখে তৈলচিত্রের বৈশিষ্ট্য তাতে প্রয়োগ করা হয়েছে। অর্থাৎ তেল রঙে আঁকা দেশি বিষয়ক ছবি। এছাড়া ইউরোপীয় বাস্তবাদীতাকে গ্রহণ করে বেশ কিছু শিল্পী কাজ করেছিলেন। যেমন—শেখ মহম্মদ আমীরের আঁকা ঘোড়ার ছবিটিতে দেখি ইউরোপীয় বাস্তবধর্মীতা, আলোছায়ার ব্যবহার এবং পরিপ্রেক্ষিত জ্ঞান।

★ কালিঘাট পট :

উনবিংশ শতকের প্রথমভাগে কালিঘাট মন্দির অঞ্চলে পটুয়াদের হাতে যে বিশেষ ধরনের পটশিল্পের ধারা গড়ে ওঠে তা কালিঘাট পট নামে খ্যাত। কলকাতার উপকণ্ঠে কালিঘাট এক প্রাচীন শক্তিপীঠ যার উল্লেখ পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে (১৪৯৫ খ্রিস্টাব্দ) রচিত বিপ্রদাসের মনসাবিজয় ও ষষ্ঠদশ শতাব্দীতে রচিত মুকুন্দরামের চন্ডীতে পাওয়া যায়। ১৮০৯ খ্রিস্টাব্দে সাবর্ণ জমিদাররা কালিঘাটের মন্দিরকে পুর্নসংস্করণ করেন ও এর পাশে

Scanned with CamScanner

একটি বাজার বসান। কলকাতা ইংরেজদের রাজধানীতে পরিণত হওয়ায় কলকাতার শ্রীবৃদ্ধি ঘটার সঙ্গে সঙ্গে কালিঘাটের মন্দিরে তীর্থযাত্রীদের আগমনও বৃদ্ধি পায় ও এটি ক্রমশ জমজমাট হয়ে উঠতে থাকে। সম্ভবত এই সময়ই কালিঘাট মন্দিরের পাশের বাজারে এসে জমায়েত হন পটুয়ার দল। এর আগে যে পটুয়ারা কালিঘাটে এসেছিলেন তার কোনো প্রামান্য তথ্য পাওয়া যায় না।

এই কালিঘাট মন্দিরের পাশে পটুয়ারা যে কোথা থেকে এসেছিলেন, তার কোনো নির্দিষ্ট তথ্য পাওয়া যায়নি। অনুমান করা হয় হয় কালিঘাট মন্দির জমজমাট হয়ে উঠলে পটুয়ারা এবং পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য পটুয়া প্রধান জেলাগুলি, যেমন বাঁকুড়া, বীরভূম, মেদিনীপুর, হুগলি, হাওড়া থেকে জীবিকার খাতিরে বিভিন্ন পটুয়ারা এখানে জমা হয়েছিলেন। প্রাথমিকভাবে এদের চিত্রের বিষয় ছিল নানা রকম হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি, যার ধারণা তারা শাস্ত্র থেকে গ্রহণ না করে লৌকিক সাহিত্য থেকে করেছিলেন। কালিঘাটের পটুয়ারা মার্গীয় লক্ষণকে মান্য করে দেবতা চরিত্র অঙ্কন করেননি, বরং বাংলার মঙ্গলকাব্যের অনুসরণে কালিঘাটের শিব মধ্যবয়স্ক, অলস, গৃহ উদাসীন, ভুড়িওয়ালা এক পুরুষ। পরবর্তীকালে কালিঘাটের পটে ধর্মীয় বিষয় ছাড়াও সামাজিক বিষয়ও উঠে আসে। তীর্থযাত্রীরা কালিঘাট মন্দির দর্শনে এলে স্যুভেনির হিসাবে অত্যন্ত অল্পমূল্যের এই পটগুলি কিনে নিয়ে যেতেন।

অন্যান্য লোকচিত্রের মতো কালিঘাট পটের একটি ছক বা টাইপ তৈরি হয়েছিল যা বাংলার অন্যান্য পটচিত্র থেকে একদম আলাদা। এই ছক কালিঘাটের পটুয়াদের একদম নিজস্ব নির্মাণ যা হঠাৎ করে গড়ে ওঠেনি। এই ছক যে একদিনে তৈরি হয়নি তা কালিঘাটের প্রথমদিককার ছবি দেখলেই বোঝা যায়। বাংলার ঐতিহ্যবাহী মাটির পুতুল, সরাচিত্র থেকে তারা তাদের আঁকা দেহাবয়বের দশাশই ভাব আহরণ করেছিলেন।

কালিঘাট পট মূলত রেখা নির্ভর। বাংলার ঐতিহ্যবাহী জড়াড়ো বা চৌকো পটও রেখা নির্ভর। কিন্তু কালিঘাট পটের রেখার সঙ্গে ঐতিহ্যবাহী পটের রেখার যথেষ্ট প্রভেদ পাওয়া যায়। কালিঘাটের পটের রেখা মূলত মৃৎশিল্পীদের হাতের রেখা-যারা অবসর সময়ে পুতুল গড়েন, হাড়ি, সরা চিত্রায়িত করেন। সেই রেখার গুণ কালিঘাট পটেও বর্তেছিল। যার জন্য কালিঘাট পটের রেখা বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায়তা মূলত বাংলার মাটির পুতুলের ওপর অঙ্কিত রেখারই একটি সম্প্রসারিত রূপ। কালিঘাট পটের রেখা অত্যন্ত দ্রুত, সাবলীল সরল, বলিষ্ঠ ও অলংকরণের ভারমুক্ত। কুম্ভকার বা মৃৎশিল্পীদের প্রচলিত তুলির টান ছাড়াও কালিঘাট পটে এক বিশেষ ধরনের রেখা দেখা গিয়েছিল যা কালিঘাট পটের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। সরু ডগার মোটা তুলি জলে ভিজিয়ে কেবলমাত্র ডগায় গাঢ় ঘন রং নিয়ে কাগজের ওপর চেপে আঁকলে একটি মোটা রেখা নির্মিত হয় যার একটি পাশ কড়া রঙে ও অন্য পাশ ক্রমশ হাল্কা হয়ে বিনীয়মান পর্দা তৈরি করে। এই রেখাই কালিঘাটের পটুয়ারা ব্যবহার করতেন দেহাবয়বের পরিণাহ বা কন্ট্যুর আঁকার জন্য। এইভাবে রেখা টানার কায়দাটি কালিঘাটের পটুয়াদের একদম নিজস্ব উদ্ভাবন। হাত, পা, দেহকান্ড প্রভৃতির দুদিকের পরিণাহে এই রেখা টানার জন্য দেহাবয়বের মধ্যে এক ভারী স্তম্ভসদৃশ আভাস তৈরি হত। এই রেখা গড়নের রেখা যা অবয়বকে ভাস্কর্যসুলভ ডৌল প্রদান করত। এছাড়া কালিঘাট পটে আরো তিনধরনের রেখা দেখা যায়। শাড়ির পাড়ে, জুতো, কালো চুলে সামান্য মোটা তুলিতে রং নিয়ে সমতালীয়ভাবে চাপানো হত। এইসব ক্ষেত্রে শিল্পী সবচেয়ে গাঢ় রং ব্যবহার করতেন যা পরিণাহ রেখার বৈশিষ্ট্যপূর্ণ চরিত্রকে আরো পরিস্ফুট করে তুলত। পেছনের পশ্চাৎপটে, শাড়ি প্রভৃতিতে অর্থাৎ বড় অংশে হাল্কা সমতলীয় রং দিয়ে মোটা তুলিতে ভরাট করা হত। হাত পায়ের আঙ্গুল, চোখ, নাক প্রভৃতি আঁকতে দ্রুত ক্ষুদ্র নিপুন রেখা সরু তুলি দিয়ে টানা হত। এই রেখা একই ভাবে পুতুলের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা হত। এই চার ধরনের রেখা পরস্পর মিলে পুরো ছবিটিকে বাঁধুনি দিত।

কালিঘাটের পটের মধ্যে লৌকিক চরিত্র থাকলেও তার সঙ্গে নাগরিক মানসিকতার মিশ্রণ ঘটেছিল যা চরিত্রগতভাবে কালিঘাট পটকে অনন্য করে তুলেছিল। কুলগতভাবে ও জাতিগতভাবে যারা কালিঘাটের পট আঁকতেন তারা ছিলেন নিম্নবর্গের মানুষ এবং গ্রাম থেকে জীবিকার সন্ধানে এখানে এসে ঠাঁই নিয়েছিলেন। কিন্তু কালিঘাট কলকাতার একদম কাছাকাছি হওয়ার জন্য কলকাতার নাগরিকতার ছোঁয়াও এর মধ্যে এসেছিল। পটের একটি বড় বৈশিষ্ট্য হল জনসচেতনতা যা কালিঘাট পটের মধ্যে দেখা গিয়েছিল। উনবিংশ শতাব্দীতে উপনিবেশ বাংলার সামাজিক কাঠামোর মধ্যে একটা বড় ধরনের ভাঙ্গাচুর চলছিল। ইংরেজ শাসনকালে বিদ্যা, যা কেবল ব্রাহ্মণদের জন্য সংরক্ষিত ছিল, তা উন্মুক্ত হয়ে যায় জাতিকুল নির্বিশেষে সর্বসাধারণে জন্য যা সরাসরিভাবে ভারতবর্ষের জাতি নির্ভর বৃত্তি নির্বাচনের ভাবনাকে প্রভাবিত করে। এছাড়া বিভিন্ন ধর্ম সংস্কার ও তৎসম্বন্ধীয় আন্দোলনগুলিও উঁচুতলার

Scanned with CamScanner

সমাজকে আলোড়িত করে তুলেছিল যার কম্পন নীচুতলার মানুষরাও অনুভব করেছিল। এছাড়া ক্রমশ প্রকট হয়ে উঠেছিল উঁচুতলার সমাজের অন্তঃসারশূন্যতা, লাম্পট্য, বাবু সংস্কৃতি। কালিঘাটের পটুয়ারা শুধু ধর্মীয় ছবি আঁকেননি—এই সমাজের ছবিও ফুটিয়ে তুলেছিলেন তাদের পটে।

তাই বিষয়কে কেন্দ্র করে কালিঘাট পটে দুটি পর্ব লক্ষ্য করা যায়। প্রথমত আঠারোশ তিয়াত্তরের আগের পর্ব এবং দ্বিতীয়ত আঠারশ তিয়াত্তরের পরের পর্ব। প্রথম পর্বে কালিঘাট পটুয়ারা মূলত ধর্মীয় বিষয় নিয়ে ছবি আঁকতেন ও দ্বিতীয় পর্বে কালিঘাটের পটুয়ারা ধর্মীয় বিষয় ছাড়াও সামাজিক ও অন্যান্য বিষয় নিয়েও ছবি এঁকেছিলেন। ধর্মীয় পট আঁকতে গিয়ে তারা মূলত এঁকেছিলেন কালী, এছাড়া শিব, রাধাকৃষ্ণ, গণেশ, গৌরনিতাই, রামায়ণ, দশমহাবিদ্যা, দশাবতার, দুর্গা প্রভৃতি। এই দ্বিতীয় পর্বের সামাজিক বিষয়ের উপর নির্ভর করে আঁকা পটগুলি বিশেষভাবে কৌতুহলোদ্দিপক। এই সামাজিক পটে আঁকা হয়েছে বাঙালির বাবুয়ানা, বাবু ও তার রক্ষিতা, পটের বিবি, বারঙ্গনা সুন্দরী, ইংরেজদের খেলাধূলা, উপরতলার মানুষদের লাম্পট্য উন্নার্গগামিতা প্রভৃতি। পটুয়ারা একেবারে নিরপেক্ষভাবে এগুলি আঁকেননি বংর এক ধরনের তীর্যক ব্যাঙ্গার্থক মনোভাব এই আঁকাগুলির মধ্যে কাজ করেছিল। পটুয়ারা সেই সময়কার (1873) বিখ্যাত কেচ্ছা এলোকেশী ও মহান্তকে নিয়েও একাধিক ছবি এঁকে সেই সময়কার ধর্ম নিয়ে ভন্ডামীকেই তুলে ধরেছেন। স্ত্রৈন স্বামীর ভেড়া বনে যাওয়া, স্ত্রী বা রক্ষিতার পদবন্দনা, বৌকে মাথায় চড়িয়ে মাকে অবহেলা প্রভৃতি পটগুলিতে পটুয়াদের একধরনের নীতিবাচক ব্যাঙ্গাত্মক মনোভাবই ব্যক্ত হয়েছে। চরিত্রগতভাবে পট লোকশিল্পের অন্তর্গত হলেও কালিঘাট পটের মধ্যে এক প্রবল নাগরিক পরিশীলনের ছোঁয়া দেখা গিয়েছিল। যার জন্য কালিঘাট পটুয়ারা শ্যামাকান্ত লড়াইয়ের দৃশ্য এঁকেছেন। এরা যে তৎকালীন সামাজিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে এতটা সচেতন ছিলেন তা হাতির পিঠে চড়া সাহেবের বাঘ শিকারের পটটি বিশ্লেষণ করলেই বোঝা যায়।

★ এদেশে আগত বিদেশি চিত্রকর :

ইংরেজরা রাজধানী স্থানান্তরিত করার পর কলকাতায় বসবাস করার জন্য কলকাতাকে নিজেদের মতো করে সাজিয়ে নিলেন। এখানে ভিড় জমালো বাঙ্গালী ধনী বাবুরা। কলকাতা একটি ধনী রাজধানী শহর হিসেবে আত্মপ্রকাশ করল। ইংল্যান্ডে খবর পৌঁছেছিল ভারতবর্ষের মাটিতে অর্থ ওড়ে এবং সঙ্গে এ খবরও পৌঁছেছিল বহু ইংরেজ সাহেবরা কিভাবে ভারতের রাজনৈতিক নিজেরা এক একজন ক্ষুদে নবাব হয়ে উঠেছিল। এই জন্য যেসব শিল্পীরা ইংল্যান্ডে যশ করতে আরেনি, তারা নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তনের আশায় ভারতবর্ষে এসে ভিড় জমালেন। এরা ইংল্যান্ডের রয়াল আকাডেমির প্রচলিত ধারার আদলে এদেশে ছবি

আঁকা শুরু করেন। ইংরেজ শিল্পীদের মধ্যে যারা কলকাতায় প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন তাদের মধ্যে উল্লেখ্য হলেন,—জন জোফানী, টিলিকেটল, রবার্ট হোম, টমাস হিকি, হামফ্রি, চার্লস ডয়েলি প্রভৃতি।

ইংল্যান্ড ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বহু গল্প প্রচলিত ছিল। তাদের কাছে ভারতবর্ষ ছিল সোনার দেশ, যেখানে হাতি, সাপ, উলঙ্গ ফকির প্রভৃতি ঘুরে বেরায় এবং অনির্বচনীয় এর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য। সেই কারণে ইংল্যান্ডের লোকেরা ভারতবর্ষের সমস্ত কিছু সম্বন্ধে কৌতুহলী ছিলেন। তারা ভারতবর্ষের ভিন্ন জীবিকার বা বৃত্তির মানুষের ছবি, বিচিত্র বেশভূষা, জীবনধারা এবং প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলির ছবি আঁকতেন। ইংল্যান্ডে এই সমস্ত আঁকা ছবিগুলির বেশ ভালো কদর ছিল এবং তা খুব সহজে বিক্রি হয়ে যেত। তৈল মাধ্যমে আঁকা হলেও পরে এগুলিকে এনগ্রেভিং, অ্যাকোয়াটিন্ট এবং লিথো পদ্ধতিতে ছাপাই ছবির অ্যালবাম বানানো হত, যাতে করে একসঙ্গে বহু ছবি বিক্রি করা যায়। এই ধরনের ছবির প্রথম সফল শিল্পী হলেন উইলিয়াম হজেস্, যিনি বারাণসী, কলকাতা, লক্ষ্ণৌ, আগ্রা ও অন্যান্য স্থান পরিক্রমণ করে বহু স্কেচ করেছিলেন এবং তার ভিত্তিতে এনগ্রেভিং প্রিন্টের অ্যালবাম 'সিলেকটেড ভিউজ অফ ইন্ডিয়া' প্রকাশ করে বহু অর্থ উপার্জন করেন।

টমাস ও উইলিয়ম ড্যানিয়েল আট বছর ধরে এদেশে নিস্বর্গ এবং দৈনন্দিন জীবনযাত্রার ছবি এঁখে অত্যন্ত খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তাঁরা উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের সমস্ত উল্লেখযোগ্য স্থানগুলি ঘুরে ঘুরে ছবি এঁকেছিলেন। তাঁরা ছবি আঁকার জন্য 'অবস্কিউরা' নামে একরকম যন্ত্র ব্যবহার করে নির্বাচিত দৃশ্যকে সাদা কাগজের ওপর লেন্সের সাহায্যে প্রতিফলিত করতেন। এই প্রতিফলিত দৃশ্যের সাহায্যে তাঁরা অত্যন্ত নিখুঁতভাবে প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীর রূপায়ণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ড্যানিয়েলদের ছবির বৈশিষ্ট্য হল, আলোকচিত্র সাদৃশ বিশ্বস্ততা। এদের তেল রঙে আঁকা বিশালাকৃতির ছবিগুলি ছাড়াও বেশ কিছু এনগ্রেভিং অ্যালবাম প্রকাশিত হয়েছিল। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—'Twelve Views of Calcutta', 'Oriental Scenary', 'Pictures Voice of India' প্রভৃতি।

এছাড়া 'সলভিনোজ দম্পতি'-র লিথোগ্রাফে করা এদেশের বাঙ্গালি জীবনধারার পালা-পার্বণ, পোশাক-আশাক, আচার-আচরণের ছবি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এছাড়া সেই সময় কিছু বিদগ্ধ ব্যক্তিদের প্রতিকৃতি চিত্রণের রেওয়াজ বিশেষভাবে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। এই প্রতিকৃতি চিত্রকরদের মধ্যে, টিলিকেটল, জন জোফানী, টমাস হিকি, রবার্ট হোম, জেমস আর্চার বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

Scanned with CamScanner

✪ ৪.৩ শিক্ষায় ড্রইং ও পেন্টিং-এর ব্যবহার— চার্ট তৈরি, পোস্টার তৈরি, ম্যাচস্টিক ড্রইং ও অন্যান্য শিক্ষোপকরণ (Use of Drawing and Painting in Education–Chart making, Poster making, match-stick drawing and other forms) :

❑ ৪.৩.১ চার্ট তৈরি (Chart making) :

সময়ের অগ্রগতির সাথে সাথে শ্রেণিকক্ষের ধরন পাল্টেছে এবং সেই সাথে শিক্ষকের ভূমিকাও বদলেছে। শিক্ষক আজ শুধু জ্ঞান বা তথ্য বিতরণের উৎস নন। শিখন পদ্ধতিতে শিশুর সক্রিয়তার গুরুত্ব এখন পরীক্ষিত সত্য। একটি শ্রেণিকক্ষ হবে শিশুদের তথ্য ভাণ্ডার-যে ভাণ্ডার পূর্ণ হয়ে উঠবে শিশুর সক্রিয় অংশগ্রহণে এবং নানাবিধ পাঠদান ও শিখনের উপকরণ ব্যবহারের মাধ্যমে। শিক্ষণ-শিখন উপকরণ বলতে শিখন-শিক্ষণ সহযোগী উপকরণের একটি ক্ষেত্রকে বোঝায়, যেগুলি শিক্ষক ব্যবহার করেন পাঠপরিকল্পনায় বিবৃত নির্দিষ্ট শিখন উদ্দেশ্যাবলি অর্জন করার জন্য।

দৃশ্য উপকরণ : মানচিত্র, ছবি, চার্ট, মডেল, সময়, তালিকা, ফিল্ম প্রোজেক্টর ইত্যাদি।

শ্রাব্য উপকরণ : বেতার, গ্রামোফোন, টেপ রেকর্ডার ইত্যাদি।

দৃশ্য-শ্রাব্য উপকরণ : সিনেমা, টেলিভিশন ইত্যাদি।

শিখনের ক্ষেত্রে কোনো বিষেয়বস্তুর মূল বক্তব্য বা তুলনামূলক বিশ্লেষণের জন্য চার্ট ব্যবহার করা হয়ে থাকে। ইতিহাস বা ভূগোল শিখনের ক্ষেত্রে চার্ট হল খুবই উপযোগী পাঠদান ও শিখন সামগ্রী। চার্ট নানা ধরনের হতে পারে। যেমন চিত্রযুক্ত চার্ট, শাখামূলক চার্ট, তালিকাযুক্ত চার্ট, ধারাবাহিক চার্ট, বৃত্তীয় চার্ট ইত্যাদি।

সর্বপ্রথম কোন বিষয় চার্ট করব সেটা ঠিক করতে হবে। সাধারণত বড়ো আর্ট পেপার বা কার্টিজ পেপারের উপর চার্ট করা হয়। রঙের মাধ্যম হিসেবে জলরং বা পোস্টার রং ব্যবহার করা হয়। অঙ্কন শুরুর আগে চারদিকে ১ ইঞ্চি মার্জিন দিয়ে নিতে হবে। যদি শুধু লেখা থাকে তাহলে বড়ো বড়ো করে সুন্দর হস্তে লিখতে হবে। তারপর লেখা অনুযায়ি রং দিয়ে বুলিয়ে নিতে হবে। এক্ষেত্রে স্কেচ পেন ব্যবহার হবে। অনেকক্ষেত্রে একটি বিষয়বস্তুর একাধিক চার্ট-এর সাহায্যে দেখানো হয়। চার্ট-এর বিষয়বস্তু অনুযায়ি ছবি অঙ্কন করতে হবে।

❑ ৪.৩.২ পোস্টার তৈরি (Postar making) :

ছাপা বা হাতের লেখা পোস্টার দেয়াল, নির্দিষ্ট বোর্ডে, ইলেকট্রিক কিয়স্ক, দোকানে বা শো-রুমের ভিতরেও নানান ধরনের পোস্টার লাগিয়ে বিজ্ঞাপন প্রচার করা হয়। এর ধরণ ধারনা চেহারা চরিত্র নির্ভর করে বিজ্ঞাপিত বক্তব্যের ওপর। জনসভায় যোগ দিতে, অমুককে ভোট দিতে, তমুক সিনেমা আসিতেছে বা চলিতেছে, জানাতে, পোস্টারের ধরনের সঙ্গে ট্যুরিজম, দামী জামাকাপড় এবং পণ্যসম্ভারের পোস্টারের প্রদর্শনীস্থল এবং চেহারায় আকাশ পাতাল তফাৎ থাকবেই। সবই নির্ভর করে বিজ্ঞাপিত বক্তব্যের এবং দর্শকের গোষ্ঠী চরিত্রের উপর।

পোস্টারের ইতিহাস দেখলে দেখা যাবে সভ্যতার আদি পর্বে পোস্টার পাওয়া যায়। সভ্যতার অগ্রতার সাথে পোস্টার-এর নতুনত্ব বেড়েছে। পোস্টার বর্তমান সমাজের হাতিয়ার ও অলংকার। পোস্টারে আবিষ্কার কে করেছেন তাঁর নাম পাওয়া যায় না। পরবর্তিকালে তথ্যগত কারণে ইতালির **এমিলিয়াস সেলারকে** Postar-এর জনক বলা হয়। তাঁর পোস্টার প্রথম দিকে ছিল Stone curving and Metal curving. খনন কার্যের ফলে যে যে পোস্টার পাওয়া যায় তাতে এসিলিয়াস সেলার-এর কিছু রাজনৈতিক পোস্টার পাওয়া যায়। মনে করা হয় রোম, কার্থেজ ও আলেকজান্দ্রিয়া প্রভৃতি জায়গায় Postar-এর দ্বারা রাস্তা সাজানো হত। অর্থাৎ বোঝা যাচ্ছে তখনকার দিনে এই শহরগুলিতে বিজ্ঞাপনের ভালো রকমই চল ছিল। সমস্ত পোস্টারগুলি সাধারণ মানুষদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য সাধারণত হামাম (স্নানাগার) ও বাজার জাতীয় জায়গায় লাগানো হত। তখনকার দিনে পোস্টারের ধরন ছিল এলোমেলো, সীমিত রং-এর ব্যবহার এবং পোস্টারে ছবির কোনো ব্যবহার ছিল না। রেনেসাঁস এর পর এই পোস্টারের ব্যাপকতা বাড়ে।

এরপর 1491 সালের ছাপা পদ্ধতি চলে আসায় পোস্টারের জগতে এক বিপ্লব ঘটে। যার ফলে দেখা যায় পোস্টারে ছবির ব্যবহার। **'দ্যা লাভলি মেলোসিনা'** (The lovely Melosina) নামে একটি বইতে একজন প্রকাশক প্রথম এই ধরনের বিজ্ঞাপন ছাপেন। বইটির বিজ্ঞাপন এর জন্য পোস্টারের বিজ্ঞাপন দেন। বিজ্ঞাপনটিতে যে ছবির ব্যবহার করা হয়েছিল তা **উডকাটের** মাধ্যমে করা হয়েছিল। 1518 সালে পোস্টারের নান্দনিকতায় সূক্ষ্মতা দেখতে পাওয়া যায়। **অলস্টে অলটোভার** এর পোস্টারে প্রথম সূক্ষ্মতা ধরা পড়ে। পোস্টারটি ছিল একটি লটারি খেলাকে কেন্দ্র করে।

ফরাসিরা পোস্টারকে commercial কাজে ব্যবহার করার পথ প্রথম সর্বসাধারণের কাছে খুলে দেয়। 1747 সালে পোস্টারের প্রথম বিপুল ব্যবহার শুরু করেন হল্যান্ডের **ডাচ** নামে এক জাহাজের ক্যাপ্টেন। তিনি প্রথম গন্ডারের প্রদর্শনীর জন্য একটি পোস্টার করেন যা চারটি ভাষায় বেরিয়েছিল—ইংরেজি, জার্মানি, ফরাসি, ল্যাটিন। উনবিংশ শতকের সূত্রপাতে

Scanned with CamScanner

তামাক, সাবান ও বিভিন্ন দ্রব্যাদির মোড়কের ওপর পোস্টারের ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায়।

1936 সালে লখনউ কংগ্রেস অধিবেসন, 1937 সালে ফৈজপুর কংগ্রেস অধিবেশনের পর নন্দলাল বসু গান্ধিজির আদেশে হরিপুরা কংগ্রেসের মঞ্চসজ্জা করেছিলেন। সম্পূর্ণরূপে দেশজ পদ্ধতিতে ভারতবর্ষের লোকায়ত জীবনকে নিয়ে 83 খানা চিত্রে তিনি এই অধিবেশনে মঞ্চ সুসজ্জিত করেছিলেন। যা বর্তমানে হরিপুরা পোস্টার নামে বিখ্যাত। সারা ভারতের লোকায়ত জীবন যেমন—তাঁত বোনা, মজুর, কৃষক, ধান বোনা, ধুনুচী, মা ও ছেলে, গৃহস্থালী কাজে নিযুক্ত রমণী এই সবই স্থান পেয়েছিল। তিনি পটুয়াদের মতো সমগোত্রীয় উজ্জ্বল রং ও রুপসীজানী দ্রুত রেখায় এই চিত্রগুলি নির্মাণ করেছিলেন।

পোস্টারের মাধ্যমে বিজ্ঞাপনের জগতে Compaing planing-এর ক্ষেত্রে অন্য মাধ্যমের থেকে Advantage পাওয়া যায়। পোস্টারের ব্যাপকতা ১টি রেডিয়ো বা খবরের কাগজের মতনই। এর বিজ্ঞাপনের বৈচিত্র হল যে Postar নিজের জায়গা থেকে নানা লোককে একই সময়ে একই সাথে অন্য নানা বিজ্ঞাপনের বিষয়ের থেকে সংযোগ রাখে। প্রতিমুহূর্তে হিসাব করে দেখা যায় এই মাধ্যমে প্রায় সব জায়গায় লাগানো হলে শহর বা গ্রামের যে অঞ্চলে লাগানো হোক না কেন ৮০% থেকে ৯০% লোক দেখতে পায়। পোস্টারের মূল বিষয় হল—

(1) মনযোগ আকর্ষিত করা—Attract Attention

(2) আত্মপ্রকাশ করা (স্বকল্পিত ভাবে)—Indentify itself be self revealing

(3) ছোটো বা আকর্ষণীয় বক্তব্য—Give brief and simple message.

(4) Appeal emotionally

(5) দর্শকদের মানসিকতায় একটি সারবক্তা বিজ্ঞাপিত বিষয় বা বস্তুটিকে পরিচয় করানোয় জাগ্রত করা।

(a) পোস্টার—ডিজাইন হয় দূর থেকে দেখার জন্য।

(b) পোস্টার—ডিজাইন কাছ থেকে দেখার জন্যও হয়।

(c) পোস্টার—ডিজাইন খুব কাছাকাছি এই দুটি বিষয় একই সাথে থাকে, যেটা দূর থেকে কাছে, দুই ক্ষেত্রেই সমানভাবে দেখার জন্য। পোস্টার এর ডিজাইন খুব ভালো করে দেখা ও বোঝার জন্য করতে হয়। যা চটজলদি দ্রুত হেটে চলা লোকের বুঝতে সুবিধা হয়। আর একই সাথে পোস্টার দেওয়ার জায়গাটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ না হলে পোস্টারটি গুরুত্ব হারিয়ে ফেলবে। হাঁটা চলা রাস্তার মধ্যে মানুষ বাস্তবতার মধ্যে এটি পড়ে বা দেখে বলে এর বিষয় বস্তুর উপস্থিতির বা গ্রাহ্যতা সংক্ষেপে সারা হয় তা copy or slogan-ই হোক বা ছবির ডিজাইনই হোক এটি মূলত Double crown এর দ্বিগুণ size অর্থাৎ 20 inc/ 30inc হয়ে থাকে।

পোস্টার সাধারণত আমরা দুই ধরনের দেখতে পাই। Consumess Postar ও Non Product অর্থাৎ Social Poster, Consumess Poster এর ক্ষেত্রে আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনের ব্যবহার করার জিনিসপত্র ও তার উপকারিতা ইত্যাদি বিষয়ের উপর দেখি। প্রসাধন Fashion, Automobile থেকে মানুষ্য জীবনের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ব্যবহার্য সমস্ত বিষয়ের উপরেই হয়ে থাকে। আর এই পোস্টারের মূল শর্ত থাকে ''Buy my brand''.

কোনো সামাজিক কারণে বা সমাজের উন্নতির স্বার্থে বিজ্ঞাপনের জন্য যে পোস্টার তৈরি করা হয় তাকে Social Poster বলে। এটি একটি out door publicity। এই Social Postar সাধারণ মানুষের দেখার সুবিধার্থে এবং যাতে সহজে চোখে পড়ে এই জন্য eye lebel এর ওপরে থাকে। এই ধরনের পোস্টার সর্বোস্তরের তৈরি করা হয়।

❑ 8.৩.৩ ম্যাচস্টিক ড্রইং (Match-stick drawing) :

দেশলাই কাঠি (Match stick) দিয়ে বিভিন্ন ধরনের সুন্দর সুন্দর ..... তৈরি করা যায়। মজবুত শক্ত কাগজের উপর দেশলাই কাঠি আঠা দিয়ে আঁটকেও নতুন নতুন ছবি তৈরি করা যায়। শিক্ষার্থীদের ভাবনা অনুযায়ী তাদের দিয়ে অলংকরণ করা গেলে শিশুরা সহজে পাঠ্যবিষয়ে প্রবেশ করতে পারবে।

দেশলাই কাঠির মডেল (Model of Match Stick)

◆ **উপকরণ :** দেশলাই কাঠি, সাইকেল টিউব ভাল্ব, রং

◆ **পদ্ধতি :** বারুদটি কেটে ফেলে দিয়ে দেশলাই কাঠিগুলির সাহায্যে দেশলাই কাঠির মডেলগুলির মূল কাঠামোর উপকরণ হিসেবে ব্যবহার হয় আর সাইকেল টিউব ভাল্বগুলি ব্যবহার করা হয়েছে জোড়া লাগাবার উপকরণ হিসেবে। ২ সেমি লম্বা করে বেশ কয়েকটি ভালব টিউবের টুকরো কাটতে হবে। এবার দুটো কাঠিকে সংযুক্ত করার জন্য দুটো দেশলাই কাঠি কাটা টিউবের টুকরোটির দুই মুখে খোল ভরে দিতে হবে। এই পদ্ধতিতে অনেকগুলি দেশলাই কাঠি ভাল্ব টিউবের টুকরো দিয়ে জুড়ে জ্যামিতিক আকৃতি দেওয়া যাবে যেমন—পঞ্জভুজ, আয়তেক্ষেত্রে, বর্গক্ষেত্র, নানাধরনে কোন দেশলাই কাঠির সাহয্যে মডেল তৈরি করা যায়। দুটি কাঠির সংযুক্ত ভাল্ব টিউবের মাঝখানে একটি কাঁটা বা সূচ জাতীয় সূক্ষ্ম কিছু বিধিয়ে ফুটো করতে হবে। আরেকটি অন্য দেশলাই কাঠির মুখটা একটু চেঁছে ছুঁচলো করে সেটি ওই ভাল্ব টিউবের ফুটোয় ঢুকিয়ে দিতে হবে। এইভাবে দেশলাই কাঠির জোড়া বা T আকৃতির তৈরি হবে। একটি সমবাহু ত্রিভুজ নিয়ে সেটির ভাল্ব টিউব জোরে কাঁটা বিঁধিয়ে ফুটো করতে হবে। এরপর 'T' জয়েন্ট-এর খাড়া কাঠিটি ত্রিকোণের ভাল্ব টিউবের

Scanned with CamScanner

ফুটোয় ঢুকিয়ে দিতে হবে। এইভাবে চতুস্তলক (৬টি প্রান্ত, ৪টি তল এবং ৪টি পেন) তৈরি করা যায়।

তিনটি দেশলাই কঠি দিয়ে দুটো আলাদা ত্রিভুজকে সংযুক্ত করে প্রিজম্ (Prism) আকৃতি দেওয়া যায়। চারটি দেশলাই কাঠি দিয়ে দুটো চতুর্ভুজকে সংযুক্ত করে ঘন বা cube তৈরি করা যায়।

Scanning Copy Right By DAS Coaching

Thank You

Visit Our Educational Website

Regularly For More Update:

https://www.dascoaching.in/

Our Free Service

Free B.Ed EBook

Online Class

Edu Blogs

Contact Us On:

Facebook: fb/dascoaching.in

YouTube: DAS Coaching

Mail: contact.dascoaching@gmail.com

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ও উত্তর
(Short Questions & Answers)

❑ অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ও উত্তর (Objective type questions & answers) :

Marks – 2

প্রশ্ন : প্রাথমিক বর্ণ ও মিশ্র বর্ণ কাকে বলে? ও কী কী?

উত্তর : যে রঙের নিজস্বতা আছে এবং অন্য কোনো রঙের মিশ্রণে তৈরি হয় না তাকে প্রাথমিক রং বা Primary Colour বা শুদ্ধ রং বলে। প্রাথমিক রং তিনটি— লাল, নীল, হলুদ।

দুটি প্রাথমিক রং মেশালে দুটি রংই তাদের স্বতন্ত্র হারায় এবং একটি তৃতীয় রঙের জন্ম দেয়, তাকে মিশ্র রং বা মাধ্যমিক রং বা Secondary Colour বলে। যেমন— লাল ও হলুদ মেশালে কমলা রং, নীল ও হলুদ মেশালে সবুজ, লাল ও নীল মেশালে বেগুনি রং তৈরি হয়।

প্রশ্ন : উষ্ণবর্ণ ও শীতল বর্ণ কাকে বলে? উদাহরণ দাও।

উত্তর : চরিত্র অনুসারে কিছু রং উষ্ণ রং বা Warm Colour ও কিছু রং Cool Colour বা ঠান্ডা Colour, যে রঙে মাঠের বিস্তার, আকাশের বিস্তার, সমুদ্রের বিস্তার যেমন—নীল, সবুজ হয় Cool Colour কারণ, কম উজ্জ্বলতার জন্য চোখের পক্ষে আরামদায়ক। যে রং তাপ, আগুনের তাপ অনুভব করা যায় তাকে উষ্ণ রং বলা হয়। কারণ উজ্জ্বলতার জন্য চোখের পীড়াদায়ক। যেমন—কমলা, হলুদ, লাল, আমরা চিত্রপট, আসবাব পত্রে, ব্যবহার জিনিসে, ঘরের রং তারতম্য অনুসারে Warm বা Cool Colour ব্যবহার করি। কারণ অনুসঙ্গ বা association অনুসারে মানুষের দেহ এবং প্রত্যক্ষণে এই উষ্ণ এবং ঠান্ডা রং-এর বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া আছে। শিল্পীরা ছবিতে এই উষ্ণ এবং ঠান্ডা রং-এর সামঞ্জস্য অনুসারে রংগুলিকে বণ্টন করে থাকেন। কারণ ছবির রং আমরা একটা নির্দিষ্ট Frame-এর মধ্যে Space-এর মধ্যে দেখি।

প্রশ্ন : জলরঙের সুবিধাগুলি কী কী?

উত্তর : জলরঙের সুবিধাগুলি হল—

(i) ছবির মধ্যে স্বতন্ত্র নান্দনিক আবেদন জলরঙের মাধ্যমে তৈরি করা যায়, যা অন্য কোনো মাধ্যমে যায় না।

(ii) সহজ সরল ব্যবহারিক পদ্ধতির জন্য সকলে সহজে করতে পারে। শিল্পীদের, শিশুদের সকলের কাছে খুবই জনপ্রিয়।

Scanned with CamScanner

প্রশ্ন : Hatching এবং Stopping বলতে কী বোঝ?

উত্তর : ছোটো ছোটো লাইন এর মাধ্যমে ভেতরের অংশকে ভরাট করা হয়। সাধারণত দূরের বস্তুর ক্ষেত্রে এমন করা হয়, পেন্সিলে চাপ দিয়ে হাল্কা বা ভারি সেড করা হয় ছায়াকরণ করার জন্য।

Stopping পেন্সিল অঙ্কন কৌশল হ্যাচিং হিসেবে একই নীতি ব্যবহার করা হয়। কিন্তু লাইন খুব ছোটো ছোটো অনুরূপ হয়।

প্রশ্ন : দেবচক কাকে বলে?

উত্তর : ঐতিহ্যবাহী ওয়ারলি চিত্রের কেন্দ্রে একটি চতুষ্কোণ ক্ষেত্র অঙ্কিত হয়, যাকে দেবচক বলা হয়। 'চক' শব্দটির অর্থ চৌকো। দেবচকের মধ্যে অঙ্কিত হয় ভূমিদেবী পালঘাট। তার সঙ্গে আঁকা হয় চাঁদ, সূর্য, চিরুনি, সিড়ি, তোরপা (বীন জাতীয় বাদ্যযন্ত্র যা ওয়ারলি আদিবাসীরা বানায় ও বাজায়) ও জঙ্গলি (তারের বাদ্যযন্ত্র), এছাড়াও দেবচকে আঁকা হয় অশ্বারোহী এক দেবতা যার পাঁচটি মাথা।

প্রশ্ন : লগ্নচক কী?

উত্তর : বিবাহ উপলক্ষ্যে ওয়ারলি আদিবাসীরা বাড়ির দেয়ালে আঁকেন 'লগ্নচক'। বাড়ির মহিলারা বর ও কনেকে স্বাগত জানানোর জন্য যে ছবি আঁকেন তাতে ফুটে ওঠে বর, কনে ও বরের বোন ঘোড়ার ওপর বসে। তাদের ঘিরে নাচ হচ্ছে গান হচ্ছে, বাদ্যযন্ত্র বাজছে। লগ্নচকের চিত্রে ফুটে ওঠে বিবাহের আনন্দদায়ক উৎসবমুখর পরিবেশ।

প্রশ্ন : প্রথম কে মধুবনী চিত্রকলা জনসাধারনের সামনে তুলে ধরেছিলেন?

উত্তর : ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দের আগে বর্হিজগতের কাছে মধুবনী চিত্রকলা অপরিচিত ছিল। ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে ভারত-নেপাল সীমান্তে একটি ভয়ংকর ভূমিকম্পের ফলে এই অঞ্চলটি বিপুলভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। মধুবনী জেলায় সেই সময় উইলিয়াম আর্চার ব্রিটিশ কলোনিয়াল অফিসার হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি ক্ষতিগ্রস্থ জেলাটি পরিদর্শন করতে এসে মধুবনী চিত্রকলার সন্ধান পান।

❑ সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ও উত্তর (Short type questions & answers) : Marks - 5

প্রশ্ন : রঙের প্রতীক সম্বন্ধে যা জান আলোচনা করুন?

উত্তর : প্রতিটি সভ্যতা তাদের সংস্কৃতিতে বর্ণকে প্রতিনিয়ত ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ব্যবহার করেছে। সময়ের চাকা গড়িয়েছে, বদলে গেছে বর্ণের ব্যবহার ও অর্থ। আদিম মানুষের কাছে লাল ছিল জীবন ও রক্তের সমার্থক। তাই সে নিজ শরীর চিত্রিত করত লাল রং দিয়ে। প্রাচীনকাল থেকে রঙের ওপর আরোপিত হয়েছে বিভিন্ন প্রতীকী অর্থ। যেমন হিন্দু ধর্মে

দেবদেবীকে আঁকা হয় মূলত হলুদ বা সাদা রঙে যেখানে অসুরের দৃশ্য সবুজ রং নির্দিষ্ট করা হয়েছে। ইসলামে এই সবুজ রংটিকেই আবার শুভ জ্ঞান করা হয়। ফ্রান্সে দশম শতকে অপরাধী ও দেশদ্রোহিদের চিহ্নিত করার জন্য তাদের বাড়ির দরজায় হলুদ রং লাগিয়ে দেওয়া হত। গোলাপী রংটি মেয়েলি হলে নীলরংটি পুরুষালি। সাদা পবিত্রতা ও পূর্ণতার প্রতীক হলেও হিন্দু ধর্মে বিধবারূপ শূন্যতার প্রতিরূপী সাদা পোষাক ধারণ করে। এইভাবে সভ্যতার পরতে পরতে বর্ণ আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে থাকে।

প্রশ্ন : ছবিতে আলো ও ছায়া (Light and shade) বলতে কী বোঝায়?

উত্তর : ইতালীয় ভাষায় আলো-ছায়াকে বলা হয় কিয়ারোসক্যু রে (Chiarosceero)। কিয়ারোসক্যুরো রেনেস যুগে সর্বাপেক্ষা সুন্দরভাবে চিত্রশিল্প প্রযুক্ত হয়েছিল। রেনেসা যুগের শিল্পীরা চেয়েছিলেন যেমন তার জগৎকে দেখছেন সেভাবেই ছবিতে আঁকতে। তাঁরা লক্ষ্য করেছিলেন বস্তুর ওপর আলো পড়লে বস্তুর উত্তর অংশে আলো সর্বাপেক্ষা বেশি পড়ে ও সেই অংশটি উজ্জ্বল ও চকচকে দেখায় এবং অবতল অংশে আলো কম পৌছায় বলে সেই অংশটি গাঢ় রঙের লাগে। শিল্পীরা ছবি আঁকতে গিয়ে রং ও আলোর এই চরিত্রটি কাজে লাগিয়েছিলেন। তাঁরা আলোকসূত্র রেখেছিলেন একদিকে। ফলে বস্তুর ওপর আলো একধার দিয়ে পড়ার জন্য অন্য ধাতুটি আলোহীন ছায়াছন্ন দেখাতো। এর ফলে বস্তুর গড়নটি পরিপূর্ণভাবে ফুটে উঠত। একটি লাল রঙের বলের একদিকে আলো পড়লে অপর পার্শ্বের গোলাকার দিকে ছায়া পড়বে। ফলে যে অংশটিকে আলো পড়েছে বলের সেই অংশটির লাল রং ফ্যাকাসে ও সাদাটে লাগবে ও ছায়াময় অংশটিকে লালরং গাঢ় ও কালচে লাগবে। এইভাবে রেনেসা শিল্পীরা বস্তুর গাত্র রঙের সঙ্গে সাদা মিশিয়ে রংকে হাল্কা করে বস্তুর উত্তলতা বেঝাতেন ও রঙেরসঙ্গে কালো মিশিয়ে রংকে গাঢ় করে বস্তুর অবতলতা বোঝাতেন। রঙের সাথে সাদা মেশানোকে বলে টিন্টিং (Tinting) ও কালো মেশানোকে বলে (Shading)। লিওনার্দো এই আলো ও ছায়ার বৈপরীত্য যাতে কাটাকাটা না লাগে তার জন্য আলো ও ছায়াময় অংশের প্রান্ত ঝাপসা ও নরম করে দিলেন যাকে বলা হয় stumato.

রেনেসা যুগে শিল্পীরা নিয়ন্ত্রিত আলো ছায়া ব্যবহার করতেন। ব্যারোক যুগের শিল্পীরা ড্রামাটিক স্পট লাইট ও গাঢ় ছায়া ব্যবহার করেছিলেন যা রেমব্রান্টের ছবিতে দেখতে পাই। ইম্প্রেশানিষ্ট ছবিতে রঙের ওপর আলোর ক্ষণস্থায়ী প্রভাব ধরতে চেয়েছিলেন এবং ছায়াকে আলোর অনুপস্থিতি জ্ঞান করে সেখানে বস্তুর রঙের কম্প্লিমেন্টারী রং ব্যবহার করেছিলেন।

প্রশ্ন : প্যাস্টেল অঙ্কন প্রক্রিয়া সম্পর্কে বিশদে ব্যাখ্যা করুন?

উত্তর : প্যাল্টেলে কিছু সুবিধা উপলব্ধ যার জন্য শিল্পীরা চিরকালই এটি পছন্দ করেছেন। এটি মোটা কাঠির আকারে উপলব্ধ, যার জন্য শিল্পীরা এটিকে ধরে সরাসরি অঙ্কন করেন, কোনোরকম তরলীকৃত করার মাধ্যমের প্রয়োজন হয় না। এই সুবিধার জন্য বাচ্চাদের মধ্যে

Scanned with CamScanner

এটি খুব জনপ্রিয়। প্যাস্টেলের মাধ্যমে সরাসরি কাগজের ওপর আঁচড় টানা যায় ও নানা রকম Texture তৈরি করা যায়। অনেক শিল্পীই খসড়া করার জন্য, out of door কাজ করার জন্য প্যাস্টেলকে বেছে নেন। তবে সরাসরি হাতে ধরে কাজ করার জন্য যে প্রস্তুতকারকরা এমন রং ব্যবহার করেন যাতে তা বিষাক্ত না হয়। আর্সেনিক এবং লেড যটিত রংগুলি কখনোই প্যাস্টেলে ব্যবহার করা হয় না। প্যাস্টেলে non-toxic রং ব্যবহার করা আবশ্যিক। বিশেষতঃ এর প্রধান ব্যবহারিক বাচ্ছারা বলে প্যাস্টেলে ক্ষতিকারক রং বা বাইন্ডার ব্যবহার করা যায় না।

প্যাস্টেল রঙের আর একটি বড়ো গুণ হল এটির রঞ্জক নিজের চরিত্র পায় পরিপূর্ণরূপে অক্ষুণ্ণ রাখতে পারে কারণ এর বাইন্ডার খুব সামান্য পরিমাণে থাকে। কাজেই বাইন্ডারজনিত যে রঞ্জকের চরিত্রের পরিবর্তন ঘটে তা এখানে অনুপস্থিত। প্যাস্টেলের প্রতিটি রং প্রায় পরিপূর্ণভাবে থাকে। তবে প্যাস্টেলে বান্ডারের উপস্থিতি খুব কম পরিমাণে থাকার জন্য প্যাস্টেলে অঙ্কিত ছবির রং ঘষা খেয়ে উঠে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এই ত্রুটি রোধ করার জন্য শিল্পীরা fixatrive ব্যবহার করেন। এছাড়া কাঁচের ফ্রেমে ছবি বাঁধিয়ে রাখলে প্যাস্টেলে অঙ্কিত ছবি ভালো থাকে। বাইন্ডারের চরিত্রের ওপর নির্ভর করে প্যাস্টেল নরম অথবা শক্ত হয়। নরম প্যাস্টেলে তেলের ভাগ বেশি থাকে বলে তা যেভাবে কাজ করে, শুকনো ড্রাই প্যাস্টেল অন্যরকমভাবে কাজ করে। উভয়ের চরিত্র আলাদা হওয়ার জন্য অঙ্কনের চরিত্রও আলাদা হয়। সফট প্যাস্টেলে যেভাবে ঘষে পুরু করে texture তৈরি করা যায়, আবার ড্রাই প্যাস্টেলে ঘষা গুঁড়ো রঙের মতো texture তৈরি করা যায়।

পশ্চিমবঙ্গের বহু শিল্পী প্যাস্টেল নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষা করেছেন। এর মধ্যে বিকাশ ভট্টাচার্য্য, যোগেন চৌধুরী, সুহাস রায়, পরিতোষ সেন, রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

Our Online Class>>

www.online.dascoaching.in

সম্ভাব্য প্রশ্নাবলি

☐ অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন (Objective type questions) : Marks - 2

১। প্রাথমিক বর্ণ ও মিশ্র বর্ণ কাকে বলে? ও কী কী?
২। উষ্ণবর্ণ ও শীতল বর্ণ কাকে বলে? উদাহরণ দাও।
৩। প্রাকৃতিক রঞ্জক কী?
৪। কৃত্রিম রঞ্জক কী?
৫। জলরঙের ব্যবহারের উপকরণগুলি কী কী?
৬। জলরঙের সুবিধাগুলি কী কী?
৭। দুজন জল রঙের চিত্রশিল্পীর নাম?
৮। টেম্পারা কাকে বলে?
৯। টেম্পারার উপকরণগুলি কী কী?
১০। টেম্পারা অঙ্কনের সুবিধা ও অসুবিধা কী কী?
১১। তেলরঙের উপকরণগুলি কী কী?
১২। তেলরঙের সুবিধা ও অসুবিধাগুলি কী কী?
১৩। অ্যাক্রিলিকের সুবিধা ও অসুবিধাগুলি কী কী?
১৪। চারকোল কী?
১৫। স্ট্রোক বলতে কী বোঝায়?
১৬। Hatching এবং Stopping বলতে কী বোঝ?
১৭। ওয়ারলি লেখচিত্র কোন অঞ্চলে দেখা যায়?
১৮। দেবচক কাকে বলে?
১৯। লগ্নচক কী?
২০। পরিপ্রেক্ষিত বলতে কী বোঝায়?
২১। হরাইজন্টাল ও ভারটিক্যাল লাইন কাকে বলে?
২২। Onepoint perspective ও Two point perspective কাকে বলে?
২৩। মধুবন চিত্রকলা কাকে বলে?
২৪। কোহবার ঘর কাকে বলে?
২৫। প্রথম কে মধুবনী চিত্রকলা জনসাধারনের সামনে তুলে ধরেছিলেন?
২৬। মধুবনী শিল্পীর নাম লেখ?

Scanned with CamScanner

২৭। গ্লাস পেন্টিং এর উপকরণ কী?
২৮। ভ্যানিশিং পয়েন্ট ও আই লেভেল কাকে বলে?
২৯। পোস্টার কত ধরনের দেখা যায়?

❑ সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন (Short type questions) : Marks - 5

১। রঙের প্রতীক সম্বন্ধে যা জান আলোচনা করুন?
২। অস্বচ্ছ জলরঙের উপকরণ ও প্রকরণ সম্পর্কে আলোচনা করুন?
৩। তেলরঙের পদ্ধতি সম্পর্কে বিশদে ব্যবহার করুন?
৪। টেম্পারার অঙ্কন প্রক্রিয়া সম্বন্ধে বিশদে ব্যাখ্যা করুন?
৫। প্যাস্টেল অঙ্কন প্রক্রিয়া সম্পর্কে বিশদে ব্যাখ্যা করুন?
৬। মধুবনী চিত্রকলা সম্পর্কে বিশদে আলোচনা করুন?
৭। ছবিতে আলো ও ছায়া (Light and shade) বলতে কী বোঝায়?
৮। কম্পোজিশন সম্বন্ধে বিশদে আলোচনা করুন?
৯। চার্ট বলতে কী বোঝায়?
১০। চিত্র শিল্পে রঙের ব্যবহার সম্পর্কে আলোচনা করুন?
১১। পোস্টারের সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করো?

❑ রচনাভিত্তিক প্রশ্ন (Essay type questions) : Marks - 10

১। ওয়ারলি চিত্র সমন্ধে বিশদে আলোচনা করো?
২। গ্লাস পেন্টিং এর উপকরণ ও পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করো?
৩। ফেব্রিক এর উপকরণ ও পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করো?
৪। স্বচ্ছ জলরঙের সম্বন্ধে বিশদে আলোচনা করুন?
৫। প্যাস্টেল রঙের সম্বন্ধে আলোচনা করুন?
৬। চিত্রশিল্পে পরিপ্রেক্ষিতের গুরুত্ব?
৭। মধুবনী চিত্রকলার মাধ্যমে ষষ্ঠশ্রেণীর ছাত্রছাত্রীর জন্য প্রোজেক্ট পেপার ব্যাক এবং অষ্টম শ্রেণীর প্রোজেক্টের ওয়াল হ্যাঙ্গিং এর উপকরণ এবং পদ্ধতি বিশদে আলোচনা করে?
৮। ওয়ারলি চিত্রকর্মের মাধ্যমে ষষ্ঠশ্রেণির ছত্রছাত্রীদের পোরেজেক্ট সরা অঙ্কন, নবম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের প্রোজেক্টে কাপড় ফেব্রিক অঙ্কন এর উপকরণ ও প্রক্রিয়া সম্পর্কে বিশদে আলোচনা করুন?
৯। অষ্টম শ্রেণি ও দশম শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের কী ধরনের স্কেচ করানো যেতে পারে?

অধ্যায় ৫

সৃজনশীল শিল্প
(Creative Art)

❑ বিষয়বস্তুর রূপরেখা :

৫.১ **সৃজনশীল লেখা—গল্প লেখা, কবিতা লেখা (Creative writing–Story writing, Poetry writing)**

৫.২ **মডেল তৈরি— মাটির কাজ, অরিগামি, পাপেট তৈরি (Model making– Clay modeling, Origami, Puppet making)**
- ৫.২.১ মাটির কাজ (Clay Modeling)
- ৫.২.২ ওরিগামি (Origami)
- ৫.২.৩ পুতুল নাচ (Puppet)

৫.৩ **অলঙ্করণ শিল্প— রঙ্গোলি, ইকেবানা, ভিত্তি চিত্র (মুরাল) [Decorative Art–Rangoli, Ikebana, Wall painting (Mural)]**
- ৫.৩.১ রঙ্গোলি বা আলপনা (Rangoli or Alpana)
- ৫.৩.২ ইকেবানা (Ikebana)
- ৫.৩.৩ ম্যুরাল বা ভিত্তিচিত্র (Wall painting)

৫.৪ **ডিজাইন— কম্পিউটার গ্রাফিক্স, সিডি কভার, বইয়ের প্রচ্ছদ, কোলাজের কাজ (Designing– Computer graphics, CD Cover, Book cover, Collage work)**
- ৫.৪.১ কম্পিউটার গ্রাফিক্স (Computer graphics)
- ৫.৪.২ সিডি কভার (CD Cover)
- ৫.৪.৩ বইয়ের প্রচ্ছদ (Book Cover)
- ৫.৪.৪ কোলাজের কাজ (Collage work)

৫.৫ **শিক্ষায় বিভিন্ন ধরনের শিল্প মাধ্যমে ব্যবহার (The use of different art forms in Education)**

Scanned with CamScanner

৫.১ সৃজনশীল লেখা— গল্প লেখা, কবিতা লেখা (Creative writing- Story writing, Poetry writing) :

★ **গল্পের নির্মাণ কৌশল** : সাহিত্য-কর্ম হিসাবে গল্পের জনপ্রিয়তা আজ বিশ্ব জুড়ে। গল্প রচনা কিন্তু সহজ নয়। ভাষা নির্মাণ-শিল্পে দক্ষতা না থাকলে গল্প রচনা করা যায় না। গল্পে একটা ঘটনা বা কাহিনি আবশ্যক; কিন্তু কাহিনি থাকলেই তা গল্প হয়ে ওঠে না। কাহিনিকে গল্পকার এমনভাবে পরিবেশন করেন যার ফলে পাঠকের মনে বাস্তবের অনুভাবনা এবং নিবিড় রসানুভূতির সৃষ্টি হয়। গল্প পাঠকের মনে রসের সঞ্চার করে। এই রসানুভূতিকেই বলে আনন্দ। গল্পে আনন্দ সৃষ্টির ক্ষমতা থাকা চাই।

★ **মধ্যযুগের গল্প** : গল্প রচনার আদি ইতিহাস খুঁজতে গেলে মানবসভ্যতার শৈশবকালে পৌঁছুতে হয়। আবহমানকাল থেকে মানুষ গল্প বলতে এবং শুনতে ভালবাসে। মধ্যযুগের গল্পগুলি মূলত নীতিমূলক। রূপকের আড়াল থেকে সেখানে মানুষকে শেখানো হয়েছে নীতি ও ধর্মের নানা কথা। অবশ্য সেইসব অনেক গল্পের আবেদন আজও অস্বীকার করা যায় না। ঈশপের গল্প, পঞ্চতন্ত্র বা হিতোপদেশের গল্পগুলি আজও মানুষকে আকর্ষণ করে। এইসব গল্প পশুপাখি মানুষেরই কথা বলে।

★ **আধুনিক ছোটো গল্প : বাংলা ও কল্পনার সংমিশ্রণ** : সভ্যতার বিবর্তনে যুগ ও জীবনের পরিবর্তন ঘটেছে অনেকখানি। মানুষ গল্পে এখন নীতিশিক্ষা চায় না—চায় চলমান জীবনের রূপকে প্রত্যক্ষ করতে। গল্প আমাদেরই জীবনের প্রতিচিত্র। অবশ্য বাস্তব ঘটনার বিবৃতিকেই ছোটো গল্প বলা চলে না। সংবাদপত্রের কাহিনি-সংবাদ যে ছোটো গল্প নয়—তা আলোচনার অপেক্ষা রাখে না। কাহিনির সঙ্গে কল্পনার মেলবন্ধন ঘটিয়েই ছোটো গল্পের উপকরণ তৈরি হয়। সাহিত্যিকের নির্মাণ কৌশল কাহিনিকে ছোটোগল্প করে তোলে। আবার শুধু পরিবেশন নৈপুণ্যই ছোটো গল্পকে রসোত্তীর্ণ করে না—গল্পের মধ্যে চরিত্র নির্মাণ ক্ষমতা এবং জীবনদর্শনের প্রকাশ ঘটলেই গল্প সার্থক হয়ে ওঠে।

★ **গল্পের বৈশিষ্ট্য** : গল্পের সংজ্ঞা নিয়ে নানা সমালোচক নানা কথা বলেছেন। বিপুল মানব জীবন প্রবাহ থেকে একটি মাত্র গণ্ডুষ তুলে ধরাই ছোটো গল্পের কাজ। স্বল্প আয়োজনের মধ্যে মানুষের জীবনের কোনো একটি অংশকে পরিস্ফুট করাই ছোটো গল্পের লক্ষ্য। ছোটো গল্প যেন টর্চ লাইটের আলো—জীবনের একটি কেন্দ্রেই তার আলোর বৃত্ত দৃশ্যমান। ছোটো গল্প বিন্দুতে সিন্ধু দর্শন করায়। তা আয়তনে যেমন সীমিত—প্রকৃতিতেও তেমনি স্বতন্ত্র। উপন্যাসের বিস্তৃতি, জটিলতা বিশ্লেষণ ছোটো গল্পে সম্ভব নয়; স্বল্পতম পরিসরের মধ্যে গূঢ়তম সত্যের ব্যঞ্জনাই ছোটো গল্পের বৈশিষ্ট্য।

★ **গল্পের প্রাসঙ্গিকতা ও একমুখীনতা** : প্রশ্ন হল, ভালো ছোটো গল্প লেখা যায় কীভাবে? যদিও গল্প রচনার বিশেষ কোনো ব্যাকরণ নেই তথাপি কয়েকটি বিষয়ের প্রতি গল্পকারকে বিশেষ মনোযোগী হতে হয়। এগুলি হল, কাহিনি বিন্যাস, পরিবেশ রচনা, চরিত্রসৃষ্টি, সংলাপ ও ভাষা। প্রথমেই স্মরণ রাখতে হবে অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের উপস্থাপনা ছোটো গল্পে বাঞ্ছনীয় নয়। অতিকথন গল্পের গুরুতর ত্রুটি বলে বিবেচিত। একই কথার বাহুল্যময় পুনরুক্তি গল্পের রসকে নষ্ট করে দেয়। সার্থক ছোটো গল্পে একমুখীনতাকে বজায় রাখতে হয়।

★ **গল্পের তিনটি অংশ** : কাহিনি নির্বাচন এবং তার উপস্থাপনাই ছোটো গল্পের সার্থকতার মূল ভিত্তি। কিন্তু তাকে গল্পে রূপ দেওয়াই আসল কৃতিত্ব। গল্পের তিনটি অংশ—সূচনা, মূল অংশ এবং উপসংহার। মূল প্লট বা কাহিনিকে উপস্থাপিত করবার পূর্বে গল্পের পটভূমিকা রচনা করা দরকার। একে সূচনা অংশ বলা যেতে পারে। সূচনা অংশ গল্পের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে সাহায্য করে। এই অংশ বর্জিত হলে—বিষয়ের আকস্মিক আরম্ভে গল্পরস ব্যাহত হয় স্মরণ রাখতে হবে, সূচনা অংশ যেন কখনো দীর্ঘায়িত না হয় পরবর্তী অংশে কাহিনি বিস্তার; কিন্তু এই বিস্তারের সার্থকতা নির্ভর করে সংহত পরিসমাপ্তির ওপর। অনেকে মনে করেন গল্পের সমাপ্তি অংশই গল্পের প্রমাণ। গল্পকার যদি গল্পের শেষে একটি চমৎকারিত্ব সৃষ্টি করতে পারেন তখন অভাবিত এক আবেদনে গল্পের স্বাদ রসোত্তীর্ণ হয়ে পড়ে। গল্পকারের উদ্দীষ্ট অভিপ্রায় এই সমাপ্তির মধ্যেই সুচিহ্নিত হয়ে উঠতে পারে। গল্পের শেষেও পাঠকের আগ্রহ অত্যন্ত সঞ্জীবিত থাকবে—একারণেই ছোটো গল্প সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের কাব্যোক্তটি স্মরণীয়—শেষ হয়ে হইল না শেষ।

★ **পরিবেশ রচনা** : কাহিনি বর্ণনার মতো পরিবেশ রচনাও গল্পের একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দিক। সার্থক পরিবেশ রচনার গুণে সাধারণ কাহিনিও অসামান্য হয়ে উঠতে পারে। কাহিনি ও পরিবেশের সঙ্গতির মধ্যেই গল্প বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠতে পারে। কাহিনি ও পরিবেশের সঙ্গতির মধ্যেই গল্প বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠে—গল্পরস ঘনীভূত হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ভৌতিক গল্পের পরিবেশ লোকালয় থেকে দূরে গভীর নিশুতি রাতের নির্জনতায় যেমন পরিস্ফুট হবে—অন্য কোনো পরিবেশে তা হবে না। আবার হাসির গল্পের জন্য চাই সম্পূর্ণ ভিন্নতর পরিবেশ।

★ **চরিত্র চিত্রন ও সংলাপ** : চরিত্র-চিত্রণ ছোটো গল্পের একটি অপরিহার্য দিক। গল্পের ভাব পূর্ণতা পায় না যদি না তার চরিত্রগুলি সজীব হয়ে ওঠে। চরিত্র সঙ্গতিপূর্ণ না হলে কাহিনিও বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠে না। চরিত্রকে জীবন্ত করে তুলতে হয়—তার আচরণ এবং সংলাপের মধ্যে। সংলাপ ছোটো গল্পের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ; যা একদিকে চরিত্রগুলিকে বাস্তবায়িত করে তুলতে সাহায্য করে, অন্যদিকে গল্পের মধ্যে নাটারস সঞ্চার করে। একথা

Scanned with CamScanner

স্মরণ রাখা একান্ত আবশ্যক যে, সংলাপ অবশ্যই চরিত্রানুগ হবে। মানুষের রুচি, শিক্ষা, পেশা, বয়স অনুযায়ী তার সংলাপও ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। সে সম্পর্কে সচেতন হয়েই গল্পকারকে সংলাপ প্রয়োগ করতে হয়। মনে রাখতে হবে, কাহিনি গল্পের প্রধান অবলম্বন হলেও চরিত্র সৃষ্টির ওপরই ছোটো গল্পের সার্থকতা নির্ভর করে।

★ **ছোটো গল্পের ভাষা :** ছোটো গল্পকারকে ভাষা প্রয়োগে বিশেষ মনোযোগী হতে হয়। ছোটো গল্প স্বল্পায়তন বলেই এর প্রতিটি শব্দই মূল্যবান। তাই ছোটো গল্পের ভাষাকে একদিকে যেমন অর্থবহ ও ব্যঞ্জনাধর্মী করে তুলতে হয়, অন্যদিকে তেমনি স্পষ্ট ও রমণীয় হতে হয়। ভাষার মধ্যে পরিমিতি বোধ ও পরিচ্ছন্ন স্টাইলের সংযোগে গল্প সার্থক হয়ে ওঠে।

★ **গল্পের নামকরণ :** গল্পের নামকরণ গল্প-রচনার একটি অপরিহার্য অঙ্গ। কাহিনি, চরিত্র বা বিষয়ের ভাবগত দিকটির প্রতি দৃষ্টি রেখেই গল্পের শিরোনাম রচনা বাঞ্ছনীয়। নামকরণের মাধ্যমেই পাঠকের সঙ্গে গল্পের প্রথম পরিচয় ঘটে। সুতরাং নামটিকে আকর্ষণীয় করে তুলতে পারলে গল্পকারের পক্ষে নিঃসন্দেহে তা কৃতিত্বের পরিচায়ক।

☛ **নিম্নে গল্প রচনার কেমন হওয়া উচিত সংকেতের মাধ্যমে তার একটি উদাহরণ দেওয়া হল :**

[**সংকেত-সূত্র :** এক গর্বিত পণ্ডিত খেয়া-নৌকোতে নদী পার হচ্ছিলেন— মাঝির অজ্ঞতায় তাঁর তাচ্ছিল্য প্রকাশ — ব্যাকরণ না জানায় মাঝির জীবন আট আনাই বৃথা — মাঝির দুঃখ — এমন সময় ঝড় ওঠে — মাঝি পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা করে তিনি সাঁতার জানেন কিনা — পণ্ডিত অজ্ঞতা প্রকাশ করে — মাঝি বলে পণ্ডিতের জীবনের ষোলা আনাই বৃথা]

অশিক্ষিত মূর্খ লোক দেখলেই মার্তণ্ড পণ্ডিতের অবজ্ঞা আর আর তুচ্ছতাচ্ছিল্যের ভাবটা আরও বেড়ে যায়। নিজের পাণ্ডিত্যের অহংকারে ধরাকে তিনি সরা জ্ঞান করেন। ন্যায়শাস্ত্র, স্মৃতিশাস্ত্র তাঁর ঠোঁটস্থ, কণ্ঠস্থ। ব্যাকরণ সম্পর্কে তাঁর অসাধারণ জ্ঞানে তিনি নিজেও ডগমগ। সবাই তাঁকে সমীহ করেই চলে। কিন্তু পণ্ডিত তর্কচঞ্চু তাঁর অসীম জ্ঞানকে মানেন না। পৃথিবীতে নিন্দুক লোকের অভাব নেই। কে একজন মার্তণ্ড পণ্ডিতের কানে কথাটা তুলে দেয়।

ক্রোধে মার্তণ্ড সেদিন পূজা-আর্চা ভুলে গেলেন। তর্কচঞ্চুকে ব্যাকরণ জ্ঞানে পরাস্ত না করা পর্যন্ত তাঁর শান্তি নেই। তাই তিনি চলেছেন নবদ্বীপের পথে। মাঝে গঙ্গা নদী। পার না হলে পৌঁছানো অসম্ভব।

বর্ষাকাল। মেঘলা আকাশ। নদীর জল কানায় কানায় পূর্ণ। শোঁ শোঁ শব্দে ঘোলা জলের তীব্র স্রোত বয়ে চলেছে। অনেক কষ্টে এক খেয়ামাঝিকে রাজি করালেন মার্তণ্ড।

মাঝি পাণ্ডিত্যের জগতের কোনো খবর রাখে না। পণ্ডিতকে সে চেনে না। সে নিজের মনে নৌকো বেয়ে চলে। মার্তণ্ড পণ্ডিত নিজের জাহির না করে থাকতে পারেন না। হঠাৎ বলে উঠলেন, 'হ্যাঁরে জানিস, কাকে নৌকো পার করছিস?'

জিজ্ঞাসু নেত্রে মাঝি চেয়ে থাকে।

'__ তা কি করে জানবি? লেখাপড়া শিখেছিস? ব্যাকরণ জানিস?'

'__ আজ্ঞে না কত্তা, ব্যাকরণ না কি বললেন যেন, তা আমি কি করে জানব বলুন, আমি ত মুখ্যুসুখ্যু মানুষ, খেয়া পারাপার করি।'

'__ তা বটে।' মুচকি হেসে মার্তণ্ড পণ্ডিত করুণার দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকালেন, 'তবে তো দেখছি, তোর জীবনের আট আনাই জলে গেল। যে লেখাপড়া জানে না, তার আর কী হবে বল?'

'ঠিক বলেছেন কত্তা, লেখাপড়া ত শিখিনি, তা জীবনের আট আনা কেন, বার আনাই জলে গেল বলতে পারেন।'

ঘোলা জলের আবর্তে নৌকো পাক খেয়ে চলে। 'ও কত্তা, আকাশের গতিক যে ভাল না, ঝড় উঠতি পারে, নৌকো সামলানো মুশকিল হতি পারে!'

একথা শুনে মার্তণ্ড পণ্ডিতের মুখ শুকিয়ে যায়।

'সাঁতার জানেন ত কত্তা?'

পাংশু মুখে পণ্ডিত বলেন, 'না, সাঁতার ত জানি না।'

মাঝি বলে ওঠে, 'তাহলে তো পণ্ডিতমশাই আপনার জীবনের ষোলো আনাই জলে গেল।'

বলতে না বলতেই একটা দমকা বাতাস এসে নৌকোয় আছড়ে পড়ল।

আমরা পূর্বে দ্বিতীয় অধ্যায়ে ২.৪ নাম্বারে কবিতা লেখা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

৫.২ মডেল তৈরি— মাটির কাজ, অরিগামি, পাপেট তৈরি (Model making– Clay modeling, Origami, Puppet making) :

❑ ৫.২.১ মাটির কাজ (Clay Modeling) :

ভাস্কর্য নির্মাণে সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় মাধ্যম মৃত্তিকা, যা সুপ্রাচীন কাল থেকে সারা পৃথিবীতে ব্যবহার হয়ে এসেছে। মাটি শিল্পের উপকরণের মধ্যে সবচেয়ে সহজলভ্য যা হাতের কাছেই পাওয়া যায়। কিন্তু আমাদের শিল্পকর্ম সব ধরনের মাটি দিয়ে সম্ভব নয়। প্রকৃতি ও উপাদানের উপর নির্ভর করে মাটিকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। **প্রথমত** প্রাইমারি মাটি যেমন—কৃষ্ণমৃত্তিকা যা সেই স্থানেই জন্ম অর্থাৎ জলে বা বায়ুদ্বারা বাহিত হয়ে অন্য জায়গার থেকে আসে না। **দ্বিতীয়ত** সেকেন্ডারি মাটি যা জল ও বায়ু বাহিত হয়ে একস্থান থেকে অন্য স্থানে যায়। এই মাটির পরিবহণের জন্য কণাগুলি মিহি গুঁড়ো হয়ে এবং নানা ধরনের জৈব বস্তু যুক্ত হয়ে নমনীয় মাটিতে রূপান্তরিত হয়।

Scanned with CamScanner

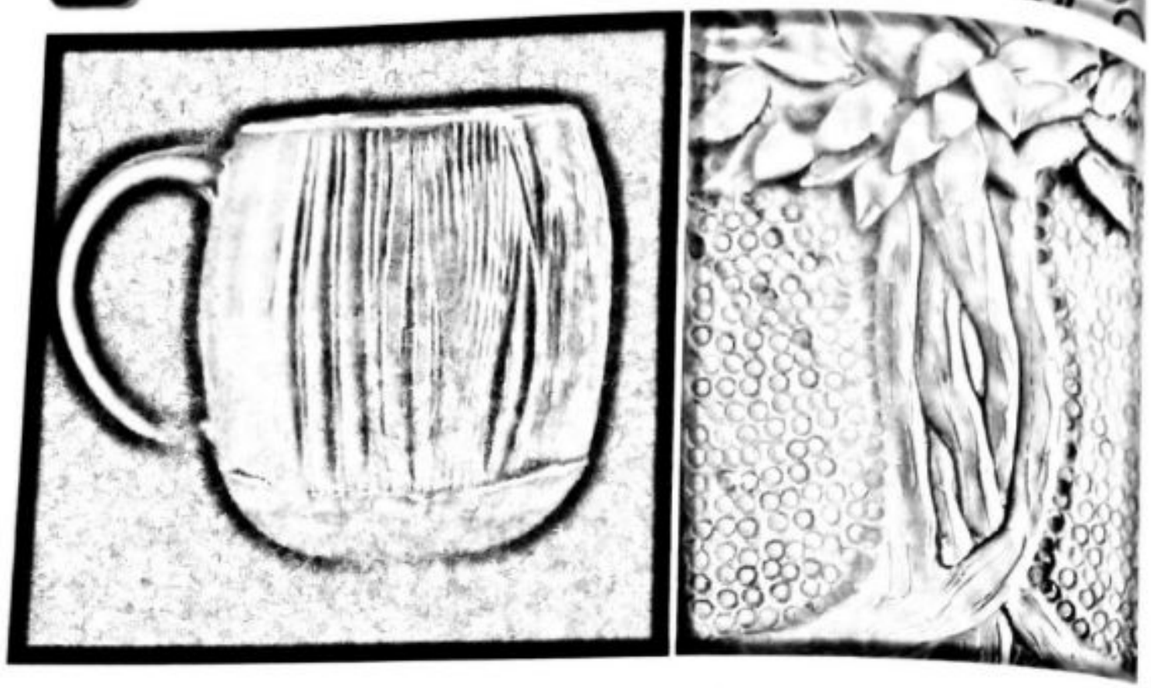

◆ **মাটি নির্বাচন :**

মাটি বিভিন্ন প্রকারের হয়। যেমন—এঁটেল মাটি, বেলে মাটি, দোঁআশ মাটি, পলি মাটি, বোল মাটি ইত্যাদি। বেলে মাটির মধ্যে বালিরভাগ বেশি থাকায় মাটির আটোসাটো ভাব কম থাকে। পলি মাটি ও দোঁআশ মাটিতেও মাটির কাজ ভালো হয় না। এঁটেল মাটিতেই মাটির কাজ ভালো হয়। এঁটেল মাটি আঠালো ও চটচটে হওয়ায় তৈরি করা জিনিস ফেটে যায় না এবং জিনিসটা শক্ত ও মজবুত হয়।

◆ **মাটির মণ্ড তৈরি :**

প্রথমে বাড়ির কাছাকাছি কোনো অংশ থেকে এঁটেল মাটি সংগ্রহ করতে হবে। এরপর মাটিটিকে রোদ খাইয়ে ভালো করে শুকিয়ে নিতে হবে। তারপর শুকনো মাটিটিকে হাতুড়ি বা ইট দিয়ে মিহি করে গুঁড়ো করতে হবে। এরপর গুঁড়ো করা মাটি চালুনি দিয়ে চেলে নিয়ে কাঁকর, বালি, পাথরের টুকরো ইত্যাদি পৃথক করা হয়। এবার গুঁড়ো এঁটেল মাটিকে অল্প অল্প জল মিশিয়ে মণ্ড তৈরি করা হয়। মণ্ড তৈরি করার সময় লক্ষ্য রাখতে হয় যাতে মাটি খুব চটচটে না হয়। যাতে মণ্ডটি এমন নরম হয় যে আঙুল দিয়ে চাপ দিলে তাতে আঙুলের দাগ বসে কিন্তু আঙুলে মাটি না লাগে। মণ্ডটি যাতে হাওয়া লেগে শুকিয়ে না যায় তার জন্য সেটিকে একটি অল্প ভেজা কাপড় দিয়ে আবৃত করে পলিথিনের প্যাকেটের মধ্যে রাখা হয়। যে মাটিতে বালির ভাগ বেশি থাকবে সেই মাটির সঙ্গে ছোট ছোট করে কাটা পাটের কুচি মিশিয়ে নিয়ে কাজ করা চলে।

◆ **প্রয়োজনীয় উপকরণ :**

- **বাঁশের ছুরি :** বিভিন্ন সামগ্রী মাটির মণ্ড থেকে তৈরি করার সময় মাটির দ্রব্যের ভাঁজ ফুটিয়ে তুলতে, উৎপন্ন দ্রব্যের নকশা করতে অথবা কোন অংশ চেঁছে তুলতে হলে বাঁশের পাতলা ছিলা থেকে তৈরি ছুরির প্রয়োজন হয়।
- **কাটবার তার :** মাটির মণ্ড থেকে বিভিন্ন সামগ্রী তৈরি করার সময় তার অতিরিক্ত মাটি কেটে বাদ দেবার জন্য ব্যবহার হয়।

এছাড়া তারের ছাঁকনি, মাটি রাখার চৌকি, জলের পাত্র, তুলি, রং গোলার পাত্র প্রয়োজন।

- **প্রয়োজনীয় উপাদান :** এঁটেল মাটির তৈরি মণ্ড, জল, বিভিন্ন রং, আঠা, বার্নিশ পেন্ট, পাতলা নরম সুতির কাপড়, মিহি শিরীষ কাগজ, মাটির কাজ করার বিভিন্ন পদ্ধতি : মাটির কাজ করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। যেমন—হাতের সাহায্যে, ছাঁচের সাহায্যে, চক্রের সাহায্যে, মডেলিং, কারভিং, স্কুপিং, কয়েলিং ইত্যাদি।

◆ **(ক) হাতের সাহায্যে মডেল প্রস্তুতকরণ :**

হাতের সাহায্যে ঘোড়া, পাখি, মাছ, ফল, মানবদেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ইত্যাদি তৈরি করা যায়। কাজ করার আগে এই জাতীয় জিনিসগুলিকে বা প্রাকৃতিক জিনিসগুলির আকৃতি এবং গঠনজাত বৈশিষ্ট্য নিখুঁতভাবে পর্যবেক্ষণ করে উপলব্ধি করতে হয়।

Step 1 : প্রথমে গোল বলের মতো করা মাটিটিকে নিজের পছন্দ অনুযায়ী আঙুলের সাহায্যে চাপ দিয়ে যেকোনো ফল বা পশুপাখির আকৃতি দিতে হবে।

Scanned with CamScanner

Step 2 : এবার বাঁশের ছুরি (Modelling tools) বা জল দিয়ে মডেলটির সারা অঙ্গ মসৃণ করে নিতে হবে।

Step 3 : এবার মডেলটিকে শুকিয়ে নিতে হবে।

Step 4 : মডেলটি শুকিয়ে গেলে ফল বা পশুপাখির রং অনুযায়ী রং করতে হবে এতে দেখতে সুন্দর হবে।

◆ **(খ) ছাঁচের সাহায্যে মডেল প্রস্তুতিকরণ :**

ছাঁচের সাহায্যে খুব সহজেই বিভিন্ন সুন্দর সুন্দর পুতুল তৈরি করা যায়। ছাঁচের সাহায্যে পুতুল বা মূর্তি বানাতে গেলে প্রথমে একটি মূর্তি প্রয়োজন। যেটির ছাঁচ তৈরি করতে হবে। তারপর সেই ছাঁচ শুকিয়ে এবং আগুনে পুড়িয়ে নিয়ে তা থেকে অনেক মূর্তি তৈরি করা যায়। তবে বর্তমানে বাজারে এইরকম ছাঁচ কিনতেও পাওয়া যায়। বিভিন্ন দেবদেবীর মূর্তি ছাঁচের সাহায্যে করা হয়। ছৌ-নাচের মুখোশ, বাচ্চাদের মাটির পুতুল ইত্যাদি ছাঁচ তুলে তৈরি করা হয়।

★ মাটির ছাঁচ প্রস্তুতকরণ :

Step 1 : ছাঁচ তৈরি করতে হলে প্রথমে মাটিটিকে দুভাগ করে নিতে হবে।

Step 2 : এবার একখণ্ড কাপড়-কাচা সাবান টুকরো টুকরো করে কেটে জলে গুলে নিতে হবে। এরসঙ্গে সমপরিমাণ নারকেল তেল মিশিয়ে ভালোভবে ফেটিয়ে নিতে হবে।

Step 3 : এরপর যে আকৃতির ছাঁচ হবে তার গায়ে তেল সাবানের প্রলেপ দিতে হবে।

Step 4 : তারপর যে দ্রব্যের আকৃতি নেওয়া হচ্ছে তার ওপরে মাটির তালটিকে চেপে ধরে ভালো করে আঙ্গুলের সাহায্যে চাপতে হবে। লক্ষ রাখতে হবে পুতুলের চোখ, কান, নাক যেন ঠিকভাবে খাঁজে খাঁজে বসে।

Step 5 : মাটি একটু শুকনো মতো হলে (৪-৫ ঘণ্টা বা ১ দিন বাদে) ওই জিনিসটা থেকে ছাঁচ বের করে নিয়ে কম রোদে ভালোভাবে শুকিয়ে নিয়ে আগুনে পুড়িয়ে নিতে হবে। বলা বাহুল্য ছাঁচটি হল জিনিসটির উল্টো।

● **ছাঁচের সাহায্যে জিনিস তৈরি :**

ছাঁচের সাহায্যে জিনিস তৈরির জন্য ভালোভাবে মাটি তৈরি করে নিয়ে বেশ করে আঙুল দিয়ে টিপে টিপে ছাঁচটির উপর বসিয়ে কিছুক্ষণ পরে নতুন তৈরি জিনিসটি ছাঁচ থেকে বার করে নিয়ে কয়েকদিন শুকিয়ে নিতে হয় বা পুড়িয়ে নিতে হবে। এরপর বস্তুটির অনুযায়ী রং করে নিতে হবে।

(গ) চাকের (Wheel) সাহায্যে মাটির কাজ :

এই প্রকল্পটি শিখতে গেলে কুমোরপাড়ায় যেতে হবে, কারণ এই ধরনের কাজ বিদ্যালয়ে করা সম্ভব নয়। চাকের সাহায্যে হাঁড়ি, কলসি, বাটি, গেলাস, ভাঁড় ইত্যাদি তৈরি করা হয়। চাক আসলে গরুর গাড়ির চাকার মতো ছোটো একটি কাঠের বৃত্তাকার পাটাতন বিশেষ। হাতের সাহায্যে এটি ঘুরিয়ে দিলে বেশ কিছুক্ষণ ঘুরতে থাকে। ঘোরার গতিবেগ কমে গেলে পুনরায় ঘুরিয়ে নিতে হয়। চাক যতক্ষণ ঘোরে ততক্ষণের মধ্যে জিনিসটি বানিয়ে নিতে হয়। চাকের মাঝখানে মাটির তাল রাখা হয়। ঘূর্ণায়মান চাকের ওই মাটির তাল দুই হাতের আঙুল (বিশেষ করে তর্জনী) বিভিন্ন ভাবে চাপ দিয়ে বিভিন্ন আকৃতির করা হয়। সম্পূর্ণ হাতের চাপের উপর নির্ভর করে বিভিন্ন পাত্র তৈরি। মাটির জিনিস চাকের উপর তৈরি করার পর নাইলনের সুতোর সাহায্যে কেটে আলাদা করে নিয়ে রোদে শুকোনোর পর আগুনে পোড়াতে হয়।

যেহেতু বেশিরভাগ খাবার দাবার কাজে এই পাত্র ব্যবহৃত হয় বলে রং করা হয় না। কিন্তু চাকের সাহায্যে তৈরি মাটির টব, পুজোর ঘট, প্রভৃতি সৌন্দর্যের জন্য রং করা হয়।

► কয়েলিং

মাটির মণ্ডটিকে সরু দড়ির আকারে পাকিয়ে নিয়ে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে নির্দিষ্ট আকার দেওয়া হয়। এটি ভেতরে ফাঁপা হওয়ার জন্য হালকা হয়। এই পদ্ধতি খুবই সরল ও কম দক্ষতা সাপেক্ষ।

► মডেলিং

সর্বপ্রথম নকশা অনুযায়ি আমেচার তৈরি করতে হবে। তারপর আমেচার উপরে মাটি চাপিয়ে মডেলিং করা হয়।

► কার্ভিং

এই পদ্ধতিতে প্রথমে মাটির ব্লক তৈরি করে নিতে হয়। তারপর মাটি কেটে কেটে বার করে কাজটা করতে হয়। সাধারণত রিলিফের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়।

★ মাটির কাজের গুরুত্ব

(1) কাজটির মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীর সৌন্দর্যবোধ বৃদ্ধি পাবে।
(2) শিক্ষার্থীরা কাজের পদ্ধতি ক্রম অনুসারে অনুকরণ করতে শিখবে।
(3) উপকরণ সম্পর্কে প্রকৃত ধারণা লাভ করবে।
(4) কাজটির শেখার মধ্যে দিয়ে শিক্ষার্থীর আত্মবিকাশ বাড়বে।

Scanned with CamScanner

❑ ৫.২.২ ওরিগামি (Origami) :

একখণ্ড কাগজকে না কেটে, কোনোরূপ আঠা ব্যবহার না করে কেবল ভাঁজ করে জীবজন্তু, পাখি ইত্যাদি রূপ দেওয়ার একটি কৌশল ও খেলা হল ওরিগামি। ওরিগামি শব্দটি জাপান থেকে এসেছে। ওরি (Ori) কথার অর্থ ভাঁজ করা ও কামি (Kami) পরিবর্তিত হয়ে গামি অর্থাৎ কাগজ। এর জন্য প্রথম যেটা প্রয়োজন তা হল কাগজ। কাগজ বলতে আমরা আজকে যা বুঝি তার আবিষ্কার হয়েছিল চিনদেশে, প্রথম বা দ্বিতীয় খ্রিস্টাব্দে হান যুগে। পাতলা শক্ত এবং সম্পূর্ণরূপে বর্গাকার কাগজই হল সবচেয়ে ভালো। জটিল আকৃতির কাজ শুরু করার জন্য একটু বড় কাগজ আদর্শ। অল্প কয়েকটি সরল ভাঁজের মাধ্যমে ওরিগামির একেকটি অংশ তৈরি করা হয়। আর এমন অনেকগুলো অংশকে একত্র করে আরও জটিল আকৃতির তৈরি করা হয়।

জাপানি পণ্ডিত আকিরা মোশিমাওরা এ শিল্পকে একেবারে নতুন করে ঢেলে সাজালেন। নতুন 'বেশ' আবিষ্কার করে নতুন নতুন মডেল বানালেন। জাপানে ওরিগামি 'ক্রাফ্ট' থেকে 'আর্ট'-এ উন্নীত হল।

★ ওরিগামির বৈশিষ্ট্য :

(1) অনেক মডেল সাদা কাগজের বদলে রঙিন কাগজে ভালো হয়।
(2) রঙিন কাগজের ক্ষেত্রে কাজ শুরুর আগে ভাঁজ করে দেখে নিতে হবে।
(3) অধিকাংশ মডেলই চৌকো কাগজ থেকে বানানো।
(4) অরিগামী কাজে নিম্ন ভাঁজই বেশি দিতে হয়, উর্ধ্ব ভাঁজ অনেক কম।
(5) কাগজ ভাঁজ করার সঙ্গে সঙ্গে চাপ দিতে নেই, কারণ ভুল ভাঁজের দাগ পড়লে মডেলটা নোংরা হয়ে যাবে কাজ করাও শক্ত হয়ে যাবে।
(6) অরিগামি করতে হলে Symbol অর্থাৎ প্রতীক চিহ্নগুলিকে মগজস্থ করতে হবে।

★ ওরিগামির গুরুত্ব :

(1) ওরিগামি কাজটি করতে গিয়ে শিক্ষার্থীরা জ্যামিতিক, অঙ্ক প্রভৃতি জ্ঞান অর্জন করবে।
(2) কাজটি মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীর সৌন্দর্যবোধ বৃদ্ধি পাবে।
(3) প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অরিগামি কাজটি করা যায়।
(4) শুধু মাত্র কাগজের মাধ্যমে কাজটি করতে হয় তাই অর্থনৈতিক ভাবে পিছিয়ে পরা অঞ্চলগুলির শিক্ষার্থীরা শিল্পের প্রতি আকৃষ্ট হবে।
(5) ওরিগামি শেখার ফলে শিক্ষার্থীর আত্মবিশ্বাস বাড়বে।

★ **প্রতীক চিহ্ন - তাদের পরিচয় :** প্রতীক চিহ্নগুলির যে পরিচয় দেওয়া হল তা এখন আন্তর্জাতিক 'সিম্বল'; অর্থাৎ সারা পৃথিবীর অরিগামি-বিশারদেরা যে ভাষাতেই লিখুন এই চিত্রকল্পগুলিই ব্যবহার করেন। এতে সুবিধা এই যে, শুধু ইংরেজি কেন, জাপানী বইয়ের ছবির নির্দেশ বুঝে নিয়ে আমরা মডেল বানাতে পারব। এই প্রতীক চিহ্নগুলি সুসংবদ্ধভাবে বিধিবদ্ধ করেছেন জাপানী বিশারদ আকিরা যোশিযাওয়া :

নমুনা- ১

লিখিত নির্দেশ	চিত্র নির্দেশ	প্রয়োগ নির্দেশ
নিম্নভাঁজ (সারিসারি হাইফেন চিহ্ন)	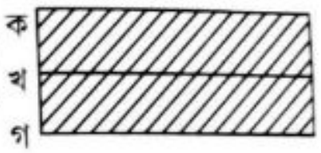	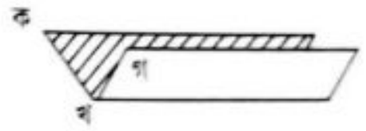
উর্ধ্বভাঁজ (ঐ চিহ্নের মাঝে ফুটকি)	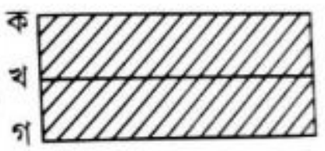	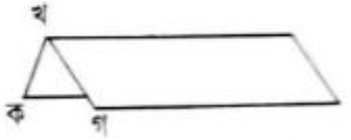
কাটতে হবে (সারিসারি ড্যাস ও কাঁচি)	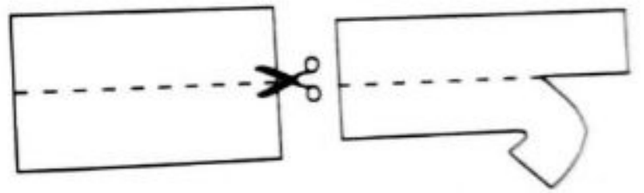	
পূর্বতন ভাঁজ (সরু কালো দাগ)	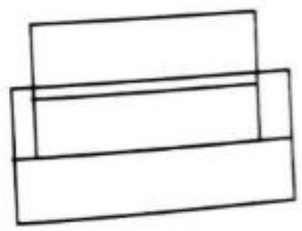	
পূর্বতন অবস্থা, অথবা কাগজের ওপিঠে রেখা আছে	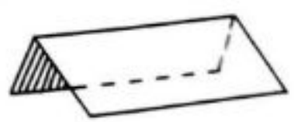	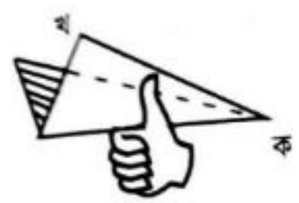
এখানে ধর (বৃত্ত চিহ্ন)	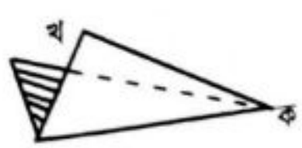	

Scanned with CamScanner

নমুনা- ২

লিখিত নির্দেশ	চিত্র নির্দেশ	প্রয়োগ ফল
সামনের দিকে ভাঁজ কর	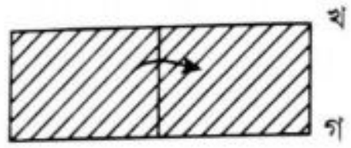	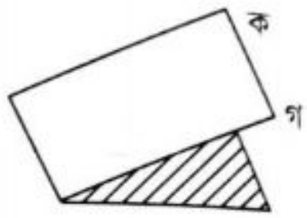
পিছনের দিকে ভাঁজ কর	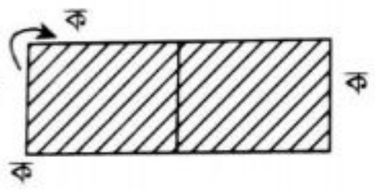	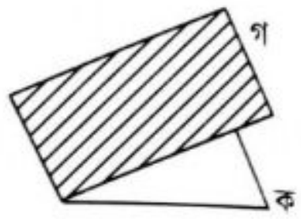
মাঝখানে ঢুকিয়ে দাও	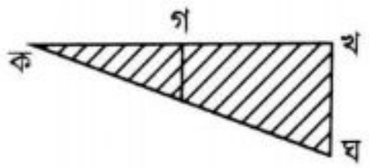	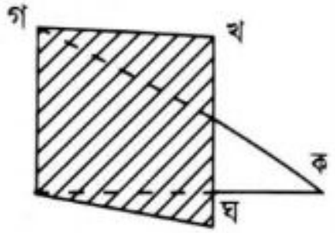
ভাঁজ কর, ভাঁজ খোল/ চাপ দাও	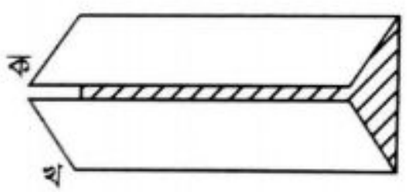	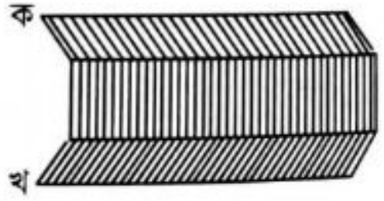
ছবিটা বড়ো করে দেখানো হল	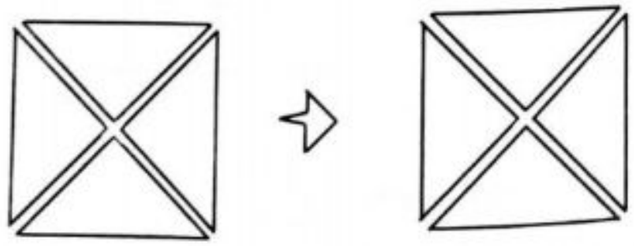	
মডেল উল্টে ধর	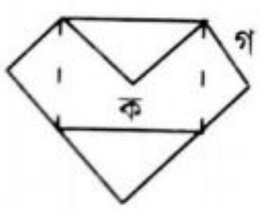	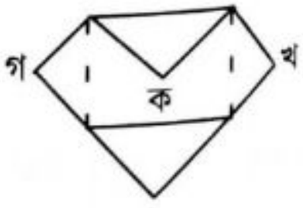

নমুনা- ৩

ebook.dascoaching.in

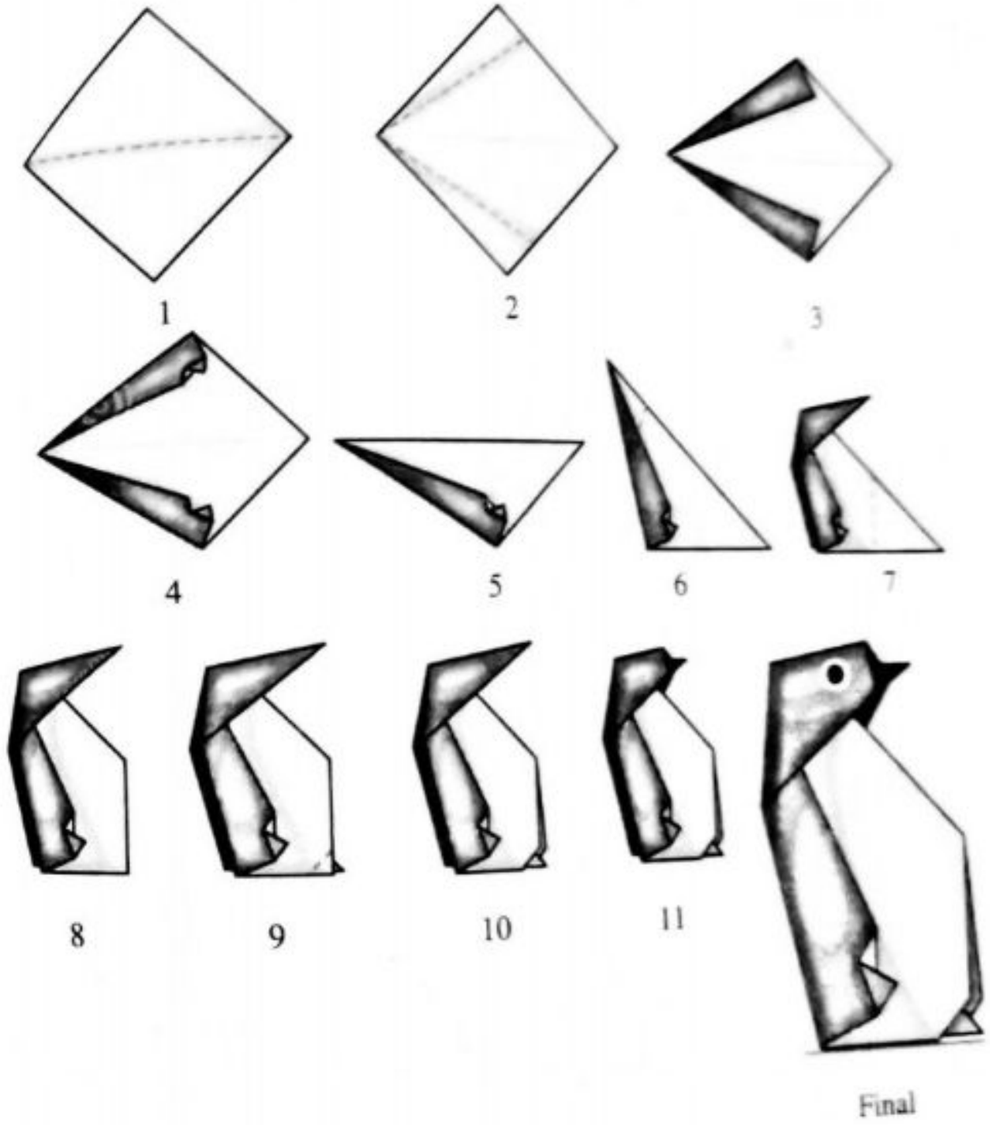

Scanned with CamScanner

নমুনা- ৪

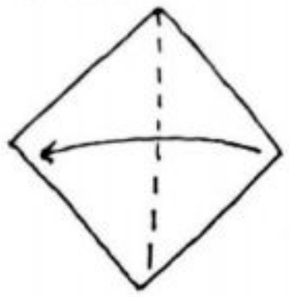

1

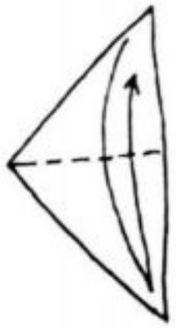

2

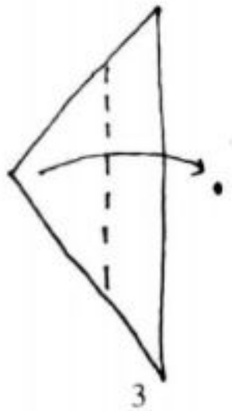

3

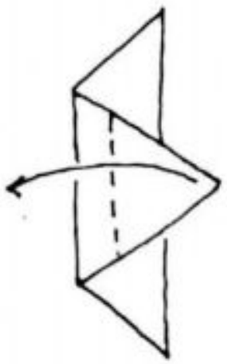

4

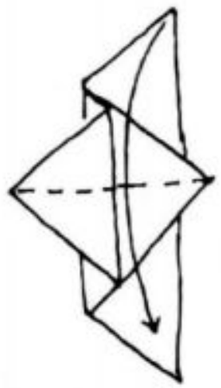

5

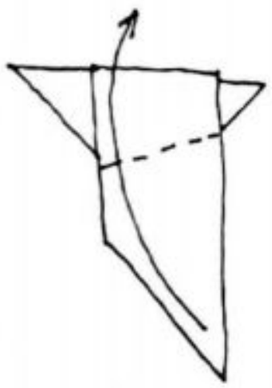

6

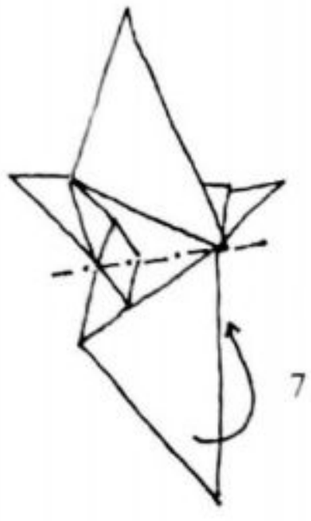

7

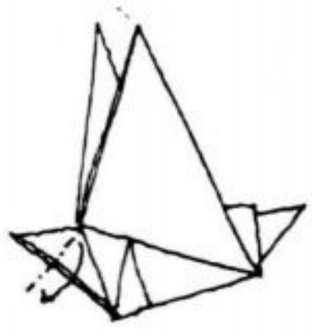

8

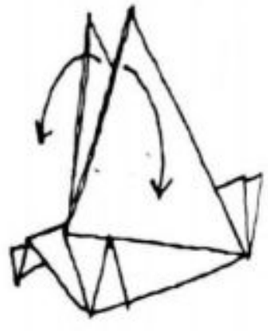

9

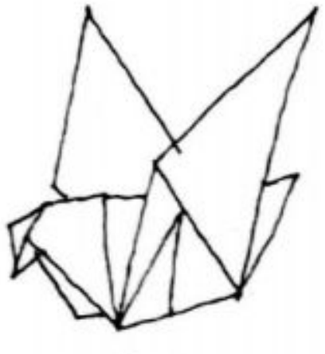

Final

নমুনা- ৫

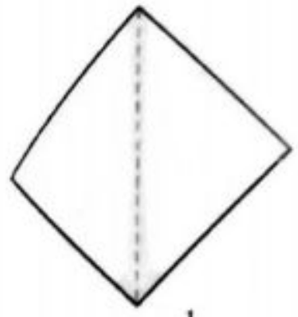

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

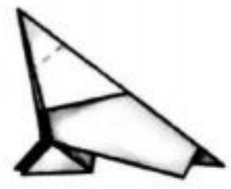

11

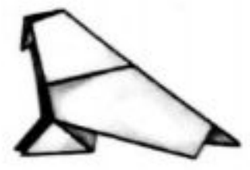

12

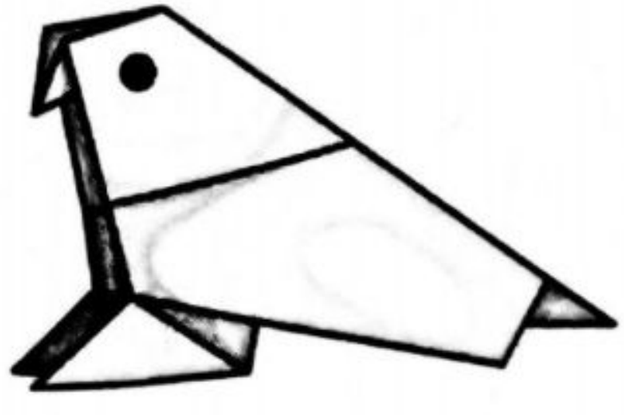

Final

Scanned with CamScanner

নমুনা- ৬

নমুনা- ৭

Scanned with CamScanner

❑ ৫.২.৩ পুতুল নাচ (Puppet) :

জড়বস্তুর মধ্যে জীবনের সঞ্চার হবার একটি আদি সংস্কার এই পুতুল নাচ। পুতুল গড়ার মতোই পুতুল নাচও একটি বিশ্বজনীন শিল্পধারা। যেহেতু পুতুলকে জীবন্ত প্রাণীর প্রতিরূপ বা প্রতিকল্প হিসেবে ভাবা হয়, তাই পুতুল নাচ ওরফে পুতুল নাট্য সেই সজীবতাকে আরও যেন বিশ্বাসযোগ্য করে তোলে। পুতুলকে দিয়ে অভিনয় করিয়ে একটা গল্পের আদল কিংবা পুরোদস্তুর কোন গল্পই দাড় করানো বিশ্বের বহু অঞ্চলেই ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল এবং অনেক জায়গায় এখনও আছে তবে মূলত এই শিল্পকে লোকনাট্য এবং লোকক্রীড়ার মধ্যবর্তী একটি প্রকরণ বলে গণ্য করাই শ্রেয়। পুতুল গড়ার পিছনে যে বিশেষ মানসিকতাটি আছে সেই প্রাগৈতিহাসিক আমল থেকেই ক্রিয়াশীল স্পষ্টতই বোঝা যায় যে পুতুল নাচও তারই অন্যতম একটি অভিব্যক্তি। পুতুল নাচ বা নাট্য এমনই একটি জনপ্রিয় শিল্পধারা যে একালে লোক সংস্কৃতির চরাচরিত কৃৎকৌশলের সীমানাকে অতিক্রম করে সেটি এখন আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যারও সাহায্য নিয়ে নিষ্পন্ন হচ্ছে।

◆ **পুতুল নাচের ইতিকথা :** পুতুল নাচের বয়স খুবই প্রাচীন। খ্রিষ্টপূর্ব ৪র্থ শতকে প্লবক, কুহক প্রভৃতি ভ্রাম্যমান আনন্দ বিনোদনকারী সম্প্রদায় পুতুল নাচিয়ে জীবিকার্জন করত বলে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে উল্লেখ হয়েছে। তার শ দুয়েক বছর পরে পতঞ্জলির মহাভাষেও পুতুল নাচের উল্লেখ আছে। ইউরোপেও পুতুল নাচ খ্রিষ্টপূর্ব আমলে পারদর্শিত হয়। ভারতীয় উপমহাদেশে বিপিন পাল প্রথম পুতুল নাচের প্রচলন করে বলে জানা যায়। বিপিন পাল তৎসময় সামাজিক পেক্ষাপট বিবেচনায় পৌরাণিক কাহিনি অবলম্বন করে পুতুল নাচ করতেন বলে জানা যায়। ভারতীয় ও ইন্দোনেশীয় পুতুল নাচ এখন পুরানো পদ্ধতিতেই নির্ভরশীল। ভিয়েতনামে ১১ শতাব্দী থেকেই জলের ওপর সুতোয় টানা পুতুল নাচের প্রচলন বেশ জনপ্রিয় হয়ে আছে এ অবধি। পশ্চিমবঙ্গে এই শিল্পকলা লোকনাট্যে সাধারণ স্রোতেই ভেসে চলেছে। লোকনাট্য যেমন পুরাণ কথা থেকে সামাজিক বিষয় অবধি, বহুবিচিত্র উপজীব্য অবলম্বন করা হয়, পুতুল নাচও তার থেকে পৃথক কিছু নয়।

◆ **পুতুল নাচের বিভিন্ন ধরনের পদ্ধতি :** আদিম প্রত্ননিদর্শ হিসেবে মত পুতুল পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে পাওয়া গেছে তাদের মধ্যে কিছু কিছু ক্ষেত্রে নৃত্যপুত্তলি রূপেই ব্যবহৃত হবার সংকেত মেলে। এই বিশেষ পুতুলগুলির গায়ে সুতো ঢোকানোর মতো ছোটো ছোটো মুঠো দেখা যায় বলে অনেক সময়ই এমন সিদ্ধান্ত করা হয়ে থাকে যে এগুলি সেই স্মরণতীত ছায়াচ্ছন্ন ধূসর আদিমকালেই নাচের পুতুল হিসেবে ব্যবহৃত হত। ঠিক এখান থেকে নাচের পুতুলের প্রকরণগুলি কত রকমের হতে পারে সেই প্রশ্ন ওঠে।

◆ Hand Pappet :

Hand Puppet হল Puppet-এর সেই ধরন যেখানে Puppet-এর ভিতরে হাত ঢুকিয়ে পাপেটের নড়াচড়াকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। Glove puppet এই Hand puppet-এর একটা ধরন।

◆ Simple Hand Pappet :

একদম সাদামাটা Hand Puppet-গুলিতে খুব কম নড়াচড়া করার অংশ থাকে। এইগুলো তৈরি হয় মোটা শক্ত ধরনের প্ল্যাস্টিক অথবা কাপড় দিয়ে। এই ধরনের Hand Puppet-এর মুখ খোলা বা কাজ করা যায় না। এইগুলো হাতের থেকে খুব বেশি বড় হয় না। Hand Puppet-এর একটি সরল ধরন হল মোজার Puppet, দস্তানা Puppet বা Glove puppet, Hand puppet-এর ধরন সহজে অনায়াসে তৈরি করা যায়।

Scanned with CamScanner

◆ মোজার পুতুল (Hand Puppet with Socks) :

মোজার পুতুল মোজা অথবা সাধারণ পোশাক দিয়ে তৈরি করা যায়। পুতুলের শিল্পীরা মোজাটিকে হাত বা হাতের নীচের বাহুতে দস্তানার মতো করে পড়তে হবে। পুতুলের মুখ তৈরি হবে যেটা গোড়ালি ও পায়ের পাতার অংশটি দিয়ে এবং পুতুল শিল্পীরা এর বুড়ো আঙুল চোয়ালের অভিনয় করবে। হাতের আঙুলের গঠন হবে মুখের মতো যেটা জমাট হইয়া কঠিন বস্ত্রে পরিণত হবে মাঝে মধ্যে জিভটা আঠা দিয়ে ভিতরে লাগাতে হবে।

মোজাটি এমনভাবে বানাতে হবে যেটা পুতুল শিল্পীর কবজি বা বাহু ঢাকাতে যথেষ্ট হয়। কখন কখন কিন্তু সবসময় নয় পুতুল শিল্পী আড়ালে দাঁড়িয়ে থাকে এবং উপরে হাত তুলে থাকে যাতে শুধু পুতুলটাই দৃশ্যমান হয়। আবার এমন অনেক পুতুল নাচের শিল্পী যারা পুতুলের সঙ্গে সামনে দাঁড়িয়ে থাকে কথোপকথন বলার জন্য, এমন ভাবে কথা বলা হবে যে কণ্ঠস্বর দূর হইতে বা অপরের নিকট হইতে আসিতেছে বলে মনে হয়।

মোজার পুতুল বিভিন্ন রঙের মোজার হতে পারে—যে কোন ধরনের মোজা দিয়ে পুতুল তৈরি করা যাবে। কিন্তু মোজা যদি ছিন্ন হয় তাহলে তা প্রদর্শন করার সময় পতিত হতে পারে। সুতরাং সেটা নতুন হওয়া বাঞ্ছনীয়। আঠা দিয়ে অতিরিক্ত কিছু যোগ করা যেতে পারে পুতুলের বিশেষত্ব আনার জন্য ফিতা বা দড়ি আঠা দিয়ে লাগাতে হবে চুলের জন্য। বোতাম অথবা গুগলি আইস পুতুলের চোখের জন্য ব্যবহার করতে হবে।

● **মোজার পুতুলের ব্যবহার :** শিক্ষাক্ষেত্রে এবং শিশুদের আমোদ-প্রমোদের জন্য মাঝে মাঝে এই মোজার পুতুল ব্যবহার করা হয়। তারা এটাকে বিস্তারিত ভাবে পুতুল খেলা অথবা শিশুদের নাটকের জন্য ব্যবহার করতে পারে। মোজার পুতুল তৈরির পদ্ধতি সৃজনাত্মক কাজ হিসেবে প্রাথমিক স্কুলে শিক্ষা দেওয়া হয়।

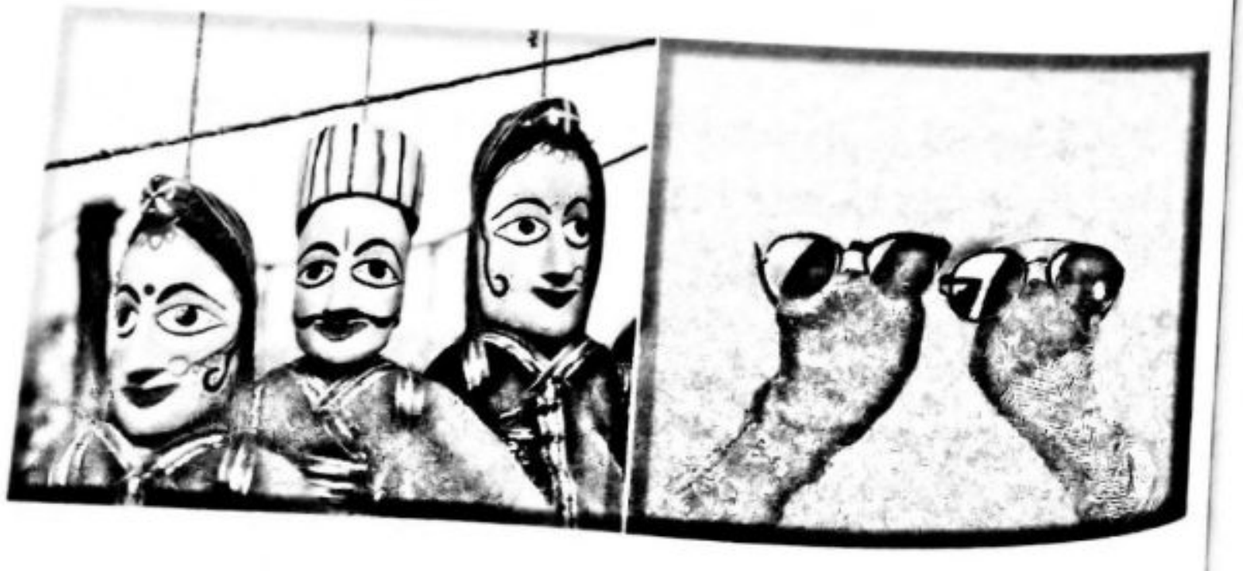

◆ হ্যান্ড শ্যাডো পাপেট :

শ্যাডো পাপেট্রি প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী পাপেট্রির একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ। এখানে চ্যাপ্টা মমতলীয় পুতুলকে ব্যবহার করা হয়। পুতুলগুলির পেছনে আলো থাকে এবং সামনে একটি পাতলা পর্দা দেওয়া থাকে। পর্দার ওপারে থাকে দর্শকেরা। এর ফলে যখন পুতুলগুলি নাড়ানো হয় তখন আলোর বিপরীতে থাকার জন্য পুতুলগুলির ছায়া পর্দার ওপরে পড়ে। দর্শকরা পর্দার ওপর প্রান্তে থাকার জন্য পুতুলগুলি দেখতে পারেন না। কেবলমাত্র পুতুলের ছায়াগুলি দেখতে পান। ভারতবর্ষ, ইন্দোনেশিয়া, বালি, কম্বোডিয়া, মালেশিয়া, থাইল্যান্ড, চিন প্রভৃতি অঞ্চলে ছায়া পাপেট বহুল পরিমাণে প্রচলিত।

◆ ভারতীয় ছায়া পাপেট :

অন্ধ্রপ্রদেশে এখনও চামড়ার ওপর ছবি এঁকে ছায়া বা শ্যাডো পাপেট তৈরি করা হয়। অন্ধ্রের থলু-বোম্মালতা ছাড়াও কর্ণাটকে টোগালু গম্বে আতা, উড়িষ্যার রাবন ছায়া নামক পাপেট উল্লেখযোগ্য।

◆ ডাণ্ডের পুতুল (Rod Puppet) :

ডাণ্ডের পুতুলগুলি মঞ্চের নীচের থেকে শিল্পীরা নড়াচড়া করান। কাহিনির প্রয়োজন অনুসারে শিল্পীরা ওই সুতো টেনে বা আলগা দিয়ে পুতুলের মাথা এবং হাত দুটিকে নড়াচড়া করান। একটি মাঝারি মাপের ডান্ডার ওপর পুতুলের মাথা এবং দুটি হাত ঢিলেভাবে লাগিয়ে শক্ত সুতো তাদের সঙ্গে বেঁধে দিয়ে সেগুলি ওই ডাণ্ডের সঙ্গেই জড়িয়ে দেওয়া হয়। পুতুলের গায়ে পোশাক চড়ানো থাকে বলে ওই সুতো টানা বা ডাণ্ড ঘোরানোটা বোঝা যায় না।

পুতুলনাচ ছোটদের কাছে খুবই প্রিয় একটি অভিকরণকলা। পাশ্চাত্য দেশগুলিতে আধুনিক প্রযুক্তি বিদ্যা এই সব পুরনো পদ্ধতির মধ্যে ব্যাপর রূপান্তর ঘটিয়ে দিয়েছে। এদেশে বা ইন্দোনেশিয়ায়, মালেশিয়ায় অবশ্য ঐতিহ্যবাহী পদ্ধতিই এখনও বেশি প্রচলিত। তবে অন্তত ভারতবর্ষে পুতুল নাচ একটি ক্ষীয়মান কলায় পরিণতি পাচ্ছে।

☛ সরল কাগজের পাপেট নির্মাণ পদ্ধতি :

- একটি 16 inch লম্বা ও 9 inch চওড়া কাগজকে তিন ভাঁজে মুড়ে নিতে হবে।
- পাশের অংশটি আঠা দিয়ে আটকে দিতে হবে যাতে কাগজটির ভাঁজটি খুলে না যায়।
- এবার কাগজের দু-দিকে যে-কোনো রং দিয়ে রং করে নিতে হবে।
- এবার কাগজের ফালিটিকে পরপর চারটি ভাঁজে ভাগ করে নিতে হবে।
- একদম উপরের ভাঁজটিকে মুখের উর্ধ্বাংশ, চোখ, নাক আঁকতে হবে।
- তিন নম্বর ভাঁজে মুখ, জিহ্বা এঁকে নিতে হবে বা জিহ্বার অংশটিকে আলাদা কাগজ কেটে বসাতে হবে।
- এবার ভাঁজ করা কাগজটিকে শিশুরা পেছনের দিকে ধরে মুখটিকে হা বন্ধ করতে পারে।

Scanned with CamScanner

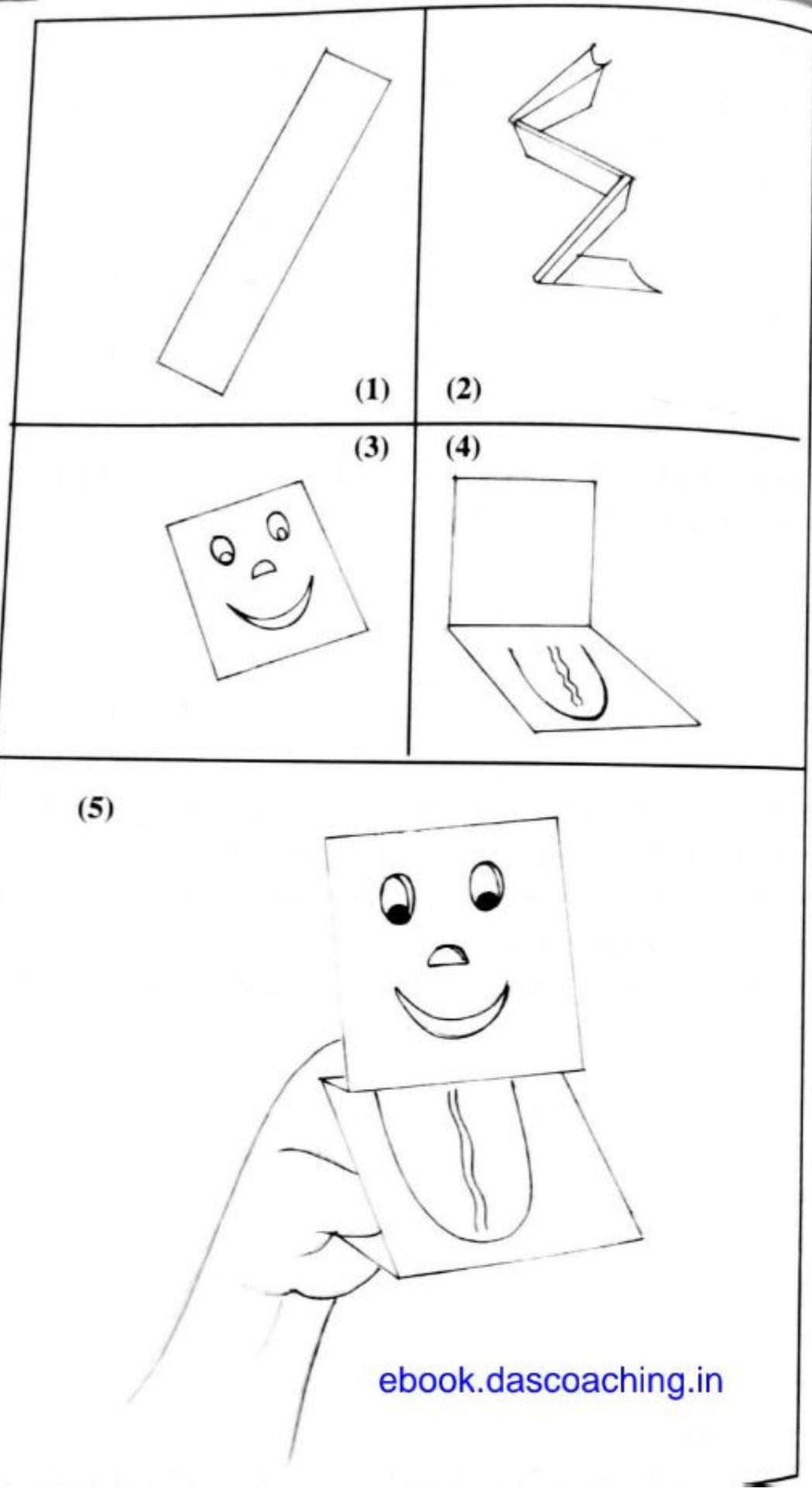

ebook.dascoaching.in

• হ্যান্ড পাপেট পদ্ধতি :

• **উপকরণ** : Felt, Velcro, Gloves, বোতাম, কাঁচি এবং মোটা সুঁচ।

• পদ্ধতি :

- কালো উল দিয়ে বোতাম দুটিকে তর্জনী এবং অনামিকায় বসিয়ে দিতে হবে যাতে তার চোখের মতো দেখতে লাগে।
- এবার একটি বড়ো গোল লাল Felt কেটে দস্তানার তালু অংশে লাল উল দিয়ে সেলাই করতে হবে।
- এরপর অন্য রঙ Felt দিয়ে মুখ এবং তলার অংশকে অলংকরণ করতে হবে।
- এরপর Felt দিয়ে দুপাশে দুটি হাত তৈরি করতে হবে।
- হাত দুটিতে ছোট Velcro টুকরো লাগিয়ে দিলে তা কোনো কিছু ধরতে সাহায্য করবে।

এই Gloves পাপেট তৈরি করা অত্যন্ত সহজ এবং শিশুরা অনায়াসে বাড়িতে পড়ে থাকা পুরনো দস্তানা দিয়ে এই Gloves পাপেট তৈরি করতে পারবে।

✪ ৫.৩ অলঙ্করণ শিল্প– রঙ্গোলি, ইকেবানা, ভিত্তি চিত্র (মুরাল) [Decorative Art– Rangoli, Ikebana, Wall painting (Mural)] :

❑ ৫.৩.১ রঙ্গোলি বা আলপনা (Rangoli or Alpana) :

মহারাষ্ট্র ও কর্ণাটকে মাটির ওপর অঙ্কিত শুভ নকশাকে রঙ্গোলি বলা হয়। রঙ্গোলি শব্দটির সংস্কৃত শব্দ রঙ্গভালি থেকে এসেছে যার অর্থ রঙ দিয়ে অঙ্কিত লতা। আভালি শব্দটির মানে লতা গুল্ম। সাধারণ মানুষের বিশ্বাস রঙ্গোলি সমৃদ্ধি ও শ্রীর দেবীকে আহ্বান করে। অঞ্চলভেদে রঙ্গোলির নাম, উপাদান এবং নকশা বদলে যায়। রঙ্গোলিকে আসামে ও বাংলায় আল্পনা, বিহারে অরিপন, ছত্তিশগড়ে চৌকপূর্ণ, রাজস্থানে মন্ডন, হিমাচল প্রদেশ ও হরিয়ানায় লিখনুয়া, কেরলে কোলাম বা কালাম গুজরাটে সাথিয়া, উত্তরপ্রদেশে সোমাকাখনা, আলমোড়ায় আপনা নামে পরিচিত। আল্পনার উৎস এখনো অমিমাংসিত। তবে দেখা গেছে মাটির ওপর অঙ্কিত এই শুভ নকশাগুলির আঞ্চলিক নামের কিছু শব্দ প্রাক আর্য যুগীয়। আল্পনা শব্দটির মূল সংস্কৃত শব্দ হল আলিম্পন যার অর্থ প্রলেপ দেওয়া। কিন্তু সম্ভবত আল্পনা শব্দটি এসেছে একটি অনার্য শব্দ আইলপনা থেকে। আইল শব্দটির অর্থ বাঁধ বা গন্ডি। অনেক বিশেষজ্ঞই মনে করেন আল্পনা যে সংস্কৃতজাত শব্দ তা ঠিক নয় বরং আল্পনার

Scanned with CamScanner

সংস্কৃতি আরো পুরোনো। লোকবিশ্বাস অনুযায়ী আল্পনা গৃহ, গ্রামকে গন্ডির মত আল্পনার রেখা ও রক্ষাকারী যাদু ক্ষমতা সম্পৃক্ত। আবার রাজস্থানে মন্ডন শব্দটির অর্থ অলংকরণ।

বেশিরভাগ পন্ডিতরাই মনে করেন রঙ্গোলি প্রাক আর্য সংস্কৃতি যা মহেঞ্জোদারোর সীলের নকশায় পাওয়া যায়। পুপুল জায়কারের মতে সীলের নকশাগুলির জ্যামিতিক রূপের সঙ্গে মন্ডনের জ্যামিতিক রূপগুলির মিল আছে। হরপ্পান সভ্যতায় যে চিত্রিত পাত্রগুলি পাওয়া যায় তার সঙ্গেও বর্তমানে বিভিন্ন অঞ্চলে অঙ্কিত রঙ্গোলিক মিল পাওয়া যায়। বাংলার আল্পনায় অঙ্কিত বেশ কিছু মেটিফ যেমন মাছ, সাপ, শঙ্খ, বিছা, নবগ্রহ, সিন্ধুসভ্যতায় প্রাপ্ত পাত্রগুলির গায়ে অঙ্কিত মেটিফগুলির সাদৃশ্যযুক্ত। এছাড়া সিন্ধু মৃৎপাত্রের গায়ে বৈচিত্রময় জ্যামিতিক নকশা দেখা যায় যেমন দাবার ছক, অনুভূমিক সমান্তরাল পটি, ত্রিভুজ, চৌকো, বৃত্ত স্বস্তিক, ডেউ। রাজস্থানের মন্ডনশিল্পে এই জ্যামিতিক মোটিফগুলি পরিলক্ষিত হয়। বিভিন্ন অঞ্চলের নকসাগুলিকে দুটি মূল ভাগে ভাগ করা যায়। আকৃতি প্রধান ও বস্তুপ্রধান। রাজস্থান, মহারাষ্ট্র ও ভারতের দক্ষিণ অংশের রঙ্গোলি আকৃতি প্রধান বা জ্যামিতিক রূপ বিশিষ্ট এবং বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা অঞ্চলের রঙ্গোলি প্রভৃতি প্রধান যেখানে প্রাকৃতিক বস্তুগুলির রূপ দেখা যায়।

◆ বিভিন্ন স্থানের রঙ্গোলি :

আপাতদৃষ্টিতে মাটির ওপর অঙ্কিত এই নকশাগুলির উদ্দেশ্য অলংকরণ ও সৌন্দর্যবর্ধন হলেও লোকবিশ্বাস অনুযায়ী এগুলি শুভ, পবিত্র ও অশুভ প্রতিরোধকারী। সাধারণত বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠান যেমন বিবাহ, অন্নপ্রাশন, নামকরণ, উপকরণ এবং কিছু পূজায় যেমন লক্ষ্মীপূজা, সরস্বতী পূজা, মকরসংক্রান্তি, দীপাবলি, গনেশ পূজায় রঙ্গোলি অঙ্কনের প্রচলন আছে। তবে মহারাষ্ট্র, গুজরাট ও দক্ষিণ ভারতে মহিলারা প্রাত্যহিক ভাবে রঙ্গোলি অঙ্কন করেন। প্রতিদিন সকালবেলা গৃহপ্রাঙ্গনের সামনের অংশটি ধুয়ে চালের গুঁড়ো দিয়ে আল্পনা আঁকা হয়। গুজরাটে সাধারনত স্বস্তিক চিহ্নটি আঁকা হয়। মহারাষ্ট্রে বাড়ীর মহিলারা অন্তত তুলসী বেদীর চারপাশে ও খাবার জায়গায় রঙ্গোলি আঁকবেই। তামিলনাড়ুতে কোলাম আঁকার মূল ইউনিট হল বিশেষ ছকে সাজানো বিন্দু। একে পুল্লি বলা হয়। এই পুল্লিগুলিকে যুক্ত করে বা চারপাশ ঘিরে যে রেখা আঁকা হয় তাকে তামিলভাষায় সিক্কু বলা হয়। কোলামে আঁকা নকশাগুলি জ্যামিতিক ও অ্যাবস্ট্রাক্ট। কখনো কখনো কোলামে ফুটে ওঠে চন্দ্র, সূর্য ও তারা। তাছাড়া ফুল, পাখী, সর্প, মাছও আঁকা হয়। গৃহ প্রাঙ্গনের সম্মুখে আল্পনা চালের গুঁড়ো দিয়ে অঙ্কিত হওয়ার কারণে তা পৃথিবীর কীটসকল ও পাখী দ্বারা ভক্ষিত হয়। এইভাবে প্রাণীকুলের সঙ্গে যুক্ত মানুষের সম্পর্ক স্থাপিত হয়। রঙ্গোলিতে আঁকা মোটিফ গুলি প্রতীকী বঞ্জনাযুক্ত যা বিশেষ অর্থ বহন করে। তাই বিশেষ বিশেষ পূজা বা অনুষ্ঠানে বিশেষ নকশার রঙ্গোলি আঁকা হয়। রঙ্গোলির এই নকশাগুলি প্রবাহিত হয় পরিবারের এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে, এইভাবে সময়ের সাথে বয়ে চলে রঙ্গোলির ঐতিহ্য।

◆ বাংলার আল্পনা :

বাংলার আল্পনা মূলত বাংলার ব্রতের একটি বিশেষ অঙ্গ। আল্পনার নকশায় নারীমনের কামনাগুলি মূর্ত হয়ে ওঠে। ব্রতানুষ্ঠানের মূলে আছে বহু মানুষের কামনা। সেই কামনাকে পূরণ করার জন্য সকলে মিলিত হয়ে ব্রত পালন করে ব্রতরই pictorical রূপ হল আল্পনা। আল্পনার মধ্যে থাকে বহুবিধ প্রতীকের ব্যবহার। এই প্রতীকগুলি যাদুবিশ্বাসজাত বলে মনে করা হয়। আল্পনার যে প্রতীকগুলি আঁকা হয় মনে করা হয় বাস্তবেও সেগুলি আয়ত্তাধীন হবে। ধানের শীষ আঁকলে মাঠে ও মরাইতে ধান উপচে পড়বে, মাছভর্তি পুকুর আঁকলে সত্যিকারের পুকুরও মাছে ভরে উঠবে। ফুলন্ত ফলন্ত গাছ, বাড়ি, মরাই আঁকলে বাস্তবেও তা পাওয়া যাবে। সেঁজুতি ব্রতে পিটুলির গোলা দিয়ে হারবালা প্রভৃতি অলঙ্কার অঙ্কন করে গৃহবধূরা মনে করে বাস্তবেও তারা এই স্বর্ণালঙ্কারগুলি লাভ করবে।

চালের গুঁড়ো দিয়ে আল্পনা হয় বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন আল্পনা জন্মগ্রহণ করেছে কৃষিভত্তিক সমাজে। হরপ্পান সভ্যতাতেও ভূমির ওপর নকশা অঙ্কনের প্রমান মেলে যাকে আল্পনার আত্মীয় বলে মনে করা হয়। আল্পনার পিছনে যে যাদুবিশ্বাস তার শিকড় প্রোথিত শিকার ভিত্তিক সমাজে। শিকারী সমাজে পশু পদচিহ্ন ছিল শুভ কারণ ঐ চিহ্ন ধরে মানুষরা শিকার খুঁজে পেত। কৃষি সমাজেও পদচিহ্নের ঐ সুরক্ষণা চরিত্র বজায় থাকল। তাই লক্ষ্মী ব্রতে লক্ষ্মীর পদচিহ্ন আঁকা হয় যা ঘরের ভিতর প্রবেশ করে ঘরে সুখ সমৃদ্ধি, ধন সম্পদ শষ্যে ভরিয়ে দেবেন। বাংলায় যেমন লক্ষ্মীপূজার মূল আল্পনা হল লক্ষ্মীর পদচিহ্ন তেমনি বিহারেও লক্ষ্মীপূজায় পদ্মলতার মাঝে লক্ষ্মীর পদচিহ্ন আকা হয়। দীপাবলীর দিন রাজস্থানে লক্ষ্মী পূজো হয় বলে দীপাবলীর দিনে অঙ্কিত মন্ডনের মূল মোটিফ হল পাগলা। দক্ষিণ-ভারতে লক্ষ্মীর পদচিহ্নের পাশে বিষ্ণুর পদচিহ্ন অঙ্কিত হয়।

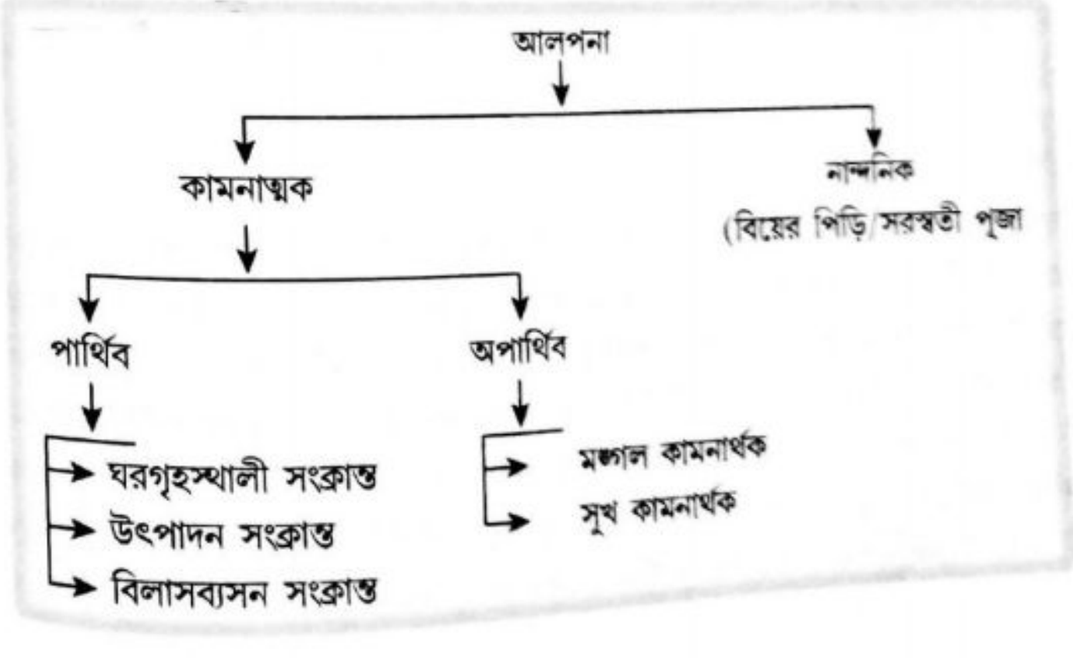

Scanned with CamScanner

• আল্পনার শ্রেণিবিভাগ :

অবনীন্দনাথ তাঁর 'বাংলায় ব্রত' গ্রন্থখানিতে আল্পনাকে দুটি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন। তাঁর মতে একরকমের আল্পনা যা মন চেয়েছে তারই চিত্রমূর্তি যেমন গহনা, ঘরবাড়ি, গোলাভরা উপচে পরা ধান, পুকুরভরা মাছ, গোয়ালঘর, রান্নাঘর, চন্দ্রসূর্য্য সন্তানবতী নারী। এমন তার কামনা ও চাহিদার ছবি। কিন্তু আরেক ধরনের আল্পনা মানুষ তার কল্পনা ও সৌন্দর্য্যবোধের তাগিদ থেকে এঁকেছে যেমন শঙ্খলতা, খুস্তিলতা, সহস্রদল পদ্ম, কল্কা প্রভৃতি।

বাংলার আল্পনাকে আবার দুইভাগে ভাগ করা যায় আচার কেন্দ্রিক আল্পনা ও আনন্দানুষ্ঠান কেন্দ্রিক আল্পনা। ব্রততে যে আল্পনা দেওয়া হয় তা প্রথম শ্রেণিভুক্ত এবং বিবাহ অন্নপ্রাশন বা অন্যান্য আনন্দ অনুষ্ঠানে যে আল্পনা দেওয়া হয় তা দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত ব্রতর জন্য চিত্রিত আল্পনা কেবল সাদা রঙেই অঙ্কিত হয়, কিন্তু অন্যান্য শুভানুষ্ঠান যেমন বিবাহের আল্পনায় অন্যান্য রঙও ব্যবহার করা হয়।

◆ শান্তিনিকেতনের আল্পনা :

বর্তমানে শান্তিনিকেতন আল্পনা নামক এক নতুন ধরনের আল্পনা জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ লক্ষ্য করেছিলেন আল্পনা হচ্ছে সর্বাপেক্ষা পরিচিত ও সহজসাধ্য অঙ্কন প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে সাধারণের মধ্যে সৌন্দর্য্য ও নান্দনিক বোধ পরিস্ফুট করা সম্ভব। তিনি আল্পনাকে কেবলই নান্দনিকতার পরিপ্রেক্ষিতে স্থাপন করলেন। এর ফলে শান্তিনিকেতন আল্পনার এক নতুন ঘরানা সৃষ্টি হল যা চরিত্রগতভাবে বাংলার গ্রামীন ঐতিহ্যবাহী আল্পনা হতে পৃথক। শান্তিনিকেতনের আল্পনা অনেক মার্জিত; পরিশীলিত ও নাগরিক মানসিকতা সম্পন্ন। তবে ঐতিহ্যবাহী আল্পনার অর্গানিক ভিগার (organic rigour) এখানে অনুপস্থিত।

শান্তিনিকেতনের আল্পনায় মূলত স্থান পেয়েছে প্রকৃতির প্রাণছন্দময়তা, ফুল, পাখী, পাতা, মাছ, গাছ, লতা কল্কা তার নিজস্ব গড়ন ও ছন্দ নিয়ে আল্পনায় স্থান পেয়েছে। শান্তিনিকেতনের আল্পনা ধর্মীয় অনুষঙ্গ বিরহিত কেবলমাত্র অলংকরন যা দর্শকদের মন সৌন্দর্য্য জাগরক করে।

• রঙ্গোলির উপকরণ : রঙ্গোলি অঙ্কনের মূল উপকরণ হল চালের গুঁড়ো। চাল জল দিয়ে বেটে লেই এর মত করে তরল সাদা রঙ ব্যবহার করা হয়। এছাড়া ক্ষেত্রবিশেষে লাল ও হলুদ রঙও ব্যবহার করা হয়। মহারাষ্ট্রে রঙ্গোলিতে বহু রঙের গুঁড়ো ব্যবহার করা হয়। বর্তমানে সাদা রঙের জন্য জিঙ্ক অক্সাইড ব্যবহৃত হচ্ছে ও অন্যান্য রঙের ক্ষেত্রেও কৃত্রিম রঙের গুঁড়ো ব্যবহার করা হয়। শান্তিনিকেতনের আল্পনায় প্রকৃতিজাত রঙগুলি যেমন ইন্ডিয়ান রেড, ইয়েলো আকার, গোরিমাটির রঙ গঙ্গামাটির রঙ, টেরাভার্ট সবুজ, নীল ব্যবহার করা হয়।

• রঙ্গোলি আঁকার উপলক্ষ :

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা তাদের বিদ্যালয়ের উৎসবগুলিতে যেমন প্রতিষ্ঠা দিবস, স্পোর্টস, পুরস্কার দান দিবস, শিক্ষক দিবস, স্বাধীনতা দিবস প্রভৃতিতে, ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যেমন সরস্বতীর পূজায় বা বিশেষ কোন অতিথি আগমন উপলক্ষে নিজ বিদ্যালয়কে সুসজ্জিত করার জন্য রঙ্গোলি আঁকতে পারে। প্রথমে কোনখানে বা কোন অ্যারো আঁকা হবে সেই অংশটি নির্বাচন করে নিয়ে সেই জায়গার আকার অনুযায়ী রঙ্গোলির নকশা ভাবতে হবে। এবার চক দিয়ে নকশার খসড়াটি এঁকে তাতে রঙ ভরতে হবে। নকশা সরল অথচ সৌন্দর্যময়, নয়নাভিরাম হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

• রঙ্গোলি আঁকার পদ্ধতি :

রঙ্গোলির জন্য জ্যামিতিক নকশা বেছে নিতেন পুরো ক্ষেত্রটিকে চারটি সমান ভাগে ভাগ করে নিলে নকশা আঁকতে সুবিধে হবে এবং নকশাচিত্র নিখুঁত হবে। কোলমে যে রকম বিন্দু দিয়ে নকশা আঁকা হয় সেইভাবে আল্পনা আঁকলে ছাত্রছাত্রীদের সুবিধা হবে কারণ তা ছক ধরে আঁকা হয়। স্বাধীনতা দিবসে ভারতের জাতীয় পতাকাকে কেন্দ্র করে আল্পনা আঁকলে তা অত্যন্ত সুন্দর লাগবে সরস্বতীর পূজার রঙ্গোলির নকশার মোটিফ হতে পারে বাংলায়। পুরো প্রকল্পটি দলগত প্রক্রিয়া হিসাবে সম্পাদন করতে হবে। রঙ হিসাবে জিঙ্ক অক্সাইড ও রঙের দোকানে প্রাপ্ত গুঁড়ো রঙ বিভিন্ন রঙের জন্য ব্যবহার করতে হবে। আঁকার জন্য মোটা লাইলনের ব্রাশ ব্যবহার করতে হবে। বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা সম্মীলিত ভাবে তাদের বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে সুসজ্জিত করে অত্যন্ত আনন্দলাভ করবে। এছাড়া বিভিন্ন ধরনের ফুল

Scanned with CamScanner

ও পাতা দিয়েও রঙ্গোলি করা যায়। তবে একটু ভারী ফুলই নেওয়া ভাল যাতে বাতাসে তা সরে না যায়। শান্তিনিকেতন আশ্রম প্রাঙ্গনে স্বাধীনতা দিবসে ফুল ও পাতা দিয়েই আল্পনা করা হয়। রঙ্গোলি যদি স্থায়ী করে রক্ষা করতে হয় তাহলে এনামেল পেন্ট দিয়ে আঁকা উচিত। গুঁড়ো রঙ হলে তার সঙ্গে ফেভিকলের আঠা মেশালে আল্পনা দীর্ঘদিন স্থায়ী হয়। গুঁড়ো রঙে সাধারণ গঁদ মেশালে তা তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যায়।

◆ বিদ্যালয় ছাত্রছাত্রীদের দ্বারা রঙ্গোলি অঙ্কন :

বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে রঙ্গোলি অঙ্কনের প্রকল্পটি উচু ক্লাসে ছাত্রছাত্রী দ্বারা সম্পাদিত করাই শ্রেয়। পঞ্চম শ্রেণির ছাত্রছাত্রীরা মাটির সরার ওপর রঙ্গোলি চিত্র অঙ্কন করতে পারে।

ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্রছাত্রীরা ফ্রেব্রিক পেন্ট এর সাহায্যে তাদের পোষাকে বা রুমালে রঙ্গোলির নকশা অঙ্কন করতে পারে এবং সপ্তম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরা জেনিমের নীল ব্যাগের ওপর ফেব্রিক পেন্ট রঙ্গোলির নকশা এঁকে ব্যাগটিকে সুশোভিত করতে পারে। এইভাবে রঙ্গোলির নকশাকে অন্যভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

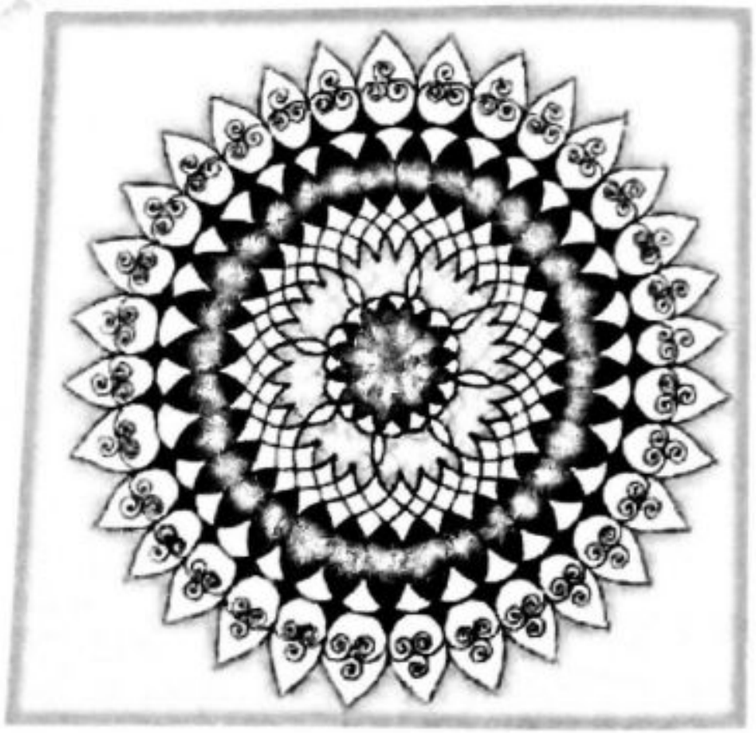

● রঙ্গোলির নক্সা :

প্রাকৃতিক আকৃতি গুলি দিয়ে রঙ্গোলি আঁকা যেতে পারে। রঙ্গোলির মূল ঐশ্বর্য্য হল তার রেখা ও আকারের ছন্দময়তা। কোন প্রাকৃতিক রূপ স্থান পেলেও তাকে ছন্দময় রূপের ডিজাইনে রূপান্তরিত করা হয়। নকশা জ্যামিতিক হলেও তা যেন সুন্দর হয়। আল্পনার আর একটি বড় বৈশিষ্ট্য হল আকারের পুনরাবত্তি। নকশার এই পুনরাবত্তি নকসাকে সুন্দর করে তোলে। কাজেই খেয়াল রাখা উচিত কোন নির্দিষ্ট মোটিফে পুনরাবৃত্ত আকারগুলি যেন

সমমাপের হয়। তা না হলে নকশা ত্রুটিপূর্ণ হয়ে যায়। রঙ্গোলির আকারের সঙ্গে রঙের প্রয়োগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিটি রঙ পরস্পরের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া উচিত। কোন রঙ অপর রঙকে ছাপিয়ে না যায়। আল্পনার রঙ অনেকটা সমবেত কণ্ঠ সংগীতের মত যেখানে দলগতভাবে গান গাওয়া হলেও প্রতিটি কণ্ঠ একই সুরে বাঁধা থাকে।

☐ ৫.৩.২ ইকেবানা (Ikebana) :

• ইকেবানার ইতিহাস :

ইকেবানা হল একটি জাপানি শব্দ অর্থ ফুল সাজানো (arranging flowers)। ইকেবানা নিছক ফুল সাজানো নয়, বরং জাপানে একটি বিশেষ শিল্পধারা হিসেবে গড়ে উঠেছিল। ইকেবানার উদ্দেশ্য হল মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক তৈরি করা। ইকেবানা কবে সৃষ্টি হয়েছিল তা নিশ্চিত করে বলা যায় না। জাপানে বৌদ্ধধর্মাবলম্বীরা পূজার অঙ্গ হিসেবে বুদ্ধের পাদপীঠে ফুল সাজিয়ে দেন। বৌদ্ধদের ফুল সাজানোর রীতি থেকেই জন্ম নেয় ইকেবানা।

1500 খ্রিস্টাব্দ নাগাদ সুরোমিচি শাসনকালে কিয়োতোতে রোক্কাকু-ডো চোহো-জি নামক একজন বৌদ্ধ ভিক্ষু ফুল সাজানোতে এত দক্ষ ছিলেন যে সকলে ফুল সাজানোর জন্য তার পরামর্শ নিতেন। তাঁর ফুল সাজানোর রীতিতে প্রথম ইকেবানার ক্লাসিকাল রীতি গড়ে ওঠে যা ইকেনোবো নামে পরিচিত। ইকেনোবো স্কুলের প্রতিষ্ঠানে 1542 খ্রি: ইকেবানা সম্বন্ধে Senno Kheden নামক একটি বই লেখেন। কালের প্রবাহে ইকেবানা জাপানী সংস্কৃতির বিশেষ অঙ্গ হয়ে যায় এবং তার শতাধিক স্কুল গড়ে ওঠে। মূলত বৌদ্ধ সমাজে পূজার অঙ্গ হিসেবে ফুল সাজানোর ধারা গড়ে উঠলেও হিয়েন যুগে কেবলমাত্র গৃহসজ্জার অংশ হিসেবে মূল সাজানো ক্রমশ জনপ্রিয়তা লাভ করতে থাকে। কামাকুরা যুগে জাপানী অভিজাতদের ক্ষমতা খর্ব করে এবং জাপানি সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও একটি বড়ো পরিবর্তন আসে। এই সময় ফুল, মোমবাতি, ধূপ দ্বারা তোকোমোনো (পবিত্র কলুঙ্গী) সজ্জার প্রচলন হয়। এই সময়কার ফুলসজ্জা কেবলমাত্র সামনে থেকে দেখা হত বলে ফ্রন্টাল অ্যারেঞ্জমেন্টই প্রাধান্য পেত। প্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগ ও পঞ্চদশ শতকের মধ্যভাগে Tanabata উৎসবে ফুল সাজানোর প্রতিযোগিতা সম্পাদিত হত। সেই সময়কার দু'জন বিখ্যাত ফুলসজ্জার শিল্পী হলেন ইকেনোবো সেনগুপ্ত বিশেষ অনুষ্ঠান হিসাবে গুরুত্ব লাভ করলে সেইস্থানে ছাপানো স্টাইলের ইকেবানাও বিশেষ গুরুত্ব পায়।

• ইকেবানার বিভিন্ন স্কুল :

বর্তমানে প্রায় তিন হাজারের বেশি ইকেবানার স্কুল গড়ে উঠেছে। এর মধ্যে জনপ্রিয় শৈলীগুলি হল শ্যোজ্যেসু, ওহারা, ইচিও, এনসু, কোইরু, ঠিকো, রিক্কা প্রভৃতি। রিক্কা শৈলীতে প্রকৃতির বিভিন্ন বস্তুর গুণ ও সৌন্দর্য্যকে প্রকাশ করা হয়।

Scanned with CamScanner

Ryou – পর্বতচূড়া
Gaku – পর্বত
Rou – জলপ্রপাত
Shi – জলের পাশের শহর
bi – উপত্যকা
you – দৃশ্যের রৌদ্রউজ্জ্বল দিক
in – দৃশ্যের ছায়াছন্ন দিক

- **ইকেবানা তৈরির উপকরণ :**

বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা বিশেষ অনুষ্ঠানগুলিতে বিদ্যালয়কে সুসজ্জিত করার অভিপ্রায় ফুল দিয়ে অলংকৃত করে। ইকেবানা ধরনের ফুল সাজাতে গেলে মনে রাখতে হবে ইকেবানার উদ্দেশ্য ফুল সাজানোর মধ্য দিয়ে প্রকৃতি ও মানুষের মধ্যে অত্মিক সম্পর্ক তৈরি করে সৌন্দর্য সাধন। তাই ইকেবানা শিল্পীর। ফুলের সাথে পাতা, শুকনো ডাল বা পাতা শুষ্ক ডাল ব্যবহার করেন। একগাদা পাতা ফুল বা জবরজং বাহুল্য ইকেবানা শিল্পীরা পরিহার করেন।

এবং সংক্ষিপ্ততার (minimal) মধ্যে সৌন্দর্য্য ও পরিমিতি প্রকাশিত হয়। তাই ছাত্রছাত্রীরা যে ফুলগুলি সাজানোর জন্য নেবে তা যেন লম্বা ডাঁটি শুদ্ধ হয়। যে-কোনো মাননসই সুন্দর পাতাই ফুলের সঙ্গে সাজানো যেতে পারে। ফুলের রং, আকার, পাত্রের আকারে সব মিলিয়ে ফুলগুলি ও পাতাকে বিভিন্ন অভিমুখে ও ভঙ্গীমায় স্থাপন করতে হবে যাতে তা একটি নিঁখুত ভারসাম্যময় কম্পোজিসান হয়ে ওঠে।

- **পদ্ধতি :**
  - প্রথমে পটের মধ্যে সূচিমুখ হোল্ডার রাখা হয় যাতে ফুল ও পাতাশুদ্ধ ডাঁটি গেঁথে সাজানো হবে।
  - পাত্রটি জল ভা হয় যাতে সূচিমুখ হোল্ডারটি ডুবে যায়। এরপর ডাঁটি শুদ্ধ ফুল, ডাঁটি শুদ্ধ আধ ফোঁটা ফুল, পাতার ডাঁটি আস্তে আস্তে হোল্ডারটিতে আটকে দিতে হয়।
  - ইকেবনায় কখনোই বেশি ফুল দিতে নেই।
  - পাত্র শুদ্ধ ফুল এমন জায়গায় রাখা উচিত যাতে তার সৌন্দর্য্য যথাযথভাবে ফুটে ওঠে।

❑ ৫.৩.৩ ম্যুরাল বা ভিত্তিচিত্র (Wall painting) :

✦ ম্যুরাল কাকে বলে? :

ম্যুরাল শব্দটির আক্ষরিক অর্থ দেয়াল চিত্র। Mur শব্দটির অর্থ দেয়াল। তাই দেয়ালের ওপর আঁকা চিত্র হল 'ম্যুরাল'। সর্বপ্রাচীন ম্যুরালের বয়স আনুমানিক ৩০,০০০ খ্রিস্ট পূর্বাব্দ। প্রত্ন প্রস্তর যুগে অঙ্কিত এই ম্যুরালগুলির নিদর্শন ছড়িয়ে আছে নানা জায়গায়। তার মধ্যে স্পেনের আলতামিরা, ফ্রান্সের লাসকো বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সাধারণত আর্থকালার ও চারকোলের সঙ্গে পশুচর্বি মেড়ে নিয়ে রঙ তৈরি করে লাগানো হত। তুলি হিসেবে ব্যবহার করা হত গাছের ডাঁটি বা সরাসরি হাতের আঙ্গুলকে। এছাড়াও রঙ করার আর একটি ধরন পাওয়া যায় যা এখনও অস্ট্রেলিয়ার বুশম্যানরা অনুসরণ করেন। যে স্থানে রঙ করবেন সেই অংশটুকু খালি পশুচর্বি মাখানো হয়। এরপর ফাঁপা হাড় বা গাছের ফাঁপা ডাল নিয়ে তার মধ্যে গুঁড়ো রঙ ভরে ফুঁ দিলে রঙ ছড়িয়ে পড়ে পশুচর্বির ওপর আটকে যেত। সাধারণত লৌহ মিশ্রিত মাটি বা হেমাটাইট থেকে লাল রঙ ও হলুদ মাটি থেকে হলুদ রঙ পাওয়া যেত। কালো রঙের উৎস ছিল চারকোল। সাধাণত: প্রাগঐতিহাসিক গুহাচিত্র এই তিন রঙেই সীমাবদ্ধ ছিল।

সাধারণত প্রক্রিয়ার উপর নির্ভর করে ম্যুরালকে মূল দুটি অংশে ভাগ করা যেতে পারে—ফ্রেস্কো ব্যুনো ও ফ্রেস্কো সেক্কো। সাধারণত বিশেষ প্রক্রিয়ায় ভেজা প্লাস্টারের ওপর

Scanned with CamScanner

করা চিত্রকে ফ্রেস্কো ব্যুনো এবং শুকনো প্লাষ্টারের ওপর করা চিত্রকে ফ্রেস্কো সেক্কো বলা হয়।

✦ ফ্রেস্কো ব্যুনো :

ফ্রেস্কো ব্যুনো মূলত চতুর্দশ শতাব্দী হতে ইটালিতে বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করে। এই প্রক্রিয়াটি Cennino Cennini বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন। এই প্রক্রিয়ায় সদ্য লেপন করা ভেজা প্লাস্টারের ওপর অঙ্কন করা হয়। প্লাস্টার শুকিয়ে গেলে প্লাস্টারের চুনের সঙ্গে রঙ যুক্ত হয়ে যায় যাকে চেঁচে তুলে ফেলা যায় না। রঙের বাঁধুনি হিসেবে সাধারণত জল ব্যবহার করা হয়। তবে কেউ কেউ চুনের জলও ব্যবহার করে থাকেন।

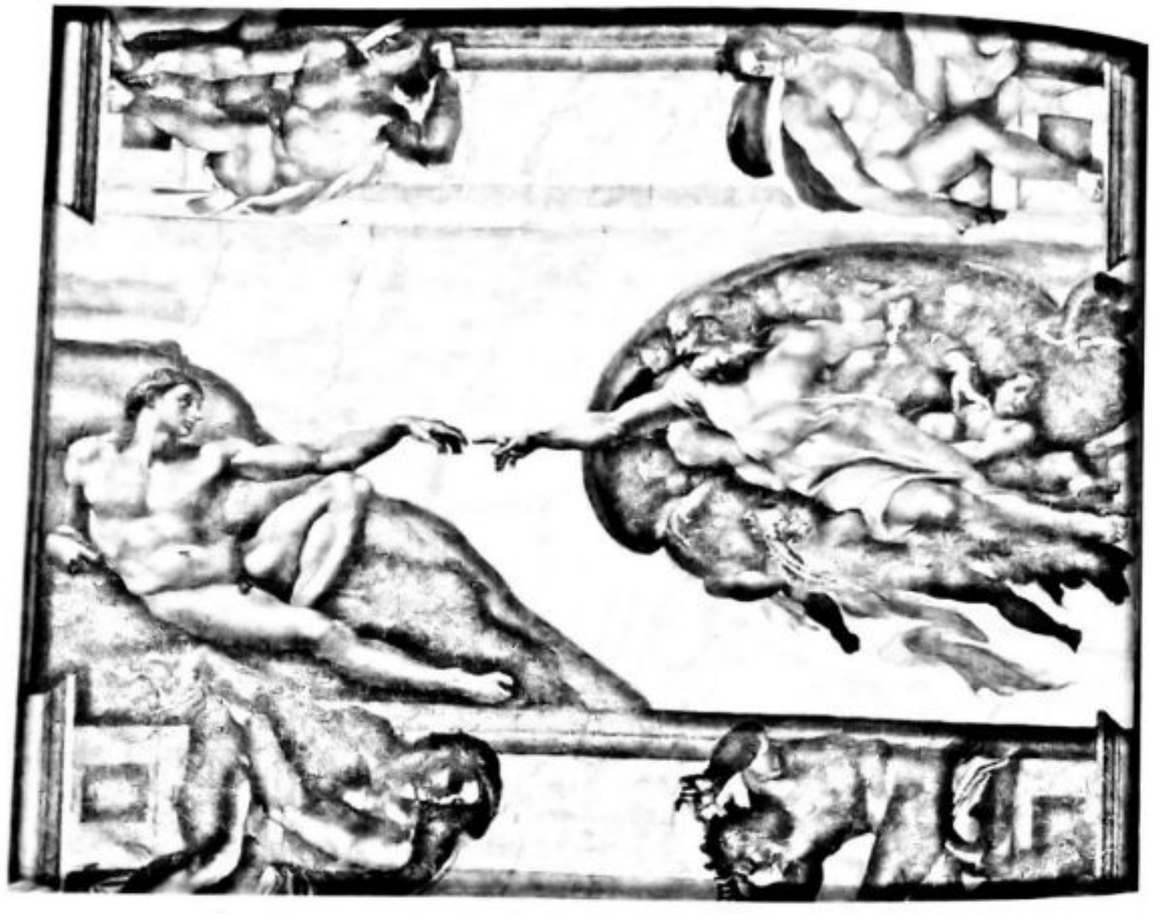

• ফ্রেস্কো জমি তৈরির পদ্ধতি :

প্রথমে দেয়ালের পুরোনো প্লাস্টার খসিয়ে নিয়ে ইট বার করে নিতে হয়। লক্ষ রাখতে হয় যাতে পুরোনো প্লাস্টারের বিন্দুমাত্র অবশিষ্ট না থাকে। এরপর পুরো ইট বের করা দেয়ালটিকে পরিষ্কার করতে হয় যাতে কোনো ধরনের লবণ বা অদ্রব্য থাকলে তা অপসারিত হয়। এই পরিষ্কার দেয়াল এবার ছবি অঙ্কনের প্লাস্টার ধরানোর জন্য প্রস্তুত হয়ে ওঠে। ইটের গাথনির ওপর পুরু করে প্লাস্টার ধরানো হয় যার একভাগ চুন ও তিনভাগ বালি। এই

প্রাথমিক প্লাস্টারের স্তরকে arricio বলা হয়। এই arricio-র ওপর পুরো ড্রয়িংটি চারকোল বা আকার দিয়ে এঁকে নেওয়া হয়।

এরপর শিল্পী ছবির নির্দিষ্ট অংশ ঠিক করে নেন যার ওপর তিনি একেবারে কাজ করবেন। যেহেতু প্লাস্টার ভেজা থাকতে থাকতেই অঙ্কন সম্পন্ন করতে হয়, এবং প্লাস্টার শুকিয়ে গেলে আর আঁকা চলে না তাই শিল্পীকে নিজের ক্ষমতা, দক্ষতা এবং ছবির চরিত্রানুযায়ী এতটুকু অংশই নির্বাচন করা উচিত যাতে তিনি একদিনেই প্লাস্টার ভেজা থাকতে থাকতেই সেই অংশের কাজ সম্পন্ন করতে পারেন। চিত্রের এই নির্বাচিত অংশের ওপর একটি মিহি স্তরের চুন-বালির আস্তরণ দেওয়া হয়। এই দ্বিতীয় ফাইনাল পাতলা স্তরকে বলা হয় intanaco এবং এই intanaco-র ওপর পুনরায় ছবির নির্বাচিত অংশের ছাপ তুলে নেওয়া হয় এবং ভেজা থাকতে থাকতে অঙ্কন শেষ করতে হয়। এই নির্বাচিত অংশকে বলা giornata।

• খসড়া অঙ্কনের পদ্ধতি :

সাধারণত ফ্রেস্কো ব্যুনো প্রক্রিয়ায় ভেজা প্লাস্টারের ওপর দুভাবে খসড়া আঁকা হয়। প্রথমত ভেজা প্লাস্টারের ওপর আলতো করে চর্বাটি রেখে তার ওপর অঙ্কনের রেখার ওপর সরু সুচালো ধাতব খণ্ড দিয়ে চাপ দিলে নীচে ভেজা প্লাস্টারের ওপর তার দাগ পড়ে যায়। দ্বিতীয় প্রক্রিয়ানুযায়ী চর্বার ওপর রেখা ধরে ছিদ্র করতে হয়। এরপর ছিদ্রময় চর্বাটিকে দেয়ালের ওপর চেপে ধরে সেটির ওপর চারকোলের গুড়ো ভর্তি কাপড়ের পুটলি থুপলেই সেই চারকোলের গুড়ো ছিদ্রের ভিতর দিয়ে দেয়ালের ওপর ছাপ ফেলে দেয়। এই প্রক্রিয়াটি সাধারণত spelvero নামে পরিচিত।

• অঙ্কন প্রক্রিয়া :

ভেজা প্লাস্টারের ওপর দ্রুত কাজ করতে হয় বলে খুব ডিটেল কাজের সুযোগ এখানে নেই। সাধারণত পরতে পরতে পর পর রঙ চাপিয়ে রঙের ডেপথ্ গড়ে তোলা হয়। ফ্রেস্কো অঙ্কনে শিল্পীকে অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হয় কারণ ফ্রেস্কো অঙ্কনে কোথাও ভুলত্রুটি হলে তা সংশোধনের কোনো উপায় থাকে না। একমাত্র উপায় হল ত্রুটিযুক্ত অংশটি ভেঙে ফেলে আবার প্লাস্টার করে পুনরায় অঙ্কন করা।

• ফ্রেস্কো ব্যুনো অঙ্কনের রং :

সাধারণত আর্থকালার ফ্রেস্কো অঙ্কনের উপযুক্ত। তবে বেশ কিছু রঙ যেমন নীল, অ্যাজুরাইট, রেড লেড, হোয়াইট লেড, ল্যাক প্রভৃতি রঙগুলি চুনের সঙ্গে বিক্রিয়া করে বলে এগুলি ফ্রেস্কো ব্যুনো মাধ্যমে ব্যবহার করা যায় না। যদি প্রয়োজন হয় তাহলে প্লাস্টার শুকিয়ে যাওয়ার পর রঙের সঙ্গে বাঁধুনি মিশিয়ে প্লাস্টারের ওপর লাগানো যায়। জিওত্তোর

Scanned with CamScanner

ফ্রেস্কো ব্যুনোর মাধ্যমে আঁকা চিত্রগুলিতে আমরা দেখি তিনি নীল রঙকে এইভাবেই ব্যবহার করেছেন।

রেনেসাঁ শিল্পীদের হাতে এই মাধ্যমের সম্ভাবনা ও উৎকর্ষতা সর্বাপেক্ষা বৃদ্ধি পায়। এর স্থায়িত্বের জন্য এটি রেনেসাঁ শিল্পীদের মধ্যে অত্যন্ত জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। মাইকেলাঞ্জলার আঁকা সিস্টাইন চ্যাপেলের চিত্রগুলি সবই এই পদ্ধতিতে চিত্রায়িত।

✦ ফ্রেস্কো সেক্কো :

সাধারণত সেক্কো প্রক্রিয়ায় দেয়ালের ওপর প্লাস্টার তৈরির পদ্ধতিটি এক থাকে, কেবল intanaco স্তরটি সম্পূর্ণরূপে শুকিয়ে নেওয়া হয়। রঙের গুঁড়ো প্রোটিন বাইন্ডার যেমন—**কেসিন গ্লু** (casein glue) এর সঙ্গে মিশিয়ে নেওয়া হয়। তারপর শুষ্ক প্লাস্টারের ওপর আঁকা হয়। ফ্রেস্কো ব্যুনো অপেক্ষা সেক্কোতে অনেক বেশি রঙ ব্যবহার করা যায় কারণ, দেখা গেছে বেশ কিছু রঙ যেমন ম্যাডার (madder) বা নীল এগুলি চুন জলের ক্ষারীয় চরিত্রের সঙ্গে বিক্রিয়া করে নিস্প্রভ হয়ে যায়। এই রঙগুলি অনায়াসে সেক্কো পদ্ধতিতে ব্যবহার করা যায়। এছাড়া সে রঙগুলি এত হাল্কা যে ফ্রেস্কো ব্যুনোতে ব্যবহার করলে tint-এ পরিণত হয়, সেগুলিও সেক্কোতে সফল ভাবে ব্যবহার করা যায়।

• ফ্রেস্কো সেক্কো ইতিহাস :

এইভাবে দেয়াল চিত্রণের ইতিহাস যথেষ্ট প্রাচীন। মিনোয়ান সভ্যতাতেই যথেষ্ট দক্ষ, কুশলী ও উন্নত মানের ম্যুরাল পাওয়া গেছে। থেরা বা নসস (Knossos) এর প্রাসাদে অঙ্কিত বেশ কিছু দেয়াল চিত্র পাওয়া গেছে যেগুলি অত্যন্ত উন্নতমানের ও অনবদ্য। মিনোয়ানরা ম্যুরাল অঙ্কনে অত্যন্ত দক্ষ ছিল। সাধারণ গৃহগুলিতেও দেয়ালে ছবি আঁকা থাকত এবং কিছু সময় অন্তর অন্তর সেগুলি বদলে ফেলা হত, যেমন—আধুনিক যুগে মানুষের কিছু বছর অন্তর দেয়াল রঙ করে বা ওয়াল পেপার বদলায়।

মিনোয়ানরা যে বিশেষভাবে প্লাস্টার তৈরি করত তা অত্যন্ত স্থায়ী এবং দৃঢ়। নীচের undercoat প্লাস্টারটি মার্বেল গুঁড়ো ও বালি মিশিয়ে বানানো হত। এর ওপর $^1/_4$ ইঞ্চি থেকে $^3/_4$ ইঞ্চি পুরু দ্বিতীয় মিহি প্লাস্টারের স্তরটি লাগানো হত। ফাইনাল প্রলেপটিতে কেবলমাত্র লাইমস্টোনই ব্যবহার কর হয়েছে। অন্য কোনো কিছু limestone-এর সাথে মেশানো থাকে না। চিত্রে ব্যবহৃত রঙ স্থানীয়ভাবে পাওয়া যেত। মাটি থেকে আবার হলুদ, রেড অক্সাইড ও ম্যাঙ্গানিজ অক্সাইড থেকে বেগুনী রঙ উপলব্ধ হত।

রোমান যুগ শুরু হওয়ার পূর্বে মধ্য ইতালির পশ্চিম দিকে এট্রুসকান সভ্যতা গড়ে ওঠে। এখানে ভূগর্ভস্থ গুহাসমাধিগুলি হতে বহু দেয়াল চিত্র পাওয়া গেছে যা এখনও অত্যন্ত ভালো অবস্থায় আছে। ফ্রেস্কো সেক্কোর সঙ্গে সঙ্গে ব্যুনো পদ্ধতিতে নির্মিত দেয়ালচিত্রও উপলব্ধ হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রক্রিয়া অবলম্বন করা হয়েছিল।

৭৯ খ্রিস্টাব্দে ভিসুভিয়াসের লাভায় চাপা পড়া পম্পেই পুনরাবিষ্কৃত হওয়ার পর পম্পেই-এর দেয়ালে অঙ্কিত রোমান দেয়াল চিত্রগুলি বিশ্ববাসীকে স্তম্ভিত করে দিয়েছে। সম্ভ্রান্ত অভিজাত রোমান নাগরিক গৃহ অভ্যন্তরের কক্ষগুলি চিত্রদ্বারা সুশোভিত করার রেওয়াজ ছিল। এ সমস্ত চিত্রগুলি শুকনো প্লাস্টারের ওপর সেক্কো পদ্ধতিতে অঙ্কিত।

• অঙ্কন পদ্ধতি :

ফ্রেস্কো সেক্কোর সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয়তম পদ্ধতিটি হল দেয়ালের ওপর টেম্পেরার মাধ্যমে অঙ্কন। রঙের দানার সঙ্গে ডিমের কুসুম মিশিয়ে ধীরে ধীরে দেয়ালের ওপর অঙ্কন করা হয়। এই পদ্ধতিতে অঙ্কিত ছবির কালার প্যালেটের সংখ্যা ও ঔজ্জ্বল্য বেশি হলেও বর্হিদেয়ালে tempera তে কাজ না করাই শ্রেয়, কারণ এর রঙ fresco buno-র মতো স্থায়ী নয়। বর্হিআবহাওয়ায় বিশেষত রোদ বৃষ্টি, তুষারপাত প্রভৃতি প্রাকৃতিক শর্তগুলিতে টেম্পেরার রঙ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তবে ঘরের ভেতরের দেয়ালে অনায়াসে এই পদ্ধতিতে অঙ্কন করা যায়। সঠিক পদ্ধতিতে অঙ্কিত টেম্পেরা সেক্কো দীর্ঘস্থায়ী হয়। পিরামিডের ভিতর মিশরীয় দেয়াল চিত্র বা অজন্তা গুহাচিত্র এই পদ্ধতিতে অঙ্কিত।

ebook.dascoaching.in

Scanned with CamScanner

◆ মোজাইক চিত্র :

ম্যুরালের আরেকটি অত্যন্ত জনপ্রিয় মাধ্যম হল মোজাইক। এই মাধ্যমটি অত্যন্ত প্রাচীন। খ্রিস্টপূর্ব ৮০০ শতাব্দী হতেই গ্রিসে মাটিতে রঙীন পাথরের টুকরো দিয়ে মোজাইক নির্মাণের রীতি দেখতে পাওয়া যায় যা খ্রী. পূ. পঞ্চম শতাব্দী নাগাদ বিকাশ লাভ করে। গ্রিকদের থেকে এই মোজাইক চিত্র নির্মাণের রীতি রোমানরা গ্রহণ করে। মোজাইক শিল্প সর্বাপেক্ষা বিকাশ লাভ করে বাইজান্টাইন যুগে। 313 খ্রিস্টাব্দে খ্রিস্টধর্ম অনুমোদন পাওয়ার পর চার্চগুলিতে মোজাইকচিত্র হয়ে ওঠে খ্রিস্টধর্ম প্রচারের প্রধানতম উপায়।

মোজাইক হল এমন একটি দেয়াল চিত্র মাধ্যম যেখানে দেয়ালের ওপর রঙিন পাথর, কাচের টুকরো ও রঙীন সেরাসিমের টুকরো বসিয়ে চিত্ররচনা করা হয়। মোজাইক চিত্রনির্মাণের জন্য রঙীন টুকরো এককগুলির নাম tessera। মোজাইক চিত্রের সর্বাপেক্ষা বড়ো গুণ হল এটি উজ্জ্বল, বর্হিআবহাওয়া স্থায়ী ও সহজনির্মাণ পদ্ধতি। এই কারণে বড়োমাপের বহির্দেওয়ালে ম্যুরালের জন্য মোজাইক অত্যন্ত উপযোগী মাধ্যম। বিনোদবিহারী দ্বারা নির্মিত শান্তিনিকেতনের আশ্রম জীবন নিয়ে রচিত ম্যুরালটি এই পদ্ধতিতে নির্মিত।

শিয়ালদহে যুবকেন্দ্রের গায়ে যে বিশালাকার ম্যুরালটি ছিল ও মেট্রো স্টেশনের অভ্যন্তরে বহু ম্যুরাল এই মোজাইক রীতিতে রচিত হয়েছে।

◆ অজন্তা ভিত্তিচিত্র :

নন্দলাল বসু তাঁর লেখা 'শিল্পচর্চা' গ্রন্থে বিভিন্ন ধরনের ভিত্তিচিত্রের প্রক্রিয়ার কথা বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করে গেছেন। অজন্তা ভিত্তিচিত্রের খসে পড়া আস্তরণ বিশ্লেষণ করে ও নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে অজন্তা ভিত্তিচিত্রের জমি কিভাবে তৈরি হয়েছে তার একটা অনুমাণ করেছেন।

অজন্তা ভিত্তিচিত্রের জমিতে দুটি স্তর পাওয়া যায়। নন্দলাল বসু প্রথম স্তরটি মশলা নির্মাণের যে উপকরণ বিধি দিয়েছিলেন তা হল—উইঢিপির মাটি তিনভাগ, ঘাস খায় এরকম গোরুর শুকনো গোবর গুঁড়ো একভাগ, ধানের তুষ একভাগ, মাখার জন্য মেথির জল ও দুটে খানেক আলকাতরা। আলকাতরার বদলে পুরনো চালের পচা খড়কুটিও মেশানো যেতে পারে। শেষোক্ত দ্রব্যটি পোকামাকড় ও উইপোকা লাগতে দেয় না। এই মশলাটিতে জল মিশিয়ে এক সপ্তাহ পচিয়েদেওয়ালের ওপর ১ ইঞ্চি পুর করে টিপে টিপে লাগাতে হবে। এই অস্তরটি ভাল করে শুকিয়ে গেলে দ্বিতীয় অস্তরটি লাগাতে হবে। প্রথম স্তরের মশলার সাথে শনের মিহি কুঁচি মেশালে দ্বিতীয় স্তরের মশলাটি তৈরি হয়ে যায়। এই মশলাটিতে বেশি করে জল মিশিয়ে থিতোতে দিলে যে মিহি পলি পড়ে সেটাকেই দ্বিতীয় স্তরে লাগানো হয়। লাগানোর পর অল্প ভেজা থাকতে থাকতে কর্নিক দিয়ে ঘসে সমান করে

নিতে হয়। মনে রাখতে হবে এটাই শেষ স্তর। কাজেই এটি মোলায়েম, মসৃণ, ঢেউহীন ও এক সমান হওয়া বাঞ্ছনীয়। এর ওপর কাঠখড়ির সাদা রং ডিমের কুসুম বা তেঁতুলবীজের আঠার সাথে মিশিয়ে প্রলেপ দিতে হবে। একেবারে মোটা করে রঙ দেওয়ার বদলে তিন চারবার পাতলা রঙের প্রলেপ দেওয়াই শ্রেয়। এইবার ছবি আঁকার জন্য জমি প্রস্তুত।

এই শিল্পচর্চা গ্রন্থে নন্দলাল বসু বহু ধরনের ভিত্তি চিত্র অঙ্কনের প্রক্রিয়ার কথা লিপিবদ্ধ করে গেছে। তিনি নিজে উদ্যোগী হয়ে বহু ধরনের ভিত্তিচিত্রের কৌশল শিখে ছিলেন যা তিনি এই গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। আরায়েস বা জয়পুরী ভিত্তিচিত্রের একটি বিস্তারিত বর্ণনা আছে যা তিনি শিখেছিলেন নরসিংহলাল নামক একজন জয়পুরী ভিত্তিচিত্র অঙ্কন পারদর্শী শিল্পীর কাছে এবং শান্তিনিকেতনের লাইব্রেরি গৃহের ভিত্তিচিত্র সেই পদ্ধতিতেই অঙ্কিত। এছাড়া এই গ্রন্থে সিংহলী ভিত্তিচিত্র ও নেপালী ভিত্তিচিত্রেরও উল্লেখ আছে।

◆ Wax Fresco Encaustic :

প্রাচীন গ্রিসে রঙের সঙ্গে মোমকে বাঁধুনি হিসাবে মিশিয়ে ছবি আঁকার প্রচলন ছিল। মিশরের ফাইআমে (Fyam) সমাধি আধারগুলির ওপরের ঢাকনায় যে ছবিগুলি আঁকা হয়েছে তা রঙের সঙ্গে গরম মোম মিশিয়ে করা। মনে করা হয় এই ছবিগুলি গ্রিক শিল্পী দ্বারা অঙ্কিত হয়েছে। মধ্যযুগে ও রেনেসাঁর সময় এই মাধ্যমটি একেবারে পরিত্যাগ করা হয়। ১৮ শতক নাগাদ ম্যুরাল চিত্রকররা এমন এক মাধ্যমের খোঁজ করছিলেন যাতে আবহাওয়ার ক্ষতিকারক দিকগুলিকে প্রতিহত করা যায়। মোম এই চাহিদাকে পূরণ করতে পারে, এই সম্ভাবনাকে সামনে রেখে এই নিয়ে (মাধ্যমটি) পুনরায় পরীক্ষা নিরীক্ষা হতে থাকে। এই প্রাচীন গ্রিক পদ্ধতিতে পুনরায় ফিরিয়ে আনার চেষ্টা হতে থাকে। মোমকে রঙের সঙ্গে মিশিয়ে অঙ্কনের এই বিশেষ পদ্ধতিটিকে Encaustic বলা হয়ে থাকে।

• Encaustic পদ্ধতি :

Encaustic পদ্ধতিটি খুব বেশি জটিল নয়। সাধারণত গুঁড়ো রঙের দানার সঙ্গে সাদা রিফাইন করা bee wax ও নির্দিষ্ট পরিমাণ damar vernish মিশিয়ে Encaustic-এর রঙ প্রস্তুত করতে হয়। ছোটো ধাতব পাত্রে সমস্ত উপাদানগুলি গরম করে মেশাতে হয় অথবা একটি গরম প্লেটের ওপর উপাদানগুলি রেখে প্যালেট নাইফ দিয়ে মিশিয়ে রঙ তৈরি করে নিতে হয়। কোনো কোনো চিত্রকর এর সঙ্গে carnauba wax মেশান যা এটিকে শক্ত করে তোলে অথবা নমনীয়তা বাড়াতে microcrystafine wax ব্যবহার করেন। বর্তমানে Encaustic অঙ্কনের জন্য বিশেষভাবে প্রস্তুত মোম, Line রেজিন ও রঙ মেশানো স্টিক পাওয়া যায়।

রঙকে সবসময় তরল ও নমনীয় রাখার জন্য গরম প্যালেটের ওপর রাখতে হয়। এই প্যালেটটি তাই বিশেষভাবে প্রস্তুত করা হয়। গ্রিক শিল্পীরা একটি ব্যারেল আকৃতি পাত্রের

Scanned with CamScanner

ভিতর জ্বলন্ত কয়লা রেখে তার ওপর একটি ধাতব প্যালেট রাখতেন, যাতে প্যালেটটি সবসময় গরম থাকে। একটি ব্রোঞ্জ স্প্যাচুলা রঙ মেশানোর কাজে ব্যবহৃত হত। বর্তমানে ইলেট্রিকে গরম হওয়া বিশেষ ধরনের প্যালেট বাজারে উপলব্ধ যা শিল্পীদের ব্যবহারের পক্ষে যথেষ্ট সুবিধাজনক। একটি অ্যালুমিনিয়াম প্যালেটের ওপর কিছু সংখ্যক গর্ত থাকে যেখানে তরল রঙ রাখা যায় এবং তলার অংশে বৈদ্যুতিক কয়েল থাকে যা প্যালেটকে নির্দিষ্ট মাত্রায় গরম রাখে। সাধারণত ২২০° থেকে ২২৫° তাপমাত্রায় কাজ করা উচিত। এছাড়া সাধারণ হিটারের ওপর মোটা ধাতুর পাত রেখে তাকে প্যালেটের মতো ব্যবহার করা যেতে পারে।

এই তরল মোম মেশানো রঙ সাধারণত ব্রিসল ব্রাশ অথবা প্যালেট নাইফ দিয়ে লাগানো হয়। এই মোম মেশানো রঙ নিয়ে শিল্পীরা পরীক্ষানিরীক্ষা করে বহুবিধ texture তৈরি করতে পারেন। শিল্পী ছবির প্রত্যাশা অনুযায়ী পাতলা বা মোটা করে রঙ চাপাতে পারেন। অঙ্কন শেষ হওয়ার পরে পুরো ছবিটির ওপর গরম তাপ প্রয়োগ করতে হয় যাতে রঙগুলি সমানভাবে বসে যায়। সাধারণত গরম ইনফ্রারেড প্রতিফলনকারী বাল্ব দিয়ে এই গরম করার কাজ করা হয়। সবসময় খেয়াল রাখতে হয় যাতে কোনো মতেই গরম বেশি না হয়ে যায়, তাহলে রঙ গলে গিয়ে ছড়িয়ে পড়ে। অনেক সময় অঙ্কন চলাকালীন সার্পেটিকেও গরম করার প্রয়োজন হলে তখন এইভাবে বাল্ব দিয়ে গরম করা হয়ে থাকে। সমস্ত ছবি ভালোভাবে ঠান্ডা হয়ে যাওয়ার পর পাতলা কাপড় দিয়ে হাল্কা করে পালিশ করে নিতে হয়।

মাধ্যমগতভাবে Encaustic mural তৈল মাধ্যমে করা mural-এর মতো দীর্ঘস্থায়ী ও আবহাওয়ার ক্ষতিকারক প্রভাবকে প্রতিহত করতে সক্ষম। এছাড়া oil মাধ্যমের থেকে এর আরো কিছু বাড়তি সুবিধা আছে যেমন এর ওপর ভার্নিশ প্রলেপ লাগে না, এটি oil-এর মতো ধুলোকে আকর্ষণ করে না।

• বিদ্যালয়ে ভিত্তিচিত্র অঙ্কনের উপযোগীতা :

ম্যুরাল বা দেয়াল চিত্র অঙ্কন একটি দলগত প্রক্রিয়া। শিল্পাচার্য নন্দলাল বসু ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে লেডি হ্যারিংহামের নেতৃত্বে যখন অজন্তা ভিত্তিচিত্রের অনুকরণ করতে গিয়েছিলেন তখন তিনি অজন্তা ভিত্তিচিত্রের বিশালতা ও নান্দনিক সৌন্দর্য দেখে অভিভূত হন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে ভিত্তিচিত্র শিল্পীদের চিত্রবোধের ও মনের বিস্তার ঘটায়। তাই তিনি কলাভবনের শিল্পশিক্ষায় ভিত্তি চিত্র অঙ্কনকে অন্তর্ভুক্ত করেন। এই কারণে বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদেরও ভিত্তিচিত্র অঙ্কনের অভিজ্ঞতা তাদের শিল্পমনকে প্রসারিত করবে ও দলগতভাবে কাজ করার মানসিকতাকে সমৃদ্ধ করবে। ঐতিহ্যবাহী দেয়ালচিত্র অঙ্কনের প্রক্রিয়া সময় সাপেক্ষ, তাই ছাত্রছাত্রীদের উপযোগী আধুনিক দেয়াল রঙ করার জন্য অ্যাক্রেলিক পেন্ট ব্যবহার করাই শ্রেয়। বিদ্যালয়ের যে অংশে মুর‍্যাল বা ভিত্তি চিত্র অঙ্কন করা হবে

তার উপযোগী চিত্র নির্বাচন করা উচিত। যেমন—লাইব্রেরি কক্ষে ভিত্তিচিত্র অঙ্কন করলে তার বিষয় হতে পারে পাঠরত বালক-বালিকা, শ্রেণিকক্ষে ভিত্তিচিত্র অঙ্কন করলে তার বিষয় হতে পারে একটি বৈদিক আশ্রমের শিক্ষাদানের দৃশ্য, খেলাধুলো করার কক্ষের বিষয় হতে পারে কোনো খেলার দৃশ্য, সঙ্গীত শিক্ষণ কক্ষে আঁকা যেতে পারে সঙ্গীতের দেবী সরস্বতী ও বিভিন্ন বাদ্য যন্ত্র।

• প্রক্রিয়া :

প্রথমে চিত্রে কী আঁকা হবে তা ঠিক করে নিয়ে তার খসড়াটি শিল্পশিক্ষক শিক্ষিকাকে দেখিয়ে নিতে হবে। তিনি এই খসড়াচিত্রটি অনুমোদন করলে দেয়ালের যে অংশে আঁকা হবে তার মাপ অনুযায়ী খসড়াচিত্রটিকে এনলার্জ করে নিতে হবে। তারপর খসড়া চিত্রটিকে একটি মোটা ট্রেসিং পেপারে ট্রেস করে নিতে হবে। এবার ছবির আউটলাইনটা ধরে কোনো তীক্ষ্ণ সূচালো বস্তু দিয়ে ফুটো করতে হবে। ফুটো করার সময় লক্ষ রাখতে হবে কাগজটি যাতে ছিঁড়ে না যায়।

ভিত্তিচিত্র অঙ্কন যেহেতু একটি দলগত প্রকল্প তাই ভিত্তিচিত্র অঙ্কনের সময় কে কোন অংশটি করবে তা ঠিক করে নিতে হবে। দলগত প্রকল্পের অধীনে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেককে মনে রাখতে হবে কাজ যত ছোটো হোক না কেন, তা অন্যান্য কাজের সমান গুরুত্বপূর্ণ। তাই প্রত্যেককে সমান গুরুত্বের সঙ্গে এই প্রকল্পটি সম্পাদন করতে হবে। দলগত প্রকল্পে কারো কোনো কাজে ত্রুটি দেখা গেলে তা পুরো কাজটিকেই নষ্ট করে দিতে পারে। কোনো ছাত্রছাত্রী তার কাজটি করতে অসমর্থ হলে অন্যান্য ছাত্র-ছাত্রীরা তার সেই ত্রুটি সংশোধন করে দেবে। দলগত প্রকল্পের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল অংশগ্রহণকারী প্রতিজনকে সমান গুরুত্ব ও সম্মান দান।

দেয়ালের কোন অংশটুকুতে ভিত্তিচিত্র অঙ্কন করা হবে সেই অংশটুকু সীমাবদ্ধ করে পুরোনো রঙ মোটা দানার সিরিশ কাগজ দিয়ে যতটা সম্ভব তুলে ফেলতে হবে। এরপর দেয়ালের ওই অংশটি ভালো করে পরিষ্কার করে নিতে হবে। ট্রেসিং পেপার টেপ দিয়ে আটকে নিয়ে ট্রেসিং করতে হবে। রেড অক্সাইডের গুঁড়ো বা নীল রঙ পুটলি করে তেলে ভিজিয়ে ট্রেসিং পেপারের ওপর থুপে থুপে বোলালে ফুটো দিয়ে রঙ দেয়ালে গিয়ে ট্রেসিংটা ফুটে উঠবে। ট্রেসিং সমাপ্ত হয়ে গেলে ট্রেসিং পেপারটি দেয়াল থেকে খুলে ফেলতে হবে। যেহেতু কম সময়ের মধ্যে দেয়ালচিত্র অঙ্কন সমাপ্ত করতে হবে তাই অঙ্কনের কাজ অঙ্কনে দক্ষ বেশকিছু ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ভাগ করে দিতে হবে। কে কোন অংশটি অঙ্কন করবে যা নিজেদের মধ্যে ঠিক করে নিয়ে রঙ করা শুরু করতে হবে। সীমা নির্দিষ্ট বলে চিত্রে বেশি সূক্ষ্ম জটিলতা অঙ্কন করা যাবে না।

Scanned with CamScanner

তৈলচিত্র অঙ্কন করার ব্রিশল ব্রাশ দিয়ে চিত্রে রঙ ভরতে হবে। অ্যাক্রেলিক রঙ প্রয়োগ করা সহজ বলে ছাত্রছাত্রী সহজে ভিত্তিচিত্রে দ্রুত রঙ করতে পারবে। অ্যাক্রেলিক পেন্টে অঙ্কনের ত্রুটি সংশোধন করাও সহজ। আসনের মূল রঙ ভরা শেষ হয়ে গেলে ফিনিশিং করে অঙ্কনকার্য সমাপ্ত করতে হবে।

- **ভিত্তিচিত্রের মাধ্যমে শিশুমনের সৌন্দর্য্যের বিকাশ :**

চিত্রের পাশে ভিত্তিচিত্রে অংশগ্রহণকারী প্রতিটি ছাত্রছাত্রীর নাম লিখে দিতে হবে। ভিত্তিচিত্র অঙ্কনের ফলে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ সুসজ্জিত হবে। শিশু ও বালক-বালিকারা তাদের চারপাশে অঙ্কন দেখলে তাদের সৌন্দর্যবোধ বিকশিত হবে ও তারাও বড় হয়ে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণকে আরো সুন্দর করে তোলার জন্য নিজেরাও ভিত্তিচিত্র অঙ্কনে অংশগ্রহণ করার জন্য উৎসাহিত হয়ে উঠবে।

✪ ৫.৪ ডিজাইন— কম্পিউটার গ্রাফিক্স, সিডি কভার, বইয়ের প্রচ্ছদ, কোলাজের কাজ (Designing– Computer graphics, CD Cover, Book cover, Collage work) :

❑ ৫.৪.১ কম্পিউটার গ্রাফিক্স (Computer graphics) :

বর্তমান সমাজ কম্পিউটারের ব্যবহার ছাড়া বাণিজ্যিক ক্ষেত্র প্রায় অচল। বিজ্ঞাপন ক্ষেত্র থেকে শুরু করে আধুনিক ব্যাঙ্কিং সিস্টেমে ATM এর ব্যবহার সবক্ষেত্রেই এখন কম্পিউটার ব্যবহার লক্ষ করা যায়। এ ছাড়া শেয়ার বাজার, রেল, বিমান ও বাসের টিকিট বুকিং, অ্যাকাউন্টিং সিস্টেম প্রভৃতি ক্ষেত্র থেকে ছোটোখাটো দোকানের হিসাব রাখতে কম্পিউটার ব্যবহৃত হচ্ছে।

যে-কোনো ধরনের পত্রিকা, ম্যাগাজিন, বইয়ের প্রচ্ছদ, কার্টুন, রঙ বেরঙের বিজ্ঞাপন, সিনেমা, ভিজিটিং কার্ড এবং শৈল্পিক যে-কোনো কম্পিউটারের গ্রাফিক্স মাধ্যমে খুব সহজেই করা যায়। 'Computer Graphics' শব্দের প্রথম ব্যবহার করেন Verne Hurdnson এবং William Fetter নামক দুই Computer Graphics গবেষক। Computer Graphics আর একটি নামেও পরিচিত—Computer Ganerated Imagery (CGI).

ইলেকট্রনিক্সের উন্নতির সাথে গ্রাফিক্সও উন্নত হয়েছে। ক্যাথোড রে টিউব এবং ব্রাউন রে টিউব এর আবিষ্কারের মধ্যে দিয়েই গ্রাফিক্স আবিষ্কার হয়। গ্রাফিক্স এর ধারণাটি 1950 সালে বিজ্ঞানীদের মানে এলেও 'Graphics' শব্দটির 1960 সালে প্রচলিত হয়। 1961 সালে Stave Russell একটি Video game তৈরি করেন যার নাম Space war. 1963 সালে বিজ্ঞানী E. E. Zajac একটি চলচ্চিত্র তৈরি করে যার নাম Stimulative of a Two

gyro gravity Attitude Control System. এই চলচ্চিত্র graphics-এর একটি উদাহরণ।

1970 সালে গ্রাফিক্স মানুষের নিত্য প্রয়োজনীয় কাজের জন্য ব্যবহৃত হতে শুরু করে। 1980 সালে Computer গ্রাফিক্স গুলিকে আধুনিকীকরণ করা হয় এবং মূলত ব্যবসার কাজে এগুলি ব্যবহৃত হতে শুরু করে। 1990 সালে Windows, Apple ইত্যাদি কোম্পানি গুলি 3D Modelling এর কাজ শুরু করে। 2000 সালে এর ব্যাপক ভাবে ব্যবহার শুরু হয়। Video game, Movie, TV advertisement ইত্যাদির ব্যবহার শুরু হয়।

নানা রকমের উন্নত যন্ত্রপাতির সাহায্যে দৃশ্যমান বিষয় গুলির বিভিন্ন ভাবে উপস্থাপন করা হয়। আর এই উপস্থাপনের ওপর ভিত্তি করে Visual তথ্য গুলির প্রকারভেদ হল—
(1) Two Dimensional (2D) Graphics (2) Three Dimensional (3D) Graphics
(3) Animated Graphics.

3D Graphics এর ব্যবহার প্রচলিত থাকলেও 2D Graphics এর ব্যবহার বেশি।

কম্পিউটার বিজ্ঞানের একটি শাখা যেখানে দৃশ্যমান বিষয়বস্তু কীভাবে ডিজিটাল উপায়ে সমন্বয় করা ও পরিবর্তন সাধন করা যায়, তা নিয়ে গবেষণা করা হয়, কম্পিউটার গ্রাফিক্স শাস্ত্রটিকে চারটি ভাগে ভাগ করা সম্ভব—

(1) রেন্ডারিং : আলোর পরিবহণ অ্যালগোরিদজোর মাধ্যমে সৃষ্টি করা যায়।
(2) ইমেজিং : ছবি আয়ত্তকরণ এবং ছবি সম্পাদনা।
(3) জ্যামিতি : বিভিন্ন জ্যামিতিক তল উপস্থাপন ও প্রক্রিয়া করা হয়।
(4) অ্যানিমেশন : দৃশ্যমান বস্তুর চলন উপস্থাপন ও পরিবর্তন করা।

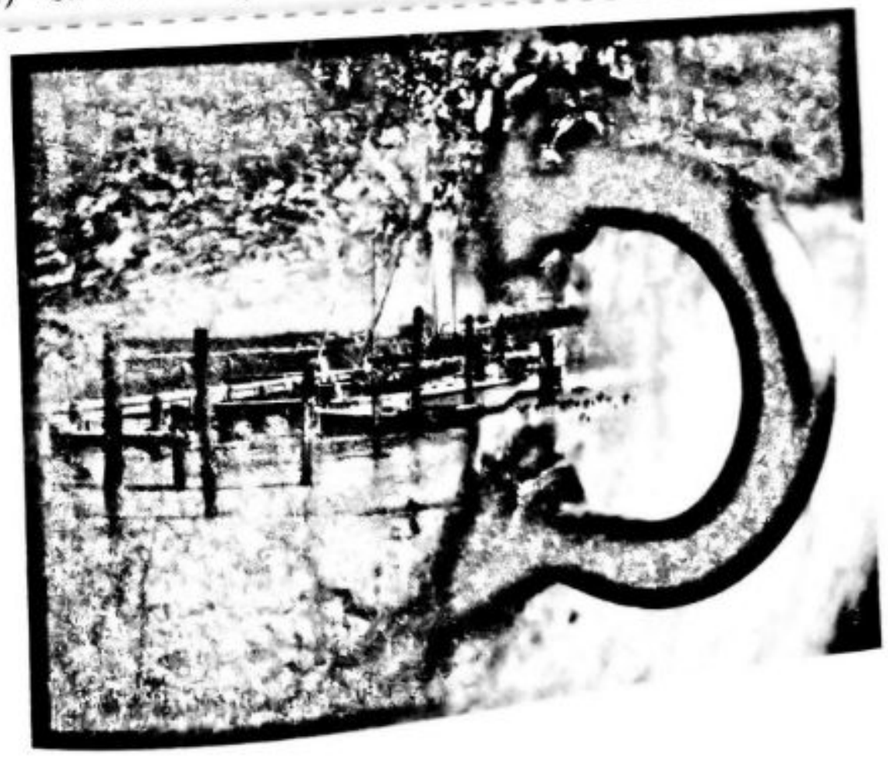

Scanned with CamScanner

Computer Graphics এ আলোচনার বিষয়বস্তুগুলি হল—User Interface Design, Sprite Graphics, Vector Graphics, 3D Modelling, Shaelers GPU Design, Computer Vision ইত্যাদি। এইভাবে Computer Graphics এর ব্যবহার বেড়েই চলেছে এবং তার আধুনিকীকরণও হয়েছে। বর্তমানে প্রতি পদে পদে Computer Graphics এর ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। কম্পিউটার গ্রাফিক্স একটি মাধ্যম হল ফটোশপ।

ফটোশপ আসলে একটি শক্তিশালী ও জনপ্রিয় গ্রাফিক্স সফ্‌ট ওয়্যার, যার মাধ্যমে খুব সহজে গ্রাফিক্যাল ইফেক্ট প্রয়োগ করে আমরা একটি ইমেজকে এডিট এবং গ্রাফিক্স ডিজাইন করতে পারি যা অন্য কোনো সফ্‌টওয়্যার দ্বারা এত দ্রুত ও সহজে করা সম্ভব নয়। পৃথিবীর দ্বিমাত্রিক গ্রাফিক্স সফটওয়্যার গুলোর মধ্যে সব থেকে জনপ্রিয় হচ্ছে ফটোশপ।

আমাদের কোনো মূল্যবান বা পছন্দের ছবি অনেক দিন খোলা জায়গায় থাকতে থাকতে ড্যাম্প বা নষ্ট হয়ে গেলে কিংবা ছবিকে বড়ো বা ছোটো করা প্রয়োজন, আমাদের ছবির কম্পোজিশন নতুন করে ঠিক করা দরকার। তখন একমাত্র ফটোশপই দিতে পারবে সঠিক সমাধান। কারণ ফটোশপে এই সমস্যাগুলো সমাধানের জন্য রয়েছে উপযুক্ত কার্যপদ্ধতি এবং সহজে ব্যবহারযোগ্য টুল। আর এজন্যই ফটোশপের জনপ্রিয়তা পৃথিবী জুড়ে। সাধারণভাবে বলা যায় ফটোশপ ডকুমেন্ট হচ্ছে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পিক্সেলের সমন্বয়ে গঠিত একটি ছবি বা ইমেজ। ইমেজ বলতে যে-কোনো ধরনের ছবি (যেমন JPEG, BMP) অথবা যে-কোনো গ্রাফিক্স প্রোগ্রামের দ্বারা তৈরিকৃত কোনো ডিজাইনের ফাইলকে বোঝায়।

❑ ৫.৪.২ সিডি কভার (CD Cover) :

যে কোনো Compact Dise (সিডি)-এর আবরণকে CD Cover বলে। এর প্রথম উদ্দেশ্য হল Protect-এর জন্য কোনো CD-এর আবরণকে আবৃত করা। আবরণ মোড়কের কাজ করে, বিভিন্ন বিষয়ের ওপর নির্মিত CD-কে চিহ্নিত করণে সাহায্য করে। এটিকে একটি বিজ্ঞাপনের অংশ হিসেবে ধরা যেতে পারে। CD Cover একটা পাতলা বাক্সের আকারে দেখতে হয়। যার front এবং back side দুটোই বর্তমান এবং মাঝে spine বা পুট দেখা যায়। CD Cover নির্মাণের সময় শিল্পী সব অংশেরই অলংকরণ করেন। এর প্রধান উদ্দেশ্য হল আকর্ষণীয় শক্তি বারানো। বিশেষ অংশের মনযোগী করা, এর জন্য যে নীতিগুলি অনুসরণ করা হয়। যথা—নান্দনিক ঐক্য সৃষ্টি করা, ডিজাইনে কোথাও কোথাও জোড়ালো ভাবে ঝোঁক দেওয়ার দরকার হয়, সারল্যের গুণ, ছবির কথা, রঙের রসে লেখা হরফ ইত্যাদি। একটি CD কভারে ডিজাইন করতে হলে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো জানা দরকার।

(i) **কভারে মাপ :** CD কভার মোটামুটি চৌক আকৃতির হয়। CD-এর আকৃতি থেকে CD-র কভারের মাপ বড় হবে। প্রয়োজন অনুযায়ী প্রান্তে Spine বা পুট ব্যবহার করা হয়।

(ii) **CD বিষয়বস্তু :** CD-র বিষয়বস্তুর ওপর নির্ভর করে সম্পূর্ণ নক্সাটি তৈরি করা হয়। কারণ বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক CD তৈরি হয়। যথা—গানের CD, সিনেমার CD, Computer Software-এর CD, কম্পিউটার game-র CD, যোগব্যায়াম, ভক্তিমূলক গান প্রভৃতির। একটি কম্পিউটার game-এর CD যে ভাবনাচিন্তার ওপর তৈরি করা বা যে সকল জনসাধারণের উদ্দেশ্যে তৈরি করা হয়, কিন্তু একটি গানের CD-কেই একই উদ্দেশ্যে তৈরি করা হয় না। তাই বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে নানান দৃশ্যগত সিডি কভার তৈরি হয়।

✦ ডিজাইন :

ডিজাইন বা নক্সা হল সম্পূর্ণ CD কভারটির দৃশ্যগত রূপ অর্থাৎ, ছবি Composition Heading রঙের প্রয়োগ। শিল্পী কভার তৈরি করার সময় কভারের মধ্যে বিষয়ের ওপর নির্ভর করে একটি ছবি ব্যবহার করে থাকেন। সম্পূর্ণ Compositionটি সাজানোর সময় শিল্পীর নান্দনিক বোধ কাজ করে। অর্থাৎ কোথায় হরফের ব্যবহার হবে, কী রং ব্যবহৃত হবে।

✦ Logo-র ব্যবহার :

সাধারণত CD নির্দিষ্ট কোনো কোম্পানি তৈরি করে থাকে। CD-র কভার তৈরি করার সময় শিল্পীকে সেই নির্দিষ্ট কোম্পানির Logo-টি অবশ্যই ব্যবহার করতে হবে। কোনো ব্যক্তিকেন্দ্রিক CD তৈরি হলে ব্যক্তির নাম ব্যবহার করা যেতে পারে।

Scanned with CamScanner

❑ ৫.৪.৩ বইয়ের প্রচ্ছদ (Book Cover) :

যে কোনো পুস্তকের স্থায়ী ভাবে বাঁধানো আবরণকে পুস্তকের প্রচ্ছদ বা বুক কভার বলে। প্রয়োজনীয় উদ্দেশ্যে সাধনের জন্য বুক কভারের আকর্ষণীয় শক্তি বাড়ানো, উপযুক্ত অংশকে বিশেষভাবে মনোভাবী করা এবং সঠিকভাবে বুক কভারের কর্তব্যকে দর্শক-পাঠকদের মনের মতো করে উপস্থাপন করতে প্রচ্ছদ পরিকল্পনার সময় কয়েকটি মূল নীতিকে অনুসরণ করা হয়, যথা নান্দনিক ঐক্য সৃষ্টি করা, ডিজাইনে কোথাও জোরালো ভাবে ঝোঁক দেওয়া হয়, সারল্যের গুণ, ছবির কথা, রঙের রসের লেখা হরফ ইত্যাদি।

● **বুক কভারের ইতিহাস :** উনবিংশ শতাব্দীর পূর্বে বইগুলো মূলত হাতে বাঁধানো হত এবং এর উপর সরক্ষণকারী আবরণ হিসেবে শক্ত কাঠের পাটার চিত্র বা শক্ত ধরনের কাগজ বা বোর্ডকে ব্যবহার করা হত। ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে তালপাতা বা কাগজের পুঁথিকে দুটি মোটা কাঠের পাটার অভ্যন্তরে সংরক্ষণ করা হত। সিকিমে বৌদ্ধ গুম্ভাগুলিতে এই ধরনের কাঠের পাটা বৈশিষ্ট্য পুস্তকে সম্ভার দেখা যায়। পুঁথির সাথে আগত এই কাঠের পাটাগুলিকে চিত্রিত করা হত যার সম্ভার পাল পুঁথিকে পেয়েছি।

ইউরোপের ক্ষেত্রেও মধ্যযুগে হাতে লেখা পার্চমেন্ট বা কাগজের উপরে হাতে লিখিত বইগুলি বুক কভার করা হত সোনা, রুপো এবং মূল্যবান বস্তু বসিয়ে। কিন্তু বই যখন থেকে হাতে বাঁধানোর বদলে মেশিনে বাঁধানো শুরু হল। তখন থেকে বুক কভারের ও নতুন অধ্যায় শুরু হল। ঊনবিংশ শতাব্দীতে এই নতুন ধরনের বুক কভারগুলি লিথোগ্রাফে বহুবর্ণে মুদ্রিত। এই সময়ের থেকে শিল্পীরা ক্রমশ বুক কভার ডিজাইন নির্মাণে অংশগ্রহণ করাতে থাকে। ক্রমশ বুক কভার ডিজাইন স্বতন্ত্র ধারা হিসেবে পরিস্ফুত হতে থাকে।

● **একজন বিখ্যাত প্রচ্ছদ শিল্পীর কর্ম :**

সত্যজিৎ রায় বইয়ের প্রচ্ছদের একজন আদর্শম প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি ছিলেন। তার নির্মিত Ma Sarada, The Ultimate Woman বইটির প্রচ্ছদে তিনি মাটির উপর বসে থাকা একজন নারীর ছবি মুদ্রিত করেছেন। এখানে কিছু তরঙ্গায়িত টান লক্ষ্য করা যায় কিছু ক্ষেত্রে মোটা কিছু কিছু সময় পুরু বক্র কালো টানটি তার লম্বা চুলের এবং লাল তরঙ্গায়িত রেখাটি সাদা শাড়ির মোটা পাড়কে প্রকাশ করছে। ঘোমটা থেকে কনুই পর্যন্ত যে বিভিন্ন তরঙ্গায়িত বর্ণবৈচিত্র্য নক্সা রেখা লব্ধ করা যায় সেটি তার ডিজাইনের সবচেয়ে দৃষ্টি আকর্ষণও গুরুত্বপূর্ণ দিক। এই বক্ররেখা তার তুলির টানের অপরিহার্য ভঙ্গি কিছুটা যদিও নমনীয় তথাপি এটি অবশ্যই দ্রুত।

প্রচ্ছদ ডিজাইনার হিসেবে রায় কিছু বইয়ের জন্য জ্যামিতিক আকার ব্যবহারে উৎসাহিত হয়ে উঠে ছিল। 'বুড়ো আংলা' বইয়ের প্রচ্ছদ নক্সায় তিনি বড় ত্রিভুজ ও স্প্রিং ন্যায় কুন্ডলীর জ্যামিতিক সমন্বয় ব্যবহার করেছিলেন। এই পেঁচানো লাইনগুলি ছিল সাদা রঙের যেটি বিষয়টিকে নাটকীয় করে তুলেছে। 'ইন্দ্রানী' উপন্যাসের প্রচ্ছদ নক্সা গাঢ় কালো রঙের উপর পেঁচানো লাইন-এর ব্যবহার করা হয়েছে। বিভিন্ন আকারে পেঁচানো লাইনের গঠন শৈলিকে আরও বেশি বিস্ময়কর করে তুলেছে। পাঠকরা বুঝতে পেরেছেন যে একজন যুবতী মেয়ের পক্ষে তার নিজস্ব জীবনের জটিলতা থেকে বেরিয়ে আসা সহজ নয়। এই বিষয়টিকে এই পেঁচানো লাইনগুলি প্রতিফলিত করেছে।

বইয়ের প্রচ্ছদ করতে গেলে নিম্নলিখিত বিষয়গুলোকে জানা দরকার।

● **বইয়ের বিষয়বস্তু :** প্রচ্ছদ তৈরি করার আগে বইটি কোন বিষয়ের ওপর তৈরি হয়েছে তা ভাল করে জেনে নেওয়ার প্রয়োজন। কারণ বিষয়ের প্রতিফলন প্রচ্ছদে দেখা যায়। রামায়ণ বা গীতার প্রচ্ছদে রামায়ণ বা গীতার কোনো ঘটনাকে চিত্রিত করা হয়। যাতে দর্শকেরা সহজেই বইয়ের ভেতরের বিষয়টি অনুধাবন করতে পারে।

● **বইয়ের মাপ :** প্রচ্ছদ তৈরি করার আগে প্রত্যেকটি পেপারের মাপ কতসংখ্যক পৃষ্ঠ ব্যবহার হচ্ছে তা জানা দরকার। প্রচ্ছদের একটি অগ্রভাগ ও একটি পশ্চাদভাগ থাকে। পৃষ্ঠা সংখ্যার ওপর নির্ভর করে Spine বা পুটের মাপ নির্ভর করে।

ebook.dascoaching.in

Scanned with CamScanner

● **বইয়ের প্রচ্ছদের নক্সায়** : একটি বইয়ের প্রচ্ছদ নির্মাণ করার সময় তার বিষয়ের ওপর নির্ভর করে সম্পূর্ণ নক্সাটি তৈরি করা হয়। নক্সা নির্মাণ করার সময় শিল্পী সম্পূর্ণ কম্পোজিশানের মধ্যে balance তৈরি করার চেষ্টা করেন যাতে তার নান্দনিকতা বজায় থাকে। রঙ ব্যবহার করার সময় শিল্পী সচেতন ভাবে এমন রং ব্যবহার করে যাতে বিষয়বস্তুর সাথে সামঞ্জস্য হয়।

● **নাম ও Logo-র ব্যবহার** : বইয়ের শিরোনামটি সুন্দর ও স্পষ্ট ক্যালিগ্রাফির সাহায্যে দৃষ্টিগোচর স্থানে ব্যবহার করতে হবে। লেখকের নাম শিরোনামের থেকে ছোটো মাপের হওয়া বাঞ্ছনীয়। বইয়ের Spine বা পুট প্রকাশনী সংস্থার নাম ও Logo এবং শিরোনামটি লিখতে হবে। সবজায়গায় একই ধরনের ক্যালিগ্রাফি ব্যবহার করা উচিত।

❑ ৫.8.8 কোলাজের কাজ (Collage work) :

কোলাজ একটি শিল্প উৎপাদন কৌশল; ফেলে দেওয়া অপ্রয়োজনীয় সাধারণ জিনিস কাগজ, বোর্ড ক্যানভাস-এর উপর আঠা দিয়ে সেঁটে একটি চিত্ররূপ সৃষ্টি করাকে **কোলাজ** বলে।

চিন দেশে 200 খ্রিস্টাব্দে কাগজ আবিষ্কারের সময় থেকে প্রথম কোলাজ প্রযুক্তিগতভাবে ব্যবহার করা শুরু হয়। দশম শতকে জাপানে কবিতার মধ্যে কোলাজের ব্যবহার ছিল। ফরাসি শব্দ coller থেকে কোলাজ আহরিত। বিংশ শতকের শুরুতে কোলাজ আধুনিক শিল্পের একটি স্বতন্ত্র অংশ হয়ে ওঠে। **জর্জ ব্রাক** এবং **পাবলো পিকাসো** উভয়ের চিত্রে বর্ণ প্রলেপের সঙ্গে ছাপা কার্ডের টুকরো, ছাপা কাগজের টুকরো, চট ছেড়া, বেতের বুনি ছাপা নকশা ইত্যাদি চিত্রাঙ্কনের সঙ্গে সঙ্গকহীন জিনিস সেটে দিতেন। পিকাসের আঁকা বেতের বুনুনিসহ স্থির জিনিস চিত্রটিকে কোলাজের সূচনা ধরা হয়।

প্রথার জড়ত্ব ভেঙ্গে শিল্প রচনায় যে-কোনো জিনিসের ব্যবহার যোগ্যতা কোলাজের সাহায্যে সিদ্ধ করা হয়েছে, বিভিন্ন রকমের কোলাজের কাজ হয়। যেমন— paper collage, wood collage, Decoupage, Photomontage, Digital collage প্রভৃতি।

✦ Paper Collage :

বিভিন্ন আকার, আকৃতি, রঙের কাগজ ব্যবহার করে যখন একটি চিত্ররূপ সৃষ্টি হয় তাকে **paper collage** বলে। এখানে শিল্প উৎপাদন কৌশল-এর প্রধান মাধ্যম কাগজ। কাগজ কোলাজ প্রসঙ্গে শিল্পী শাকিলার নাম উল্লেখযোগ্য।

✦ Wood collage :

বিভিন্ন আকার আকৃতির কাঠের টুকরো, অন্য কোনো মানানসই উপকরণ আঠা দিয়ে সেঁটেও কাঠের উপর চিত্ররূপ সৃষ্টি করা হয় তাকে **wood collage** বলে। শিল্পী **Kurt Sckewitters** 1920 সালে wood collage-এর পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করেন। Wood collage নীতি পরিষ্কারভাবে অন্তত ছবি হিসেবে স্থাপন করা হয়, তাঁর আঁকা **'Merz Picture with candle'** ছবিটিতে।

✦ Decoupage :

কোনো বস্তুর সৌন্দর্য্যের জন্য তার উপর রঙিন চকচকে কাগজ, সুন্দর ডিজাইনের ছবির কাটা কাটা অংশ আঠা দিয়ে লাগিয়ে কোলাজ সৃষ্টি করাকে Decoupage বলে।

✦ Photomontage :

ফটোগ্রাফ বা ফটোগ্রাফের অংশ থেকে তৈরি কোলাজকে photomontage বলা হয়। এই প্রক্রিয়ায় অন্যান্য ফটোগ্রাফ কেটে এর অংশগুলি দিয়ে একটি যৌগিক আলেখ্যচিত্রের মাধ্যমে কোলাজ সৃষ্টি হয়।

☛ কোলাজের পদ্ধতি :

- প্রথমে কোনো ছবি করব, সেটা চিন্তা করে Layout করে নিতে হবে।
- ছবির উপর নির্ভর করে surface টা নির্বাচন করতে হবে। Surface হিসেবে সমতলক্ষেত্র। অর্থাৎ কাগজ, বোর্ড, ক্যানভাস ব্যবহার করা হয়।
- Surface-এর অনুযায়ী আঠা নির্বাচন করতে হবে, যেমন— ক্যানভাসের উপর ফেভিকল, কাগজের উপর gum লাগাতে হবে। আঠার মান উন্নত হওয়া দরকার।
- এবার কোন্ উপকরণের কোলাজ করব তা ঠিক করতে হবে। উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করা হয় রঙিন কাগজ, ম্যাগাজিনের কাগজ, খবরের কাগজ, ট্রেসিং পেপার, কার্বন পেপার, বালি, কাঠ, কাঠের গুঁড়ো, দরি, খড়, গাছের ছাল, গমের কাঠি,

Scanned with CamScanner

কাঠের ছিলকা, মাছের আঁশ প্রভৃতি। কিন্তু এমন বস্তু ব্যবহার করব যেটা পচনশীল নয় এবং যা ছবি নষ্ট করবে না।

- Surface-এর উপর অঙ্কন করতে হবে এবং সেই ছবি অনুযায়ী বস্তুর অংশগুলি আঠা দিয়ে অর্থপূর্ণভাবে সেটে যেতে হবে। ঠিক করে না লাগালে ছবি সুন্দর করে ফুটে উঠবে না।
- সম্পূর্ণ Background-এ কাগজ দিয়ে ঢেকে দিতে হবে।
- কোলাজকে সুন্দর করার জন্য প্রয়োজন হলে কালি বা রং ব্যবহার করা যেতে পারে।
- কোলাজ হয়ে যাবার পর তা সঠিক পদ্ধতিতে ঠিকভাবে সংরক্ষণ করতে হবে।

☛ **কোলাজের গুরুত্ব :**

- কোলাজের মধ্যে দিয়ে শিক্ষার্থীর সৌন্দর্যবোধ বৃদ্ধি পাবে।
- রঙের বিকল্প হিসেবে ব্যবহার করার জন্য শিক্ষার্থীর অর্থ সাশ্রয়ের প্রবণতা ও আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে।
- প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কোলাজের কাজটি শেখার মধ্যে দিয়ে শিক্ষার্থীব আত্মবিকাশ বাড়বে।
- কোলাজের কাজটি অনেক রকম মাধ্যমে শিক্ষার্থী নিজে সম্পাদন করার আনন্দ উপভোগ করবে।
- ফেলে দেওয়া বস্তু দিয়ে কাজ করা যায় অর্থাৎ কোনো বস্তুকে নতুনভাবে ব্যবহার করার মধ্যে দিয়ে শিক্ষার্থী বিভিন্ন সামাজিক গুণ বিকাশ লাভ করবে।
- রঙের বিকল্প হিসেবে ব্যবহার করার জন্য অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে থাকা শিক্ষার্থীরাও এটি করতে পারে।

✪ ৫.৫ শিক্ষায় বিভিন্ন ধরনের শিল্প মাধ্যমে ব্যবহার (The use of different art forms in Education) :

✦ মুখোশ (Mask) :

মুখোশ মানুষের তৈরি প্রাচীনতম শিল্পবস্তুগুলির অন্যতম। দশ বা বারোহাজার বছর আগের অর্থাৎ প্রাচীন প্রস্তুরযুগে যে সব গুহচিত্র পৃথিবীর অনেক দেশেই আবিষ্কৃত হয়েছে তাদের মধ্যে মুখোশ পরা মানুষের ছবি পাওয়া যায়। মুখোশ ছিল ধর্মাচারের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ যা বহু শতাব্দীর পথ পেরিয়ে এসেও পৃথিবীর বিভিন্ন প্রত্যন্তের নানা আদিবাসী গোষ্ঠীর মধ্যে এখনও অল্পবিস্তর প্রচলিত। এমনকি সভ্যতার বিবর্তনের ধারণা যে সব সমাজ উন্নততর

স্তরে গিয়ে পৌঁছেছে কোনও না কোনও সময়ে তাদের মধ্যেও মুখোশ ব্যবহারের রীতির ব্যাপকভাবে প্রচলন স্মরণযোগ্য। প্রাচীন মিশর এবং গ্রিসের কথা এখানে মনে করা যেতে পারে। ভারতবর্ষ এবং দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার কোনও কোনও দেশ যেমন—থাইল্যান্ড বা ইন্দোনেশিয়া আজও মুখোশে নৃত্যের ধারাকে ধরে রেখেছে। ধ্রুপদী এবং লৌকিক উভয় ধারাতেই।

আদিম সংস্কারবদ্ধ সমাজে কেউ কোনও প্রাণীর মুখোশ পরলে তার সমরূপ গুণ বা ক্ষমতা অর্জিত হতে পারে, এমন বিশ্বাস বহু সময়েই দেখা যায়। সিংহের মুখোশ যে পড়বে সেই সিংহতুল্য বলেই নিজের এবং অন্যের কাছে গণ্য হয়। দেবতার মুখোশ যে পড়ল সেও হয়ে গেল দেবতুল্য। বিকৃত মুখের ঢঙে তৈরি মুখোশ পরে অশুভ প্রেতসত্তা ইত্যাদির চোখে ধুলো দেওয়া যায়। নরনারীর যৌবণ আগমনের স্বীকৃতিমূলক উৎসবে, শিশুর জন্মকালে, রোগীর চিকিৎসা অথবা মৃত্যুকালে, বিবাহকালে পূজার্চনার সময়ে এবং আরও কোনও কোনও সময়ে মুখোশের প্রচলন খুব ব্যাপক। অনেক রকমের মুখোশ দেখা যায় যেমন—

(1) পশুর মুখ
(2) দেবদেবীর কল্পিত মুখ
(3) প্রেতসত্তার কল্পিত মুখ
(4) মানুষের মুখ
(5) কোনো পশু বা মানুষের বিকৃত মুখ

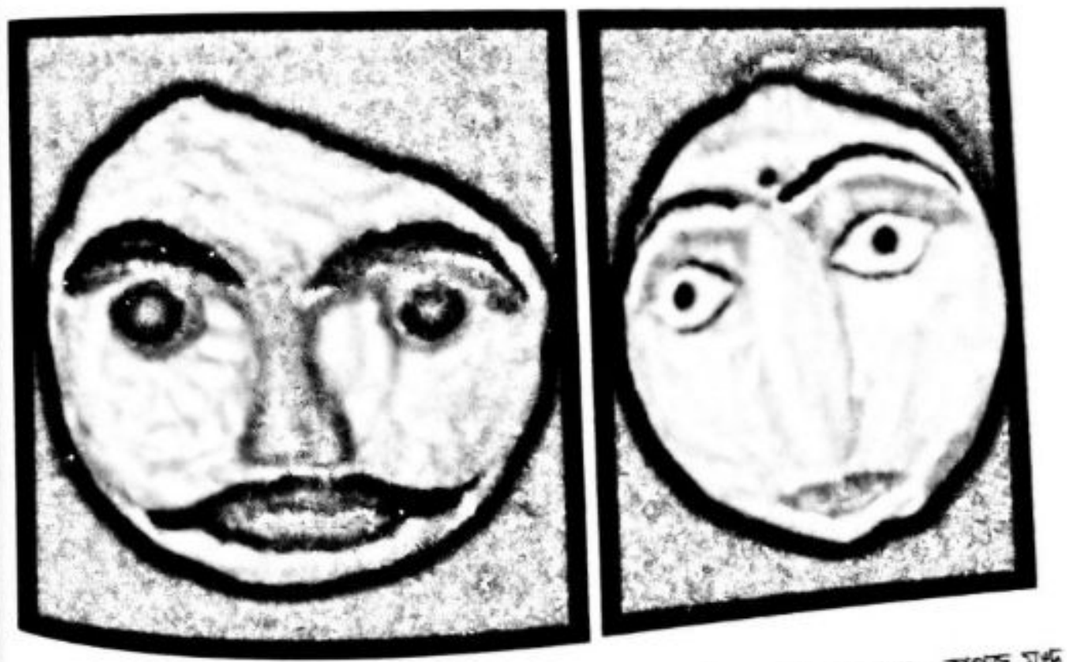

কাগজ দিয়ে অনেক রকমের পদ্ধতিতে মুখোশ তৈরি করা যায়। যেমন—কাগজ মণ্ড (Paper Pulb), পেপার ম্যাসে (Paper Mache), মাউথ বোর্ড দিয়ে মুখোশ ইত্যাদি।

Scanned with CamScanner

■ কাগজের মণ্ড (Paper Pulh) :

কাগজের মণ্ড বানাবার বহু পদ্ধতি আছে। যিনি যেটি ভালো মনে করেন গ্রহণ করতে পারেন। সংবাদপত্রের কাগজ, আর্ট পেপার ইত্যাদি কাগজ ছোট ছোট টুকরো করে দুই-এক দিন জলের মধ্যে ভিজিয়ে রাখতে হবে। তারপর কাগজ হাতে দিয়ে দুমড়ে, বালতির জল ফেলে হাত দিয়ে চটকালে সহজে গলে যায়। তারপর হামালদিস্তা বা শিলনোড়ায় ভালো করে বেটে মেশাতে হবে যাতে কাগজের আঁশগুলি একেবারে মিশে যায়। এরপর এলামাটি, গিরিমাটি, মডেলিং ক্লে, আঠা প্রয়োজন মতো মেশাতে হবে। এবার মণ্ডটা ভালো করে মাখতে হবে। এই মণ্ডটি দিয়ে যে কোন আকৃতির যে কোন মডেল তৈরি করা যেতে পারে। পরিষ্কার মেঝের উপর কাজ করা দরকার। বেশিদিন রেখে দিলে মণ্ডটি নষ্ট হয়ে যায়। হাত দিয়ে বা মাটির কাজের যন্ত্রপাতি দিয়ে সুন্দর মুখোশ করে নিতে হবে। তারপর ফ্রেবরিক রঙ দিয়ে রঙ করলে ভালো হয়। সর্বপ্রথম সাদা রঙ করে নিতে হবে, এরপর ইচ্ছে মতো মুখোশে রঙ করে নিতে হবে।

■ পেপার ম্যাসে (Paper Mache) :

কাগজ ছোটো ছোটো টুকরো করে নিতে হবে, মাটির সরা, বেলুন, মাটির মুখোশ ইত্যাদি ছাচ হিসেবে ব্যবহার করা যায়। কাগজের টুকরোগুলোকে জলে ভালো করে ভিজিয়ে ছাঁচের উপর লাগাতে হবে। এরপর আঠা দিয়ে মিশিয়ে কাগজে ছয় সাতটা স্তর লাগাতে হবে। প্রথম স্তরে আঠা ব্যবহার করবে না। তাতে ছাঁচের সঙ্গে কাগজ আটকে যায়। সুন্দর করে কাগজের স্তরগুলি দিতে হবে। এরপর শুকিয়ে নিতে হবে এবং ছাঁচ থেকে পেপার ম্যাসেটা তুলে নিতে হবে। এবার মুখোশের মতো চোখ নাক মুখ কাগজ আটকে নেওয়া যায়। সুন্দর করে রঙ করে নিতে হবে এবং বার্নিস ব্যবহার করলে সুন্দর দেখাবে।

■ কাগজের মুখোশ তৈরি :

◆ **প্রয়োজনীয় কাঁচামাল :** (i) আর্টবোর্ড বা কাপড়ের বাক্সের পাতলা পিজবোর্ড; (ii) বিভিন্ন জল রং বা তেল রং; (iii) ইলাস্টিক ব্যান্ড; (iv) বার্নিশ পেন্ট (প্রয়োজনে); (v) পাট (প্রয়োজনে); (vi) আঠা।

◆ **প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম :** (i) পেনসিল; (ii) তুলি; (iii) প্যালেট; (iv) জলের পাত্র; (v) কাঁচি; (vi) ব্লেড।

◆ **প্রস্তুতপদ্ধতি :**

Step - 1 : প্রথমে নিজের মুখমণ্ডলের মাপের চেয়ে চারধারে কিছুটা বড়ো একটি ডিম্বাকৃতির আউটলাইন আর্টবোর্ডের ওপর বা পিজবোর্ডের ওপর আঁকতে হবে।

Step - 2 : ওই কাগজের মধ্যে নিজের চোখ দুটি স্থান চিহ্নিত করতে হবে।

Step - 3 : এখন চোখের তারা চিহ্নিত স্থান দুটি ব্লেডের সাহায্যে সাবধানে গোল করে কেটে নিতে হবে।

Step - 4 : এরপর ডিম্বাকৃতি মুখমণ্ডলের মধ্যে পছন্দমতো মুখাকৃতির ছবি এঁকে বিভিন্ন রং দিয়ে ভরিয়ে দেবদেবী, রাক্ষস, চিনাম্যান, স্পেইভার ম্যান, জোকার, মহাপুরুষ প্রভৃতির মুখমণ্ডল আঁকতে পারা যায়।

Step - 5 : চোখের চিহ্নিত অংশে ইচ্ছে করলে রঙিন সেলোফেন পেপার দিয়ে তলার দিকে ঢেকে দেওয়া যায়।

Step - 6 : নাক অংশটির দু-ধার এবং নীচের দিকটি ব্লেড দিয়ে চিরে দিলে নাকটি উঁচু লাগবে এবং মুখোশ পরা অবস্থায় শ্বাস নিতে সুবিধে হবে। এই অংশটি একটু বড়ো করে কাটতে হবে এবং কাটা অংশটি মাঝখান বরাবর ভাঁজ করে দিতে হবে যাতে মাঝখানের ক্রিজটি উঁচু থাকে ও দু-ধার নীচে থাকে।

Step - 7 : রং করা হয়ে গেলে ও রং শুকিয়ে গেলে এর ওপর বার্নিশ পেন্ট করা যায় তাতে মুখোশটি আরও উজ্জ্বল লাগবে।

Step - 8 : সব কাজ শেষ হলে মুখোশটি আউটলাইন বরাবর কেটে নিতে হবে যাতে দুদিকের কানের কাছে কিছুটা করে বর্ধিত অংশ থাকে। ওই অংশে দুটি ছোটো ছিদ্র করে ইলাস্টিক ব্যান্ড লাগিয়ে দিলে মুখোশ তৈরি।

■ মুখোশ গুরুত্ব :

(1) মুখোশ TLM হিসেবে ব্যবহার করা হয়।
(2) শিক্ষার্থী কাজটি নিজে সম্পাদন করার আনন্দ উপভোগ করবে।
(3) কাজটি করার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীর সৌন্দর্যবোধ বৃদ্ধি পাবে।
(4) শিক্ষার্থীদের আত্মবিকাশ ঘটবে।

✦ কভার ফাইল তৈরি (Cover File) :

অফিসে বিভিন্ন কাগজ পত্র রাখার জন্য এবং বাড়িতে ব্যক্তিগত কাগজপত্র যত্ন সহকারে গুছিয়ে রাখার জন্য কভার ফাইল ব্যবহার করা যায়। এ ছাড়াও প্রয়োজনীয় কাগজপত্র কভার ফাইলে রাখতে পারি।

Scanned with CamScanner

◆ **প্রয়োজনীয় উপকরণ :** কভার ফাইল তৈরির জন্য কাঁচামাল হিসেবে যেসব সামগ্রী প্রয়োজন সেগুলি হল (i) 20″ × 19″ মাপের একটি রঙিন আর্টবোর্ড, (ii) 12″ × 10″ মাপের একটি শক্ত পিচবোর্ড, (iii) 13″ × 9″ মাপের একটি ব্রাউন পেপার, (i) 30″ লম্বা একটি লেস, (v) আঠা।

◆ **প্রয়োজনীয় সবঞ্জাম :** কভার ফাইল তৈরির জন্য সরঞ্জাম হিসেবে যে সমস্ত সামগ্রীর প্রয়োজন হয়, সেগুলি হল— (i) কাঁচি, (ii) স্কেল, (iii) পেনসিল, (iv) বেনা (v) গ্রুভিং করার যন্ত্র।

☛ **প্রস্তুতপদ্ধতি :**

- প্রথমে 20″ × 19″ মাপের রঙিন আর্টবোর্ডটিকে নীচের ড্রয়িং অনুযায়ী দাগগুলি টেনে নাও। তারপর কাঁচি দিয়ে a. b. c ও d খন্ডগুলি কেটে আলাদা করে নাও।
- কার্ডবোর্ডের অসমৃণ দিকটির ওপর করে পেনসিলের সাহায্যে দাগ টানা হলো। এবং প্রত্যেকটি মূল খন্ডের একধারে আঠা লাগানোর জন্য। ইঞ্চি মাপের একটি করে দাগ টানা হলো।
- প্রথম টুকরোর অসমৃণ দিকটির যে ধারে। 1 ইঞ্চি বর্ডার টানা হল সেই অংশে আঠা লাগিয়ে তার ওপর 12″ × 10″ মাপের পিচবোর্ডের লম্বা দিকটি ধার বরাবর আঠা লাগানো অংশটিতে ঢেকে বসিয়ে দিতে হবে। একই ভাবে দ্বিতীয়,তৃতীয় এবং চতুর্থ টুকরোগুলির 1 ইঞ্চি বর্ডার দেওয়া অংশের উপর আঠা লাগিয়ে পিচবোর্ডটির নিচের দিকে আটকে দেওয়া হল। এবার 12″ × 10″ মাপের ব্রাউন পেপার দুটি দিয়ে সেটি আঠার সাহায্যে পিচবোর্ডের উভয় দিকে লাগিয়ে দেওয়া হয়।
- এখন ফাইলটি উলটে নিয়ে 12″ × 10″ মাপের পিচবোর্ডের লম্বাদিকের মাঝখান বরাবর দুদিক থেকে 3″ ইঞ্চি ভেতরে বেনার সাহায্যে দুটি গর্ত করো। এবং এই গর্ত দিয়ে লেসের দুটি প্রান্ত ঢুকিয়ে নীচের দিক থেকে টেনে বার করো।
- এইবার পর্যায়ক্রমিক ভাবে a, b, c এবং d খন্ডগুলি ভাঁজ করে পিচবোর্ডের ওপর ফেলে লেস দিয়ে বেঁধে ফেলো। কভার ফাইল এখন ব্যবহার উপযোগী হয়ে গেছে।

■ **গুরুত্ব :**

(1) প্রয়োজন ভিত্তিক উৎপাদনাত্মক কাজের পধতি সম্পর্কে অবহিত হবে।
(2) অর্থ সাশ্রয়ের প্রবণতা ও আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে।
(3) কাজটি করতে গিয়ে শিক্ষার্থীরা জ্যামিতি, অঙ্ক প্রভৃতির জ্ঞান অর্জন করতে পারবে।
(4) কাজটির মধ্যে দিয়ে শিক্ষার্থীর সৌন্দর্যবোধ বৃদ্ধি পাবে।

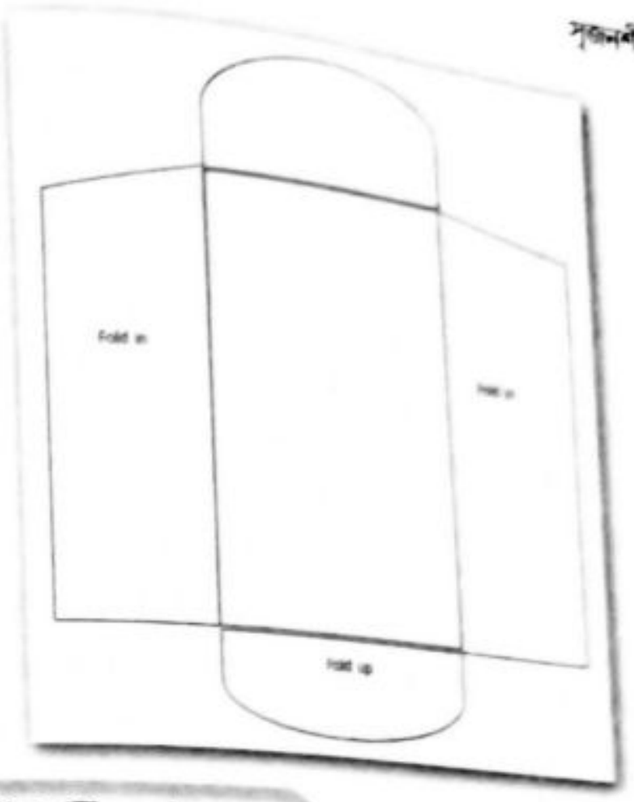

◆ **কাগজের খাম (Envelope) :**

কাগজের খাম, দৈনন্দিন জীবনে, অফিসে, বিদ্যালয় বিভিন্ন কাজে ব্যবহৃত হয়।

● **কাগজের খামের তৈরির উদ্দেশ্য :**

(1) কাগজের খাম তৈরির মধ্যে দিয়ে শিক্ষার্থী নিজের প্রয়োজনীয় সামগ্রী উৎপাদনে দক্ষতা অর্জন করেও কাজের জগতের সঙ্গে পরিচিত হবে।
(2) স্বনির্ভর হবে এবং শ্রমের মর্যাদা দিতে শিখবে।
(3) কাগজের ধরন, গাণিতিক পরিমাণ প্রভৃতি বিষয়ে জ্ঞান লাভ করবে।
(4) যেহেতু কাগজ দ্বারা তৈরি করা হচ্ছে তাই শিক্ষার্থী অপচয় রোধে উৎসাহ পাবে এবং মমত্ববোধ, সহমর্মিতা অর্জন করবে।
(5) কাজটি শেখার মধ্যে দিয়ে শিক্ষার্থীর আত্মবিকাশ বাড়বে এবং অর্থ সাশ্রয়ের প্রবনতা ও আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে
(6) কাজটি নিজে সম্পাদন করার জন্য শিক্ষার্থী আনন্দ উপভোগ করবে এবং তার সৌন্দর্যবোধ বৃদ্ধি পাবে।

◆ **প্রয়োজনীয় উপকরণ :** (1) সাদা বা ব্রাউন পেপার (2) আঠা

◆ **প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম :** (1) স্কেল (2) কাঁচি (3) ছুরি (4) পেনসিল (5) রাবার (6) আঠা লাগানোর জন্য তুলি

Scanned with CamScanner

পদ্ধতি :

কাগজের খাম তৈরি করার আগে ঠিক করে নিতে হয় কোন্ প্রকার এবং কী মাপের খাম বানানো হবে। কাগজের খাম বিভিন্ন মাপের এবং বিভিন্ন ধরনের হয়। কয়েক প্রকার খাম চিঠিপত্র আদান প্রদানের জন্য, আবার কয়েক প্রকার অফিসের কাজে ব্যবহৃত হয়, ম্যাগাজিন ভরার জন্য, বিবাহ ও অন্যান্য অনুষ্ঠানে কার্ড ভরার জন্য ব্যবহার করা হয়।

প্রথমে একটি সাদা বা ব্রাউন পেপারে 27×21 cm মাপের অংশ স্কেল ও পেনসিলে সাহায্যে চিহ্নিত হয়। পরে কাঁচি দিয়ে কেটে ওই টুকরোটা মূল পেপার থেকে আলাদা করা হয়। এরপর উপরের দিকে প্রান্ত থেকে ভিতরের দিকে 2cm ভেতরে এবং নীচের দিকে প্রান্ত থেকে 4cm ভেতরে পেনসিল দিয়ে দুটি লম্বায় দাগ টেনে নিতে হবে। এরপর লম্বায় দুই প্রান্ত থেকে 7cm ভেতরে লম্বা দাগ টানতে হবে। এবার দাগদুটি বরাবর ভাঁজ করে নিতে হবে। এরপর চিত্রের শেড দেওয়া অংশটা পেনসিল দিয়ে দাগ টেনে ছুরির সাহায্যে কেটে বাদ দিতে হবে। এরপর ডানদিকের C নং ও মাঝের নীচের দিকে D নং অংশ ধরে সরু করে আঠা লাগিয়ে প্রথম A নং টি B নং অংশের ওপরে ভাঁজ করে বসিয়ে তার ওপর C নং আঠা লাগানো অংশটি A নং অংশের ওপর বসিয়ে চেপে আটকে দিতে হবে। এর পরেই D নং অংশটি A নং ও B নং অংশের ওপর নীচের দিকে চেপে বসিয়ে দিতে হবে। উপরে অংশটি খোলা থাকবে কাগজপত্র খাম ঢোকানোর জন্য। ভাঁজ করার সময় সতর্ক থাকতে হবে যেন অঙ্কন করা দাগগুলি খামের ভিতরে দিকে থাকে। বাইরে দেখা না যায়। এরপর খামের ওপরের যে কোনো অংশে সুন্দর করে আলপনা অঙ্কন করে খামটিকে আরো সুন্দর ও সৌখিন করে তুলতে হবে।

✦ কাগজের ব্যাগ (Paper Bag) :

কাগজের ব্যাগ একটি উৎপাদনাত্মক কাজ যেটি আমাদের ব্যবহারিক প্রয়োজনে লাগে। এই কাজটি শেখার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর স্বনির্ভরতা ও শ্রমের মর্যাদা দিতে শিখবে। প্রয়োজন ভিত্তিক উৎপাদনাত্মক কাজের পদ্ধতি সম্পর্কে অবহিত হবে।

উপকরণ : হ্যান্ডমেড পেপার, কাঁচি, আঠা, স্কেল, পেনসিল ইত্যাদি।

পদ্ধতি :

একটি রঙিন হ্যান্ডমেড পেপার নিতে হবে। সর্বপ্রথম স্কেল দিয়ে পেপারটির মাপ নিয়ে নিতে হবে। ধরা যাক পেপারটির মাপ 29″/20″। এবার চওড়ায় 29″ পাঁচ ভাগে ভাগ করে দাগ টেনে নিতে হবে। যেমন—A অংশ 4″, B অংশ 10″, C অংশ 4″, D অংশ 10″, এবং E অংশ 1″, A ও C অংশ দুটি ধারের অংশ এবং B ও D অংশ দুটি সামনের পেছনের অংশ।

এবার লম্বায় অর্থাৎ 20″ নীচের দিক দিয়ে 4″ একটা অংশ G দাগ টেনে নিতে হবে। G অংশের উপরে আবার 14″ একটা দাগ H অংশ নেব। ছবির যেখানে যেখানে কালো Shade দেওয়া আছে সেই অংশগুলি কেটে বাদ দিয়ে দেব। এবার Line বরাবর প্রত্যেকটি অংশ ভাঁজ করে নেব। এরপর E অংশটি A অংশের কোণে আঠা দিয়ে লাগিয়ে নিতে হবে। G অংশটির প্রত্যেকটি অংশ আঠা দিয়ে লাগিয়ে নিতে হবে যাতে নীচের দিকটা বন্ধ হয়ে যায়। H অংশের উপরে অংশটা ভাঁজ করে ভেতরে দিকে ঢুকিয়ে নিতে হবে। উপরে মাঝ বরাবর হ্যান্ডল লাগিয়ে নিতে হবে।

ebook.dascoaching.in

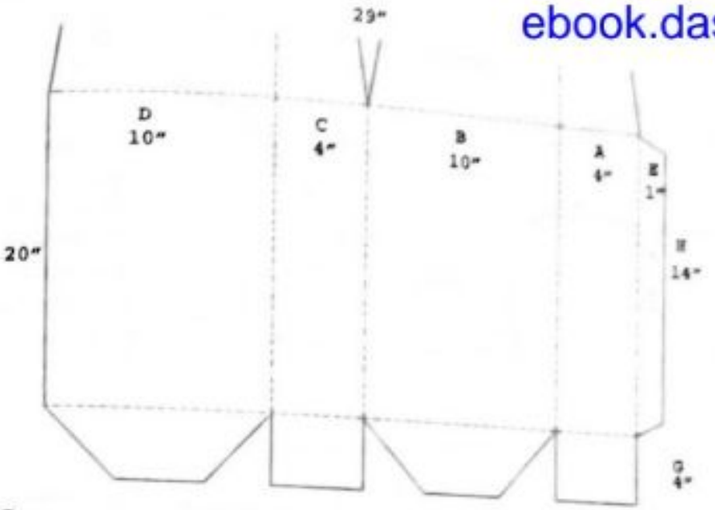

ব্যাগটি তৈরি হয়ে যাবার পর তার উপরের অংশে নানারকম উপকরণ দিয়ে সুন্দর করে সাজিয়ে নেওয়া যেতে পারে।

কাগজের ব্যাগ তৈরি করার গুরুত্ব :

(1) শিক্ষার্থীরা নিজেরা তৈরি করে বলে কর্ম সম্পাদনের সম্পূর্ণতাজনিত আনন্দ লাভ করে।
(2) খুব সাধারণ উপকরণ দিয়ে তৈরি বলে অর্থ সাশ্রয়ের প্রবণতা ও আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে।
(3) শিক্ষার্থীরা কাজটি করতে গিয়ে অঙ্ক, জ্যামিতি, জ্ঞান অর্জন করতে পারবে।
(4) ব্যাগটি হয়ে যাবার পর উপরে সুন্দর কারুকার্য করার মধ্যে দিয়ে সৌন্দর্যবোধ বৃদ্ধি পাবে।

■ কাগজ কাটার কাজ :

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের কর্মশিক্ষা পাঠ্যসূচিতে ষষ্ঠশ্রেণি থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত কোন্ কাজ কোন্ শ্রেণিতে করানো হবে তা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়নি। তবুও কাগজ কাটার কাজ ষষ্ঠশ্রেণির উপযোগী এবং সপ্তম শ্রেণি পর্যন্ত যেতে পারে।

কাগজ কেটে নানানরকম জিনিস তৈরি করা যায়। যেমন—ফুল, মুখোশ, কাগজের মালা, কাগজের ফুলের তোড়া ইত্যাদি। এছাড়া বিভিন্ন কাগজের টুকরো দিয়ে নানান ছবি তৈরি করা যায়। নীচে পেপার কাটিং এর দ্বারা প্রস্তুত কিছু জিনিসের নমুনা দেওয়া হল।

Scanned with CamScanner

✦ কাগজের মালা তৈরি :

◆ **প্রয়োজনীয় কাঁচামাল :**

(i) বিভিন্ন রং-এর টিস্যু পেপার বা ঘুড়ির কাগজ— ৬টি সিট; (ii) শক্ত সুতো। (vi) একটি বড়ো পিচ্‌বোর্ডের টুকরো; (vii) কাঁচি।

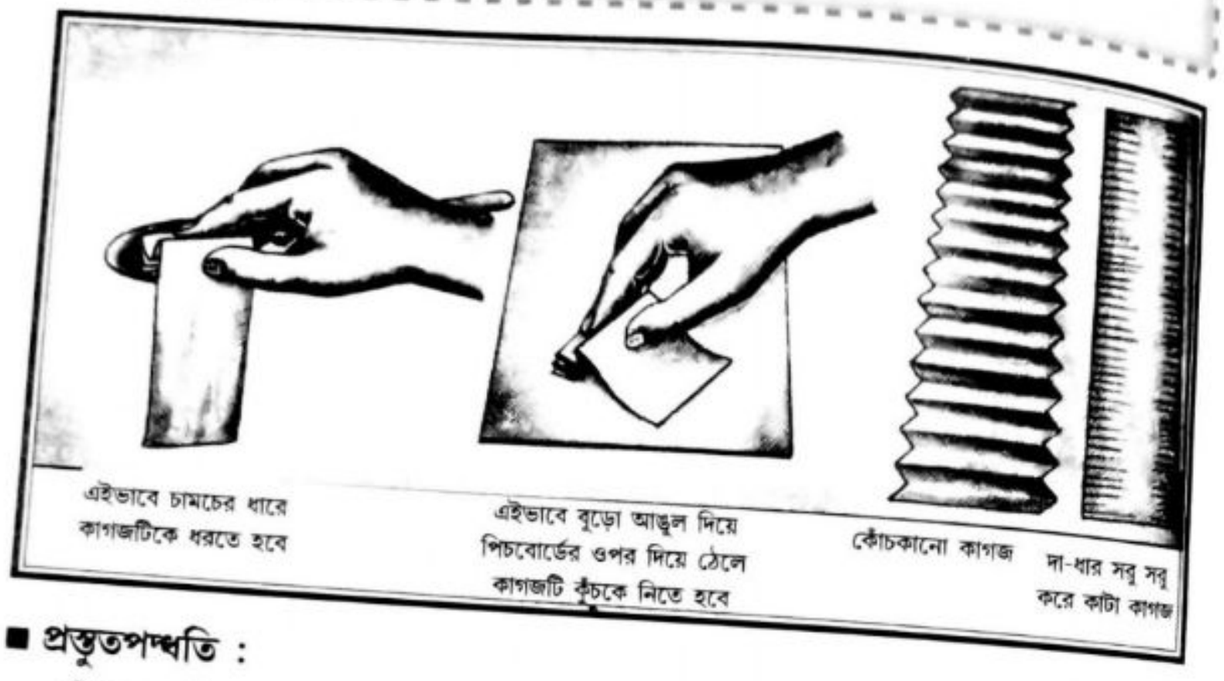

■ **প্রস্তুতপদ্ধতি :**

Step - 1 : প্রথমে স্কেল ও পেনসিল দিয়ে টিস্যু পেপারের ওপর 2½´´—3´´ ব্যবধানে সমান মাপের দাগ টেনে নিতে হবে।

Step - 2 : তারপর বড়ো টিস্যু পেপার থেকে ছুরির সাহায্যে 2½´´—3´´ মাপের লম্বা ফালি কেটে নেওয়া হল। লক্ষ রাখতে হবে যাতে প্রতিটি ফালি সমান চওড়া থাকে।

Step - 3 : এরপর প্রতিটি ফালিকে পিজবোর্ডের রেখে চামচের সাহায্যে কুঁচকে নিতে হবে। চামচের অবতল অংশে তর্জনি আঙুলটি রেখে এবং বৃদ্ধাঙ্গুলির সাহায্যে কাগজের ফালির একটি প্রান্ত চামচের এক প্রান্তে চেপে ধরে বৃদ্ধাঙ্গুলিটি দিয়ে কাগজের ফালিটি পিজবোর্ডের উপর রেখে ধীরে ধীরে ঠেলে নীচ থেকে ওপরের দিকে ঠেলে তুলতে হবে। তাহলে কাগজটি পাঞ্জাবির হাতায় গিলে করার মতো কুঁচকে যাবে। একইভাবে কাগজের ফালিটির প্রথমে মাঝখান বরাবর এবং তারপর দুটি ধার বরাবর চামচ ঠেলে কুঁচকে নিতে হবে। এই ভাবে সমস্ত কাগজের ফালিগুলি প্রথমে কুঁচকে নিতে হবে। বারবার অনুশীলনের দ্বারা চামচ দিয়ে কাগজ কোঁচকানো রপ্ত করতে হয়।

Step - 4 : এরপর ছুঁচে সুতো ভরে সুতোর শেষ প্রান্তে একটি মোটা গিঁট দিতে হবে।

Step - 5 : তারপর একটি কোঁচকানো ধারকাটা বা রঙিন কাগজের ফালি নিয়ে তার মাঝখান বরাবর ছুঁচ দিয়ে রান সেলাই বা কাঁথা ফোঁড় দিয়ে ছুঁচের মধ্যে গাঁথতে হবে। লক্ষ রাখতে হবে যাতে ফোঁড় খুব ঘন বা খুব বড়ো না হয় এবং ফোঁড় যেন কাগজের ফালির ঠিক মাঝখান বরাবর দেওয়া হয়।

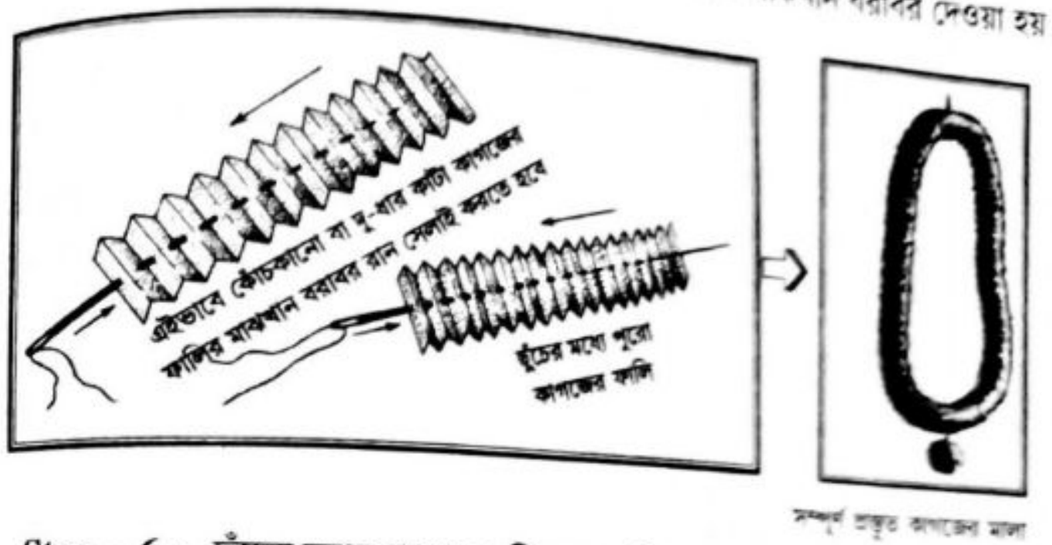

Step - 6 : ছুঁচের মধ্যে পুরো একটি লম্বা ফালি সেলাই করে নেওয়ার পর ফালিটির প্রথম অংশটি ডান হাত দিয়ে ছুঁচের নীচের দিকে ধরে ছুঁচটি খাড়াভাবে ধরে বাম হাত দিয়ে ছুঁচের মধ্যে থাকা কাগজের ফালিটি আস্তে আস্তে স্প্রিং-এর মতো পেঁচিয়ে দিতে হবে। লক্ষ রাখতে হবে প্যাঁচ যেন খুব বেশি না হয় ও প্যাঁচানো কাগজটি চুল্লির মতো দেখতে না হয়। প্যাঁচানো হয়ে গেলে কাগজের ফালিটি প্রথমে ছুঁচের মধ্যে চেপে ছোটো করে নিতে হবে এবং তারপর ঠেলে সুতোর শেষ প্রান্তে গিঁটের কাছে ঠেলে নামিয়ে দিতে হবে।

Step - 7 : এইভাবে একটির পর একটি ফালিকে একইভাবে সেলাই করে ও পেঁচিয়ে সুতোর মধ্যে গাঁথতে হবে। একই রঙের কাগজ তিন-চারটি পর পর গাঁথতে হবে এবং কোন্ রঙের কাগজের পাশে কোন্ রঙের কাগজ মানাবে সেইমতো কাগজ গাঁথতে হবে।

Step - 8 : সব কাগজগুলি গাঁথা হয়ে গেলে সুতোর দু-প্রান্ত এক সঙ্গে এমনভাবে বাঁধতে হবে যাতে কোথাও ফাঁকা না থাকে। সুতোর মধ্যে কাগজগুলি যাতে ফাঁকা ফাঁকা না থাকে সেদিকে নজর রাখতে হবে। এইভাবে কাগজের মালা তৈরি শেষ করতে হবে।

একই পদ্ধতিতে যেকোনো এক রঙের কাগজ দিয়েও মালা তৈরি করা যেতে পারে।

Scanned with CamScanner

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ও উত্তর
(Short Questions & Answers)

❑ অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ও উত্তর (Objective type questions & answers) : Marks – 2

প্রশ্ন : ওরিগ্যামি কাকে বলে?

উত্তর : একখণ্ড কাগজকে না কেটে, কোনোরূপ আঠা ব্যবহার না করে কেবল ভাঁজ করে জীবজন্তু, পাখি ইত্যাদি রূপ দেওয়ার একটি কৌশল ও খেলা হল ওরিগামি। ওরিগামি শব্দটি জাপান থেকে এসেছে। ওরি (Ori) কথার অর্থ ভাঁজ করা ও কামি (Kami) পরিবর্তিত হয়ে গামি অর্থাৎ কাগজ।

প্রশ্ন : মাটির কাজের গুরুত্ব কী?

উত্তর : মাটির কাজের গুরুত্বগুলি হল—

(i) কাজটির মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীর সৌন্দর্যবোধ বৃদ্ধি পাবে।

(ii) শিক্ষার্থীরা কাজের পদ্ধতি ক্রম অনুসারে অনুকরণ করতে শিখবে।

(iii) উপকরণ সম্পর্কে প্রকৃত ধারণা লাভ করবে।

(iv) কাজটির শেখার মধ্যে দিয়ে শিক্ষার্থীর আত্মবিকাশ বাড়বে।

প্রশ্ন : Simple Hand পাপেট কাকে বলে?

উত্তর : একদম সাদামাটা Hand Puppet-গুলিতে খুব কম নড়াচড়া করার অংশ থাকে। এইগুলো তৈরি হয় মোটা শক্ত ধরনের প্ল্যাস্টিক অথবা কাপড় দিয়ে। এই ধরনের Hand Puppet-এর মুখ খোলা বা কাজ করা যায় না। এইগুলো হাতের থেকে খুব বেশি বড় হয় না।

প্রশ্ন : একজন বিখ্যাত প্রচ্ছদ শিল্পীর নাম লেখ?

উত্তর : সত্যজিৎ রায় বইয়ের প্রচ্ছদের আদর্শ সুপ্রতিষ্ঠিত শিল্পী ছিলেন।

প্রশ্ন : ভিত্তি চিত্রের মাধ্যমে শিশুমনে সৌন্দর্য্য বিকাশ কীভাবে ঘটে?

উত্তর : চিত্রের পাশে ভিত্তিচিত্রে অংশগ্রহণকারী প্রতিটি ছাত্রছাত্রীর নাম লিখে দিতে হবে। ভিত্তিচিত্র অঙ্কনের ফলে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ সুসজ্জিত হবে। শিশু ও বালক-বালিকারা তাদের চারপাশে অঙ্কন দেখলে তাদের সৌন্দর্যবোধ বিকশিত হবে ও তারাও বড় হয়ে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণকে আরো সুন্দর করে তোলার জন্য নিজেরাও ভিত্তিচিত্র অঙ্কনে অংশগ্রহণ করার জন্য উৎসাহিত হয়ে উঠবে।

প্রশ্ন : কোলাজ কাকে বলে?

উত্তর : কোলাজ একটি শিল্প উৎপাদন কৌশল; ফেলে দেওয়া অপ্রয়োজনীয় সাধারণ জিনিস কাগজ, বোর্ড ক্যানভাস-এর উপর আঠা দিয়ে সেঁটে একটি চিত্ররূপ সৃষ্টি করাকে কোলাজ বলে।

❑ সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ও উত্তর (Short type questions & answers) : Marks – 5

প্রশ্ন : শান্তিনিকেতনের আলপোনা সম্পর্কে বিশদে আলোচনা করুন।

উত্তর : বর্তমানে শান্তিনিকেতন আল্পনা নামক এক নতুন ধরনের আল্পনা জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ লক্ষ্য করেছিলেন আল্পনা হচ্ছে সর্বাপেক্ষা পরিচিত ও সহজসাধ্য অঙ্কন প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে সাধারণের মধ্যে সৌন্দর্য ও নান্দনিক বোধ পরিস্ফুট করা সম্ভব। তিনি আল্পনাকে কেবলই নান্দনিকতার পরিপ্রেক্ষিতে স্থাপন করলেন। এর ফলে শান্তিনিকেতন আল্পনার এক নতুন ঘরানা সৃষ্টি হল যা চরিত্রগতভাবে বাংলার গ্রামীন ঐতিহ্যবাহী আল্পনা হতে পৃথক। শান্তিনিকেতনের আল্পনা অনেক মার্জিত, পরিশীলিত ও নাগরিক মানসিকতা সম্পন্ন। তবে ঐতিহ্যবাহী আল্পনার অর্গানিক ভিগার (organic rigour) এখানে অনুপস্থিত। শান্তিনিকেতনের আল্পনায় মূলত স্থান পেয়েছে প্রকৃতির প্রাণছন্দময়তা, ফুল, পাখী, পাতা, মাছ, গাছ, লতা কল্কা তার নিজস্ব গড়ন ও ছন্দ নিয়ে আল্পনায় স্থান পেয়েছে। শান্তিনিকেতনের আল্পনা ধর্মীয় অনুষঙ্গ বিরহিত কেবলমাত্র অলংকরন যা দর্শকদের মন সৌন্দর্য জাগরক করে।

প্রশ্ন : অজন্তা ভিত্তি চিত্র সম্বন্ধে লিখুন?

উত্তর : নন্দলাল বসু তাঁর লেখা 'শিল্পচর্চা' গ্রন্থে বিভিন্ন ধরনের ভিত্তিচিত্রের প্রক্রিয়ার কথা বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করে গেছেন। অজন্তা ভিত্তিচিত্রের খসে পড়া আস্তরণ বিশ্লেষণ করে ও নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে অজন্তা ভিত্তিচিত্রের জমি কিভাবে তৈরি হয়েছে তার একটা অনুমাণ করেছেন।

অজন্তা ভিত্তিচিত্রের জমিতে দুটি স্তর পাওয়া যায়। নন্দলাল বসু প্রথম স্তরটি মশলা নির্মাণের যে উপকরণ বিধি দিয়েছিলেন তা হল—উইঢিপির মাটি তিনভাগ, ঘাস খায় এরকম গোরুর শুকনো গোবর গুঁড়ো একভাগ, ধানের তুষ একভাগ, মাথার জন্য মেথির জল ও দুটে খানেক আলকাতরা। আলকাতরার বদলে পুরনো চালের পচা খড়কুটিও মেশানো যেতে পারে। শেষোক্ত দ্রব্যটি পোকামাকড় ও উইপোকা লাগতে দেয় না। এই মশলাটিতে জল মিশিয়ে এক সপ্তাহ পচিয়েদেওয়ালের ওপর ১ ইঞ্চি পুর করে টিপে টিপে লাগাতে হবে। এই অস্তরটি ভাল করে শুকিয়ে গেলে দ্বিতীয় অস্তরটি লাগাতে হবে। প্রথম স্তরের মশলার সাথে শনের মিছি কুঁচি মেশালে দ্বিতীয় স্তরের মশলাটি তৈরি হয়ে যায়। এই

Scanned with CamScanner

মশলাটিতে বেশি করে জল মিশিয়ে থিতোতে দিলে যে মিহি পলি পড়ে সেটাকেই দ্বিতীয় স্তরে লাগানো হয়। লাগানোর পর অল্প ভেজা থাকতে থাকতে কর্নিক দিয়ে ঘসে সমান করে নিতে হয়। মনে রাখতে হবে এটাই শেষ স্তর। কাজেই এটি মোলায়েম, মসৃণ, ঢেউহীন ও এক সমান হওয়া বাঞ্ছনীয়। এর ওপর কাঠখড়ির সাদা রং ডিমের কুসুম বা তেঁতুলবীজের আঠার সাথে মিশিয়ে প্রলেপ দিতে হবে। একেবারে মোটা করে রঙ দেওয়ার বদলে তিন চারপার পাতলা রঙের প্রলেপ দেওয়াই শ্রেয়। এইবার ছবি আকার জন্য জমি প্রস্তুত।

এই শিল্পচর্চা গ্রন্থে নন্দলাল বসু বহু ধরনের ভিত্তি চিত্র অঙ্কনের প্রক্রিয়ার কথা লিপিবদ্ধ করে গেছে। তিনি নিজে উদ্যোগী হয়ে বহু ধরনের ভিত্তিচিত্রের কৌশল শিখে ছিলেন যা তিনি এই গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। আরায়েস বা জয়পুরী ভিত্তিচিত্রের একটি বিস্তারিত বর্ণনা আছে যা তিনি শিখেছিলেন নরসিংহলাল নামক একজন জয়পুরী ভিত্তিচিত্র অঙ্কন পারদর্শী শিল্পীর কাছে এবং শান্তিনিকেতনের লাইব্রেরি গৃহের ভিত্তিচিত্র সেই পদ্ধতিতেই অঙ্কিত। এছাড়া এই গ্রন্থে সিংহলী ভিত্তিচিত্র ও নেপালী ভিত্তিচিত্রেরও উল্লেখ আছে।

প্রশ্ন : পুতুল নাচের ইতিহাস সম্বন্ধে আলোচনা করুন?

উত্তর : পুতুল নাচের বয়স খুবই প্রাচীন। খ্রিষ্টপূর্ব ৪র্থ শতকে প্লবক, কুহক প্রভৃতি ভ্রাম্যমান আনন্দ বিনোদনকারী সম্প্রদায় পুতুল নাচিয়ে জীবিকার্জন করত বলে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে উল্লেখ হয়েছে। তার শ দুয়েক বছর পরে পতঞ্জলির মহাভাষেও পুতুল নাচের উল্লেখ আছে। ইউরোপেও পুতুল নাচ খ্রিষ্টপূর্ব আমলে পারদর্শিতা হয়। ভারতীয় উপমহাদেশে বিপিন পাল প্রথম পুতুল নাচের প্রচলন করে বলে জানা যায়। বিপিন পাল তৎসময় সামাজিক পেক্ষাপট বিবেচনায় পৌরাণিক কাহিনি অবলম্বন করে পুতুল নাচ করতেন বলে জানা যায়। ভারতীয় ও ইন্দোনেশীয় পুতুল নাচ এখন পুরানো পদ্ধতিতেই নির্ভরশীল। ভিয়েতনামে ১১ শতাব্দী থেকেই জলের ওপর সুতোয় টানা পুতুল নাচের প্রচলন বেশ জনপ্রিয় হয়ে আছে এ অবধি। পশ্চিমবঙ্গে এই শিল্পকলা লোকনাট্যে সাধারণ স্রোতেই ভেসে চলেছে। লোকনাট্য যেমন পুরাণ কথা থেকে সামাজিক বিষয় অবধি, বহুবিচিত্র উপজীব্য অবলম্বন করা হয়, পুতুল নাচও তার থেকে পৃথক কিছু নয়।

প্রশ্ন : মোজাইক চিত্র কাকে বলে?

উত্তর : ম্যুরালের আরেকটি অত্যন্ত জনপ্রিয় মাধ্যম হল মোজাইক। এই মাধ্যমটি অত্যন্ত প্রাচীন। খ্রিস্টপূর্ব ৮০০ শতাব্দী হতেই গ্রিসে মাটিতে রঙীন পাথরের টুকরো দিয়ে মোজাইক নির্মাণের রীতি দেখতে পাওয়া যায় যা খ্রী. পূ. পঞ্চম শতাব্দী নাগাদ বিকাশ লাভ করে। (গ্রিকদের থেকে এই মোজাইক চিত্র নির্মাণের রীতি রোমানরা গ্রহণ করে। মোজাইক শিল্প সর্বাপেক্ষা বিকাশ লাভ করে বাইজান্টাইন যুগে। 313 খ্রিস্টাব্দে খ্রিস্টধর্ম অনুমোদন পাওয়ার পর চার্চগুলিতে মোজাইকচিত্র হয়ে ওঠে খ্রিস্টধর্ম প্রচারের প্রধানতম উপায়।

মোজাইক হল এমন একটি দেয়াল চিত্র মাধ্যম যেখানে দেয়ালের ওপর রঙিন পাথর, কাচের টুকরো ও রঙীন সেরামিকের টুকরো বসিয়ে চিত্ররচনা করা হয়। মোজাইক চিত্রনির্মাণের জন্য রঙীন টুকরো এককগুলির নাম tessera। মোজাইক চিত্রের সর্বাপেক্ষা বড়ো গুণ হল এটি উজ্জ্বল, বর্হিআবহাওয়া স্থায়ী ও সহজনির্মাণ পদ্ধতি। এই কারণে বড়োমাপের গ্রহদেওয়ালে ম্যুরালের জন্য মোজাইক অত্যন্ত উপযোগী মাধ্যম। বিনোদবিহারী দ্বারা নির্মিত শান্তিনিকেতনের আশ্রম জীবন নিয়ে রচিত ম্যুরালটি এই পদ্ধতিতে নির্মিত।

শিয়ালদহে যুবকেন্দ্রের গায়ে যে বিশালাকার ম্যুরালটি ছিল ও মেট্রো স্টেশনের অভ্যন্তরে বহু ম্যুরাল এই মোজাইক রীতিতে রচিত হয়েছে।

প্রশ্ন : কাগজের মন্ড বা Paper Pulb বলতে কী বোঝায়?

উত্তর : কাগজের মণ্ড বানাবার বহু পদ্ধতি আছে। যিনি যেটি ভালো মনে করেন গ্রহণ করতে পারেন। সংবাদপত্রের কাগজ, আর্ট পেপার ইত্যাদি কাগজ ছোট ছোট টুকরো করে দু-এক দিন জলের মধ্যে ভিজিয়ে রাখতে হবে। তারপর কাগজ হাতে দিয়ে দুমড়ে, বালতির জল ফেলে হাত দিয়ে চটকালে সহজে গলে যায়। তারপর হামানদিস্তা বা শিলনোড়ায় ভালো করে বেটে মেশাতে হবে যাতে কাগজের আঁশগুলি একেবারে মিশে যায়। এরপর এলামাটি, গিরিমাটি, মডেলিং ক্লে, আঠা প্রয়োজন মতো মেশাতে হবে। এবার মণ্ডটা ভালো করে মাখতে হবে। এই মণ্ডটি দিয়ে যে কোন আকৃতির যে কোন মডেল তৈরি করা যেতে পারে। পরিষ্কার মেঝের উপর কাজ করা দরকার। বেশিদিন রেখে দিলে মণ্ডটি নষ্ট হয়ে যায়। হাত দিয়ে বা মাটির কাজের যন্ত্রপাতি দিয়ে সুন্দর মুখোশ করে নিতে হবে। তারপর ফ্লেবরিক রঙ দিয়ে রঙ করলে ভালো হয়। সর্বপ্রথম সাদা রঙ করে নিতে হবে, এরপর ইচ্ছে মতো মুখোশে রঙ করে নিতে হবে।

Follow Our B.Ed Related Website>>

www.dascoaching.in

Our Online Class>>

www.online.dascoaching.in

Scanned with CamScanner

সম্ভাব্য প্রশ্নাবলি

❑ অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন (Objective type questions) :

Marks - 1

১। ওরিগ্যামি কাকে বলে?
২। ওরিগ্যামির দুটি গুরুত্ব লিখুন।
৩। কোন মাটিতে মাটির কাজ ভালো হয়?
৪। মাটির কাজের প্রয়োজনীয় উপাদানগুলি কী কী?
৫। কয়েলিং ও মডেলিং বলতে কী বোঝায়?
৬। মাটির কাজের গুরুত্ব কী?
৭। ইকেবানা বলতে কী বোঝায়?
৮। পুতুল নাচ বা Puppet কাকে বলে?
৯। পাপেটের কয়েকটি ধরনের নাম লেখ?
১০। Simple Hand পাপেট কাকে বলে?
১১। ভারতের কোথায় কোথায় ছায়া পাপেট দেখা যায়?
১২। মুরাল বা ভিত্তিচিত্র কাকে বলে?
১৩। ফ্রেস্কো সেক্কো কাকে বলে?
১৪। ভিত্তি চিত্রের মাধ্যমে শিশুমনে সৌন্দর্য্য বিকাশ কীভাবে ঘটে?
১৫। বুক কভার বা বইয়ের প্রচ্ছদ কাকে বলে?
১৬। একজন বিখ্যাত প্রচ্ছদ শিল্পীর নাম লেখ?
১৭। কোলাজ কাকে বলে?
১৮। কোলাজের উপকরণগুলি কী কী?
১৯। সিডি কভার বলতে কী বোঝায়?
২০। Photoshope বলতে কী বোঝায়?

❑ সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন (Short type questions) :

Marks - 5

১। মাটি মন্ড তৈরি করার পদ্ধতি কী?
২। ছাঁচের সাহায্যে মডেল প্রস্তুতকর বলতে কী বোঝায়?
৩। Rod পাপেট বলতে কী বোঝায়?
৪। পুতুল নাচের ইতিহাস সম্বন্ধে আলোচনা করুন?

৫। শান্তিনিকেতনের আলপোনা সম্পর্কে বিশদে আলোচনা করুন।
৬। ভারতের বিভিন্ন স্থানে রঙ্গোলি কী কী নামে পরিচিত?
৭। বাংলার নক্সা বলতে কী বোঝায়?
৮। ফ্রেস্কো ব্যুনো অঙ্কনের রঙগুলো কী কী?
৯। মোজাইক চিত্র কাকে বলে?
১০। কম্পিউটার গ্রাফিক্স এর ইতিহাস সম্পর্কে লিখুন?
১১। একটি গ্রাফিক্স এর ইতিহাস সম্পর্কে লিখুন?
১২। একটি প্রচ্ছদ বা বুক কভার নির্মাণের পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করুন?
১৩। একটি সিডি কভার নির্মাণের পদ্ধতি আলোচনা করুন?
১৪। অজন্তা ভিত্তি চিত্র সম্বন্ধে লিখুন?
১৫। অষ্টম শ্রেণির জন্য কোলাজ নির্মাণের পদ্ধতি সংক্ষেপে আলোচনা করুন?
১৬। একটি Hand Puppet তৈরী করার পদ্ধতি সংক্ষেপে লিখুন।
১৭। কাগজের মন্ড বা Paper Pulb বলতে কী বোঝায়?
১৮। একটি সরল কাগজের পাপেট নির্মাণের পদ্ধতি সংক্ষেপে লিখুন?

❑ রচনাভিত্তিক প্রশ্ন (Essay type questions) :

Marks - 10

১। রঙ্গোলির উপকর এবং পদ্ধতি সম্পর্কে বিশদে আলোচনা করুন?
২। পুতুল নাচ বা পাপেট বলতে কী বোঝায়?
৩। ভিত্তি চিত্র কী? এবং বিদ্যালয়ের ভিত্তি চিত্র অঙ্কনের প্রক্রিয়া এবং উপযোগীতা কী?
৪। আলপোনা বলতে কী বোঝায়?
৫। মাটির কাজের যন্ত্রপাতি এবং তার ব্যবহার নিয়ে আলোচনা করুন?
৬। কোলাজের সম্বন্ধে বিশদে আলোচনা করুন?

Follow Our B.Ed Related Website>>
www.dascoaching.in
Our Online Class>>
www.online.dascoaching.in

Scanned with CamScanner

ব্যবহারিক অংশ

PRACTICUM [Engagement with Field]

বিএড পাঠক্রমের অন্তর্নিহিত 'Course-EPC-2 (1.2 EPC 2)'–এর অন্তর্গত 'শিক্ষায় নাটক ও চারুকলা' (Drama and Arts in Education) অংশের শেষ পর্যায়ে এক ক্রেডিট (One credit) বা ২৫ নম্বরের ব্যবহারিক প্রয়োগিক ক্ষেত্র (Practicum/ Engagement with field) রয়েছে। নতুন বিএড পাঠ্যক্রমের অন্তর্নিহিত এই ক্ষেত্রে মোট সাতটি শিরোনামে পর্যায়ভুক্ত ক্ষেত্র আছে। বিএড-এর শিক্ষার্থীদের এই তেরোটি ক্ষেত্রের মধ্যে যে-কোনো একটি সম্পন্ন করতে হবে সঠিক ভাবে নির্দেশ অনুযায়ী। আলোচ্য ক্ষেত্রগুলি সম্পর্কে 'বিএড'-এর শিক্ষার্থীদের সুবিধার জন্যে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল এবং কতকগুলি প্রাসঙ্গিক দৃষ্টান্ত দেওয়া হল, যেগুলি তারা সম্পূর্ণ নিজের দৃষ্টিভঙ্গি ও বিবেচনা অনুসারে সম্পাদন করবেন।

Any one of the following :-

1. Develop a script of any lesson in any subject of your choice to perform a Play/ Drama.
2. Develop a script for the street play focusing on "Girl's education and Women empowerment".
3. Prepare a script of Bhavai based on some Socio-political issues.
4. Prepare a pictorial monograph on "Various folk dance of Gujarat".
5. Prepare a pictorial monograph on "Various Dance forms in India".
6. Prepare a calendar chart on "Various Musical Instruments in India".
7. Develop an Audio CD based on newly composed Poems of Gujarati/Hindi language.
8. Prepare some useful, productive and decorative models out of the west materials.
9. Visit the Faculty of Performing Arts in your city and prepare a detailed report on its multifarious functioning.
10. Organize a competition on some Decorative/Performing Art forms in the school during your School Internship programme and prepare a report on it.
11. Organize a workshop on some selected Creative Art forms in the school during your School Internship programme and prepare a report on it.
12. Develop a creative design based on your choice for CD Cover or Book cover.
13. Develop a design or picture based on collage work.

Scanned with CamScanner

(1) যে-কোনো একটি বিষয়ের পাঠ এককের নাটক করার জন্য নাট্যরূপান্তরকরণ
(Develop a script of any lesson in any subject of your choice to perform a play/Drama)

বিষয় : বাংলা

পাঠএকক : গাধার কান

শ্রেণি : সপ্তম

গাধার কান

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

গিরীন ।। টুনু আর মাত্র পনেরো মিনিট বাকি, এখনও সমরেশ ফিরল না। আজ সর্বনাশ হলো দেখছি।

টুনু ।। সমরেশদা কোথায় গেছে?

প্রণব ।। সমরেশ তুক্ করতে গেছে।

টুনু ।। তুক্ কীসের পানুদা?

প্রণব ।। জানিস না, খেলার আগে গাধার কান না মললে আমরা হেরে যাই।

টুনু ।। যাঃ, তুমি ঠাট্টা করছ!

প্রণব ।। ঠাট্টা? তোর সঙ্গে আমি ঠাট্টা করব?

টুনু ।। তবে কি সত্যি সমরেশদা গাধার কান মলতে গেছে?

প্রণব ।। সত্যি না তো কি মিথ্যে বলছি?

টুনু ।। হিঃ-হিঃ-হিঃ, গাধার কান—!

গিরীন ।। হাসছিস যে! গাধার কান মলা হাসির কথা নাকি? গেল বছর গাধার কান মলে আমরা কাপ জিতেছি; তার আগের বছর গাধা পাওয়া গেল না আমরাও গেলাম—

[দৌড়তে দৌড়তে হন্তদন্ত ভাবে সমরেশের প্রবেশ]

সমবেত ভাবে।। কী হলো, কী হলো? সমরেশ তুই কোথায় গিয়েছিলিস?

সমরেশ ।। পেলুম না। শহরে কোথাও একটি গাথা নেই। সেই একটা থেকে খুঁজে বেড়াচ্ছি—

গিরীন ।। ঘাটে খুঁজেছিলি?

সমরেশ ।। ঘাটে, মাঠে, ধোবার বাড়িতে—কোথায় খুঁজতে বাকি রাখিনি। নো গাধা। আশ্চর্য, আজকের দিনেই গাধাগুলো লোপাট হয়ে গেল!

গিরীন ।। আর কী হবে। নে সমরেশ শীগ্‌গির তৈরি হয়ে নে—আর সময় নেই।

সমরেশ ।। গাধা পাওয়া যাক আর না যাক খেলাতে তো হবে। শুনছি মিশন স্কুল আমাদের হারাবে বলে প্রতিজ্ঞা করেছে। তার পরে গাধার কানটাও মলে আসতে পারলাম না। আহা একটা গাধার বাচ্চাও যদি পেতাম তাহলে আমার তুকটার কাজ হয়ে যেত।

গিরীন ।। না পাওয়া গেলে সে আর কি করা যাবে?

[এমন সময় খিক্ খিক্ করে হাসির শব্দ শোনা গেল, টুনু হাসছে]

সমরেশ ।। হাসছিস কেন রে টুনু? টুনুর সব কথাতেই হাসি—শুনলে এত রাগ হয়!

টুনু ।। না সমরেশদা,'—(বলেই জোরে হেসে ফেললে).—'হিঃ-হিঃ, সমরেশদা, তুমি সারা দুপুর গাধার কান মলবার জন্য ঘুরে বেড়ালে, আর একটাও গাধা পেলে না! হিঃ হিঃ—তুক্ করা হল না!

সমরেশ ।। হাসি! তুক্ করার নামে হাসি! ছুঁচো কোথাকার! আজ আমরা হেরে যাব, আর হাসি হচ্ছে?

টুনু ।। (কাঁদো-কাঁদো হয়ে) কে বললে হেরে যাব?

সমরেশ ।। বলবে আবার কে? আমরা সবাই জানি, যখন গাধা পাওয়া যায়নি—

টুনু ।। কখ্খনো না—দেখে নিয়ো! কান ছেড়ে দাও, লাগছে! (সমরেশ টুনুর কান মলে দেয়)

গিরীন ।। ছেড়ে দে সমর, খেলার আগে আর কিছু বলিসনি। কিন্তু যদি হেরে যাই—

[এই সময় মাঠে রেফারির বাঁশি বেজে উঠল। দুই পক্ষের খেলোয়াড়রা মাঠে গিয়ে দাঁড়ালো]

টুনু ।। (রেফারি দিব্যেন্দুবাবুকে দেখে টুনু গিরীনের কানে-কানে ফিস্-ফিস্ করে বললে), 'ও গিরীনদা, রেফারি যে দিব্যেন্দুবাবু!

গিরীন ।। তাতে কী হয়েছে?

টুনু ।। গিরীনদা তুমি তো জানই দিব্যেন্দুবাবু যে অসম্ভব জিলিপি খেতে ভালোবাসে। যে পক্ষ তাকে জিলিপি খাওয়ায় সেই পক্ষকে তিনি জিতিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন। আমার মনে হয় মিশন স্কুলের ছেলেরা তাকে পেট ভরে জিলিপি খাইয়েছে।

Scanned with CamScanner

গিরীন ॥ দেখ টুনু এসব ভেবে আর লাভ নেই। আমাদের তো খেলতে হবে, তুই রোগাপটকা আছিস হরিণের মতো দৌড়তে পারিস, আমি ব্যাকে আছি, সমরেশ হাপে আছে, চেষ্টা তো একটা করি জেতার।

[হঠাৎ খেলতে খেলতে প্রতিপক্ষ টিমের এক খেলোয়াড় বুটশুদ্ধ টুনুকে এক লাথি মারে]

টুনু ॥ ফাউল দিয়েছে বক্সের মধ্যে, তার মানে পেনাল্টি। কীরে রণজিৎ, দিব্যেন্দুবাবু শেষপর্যন্ত পেনাল্টি দিয়েছে তো।

রণজিৎ ॥ না রে দিব্যেন্দুবাবু পেনাল্টি দেয়নি, আমাকে অফ সাইড দিয়েছে।

টুনু ॥ দেখলে গিরীনদা, দিব্যেন্দুবাবু জিলিপি—

গিরীন ॥ এখন ওসব কথা নয়, নিজের জায়গায় যা। দিব্যেন্দুবাবু যা খুশি কুরুন, আজ তোকে গোল দিতে হবে মনে থাকে যেন।

টুনু ॥ (ছলছল চোখে) কিন্তু আমার বুড়ো-আঙুলটা ভেঙে গেছে যে—

গিরীন ॥ তা যাক। কিন্তু গোল দেওয়া চাই-ই।

টুনু ॥ যা আমরা গোল খেয়ে গেলাম। সমরেশদা যে কি করছিল কে জানে? রণজিৎ তোকে আর একটু নীচে নেমে খেলতে হবে। আমি তো আর খোঁড়া পা নিয়ে খেলতে পারছি না রে।

রণজিৎ ॥ হ্যাঁ আমি তাই করছি। [এমতবস্থায় খেলার হাফটাইম হল।]

গিরীন ॥ টুনু, তোর পায়ে কী হয়েছে দেখি? কই, কী হয়েছে?' (বলে গিরীন আঙুল ধরে টান দিলে)

টুনু ॥ উঃ-উঃ—ছেড়ে দাও গিরীনদা, বড্ড লাগছে—আঙুলের মাথাটা একেবারে মটকে গেছে!

গিরীন ॥ ও কিছু নয়—এই দ্যাখ্ আমার কী হয়েছে।

টুনু ॥ এ মা এ তো কথ্‌বেলের মতো ফুলে উঠেছে দেখছি। খুব ব্যথা করছে না।

গিরীন ॥ দূর! খেলার সময় কি আর ওসব মনে থাকে!' (তারপর টুনুর পাশে বসে তার গলা জড়িয়ে ধরে গিরীন বললে), 'টুনু, আজ তুই-ই ভরসা। একটা গোলে হেরে আছি, সে কিছুই নয়; তুই যদি চেষ্টা করিস তাহলে তিনটে গোল দিতে পারিস।

টুনু ॥ পারব! কিন্তু পায়ের ব্যথায় যে দৌড়াতে পারছি না—

গিরীন ॥ পায়ের ব্যথা ভুলে যা—শুধু মনে রাখ, আজ আমাদের জিততেই হবে।

টুনু ॥ (কাঁপা গলায়) আচ্ছা—প্রাণপন চেষ্টা করব।

[হাফটাইমের পর খেলা শুরু]

দর্শকবৃন্দ ॥ 'গোল! গোল!' আমাদের টুনু গোল করেছে রে। প্রতিবার পড়ে গিয়েও বেচারা টুনু শেষপর্যন্ত বলটা গোলে রাখতে পেরেছে। ওঃ কী দারুণ গোল!

টুনু ॥ গিরীনদা, আঙুল ঠিক হয়ে গেছে।

গিরীন ॥ (গিরীন টুনুকে জড়িয়ে ধরে বললে), 'সে কী রে, কী করে ঠিক হলো?

টুনু ॥ ঐ যে গোল-কিপারের সঙ্গে ধাক্কা লাগল, ব্যস, ঠিক হয়ে গেছে।

[শব্দ উঠল—'গোল! গোল!]

গিরীন ॥ টুনুর পাশ থেকে দারুণ গোলটা করল না শেষপর্যন্ত আমাদের রণজিৎ। সমরেশ তুই হাফটা ঠিক করে সামলা যাতে আমাদের উপরে একটু কম প্রেসার আসে।

সমরেশ ॥ আমি চেষ্টা করছি, ওদেরকে হাফে আটকে রাখার।

[শেষপর্যন্ত টাউন স্কুল মিশন স্কুলকে ৪-১ গোলে হারায়। খেলার পরে জটলা।]

শানু ॥ আচ্ছা, আজ আমরা জিতলুম কী করে? গাধার কান মলা তো হয়নি।

সমবেত ভাবে ॥ (সকলে এ-ওর মুখের দিতে তাকাতে লাগল, কথাটা এতক্ষণ মনেই ছিল না) সত্যিই তো! এ-রকম অসম্ভব ব্যাপার ঘটল কী করে?

সমরেশ ॥ (হঠাৎ জোরে হেসে উঠল) বুঝেছি!

সমবেত ভাবে ॥ কী! কী! কী বুঝেছ?

সমরেশ ॥ মনে নেই! খেলার আগে টুনুর কান মলে দিয়েছিলুম। তাতেই গাধার কান মলার ফল হয়েছে।

শানু ॥ বেশ হয়েছে। এবার থেকে টুনুর কান মলে খেলতে নামলেই চলবে। আর গাধা খুঁজে বেড়াতে হবে না।

গিরীন ॥ (হাসতে হাসতে দাঁড়িয়ে উঠে বললে), সে আসছে বছর দেখা যাবে। আজ টুনুই আমাদের হিরো! (এই বলে টুনুকে দুহাতে ধরে কাঁধে তুলে নিয়ে বললে), বল থ্রি চিয়ার্স ফর টুনু! হিপ্ হিপ্ হিপ্ হুররে!

Scanned with CamScanner

(3) বাংলার বিভিন্ন লোকনৃত্যের চিত্রসহ উপস্থাপনা (Prepare a Pictorial Monograph on Various Folk Dance of Bengal)

গরবা নৃত্য

গুজরাট প্রদেশের লোকনৃত্যকে মোটামুটিভাবে তিনটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়—গরবা, গরবী ও রাস। এ ছাড়াও দধিলীলা নামে যাত্রা ধরনের অনুষ্ঠান প্রচলিত আছে যাতে নাটক ও নাচের সমন্বয় দেখা যায়।

গরবা নৃত্য শুধুমাত্র মেয়েদের জন্য নির্দিষ্ট। অম্বামাতার উৎসব উপলক্ষে নবরাত্রির সময় প্রকৃতপক্ষে সারা প্রদেশেই গরবা নাচ ও গানের সমারোহ দেখা যায়। গরবা নাচে শিল্পীসংখ্যার কোনো বিধিনিষেধ নেই। হাতে তাল, তুনি দিয়ে বা মাথায় কলসী নিয়ে বিভিন্ন ভঙ্গিতে এই নাচ অনুষ্ঠিত হয়।

গরবী নৃত্য শুধুমাত্র পুরুষদের জন্যে নির্দিষ্ট। গরবী নৃত্যও অম্বামাতার উৎসব উপলক্ষে নবরাত্রিতে অনুষ্ঠিত হয়। ধুতি ও শার্ট পরা সাধারণ পোশাকই সঙ্গীত সহযোগে সহজ স্বচ্ছন্দ ভঙ্গিতে নাচ হয়।

রাসনৃত্য সাধারণভাবে পুরুষদের জন্যে নির্দিষ্ট হলেও কোনো কোনো সময় এতে স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েই একত্রে যোগদান করে। পুরাণে উল্লিখিত "হল্লীসক" নৃত্যের সঙ্গে রাসনৃত্যের সাদৃশ্য দেখা যায়। এই রাসনৃত্য তিন প্রকারের-লাঠি সহযোগে দণ্ডরাস, তালি সহযোগে তালরাস ও ভাব সহযোগে ললিতরাস।

ভাঙ্গড়া নৃত্য

ভাঙ্গড়া হল পাঞ্জাবের মাঝহা (majha) অঞ্চলের উৎসকৃত একটি নৃত্য। ভাঙ্গড়া শব্দটি পাঞ্জাবী নৃত্য 'ভাগা' (bagaa) থেকে উৎপন্ন। এই নৃত্যটি মাঝহা থেকে উৎসকৃত হয়ে

শিয়ালকোট, গুজরানওয়ালা, শেখপুর, গুজরাট (বর্তমানে পাঞ্জাব প্রদেশের পাকিস্তানে অবস্থিত) প্রভৃতি স্থানে অনুষ্ঠিত হয়। এই নৃত্য পাঞ্জাবিদের বৈশাখী উৎসবে বিশেষভাবে অনুষ্ঠিত হয়। শস্য উৎপন্নের সময়, বিশেষত গম উৎপাদনের সময় এই বৈশাখী উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। এই নৃত্য সাধারণত পুরুষ ও নারী উভয়ই অংশগ্রহণ করে। পুরুষেরা কুর্তা পাগড়ি ও সিল্কের কাপড় পরে ও নারীরা ঘাঘরা, দোপাট্টা, সালোয়ারকামিজ পরে নৃত্য করে। অনেকে মিলে ঢোল, বাঁশি ইত্যাদি বাজাতে থাকে। এই নৃত্যে সাধারণত উচ্চস্বরে সঙ্গীত পরিবেশিত হয় ও পুরুষের উদ্দামভাবে নৃত্যে আপ্লুত হয়।

বিহু নৃত্য

আসাম ও মণিপুরেও লোকনৃত্যের অসংখ্য বৈচিত্র্য দেখা যায়। আসামের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় ও প্রচলিত লোকনৃত্য **বিহু**। বিহু উৎসবে সমাজের সব স্তরের লোকেরাই অংশগ্রহণ করে। একত্রিশে চৈত্র অর্থাৎ বৎসরের শেষ দিনে বিহু উৎসব সূচিত হয় এবং প্রায় একমাস ধরে

Scanned with CamScanner

এই উৎসব চলে। বিহু নৃত্যের দুটি অংশ—বিহু ও হুচারী। বিহু নৃত্য শ্যামল প্রান্তরে বৃক্ষছায়ায় অনুষ্ঠিত হয়। বিহু ঢোল, গাগনা, বাঁশী, সিঙা প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র ও গানের সহাযোগে এই অনুষ্ঠান হয়। ছেলেমেয়েরা তাকা (চেরা বাঁশের দ্বারা প্রস্তুত) দ্বারা সমবেতভাবে তালরক্ষা করে। বিভিন্ন ভঙ্গিতে চক্রকারে মণ্ডলরচনা করে এই নৃত্যের স্বতস্ফূর্ত সাবলীল ছন্দ মাধুর্য রচনা করে।

হুচারী অংশ গ্রামের সম্ভ্রান্ত অধিবাসীদের বাড়ির সামনে অনুষ্ঠিত হয়। এই অংশে কেবলমাত্র যুবক সম্প্রদায় অংশ গ্রহণ করে। প্রথম অংশে ভক্তিমূলক গানের। (হুচারী কীর্তন) মাধ্যমে শুভু নববর্ষের জন্যে দেবতার আশীর্বাদ প্রার্থনা করা হয়। তারপরে **বিহুগীতি** অনুষ্ঠিত হয়।

আসামের রণনৃত্যের মধ্যে ঢুলিয়া ও ভাওয়ারিয়া বিশেষ প্রসিদ্ধ। জয়ঢাক, শিঙা ও বাঁশী সহযোগে অসিনৃত্যের মতো যুদ্ধের মহড়ার ভঙ্গিতে নৃত্য প্রদর্শিত হয়।

দেওধনি বা নাগকন্যার নৃত্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই নৃত্যের শিল্পীকে আজীবন কুমারী থাকতে হয়। খোলাচুলে, একটি ঘুঘুপাখির রক্ত পান করে জয়ঢাক ও বাঁশীর সহযোগে এই নৃত্য প্রচণ্ড উদ্দামতা সৃষ্টি করে। শিল্পী মূর্ছিত হয়ে পড়ে না যাওয়া পর্যন্ত এই নৃত্যের বিরতি হয় না।

ডান্ডিয়া নৃত্য

ডান্ডিয়া নৃত্য ভারতবর্ষের গুজরাতের একটি জনপ্রিয় লোকনৃত্য। এই নৃত্য বৃন্দাবনের রাধাকৃষ্ণের হোলি উৎসবের সঙ্গে সম্পৃক্ত। এই নৃত্যটি গর্বার সঙ্গে নবরাত্রির দিনে পশ্চিম ভারতীয় উপকূল অঞ্চলের রাজ্যগুলিতে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। সাধারণত জোড়া সুদৃশ্য লাঠি নিয়ে তালে তাল মিলিয়ে মহিলা ও পুরুষেরা নৃত্য করে। বর্তমান বিশ্বের গুজরাতি ভাষাভাষি লোকেদের মধ্যে বিশেষত কানাডা, আমেরিকা ও ইংল্যান্ডে বিশেষভাবে এই নৃত্য জনপ্রিয়।

ভাভাই নৃত্য

ভাভাই হল রাজস্থানের একটি লোকনৃত্য। এই নৃত্যর সময় স্ত্রী-পুরুষ নৃত্যশিল্পীরা মাটির পাত্রের ওপর অথবা পিতলের পাত্রের ওপর এক পায়ের আঙুলে ভর দিয়ে ঘুরপাক খেতে থাকে। অনেকসময় মাথায় মাটির পাত্র ইত্যাদি নিয়েও এই নৃত্য করা হয়ে থাকে। একটি পিতলের থালার ওপর কাঁচ নির্মিত দ্রব্য হাতে নিয়ে নৃত্যটি নিয়ন্ত্রিত হয়। প্রধানত পুরুষেরা হারমোনিয়াম বাজিয়ে গান করে, অপরদিকে নারীরা ওই তালে সঙ্গ দিয়ে নাচ করতে থাকে। হারমোনিয়াম ছাড়াও ঢোল, পাখোয়াজ, সারেঙ্গি ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র ব্যবহৃত হয়।

Follow Our B.Ed Related Website>>

www.dascoaching.in

Our Online Class>>

www.online.dascoaching.in

Scanned with CamScanner

(4) ভারতের বিভিন্ন ধরনের বাদ্যযন্ত্রের একটি ক্যালেন্ডার চার্ট তৈরি (Prepare a Calendar Chart on Various Musical Instrument in India)

তানপুরা

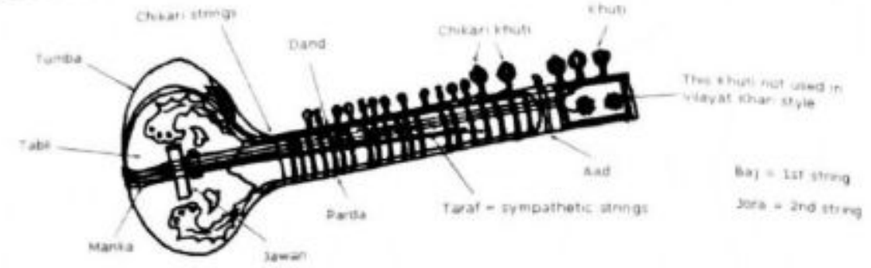

অনেকে মনে করেন তব্বুর নামক মুনি তানপুরা যন্ত্রটির আবিষ্কর্তা, সেইজন্য তানপুরার আর এক নাম তম্বুরা।

তানপুরার নীচের যে গোলাকার অংশ তাহাকে 'তুম্বা' বলা হয়। এটি সাধারণত লাউ বা কদাচিৎ কাঠেরও হয়ে থাকে। এর ভিতরের অংশ ফাঁপা। তার ফলে, এই যন্ত্র বাজানো হলে তারের ধ্বনি বেশিক্ষণ স্থিতি লাভ করে এবং গুঞ্জরিত হয়।

পাখোয়াজ

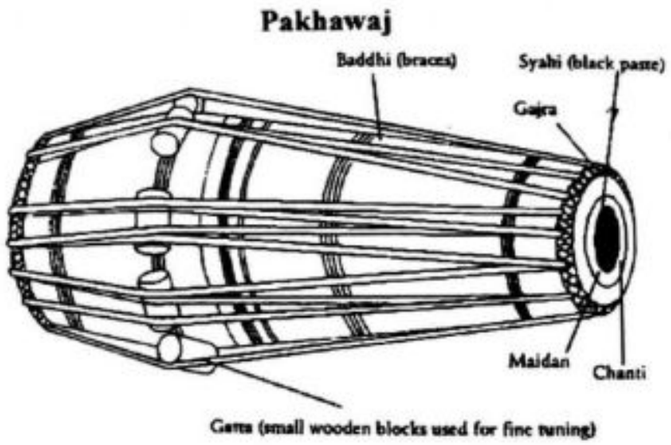

বর্তমানে প্রচলিত সর্বপ্রকার অবনন্ধ বা আবদ্ধ যন্ত্রের মধ্যে পাখোয়াজ প্রাচীনতম। বৈদিক যুগের পুস্কর যন্ত্রের সঙ্গে পাখোয়াজের অনেক সাদৃশ্য আছে। আবার কিছু কিছু বৈসাদৃশ্যও পরিলক্ষিত হয়।

এই যন্ত্রটির আকার অনেকটা ঢোলকের মতন। এই অবয়ব নিম, খয়ের, চন্দন ইত্যাদি কাঠের হয়ে থাকে এবং ভিতর ফাঁপা। দুই পাশের-গোলাকার অংশের মধ্যে বাম পাশের পরিধি ডান পাশ অপেক্ষা বেশী। উভয় পাশই চামড়ার দ্বারা আচ্ছাদিত ও পরস্পর দোয়াল বা ছোট্ দ্বারা আবদ্ধ এবং সুরে বাঁধার জন্য তবলার মতন এতেও আটটি গুলি থাকে। বামপাশে গোলাকার অংশের মধ্যস্থলে শিল্প যন্ত্রটি বাজাবার পূর্বে ময়দা বা আটার মন্ড করে

তবলার আকারে প্রলেপ দেন। ডানপাশ, বামপাশ অপেক্ষা আকারে ছোটো এবং অনেকটা তবলার অনুরূপ। এতেও তবলার মতন ছাউনী, গাব বা খির, ময়দান, ছোট্, চাঁটি, গজরা, গুলি ইত্যাদি থাকে।

খোল

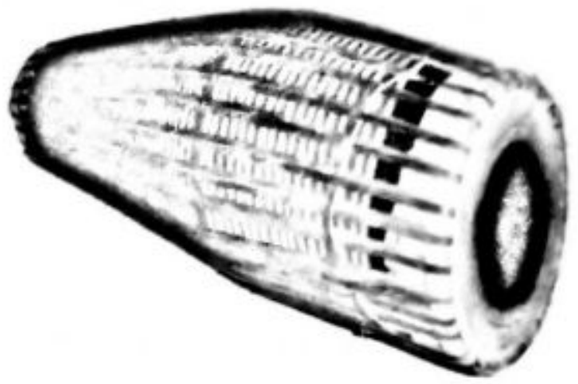

খোল বাদ্যযন্ত্রটি অবনন্ধ বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে একটি প্রকার এবং বয়সের দিক থেকেও এটি খুব প্রাচীন। খোলের আকার অনেকটা ঢোলের ন্যায় হলেও খোল অপেক্ষাকৃত লম্বা, মধ্যভাগ স্ফীত বা মোটা এবং দুই পাশই চামড়ার দ্বারা আচ্ছাদিত। এর বাম দিককে বাঁয়া এবং ডান দিককে তবলার সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। শুধু তাই নয়, খোলের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সঙ্গে-ও তবলা বাঁয়ার অনেক মিলই পরিলক্ষিত হয়। যেমন—ছাউনী, খিরণ বা গাব, পুরী, ময়দান, গজরা বা ঢাক, দোয়াল বা ছোট্ ইত্যাদি তবলা বাঁয়ার অনুরূপ। কিন্তু খোলেতে গুলি নাই, কেননা খোলে সুর বাঁধিবার কোন প্রয়োজন হয় না। কীর্ত্তন, নামকীর্ত্তন, ভক্তিগীতি এবং রবীন্দ্রসঙ্গীতে খোল বাজানো হয়ে থাকে।

এস্‌রাজ

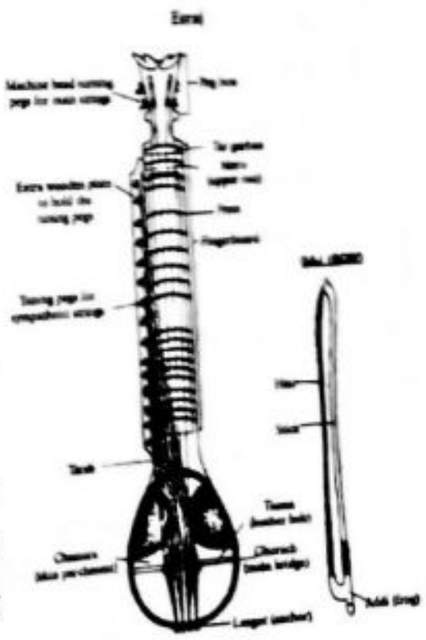

এস্‌রাজ বাদ্যযন্ত্রটি বিতত্ শ্রেণিভুক্ত। এর উপরের অংশ অর্থাৎ দন্ড সেতার এবং নীচের অংশ অর্থাৎ তুম্বা অনেকটা সারেঙ্গীর অনুরূপ।

দন্ডের উপরিভাগে চারটি মুখ্য তার বাঁধবার জন্য যে খুঁটি থাকে তাকে কান বা খুঁটি বলা হয় এবং দন্ডের ডানপাশে তরফের কানগুলি স্থাপিত থাকে।

দন্ডেব উপরে মুখ্য চারটি কানের নীচে যে পাতলা হাড়ের টুকরোটি খাড়াভাবে বসান থাকে তাকে অটি বা আড়া বলা হয়। এর উপরেই তারগুলি স্থাপন করা হয়।

Scanned with CamScanner

তুম্বার উপরের অংশ অর্থাৎ হাড় বা হাতির দাঁতের দ্বারা প্রস্তুত ব্রীজ বা সোয়ারী খাড়াভাবে তব্‌লীর মধ্যস্থলে অবস্থিত থাকে। অনেক শিল্পী তব্‌লীতে গ্রামোফোনের sound box সংযুক্ত করে বাজিয়ে থাকেন। তখন এই যন্ত্রটিকে "তার সানাই" বলা হয়। এর আওয়াজও স্বাতন্ত্রপূর্ণ।

ব্রীজের উপরের মুখ্য চারিটি তার এবং নীচের দিকের তারগুলি খুঁটি বা কানের সঙ্গে বাঁধা থাকে। তুম্বার পশ্চাত্যের অংশ কাঠের দ্বারা প্রস্তুত এবং ফাঁপা। তুম্বার নীচের অংশে ধাতুর তৈরি একটি অংশ থাকে যাতে তারগুলি বাঁধা হয় তাকে পন্থী, লঙ্গোট বা মোগরা বলা হয়।

একতারা

একতারা যন্ত্রটি একতার বিশিষ্ট বলে এর নাম একতারা। এই যন্ত্রটির জন্মবৃত্তান্ত আজও সঠিকভাবে নিরুপিত হয়নি। তবে, এটি যে বয়সে অতি প্রাচীন এতে কোনো সন্দেহ নেই। আমরা জানি যে বাউল সম্প্রদায়ের জন্ম-ইতিহাস অতি প্রাচীন এবং আজও অজ্ঞাত। বাউল-সঙ্গীতে এই যন্ত্রটি অপরিহার্য। সুতরাং যন্ত্রটি যে অতি প্রাচীন তা এককথায় বলা যায়।

এই যন্ত্রটির নীচেকার অংশ বা তুম্বা ছোটো লাউয়ের খোল দিয়ে তৈরি হয়। উক্ত গোলাকার তুম্বার দুই পাশে দুটি বাঁশে কঞ্চি সংযুক্ত থাকে এবং এই কঞ্চি দুটি উপরে গিয়ে অবশেষে একসঙ্গে মিলিত হয় এবং ঐ জায়গায় একটি কান থাকে। তুম্বার মধ্যস্থলে ছিদ্র থাকে এবং এই ছিদ্রের মধ্যে দিয়ে তার গলিয়ে উপরে কানের সঙ্গে বাঁধা থাকে। শিল্পী নিজের প্রয়োজনমত উক্ত তারাকে সুরে বেঁধে আঙ্গুলের দ্বারা গানের ছন্দের সঙ্গে সমতা রেখে বাজিয়ে থাকেন। বাউল অঙ্গের রবীন্দ্রসঙ্গীত এবং লোকসঙ্গীতের সঙ্গে এই যন্ত্রটির সংগত বিশেষ শ্রুতিমধুর।

সেতার বা সিতার

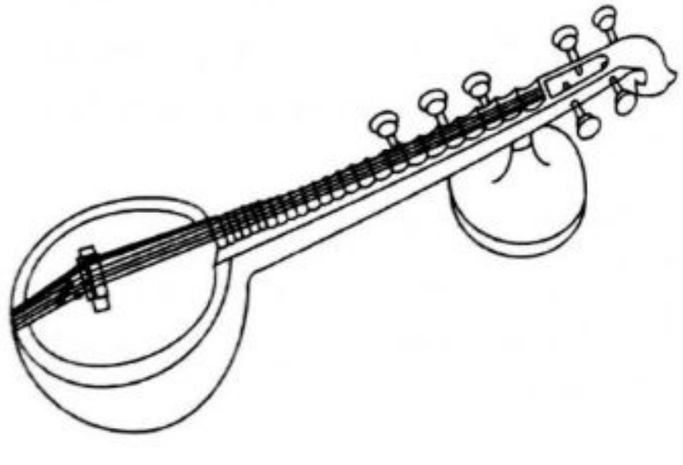

সেতার যন্ত্রটির সৃষ্টিকাল ও স্রষ্টা সম্বন্ধে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। তবে অনেকে মনে করেন যে, আলাউদ্দিন খিলজীর রাজত্বকাল চতুর্দশ শতাব্দীতে (১২৯৬-১৩১৬) আমীর খসরু কচ্ছপী বাদ্যযন্ত্রী বীণার

অনুকরণে তিন তারযুক্ত সেতার যন্ত্রটি সৃষ্টি করে ও এর নাম দিয়েছিলেন 'সহতার'। ফারসি ভাষায় 'সহ' শব্দের অর্থ হল তিন অর্থাৎ প্রথম অবস্থায় সেতারে মোট তিনটি তার ছিল। বর্তমানে সেতারে মোট ৭টি তার থাকে। এই যন্ত্রটি তত শ্রেণিভুক্ত।

মন্দিরা

মন্দিরা বাদ্যযন্ত্রটি 'ঘন' শ্রেণিভুক্ত। এটি ধাতুর (কাঁসা) হয়ে থাকে। উক্ত যন্ত্রটি বয়সে অতি প্রাচীন। বাউল, কীর্তন, রবীন্দ্রসঙ্গীত এবং অন্যান্য পল্লী-সঙ্গীতের সঙ্গে বাজানো হয়ে থাকে। এর আওয়াজ অতি সুমিষ্ট এবং আকার ছোটো বাটির মতো।

গীটার

গীটার বাদ্যযন্ত্রটি বর্তমানে সঙ্গীত-জগতে একটি বিশেষ স্থান দখল করে আছে। যদিও আমরা জানি গীটার যন্ত্রটি বিদেশ থেকে আগত কিন্তু যন্ত্রটির অবয়ব পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, দক্ষিণ ভারতে অতি সুপ্রাচীন কালে এই ধরনের একটি বাদ্যযন্ত্র প্রচলিত ছিল, যদিও আজ তা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত। মনে হয় এই যন্ত্রটি একটু অদল বদলের মাধ্যমে নতুন নাম পরিগ্রহ করে আমাদের দেশে নবরূপে গীটার নামে আত্মপ্রকাশ করেছে। সে যাই হোক এই কথা কোনোভাবে আজ অস্বীকার করা যায় না যে, বর্তমানে আমাদের দেশে এর বহুল প্রচার এবং ব্যাপ্তি ঘটেছে। তারমধ্যে আমরা দুই ধরনের গীটার দেখতে পাই (ক) স্প্যানিশ (Spanish), (খ) হাওয়াইয়ান গীটার।

বেহালা

বেহালা বাদ্যযন্ত্রটির জন্মবৃত্তান্ত সম্বন্ধে বহু মত প্রচলিত আছে। অনেকে মনে করেন যে, এটি মূলত ভারতীয় যন্ত্র বিশেষ। লঙ্কারাজ রাবণের একতন্ত্রী পিনাকী বীণা থেকে ক্রমবিবর্তনে বেহালার জন্ম।

যার দ্বারা তারের মাধ্যমে গুঞ্জরিত-আওয়াজ আমরা শুনতে সমর্থ হই, উক্ত বেহালার অংশবিশেষকে রেজন্যান্ট বক্স

Scanned with CamScanner

(Resonant box) বলা হয়। রেজন্যান্ট বক্স-এর উপরের কাঠের আচ্ছাদনটিকে টেবিল বা বেলী বলা হয়। এর উপরে ব্রীজ থাকে, এতে বেহালার তার স্থাপন করা হয়।

বেহালার তারগুলি ছড় (Bow) দ্বারা বাজানো হয়ে থাকে, একে ছড়ি বলে। উক্ত ছড়ির উপরি অংশ কাঠের ও আংশিক বক্র এবং যে অংশটি তন্ত্রে ঘর্ষণ করা হয় সেটি অশ্বপুচ্ছ দ্বারা তৈরি করা হয়ে থাকে। বাজাবার পূর্বে শিল্পী পুচ্ছগুলিতে 'রজন' ঘর্ষণ করে নেন।

ঢোলক

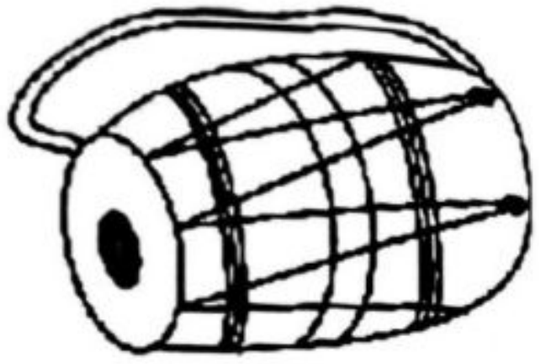

'ঢোলক' যন্ত্রটি বিশেষ করে নানা গ্রাম্য অনুষ্ঠানাদিতে সবিশেষ জনপ্রিয়। অনেকে 'ঢোলক' যন্ত্রটিকে 'ঢোল' বলে থাকেন। এটি আভিধানিক অর্থে সঠিক নয়। কারণ 'ঢোল' যন্ত্রটি 'ঢোলক' অপেক্ষা স্ফীত ও বড়ো এবং একে স্কন্ধে ঝুলিয়ে বাম হস্তে ঈষৎ বক্রভাবে চেপে ডান হাতে বাজান হয়ে থাকে। উভয় যন্ত্রের অবয়ব কাঠ নির্মিত হলেও 'ঢোলকের' আকার আনুমানিক ১৮″ ইঞ্চি—২০″ইঞ্চি দীর্ঘ এবং ১২″ ইঞ্চি ব্যাসার্ধ যুক্ত হয়ে থাকে, উভয় দিক সমান ব্যাসের গোলাকার চামড়া দিয়ে ঢাকা। এই গোলাকার অংশ দুটি পরস্পর তীর্যকভাবে সুতোর ডুরী দ্বারা তবলার ছটের ন্যায় আবদ্ধ। উক্ত ডুরীগুলোতে গোলাকার পিতলের আংটা পরান থাকে। এই গোলাকার আংটাগুলি স্থানচ্যুত করে যন্ত্রটিকে সুরে আবদ্ধ করা হয়। ডান হস্তে ডান পার্শ্বস্থ দিক এবং বামহস্তে একটি শক্ত কাঠির দ্বারা উক্ত যন্ত্রটিকে বাজান হয়ে থাকে। বলা বাহুল্য তবলা, পাখোয়াজ যন্ত্রের ন্যায় ইত্যাদি ছন্দবহুল বোল এই যন্ত্রে বাজান হয়ে থাকে এবং অতিশয় সুখশ্রাব্য। এই যন্ত্রটি পূর্বে আখড়াই, পাঁচালী ইত্যাদি গানে প্রয়োগ হলেও বর্তমানে কবি, তরজা, যাত্রা ইত্যাদি গানে বহুল প্রচলিত।

This E-Book Download From>>

www.ebook.dascoaching.in

(5) একটি নতুন কবিতার অডিও সিডি তৈরি (Develop and Audio CD based on newly composed Poems)

আড্ডা

সুরজিৎ চট্টোপাধ্যায়

টালিগঞ্জ স্টেশনের কাছে বন্ধুরা জড়ো হয়ে আজ
আজ সারা রাত ধরে হবে আড্ডা
রাত জাগা সেই আড্ডা শরীরের আনাচে কানাচে
যে যেখানে যা কিছু আছে আজ
সারা রাত ধরে হবে আড্ডা রাত জাগা সেই আড্ডা।
চেনা চেনা বাড়িগুলো ভেজা ভেজা চোখ মেলে
সদর দরজা খুলে
সাড়া দাও এই ছেলে ডাক পিছু ডাক
চুন খসা কলঘরে বালতি উপচে পড়ে
এখানে বৃষ্টি ঝড়ে আকাশে গায়ে পড়ে
তোমার রাজ পোষাক
কার ইশারাতে এই ঝড় জল রাতে
তুমি হাঁটো ফুটপাতে
ঝোড়ো হাওয়া সেই আড্ডা॥
আলো কেউ জ্বালেনি সেখানে
কে যে কার প্রেমিকা কে জানে আজ
সারা রাত ধরে হবে আড্ডা ছুঁয়ে ছুঁয়ে থাকা সেই আড্ডা।
নদীর গল্প কথা পাহাড়ী রাস্তা জুড়ে গিয়েছে
বছর ঘুরে পুরোনো ক্যালেন্ডার মাস মধুমাস
অফিস কাছারী বাড়ি সাইন বোর্ড লেখা শহরে
ভর দুপুরে আসলে ভীষণ একা বাস ট্রাম নাই
পথ আঁকাবাকা যত দূরে যায় দেখা
শুধু মরীচিকা ফেলে আসা সেই আড্ডা
ভেঙে যাওয়া সেই আড্ডা ভাঙে ঘর যার নিশি ডাকে
শরীরে খুঁজবো বলে তাকে আজ
সারা রাত ধরে হবে আড্ডা খুঁজে খুঁজে ফিরি আড্ডা।

Scanned with CamScanner

মাদা	দা	দা	মা	মা	পা	পা	জ্ঞা	মা	মা	-া	-া	মা	-া	মা	মা
টা	লি	গ	ঞ্জ	স্টে	শ	নে	র	কা	ছে	০	০	ব	ন	ধূ	রা

মা	পা	মা	জ্ঞা	ধ্া	সা	সা	ণ্া	-া	-া	-া	-া	ধা	ধা	ধা	-া
জ	ড়ো	হ	য়ে	আ	ছে	আ	০	০	০	০	জ	সা	রা	রা	ত

ধা	জ্ঞা	ধ্া	সা	সা	-া	সা	-া	-া	-া	-া	-া	-া	সা	-া	সা
ধ	রে	হ	বে	আ	ড	ডা	০	০	০	০	০	০	হুঁ	০	হুঁ

সা	ধ্া	-া	সা	ণ্া	-া	পা	-া	-া	-া	-া	-া	-া	-া	-া	-া
হুঁ	হুঁ	০	হুঁ	হুঁ	০	হুঁ	০	০	০	০	০	০	০	০	০

-া	-া	-া	-া	-া	জ্ঞা	-া	মা	মপা	-া	মা	জ্ঞা	মা	-া	জ্ঞমা	-া
০	০	০	০	০	রা	ত	জা	গা	০	সে	ই	আ	ড	ডা	০

-া	-া	-া	-া	-া	-া	-া	-া	-া	-া	-া	-া	পা	পা	পা	পা
০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	শ	রী	রে	র

মা	পা	মা	মা	মা	মা	-া	-া	-া	-া	-া	-া	মা	মা	মা	মা
আ	না	চে	কা	না	চে	০	০	০	০	০	০	যে	যে	খা	নে

মা	পা	মা	জ্ঞা	ধ্া	সা	সা	ণ্া	-া	-া	-া	-া	জ্ঞা	জ্ঞা	জ্ঞা	জ্ঞা
যা	কি	ছু	ই	আ	ছে	আ	০	০	০	০	জ	চে	না	চে	না

জ্ঞা	জ্ঞা	জ্ঞা	জ্ঞা	জ্ঞা	জ্ঞা	জ্ঞা	জ্ঞা	জ্ঞা	-া	জ্ঞা	মা	রা	রা	-া	রা
বা	ড়ী	গু	লো	ভে	জা	ভে	জা	চো	খ	মে	লে	স	দ	র	দ

-া	রা	রা	রা	রা	রা	রা	সা	রা	-া	ণ্া	ণ্া	সা	-া	-া	রা
র	জা	খু	লে	সা	ড়া	দা	ও	এ	ই	ছে	লে	ডা	০	ক	পি

-া	ণ্া	সা	-া	-া	-া	-া	-া	-া	-া	-া	-া	জ্ঞা	-া	জ্ঞা	জ্ঞা
০	ছু	ডা	ক	০	০	০	০	০	০	০	০	ঠ	ন	ব	সা

জ্ঞা	-া	জ্ঞা	জ্ঞা	জ্ঞা	-া	জ্ঞা	জ্ঞা	-া	জ্ঞা	জ্ঞা	রা	রা	রা	রা	রা
ক	ল	ঘ	রে	বা	ল	তি	উ	প	ড়ে	প	ড়ে	এ	বা	নে	বু

-া	রা	রা	রা	রা	রা	রা	-া	সা	ণ্া	ণ্া	সা	সা	-া	সা	-া
ষ	টি	ঝ	ড়ে	আ	কা	শে	০	গা	য়ে	প	ড়ে	ভো	০	মা	০

-া	সা	-া	ণ্া	সা	-া	-া	-া	-া	-া	-া	-া	মা	-া	মা	মা
র	রা	জ	পো	ষা	০	০	০	০	০	০	ক	রা	র	ই	ণা

মা	মা	জ্ঞা	-া	-া	-া	-া	-া	-া	-া	মা	-া	পা	-া	পা	-া
রা	তে	০	০	০	০	০	০	০	০	এ	ই	ঝ	ড়	ভ	ল

পা	মপা	মা	-া	-া	-া	-া	-া	-া	না	না	না	না	পা	মা	পা
রা	তে	০	০	০	০	০	০	০	০	তু	মি	হা	সৌ	ফু	ট

পা	মা	-া	-া	-া	-া	-া	-া	-া	-া	-া	-া	-া	সা	-া	সা
পা	তে	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	হুঁ	০	হুঁ

সা	ঋা	-া	সা	ণা	-া	জ্ঞা	-া	-া	-া	-া	-া	-া	-া	-া	-া
হুঁ	হুঁ	০	হুঁ	হুঁ	০	হুঁ	০	০	০	০	০	০	০	০	০

-া	-া	-া	-া	-া	জ্ঞা	জ্ঞা	মা	পা	-া	মা	জ্ঞা	মা	-া	মা	জ্ঞা
০	০	০	০	০	ঝ	ড়ো হাও		য়া	০	সে	ই	আ	ড	ডা	০

Scanned with CamScanner

-।	-।	-।	-।	-।	-।	-।	-।	-।	-।	-।	-।	দা	দা	দা	মা
০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	আ	লো	কে	উ
মা	পা	মা	মা	মা	মা	-।	-।	-।	-।	-।	-।	মা	মা	মা	-।
জ্ঞা	লে	নি	সে	খা	নে	০	০	০	০	০	০	কে	যে	কা	র
মা	পা	মা	জ্ঞা	ঋা	সা	সা	ণ্া	-।	-।	-।	-।	ঋা	ঋা	ঋা	-।
প্রে	মি	কা	কে	জা	নে	সে	০	০	০	০	০	সা	রা	রা	ত
ঋা	জ্ঞা	ঋা	সা	সা	-।	সা	-।	-।	-।	-।	-।	-।	সা	-।	সা
ধ	রে	হ	বে	আ	ড	ডা	০	০	০	০	০	০	হুঁ	০	হুঁ
সা	ঋা	-।	সা	ণ্া	-।	জ্ঞা	-।	-।	-।	-।	-।	-।	-।	-।	-।
হুঁ	হুঁ	০	হুঁ	হুঁ	০	হুঁ	০	০	০	০	০	০	০	০	০
-।	-।	-।	-।	-।	জ্ঞা	জ্ঞা	মা	পা	-।	মা	জ্ঞা	মা	-।	মা	-।
০	০	০	০	০	ছুঁ	য়ে	ছুঁ	য়ে	০	থা	কা	আ	ড	ডা	০
-।	-।	-।	-।	-।	-।	-।	-।	-।	-।	-।	-।				
০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০				

(8) ফেলে দেওয়া অপ্রয়োজনীয় বস্তু থেকে প্রয়োজনীয়ত, উৎপাদনাত্মক ও পরিশোভিত মডেল তৈরি (Prepare some useful, productive and decorative models out of the west materials) :

মনব সভ্যতার বিভিন্ন যুগে, আমরা দেখেছি শিখনবস্তু সমাজজীবনে একটি আবশ্যকীয় অঙ্গ। শিল্পের কদর মানবসমাজের সভ্য অথবা অসভ্য সকলেই করেছে অর্থাৎ কী সভ্য, কী অর্ধসভ্য, কী অসভ্য সকল শ্রেণির মধ্যে শিল্পের সবিশেষ প্রয়োজন রয়েছে। শিল্প যে একটি সমগ্র জাতির পরিচয় বহন করে একথা আমরা মেনে নিতে পারি। শিল্পের বস্তুবিধি এবং প্রয়োজনবাদ এই বক্তব্যের সঙ্গে শিল্পের আদর্শ এবং উদ্দেশ্য এই দুটি বিষয় জড়িত। শিল্পের মাধ্যমে সুন্দর বস্তু সৃষ্টি হয়। এই বিশ্ব প্রকৃতিতে সৌন্দর্য চতুর্দিকে ছড়ানো রয়েছে। যার শিল্পীর চোখ রয়েছে, তিনিই এই সৌন্দর্যকে দেখতে পাবেন, অনুভব করতে পারবেন।

আমাদের চারপাশে বহু এমন বস্তু রয়েছে যাদের সৌন্দর্যতা আমরা দেখতে পাই না বা অনুভব করতে পারি না। যেমন কাগজ, মাছের আঁশ, ডিমের খ্রি, ডিমের খোসা, পুরোনো কাপড় প্রভৃতি। কাগজ যখন আমাদের সামনে পড়ে থাকে তখন খুবই তুচ্ছ বস্তু হিসেবে আমরা তার প্রতি আগ্রহ দেখাই না। কিন্তু যখন সেই কাগজ দিয়ে কোলাজ পেনসিল প্রভৃতি প্রস্তুত করা হয় তখন তার গুরুত্ব ও সৌন্দর্যটা আমরা বুঝতে পারি। অর্থাৎ, যে সমস্ত বস্তু আমাদের কোনো ব্যবহারিক কাজে লাগে না তাকে আমরা ফেলে না দিয়ে পুনরায় সেই উপকরণ দিয়ে নতুন কিছু তৈরি করতে পারি। ফেলে দেওয়া বস্তু দিয়ে কোনো সৃষ্টিশীল কাজ করলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে অনেক প্রভাব পড়ে। যেমন, তারা যে-কোনো উপকরণ দিয়ে পুতুল সৃষ্টি করতে শেখে। তাদের সৃজনাত্মক দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। তারা বুঝতে পারে কোনো বস্তুই ফেলে দেবার নয়, তাই তাদের সমস্ত ফেলে দেওয়া বস্তুর প্রতি মমত্ববোধ ও আগ্রহ দেখা যায়। এর মাধ্যমে পরিবেশ ও সমাজ সচেতনতার বৃদ্ধি পায়।

◆ **গুরুত্ব :**

1. ফেলে দেবার জিনিস পুনরায় ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে পরিবেশ রক্ষা হবে। গ্রিন হাউস গ্যাস নির্গমন কমিয়ে বায়ু দূষণ এবং জল দূষণ কমাতে সাহায্য করে।
2. ছাত্র-ছাত্রীদের সৃজনাত্মক দক্ষতা বৃদ্ধি পায়।
3. নতুন নতুন সৃষ্টির মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের উৎসাহ বাড়বে।
4. ফেলে দেওয়া বস্তুর প্রতি আগ্রহ বাড়বে।
5. কোন্ বস্তুকে নতুনভাবে ব্যবহার করা যায় তা জানবে।
6. কোনো বস্তুই তুচ্ছ না তা অনুভব করা যায়। অপচয় রোধ করা যাবে।
7. ফেলে দেওয়া বস্তুকে পুনরায় ব্যবহার করার মধ্যে দিয়ে সমাজ সচেতনতা বাড়বে।
8. ফেলে দেওয়া বস্তু দিয়ে তৈরি করা হয় বলে এর খরচ কম হবে।

Scanned with CamScanner

কয়েকটি উপকরণ-এর মধ্যে দিয়ে দেখানো যাবে যে কীভাবে ফেলে দেওয়া জিনিস দিয়ে নতুন জিনিস তৈরি করা যায়।

✪ পেন-দানি :

◆ কাগজের কলমদানি প্রস্তুতি :

● প্রয়োজনীয় কাঁচামাল :

(i) শক্ত বোর্ড পেপার বা জুতোর বাক্স বা জামা-কাপড়ের বাক্স; (ii) সাদা বা রঙিন কাগজ; (iii) ফেভিকল; (iv) রং।

● প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম :

(i) কাঁচি; (ii) স্কেল; (iii) পেনসিল; (iv) তুলি; (v) প্যালেট।

● প্রস্তুতিপদ্ধতি :

Step - 1 : প্রথমে একটি 10´´ × 5´´ মাপের কার্ড বোর্ডের টুকরো কেটে নেওয়া গেল।

Step - 2 : তারপর এটির একপ্রান্তে প্রস্থ বরাবর ফেভিকল লাগিয়ে এবং অন্য প্রান্তটি তার সঙ্গে আটকে একটি চোঙের আকার দিতে হবে।

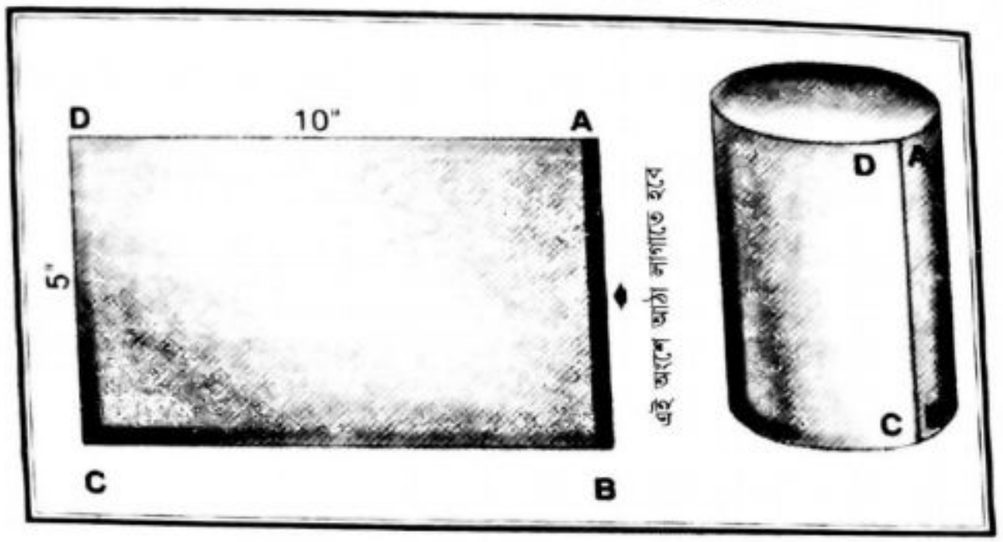

Step - 3 : এরপর চোঙের একটি খোলামুখ একটি গোলাকার চাকতির মতো আর্ট বোর্ড দিয়ে আটকে দিয়ে। চাকতি ও চোঙের জোড় অংশটি আঠা-লাগানো অন্য কাগজ দিয়ে ভালো করে আটকে দিতে হবে।

Step - 4 : এরপর পুরো চোঙটি সাদা কাগজ বা রঙিন কাগজ আঠা দিয়ে মুড়ে দেওয়া।

Step - 5 : এরপর উপরের ছবির মতো চোঙটির গায়ে শক্ত সাদা কাগজ দিয়ে চোখ, কান মুখ প্রভৃতি অংশগুলি বসিয়ে এবং দরকার মতো রং করে নেওয়া।

Step - 6 : আঠা ও রং শুকিয়ে গেলে চোঙের ভেতরে কয়েকটি ছোটো পাথরের টুকরো দিয়ে ভারি করে দিতে হবে। এইভাবে কাগজের কলমদানি তৈরি করা যেতে পারে।

✪ ওয়েস্ট বক্স তৈরি :

◆ প্রয়োজনীয় কাঁচামাল :

(i) 14´´ × 12´´ মাপের কার্ড বোর্ড 4টি; (ii) 10´´ × 10´´ মাপের কার্ড বোর্ড 1টি; (iii) ফেভিকল; (iv) কাপড়ের ফালি (2´´ চওড়া) 8 ফুট; (v) প্রিন্টেড মার্বেল পেপার 16´´ × 12´´ মাপের 4টি এবং 11´´ × 11´´ মাপের 1টি; (vi) কয়েকটি বড়ো স্টোন চিপ্।

◆ প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম :

(i) স্কেল; (ii) পেনসিল; (iii) কাঁচি।

Scanned with CamScanner

◆ **প্রস্তুতিপদ্ধতি :**

Step - 1 : প্রথমে 14´´ × 12´´ মাপের কার্ডবোর্ডগুলিকে নীচের ছবির মতো 14´´ × 10´´ মাপের করে কেটে নিতে হবে। ADE ও BCE অংশ কেটে বাদ দিতে হবে।

Step - 2 : এরপর 14´´ × 10´´ মাপের কার্ডবোর্ডগুলি নীচের ছবির মতো করে সাজিয়ে ধারগুলি কাপড়ের ফালিতে ফেভিকল মাখিয়ে বা কাগজের ফালিতে ফেভিকল মাখিয়ে বা পেপার টেপ দিয়ে জুড়ে দিতে হবে।

Step - 3 : এরপর একটি 10´´ × 10´´ আর্টবোর্ডের ওপর কাঠামোটি বসিয়ে আগের মতো আবার কিনারাগুলি জুড়ে দিতে হবে।

Step - 4 : এরপর ওয়েস্ট বক্সটির বাইরের দিকগুলি প্রিন্টেড মার্বেল পেপার বা প্রিন্টেড গ্লসি পেপার দিয়ে ঢেকে দিতে হবে।

Step - 5 : ওয়েস্ট বক্সটি যাতে সহজে উলটে না যায় তাই তলদেশটি ভারী করার জন্য ভেতরে কয়েকটি স্টোন চিপ্‌স রেখে দিলেই ওয়েস্ট বক্স ব্যবহারের উপযোগী হয়ে উঠবে।

✪ ডিমের ট্রে দিয়ে ঘর সাজানোর জিনিস :

◆ **উপকরণ :** (i) ডিমের ট্রে (ii) পোস্টার রং (iii) আঠা (iv) তুলি (v) কাচের পাইপ (vi) ফাইবারের ঘণ্টা (vii) সুতো, সূঁচ (viii) কাচ ও চুমকি

◆ **পদ্ধতি :** প্রথমে একটি ডিমের খালি ট্রে নিলাম। এরপর ওই ট্রেটির সোজা দিকটিতে রঙ করে নিয়ে, শুকিয়ে নিলাম। এবার দোকান থেকে কিনে আনা সস্তা চুমকি ও গোল ছোটো কাঁচ আঠা দিয়ে ডিমের ট্রেটিতে নির্দিষ্ট রীতিতে বসিয়ে দিলাম (উঁচু অংশগুলিতে গোল কাঁচ ও ভিতরের অংশগুলিকে ছোটো চুমকি বসিয়ে নিতে হবে)। এরপর সরু লম্বা কাচের পাইপ ও ঘণ্টা কিনে একটি নির্দিষ্ট দূরত্ব অন্তর ডিমের ট্রে-টির দুটি সাইড-এ কাচের পাইপের নীচে ঘণ্টাটি সূতো দিয়ে বেধে দিতে হবে। এই সাইড দুটির মধ্যবর্তী কোণের বিপরীত দিকের কোণে আর একটি সুতো বাঁধতে হবে, ফলে ঘরে এটি টাঙাতে সুবিধা হবে।

✪ ফুলদানি :

◆ **উপকরণ :** (i) ব্যবহার করা ছয় খাঁজযুক্ত জল খাওয়ার প্লাস্টিকের গ্লাস একটি,
(ii) চা খাওয়ার প্লাস্টিকের কাপ একটি,
(iii) আইসক্রিমের চামচ ছ-টি,
(iv) স্ট্র বা প্লাস্টিকের সরু পাইপ,
(v) শোলার ছোটো ছোটো বল,
(vi) আঠা।

◆ **পদ্ধতি :** গ্লাসের প্রতি খাঁজে একটি করে অর্থাৎ ছ-টি খাঁজে ছ-টি আইসক্রিমের কাঠি আঠা দিয়ে লাগানো হল। ছ-টি আইসক্রিমের কাঠির মাঝে যে ফাঁকা জায়গা থাকবে সেখানে শোলার বলগুলিকে অর্ধেক করে আঠা দিয়ে দু-টি সারিতে লাগাতে হবে। আইসক্রিমের কাঠির উপরে দুই ধারে স্ট্র লাগানো হল। স্ট্র গুলিকে কাঠির মাপে আগে কেটে নিতে হবে। এবার গ্লাসের উপর দিকে যে ফাঁকা জায়গা থাকবে সেখানেও দুই সারিতে (গ্লাসের চারদিকে বৃত্তাকার) শোলার বল লাগানো হল। গ্লাসের নীচের দিকেও যে ফাঁকা জায়গা পড়ে থাকে সেখানেও বৃত্তাকারে একটি সারিতে শোলার বল লাগানো হল। প্লাস্টিকের চায়ের কাপের উপর কাপের মুখের দিক থেকে নীচের দিকে তিনটি সারিতে শোলার বল লাগানো হল। এবার চা-এর কাপটি মাটিতে উপর করে রেখে কাপের উল্টো দিকে আঠা দিয়ে গ্লাসের উল্টোদিক আটকে নিতে হবে। যেন মনে হয় কাপটি মাটিতে উপুর করে রাখা আছে, আর গ্লাসটি তার উপর বসিয়ে আছে সোজা ভাবে। যা অনেকটা ফুলদানির মতো দেখতে হবে।

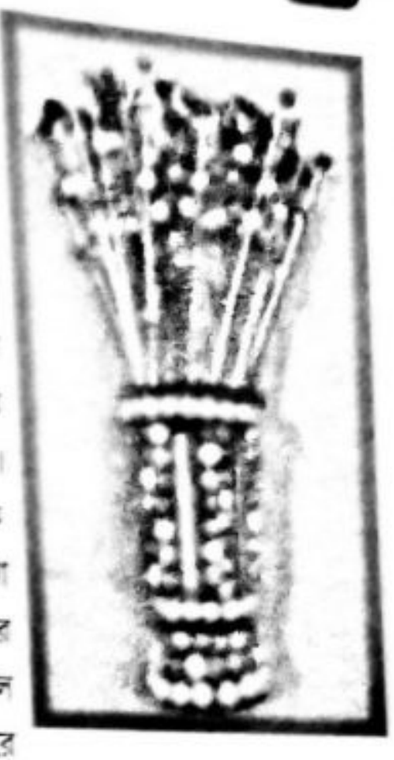

তারপর ফুলদানির ফুল তৈরির জন্য বেশকিছু স্ট্র ও শোলার বল লাগবে। প্রতিটি স্ট্র-এর মধ্যে ৩-৪টি শোলার বল ঢোকাতে হবে। শোলার বলগুলি যেন স্ট্র-এর এক প্রান্ত থাকে, এইভাবে প্রায় ৩৫-৪০ টি কাঠি তৈরি করে কাঠি গুলিকে গ্লাসের মধ্যে এমনভাবে রাখতে হবে যে শোলাগুলি যেন উপর দিকে থাকে অর্থাৎ দেখা যায়। শোলা সমেত কাঠিগুলি গ্লাসের মধ্যে সাজিয়ে রাখলে তা ফুলদানির মতো দেখতে হবে। অর্থাৎ পুরোপুরিভাবে ফুলদানি প্রস্তুত হল।

✪ নাগরদোলা :

◆ **উপকরণ :** কার্ডবোর্ড, ফেলে দেওয়া বাক্স, প্লাস্টিক চায়ের ছোটো ছোটো চারটি কাপ, কাঁচি, রঙ, আঠা, তুলি ইত্যাদি।

◆ **পদ্ধতি :** প্রথমে বাক্সকে কেটে একটি স্ট্যান্ডের আকার দিতে হবে। অর্থাৎ সামনের দিকে নীচেটা সমান রেখে সামনের উপরটা ত্রিভুজ আকারে কেটে নিতে হবে, ঠিক তেমনি পিছনের অংশটা সামনের থেকে একটু বড়ো করে ত্রিভুজ আকারে কেটে নিতে হবে। তারপর সামনের সঙ্গে পিছনের অংশদুটি আঠা দিয়ে জুড়ে দিতে হবে। কিছুক্ষণ ধরে থাকতে হবে যাতে জোড়া অংশটি মজবুত হয়। এরপর কার্ডবোর্ডটিকে গোল করে কেটে

Scanned with CamScanner

নিতে হবে। তারপর কাঁচি চালিয়ে নিজের পছন্দমতো নকশা করে কেটে নিতে হবে। তারপর সেটিকে ইচ্ছামতো রঙে রাঙিয়ে তুলতে হবে। এবার ওই কেটে নেওয়া বোর্ডের গোল রঙ করা অংশটির আগের তৈরি করা স্ট্যান্ডের উপর সামনের দিক করে আঠা দিয়ে ভালোভাবে লাগিয়ে দিতে হবে। তারপর ফেলে দেওয়া ছোটো ছোটো চায়ের কাপগুলিকেও নিজের ইচ্ছামতো রঙ দিতে হবে। যাতে কাপগুলো সুন্দর দেখতে লাগে। যেন মনেই হয় না যে, এগুলি ফেলে দেওয়া কাপ। তারপর রঙ করা কাপগুলিকে স্ট্যান্ডের সঙ্গে অর্থাৎ উপরে আটকানো গোল কার্ডবোর্ডের উপর চারটি কোণে চারটি কাপ সুন্দর করে আঠা দিয়ে লাগিয়ে দিতে হবে। এমনভাবে লাগাতে হবে জিনিসটার মধ্যে যাতে সৌন্দর্য্য আসে। নাগরদোলা এখন প্রস্তুত হয়ে গেছে। জিনিসটা অর্থাৎ নাগরদোলাকে আরও যাতে সবার কাছে আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে তার জন্য ছোটো ছোটো একটি প্লাস্টিক কার্টুন চরিত্র ওই দোলার উপরে বসিয়ে দিতে হবে। কিন্তু মনে রাখতে হবে প্লাস্টিক কার্টুন চরিত্রটি যেন ওই দোলার চেয়ে ভারি না হয়। এইভাবে ফেলে দেওয়া জিনিস দিয়ে একটি সুন্দর এবং মজার নাগরদোলা প্রস্তুত হতে পারে।

✪ পা-মোছা :

◆ **উপকরণ** : দুটো কাঁটা, একটা গোটা পুরোনো সিল্কের বা সিন্থেটিকের শাড়ি।

◆ **পদ্ধতি** : প্রথমে শাড়িটিকে সরু ফিতের মতো করে লম্বা করে কেটে গুটিয়ে ফেলতে হবে। এবার প্রথমে ১টা কাঁটার ৩০টা ঘর করে নেব। এবার ২টো কাঁটা বুনে নেব। ১টা ঘর বাড়াব ও ৩টে করে ঘর ছাড়ব। এবার ১০টি কাঁটা হবে অর্থাৎ দুটো কাঁটায় ২০টি ঘর উঠবে। আবার ১টি ঘর বাড়িয়ে গোটাকাঠা বুনব। সেটা শেষ হলে অন্য কাঁটার আবার ৬টা ছাড়ব। এই ভাবে প্রথমে ৩টে তারপর ৬, ৯, ১২, ১৫, ১৮, ২১ ... এইভাবে নেবে। এবার ঘর বন্ধ করে শেষ করব।

✪ হ্যারিকেন তৈরি :

◆ **উপকরণ** : প্লাস্টিকের গ্লাস, কাপ, স্ট্র, সরু লোহার তার, ইলেকট্রিকের মোটা গেজের তার, আঠা ইত্যাদি।

◆ **পদ্ধতি** : প্রথমে একটা ভাঙা ডি নীচের দিকে কেটে নিয়ে সেটা হ্যারিকেনের বেস বা নীচের অংশ তৈরি করলাম। তারপর একটা কৌটোর মুখ দিয়ে হ্যারিকেনের কাঁচ তথা ফার্মেস বসানোর জন্য ওই বেসের উপর আঠা দিয়ে জুড়ে দিলাম। এরপর ওগুলোকে রঙিন পেপারে মুড়ে দিলাম। মোটা গেজের ইলেকট্রিক তার ফার্নেস আটকানোর জন্য রিং তৈরি করলাম, হ্যারিকেনের বেস সরু লোহার তার দিয়ে ফুটো করে দুপাশ দিয়ে উপরে দিকে তোলা হল, তাতেও রঙিন কাগজ গোল করে দেওয়া হল। এরপর ওই গ্লাসের উপর একটা

কাপ উপুর করে আঁঠা দিয়ে বসানো হল। এবং সেটা ওই লোহার তার দিয়ে মাথা দিয়ে ফুটো করে একপাশে জোড়া হল। এরপর একটা তার আংটা হিসেবে ব্যবহার করা হল। একটা colgate মাজনের মুখটা হ্যারিকেনের বেসের সঙ্গে তেল দেওয়ার জায়গা হিসেবে যুক্ত করা হল, এইভাবে বিভিন্ন জিনিসপত্র ব্যবহার করে একটা হ্যারিকেন তৈরি হল।

✪ কাপড়ের ব্যাগ :

◆ **উপকরণ** : বড়ো আকৃতির যে-কোনো কাপড়, দুটি আলাদা আলাদা রঙের বড়ো কাপড়ের অংশ, দুটি বোতাম, কাঁচি, সূচ, সুতো।

◆ **পদ্ধতি** : প্রথমে ওই বড়ো, আকৃতির কাপড়টি থেকে দুটি সমান মাপের বর্গাকার কাপড় কেটে নেব এবং একটা লম্বা ফিতের ন্যায় বেশ বড়ো কাপড় ও একটি ছোটো আকারে ফিতের ন্যায় কাপড় কেটে নেবো। এবার ওই রঙিন কাপড়গুলিকেও লম্বা ফিতের ন্যায় কাটতে হবে। এক্ষেত্রে ফিতের প্রস্তুত পূর্ববর্তী ফিতের অর্ধেক হবে। বোঝার সুবিধার্থে গোলাপি ও সবুজ রঙের কাপড় নেওয়া হল। এবার ওই বর্গাকার কাপড় দুটির ওপর একটি রঙের ফিতা ওপর থেকে নীচে পরপর সমান্তরালে রাখতে হবে (ধরে নিলাম গোলাপী ফিতেগুলি রাখা হল), এবার সবুজ রঙের ফিতেগুলি লম্বালম্বিভাবে পাশাপাশি বসাতে হবে।

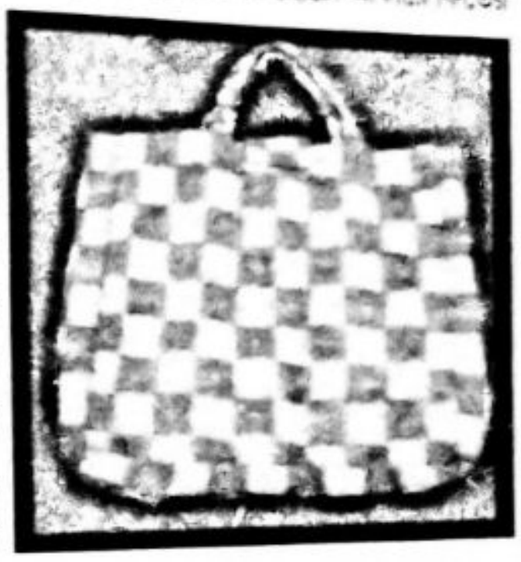

এক্ষেত্রে চাটাই বোনা পদ্ধতি করতে হবে। ফিতেটি এবার গোলাপী ফিতের ওপর দিয়ে যাবে। ও একবার নীচে দিয়ে যাবে। এইভাবে দুটি বর্গাকার কাপড় সাজিয়ে সেলাই করতে হবে। এবার ওই পদ্ধতি অনুসরণ করে লম্বা ফিতে দুটিতেও রঙিন কাপড়ের চাটাই বুনতে হবে। এবার একটি বর্গাকার কাপড়ের ওপর আর একটি বর্গাকার কাপড় রাখলাম। এক্ষেত্রে তলায় ও ওপরে রঙিন বুননটি থাকবে। এবার লম্বা ফিতেটি সাইড দিয়ে দুটি কাপড়ের সাথে সেলাই করতে হবে। দেখা যাবে একটি থলির মতো। এবার কয়েকটি গোলাপী ও সবুজ ফিতে নিয়ে চুলের ন্যায় বিনুনি করতে হবে। এভাবে বিনুনি করা দুটি ফিতে বানাতে হবে। এগুলি ব্যাগের হাতল হবে। হাতলটি ব্যাগের সঙ্গে সেলাই করতে হবে। মোট ৪ জায়গায় সেলাই হবে। এবার পূর্বের ছোটো বুনন করা ফিতেটির একদিক ব্যাগের একদিকের হাতলের মধ্যবর্তী স্থানে আটকাতে হবে। অপর প্রান্তে দুটি বোতাম লাগাতে হবে। এটি কাপড়ের সাথে আটকে থাকবে। প্রয়োজনে খোলা পরা করা যাবে। পরিবর্তে চেন লাগানো যেতে পারে।

Scanned with CamScanner

(10) বিদ্যালয়ে পাঠদানের সময় কয়েকটি আলংকারিক/ প্রদর্শিত শিল্পকলার প্রতিযোগিতার আয়োজন ও তার বিবরণ প্রস্তুতকরণ (Organize a competition on some Decorative / Performing Art forms in the school during your School Internship programme and prepare a report on it) :

✪ অলংকরণ বা decorative art :

অলংকরণ চিত্রশিল্পের একটি উপশাখা যা মূলত কারুশিল্পের অন্তর্গত। রেনেসা যুগে চারু বা কারুশিল্প আলাদা ছিল না। এই দুটি শাখাকেই একত্রে ডিসাইন বলা হত। অলংকরণের কাজ হল কোনো বস্তুর সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করা। এটি স্বয়ংসম্পূর্ণ সৌন্দর্য বিধায়ক কলা নয় বলে একে চারুশিল্পের অন্তর্গত করা হয় না। মানুষের সৌন্দর্যস্পৃহা তার সাধারণতম ব্যবহার্য ভোজ্য পাত্রকেও অলঙ্কৃত করে তুলেছে। তাই অলংকরণ শিল্পের প্রকাশ ঘটেছে মানুষের সৃষ্ট সর্ব ক্ষেত্রে তার পরিধেয়, বাসস্থান, আসবাবপাত্র, ধর্মীয় আচারে।

◆ অলংকরণের উদ্দেশ্য :

অলংকরণের উদ্দেশ্য হল যে-কোনো উপযোগী বস্তুকে অলংকৃত করে সুন্দর করে তোলা। পৃথকভাবে অলংকরণের কোনো অস্তিত্ব বা উপযোগিতা নেই।

◆ অলংকরণের মোটিফ :

অলংকরণের মোটিফের দুটি ধরণ দেখা যায়— বিমূর্ত ও প্রাকৃতিক। বিমূর্ত মোটিফগুলিকেও দুটি ভাগে ভাগ করা যায়— জ্যামিমিত ও অর্গানিক। প্রাকৃতিক মোটিফের অনেকগুলি ভাগ আছে- পুস্প, উদ্ভিদ, ফল, প্রাণি, পাখি অন্যান্য প্রাকৃতিক বস্তু প্রভৃতি।

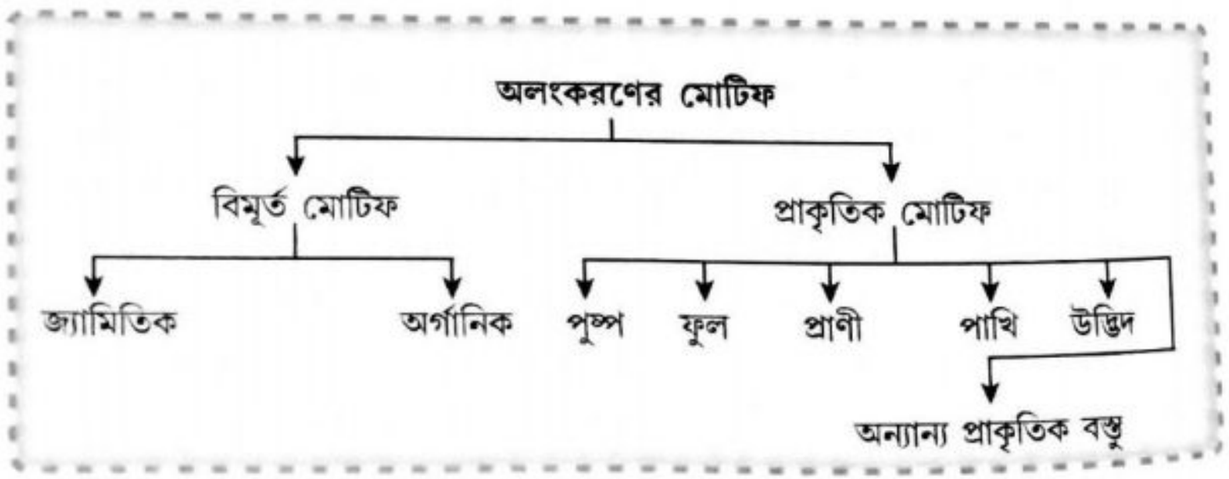

◆ বিমূর্ত মোটিফ :

যে মোটিফগুলির রূপ আমাদের চেনা প্রাকৃতিক রূপের সাথে মেলে না তাকেই বিমূর্ত মোটিফ বলা হয়।

◆ জ্যামিমিক মোটিফ :

ত্রিভুজ, চতুষ্কোণ, বৃত্তাকার, দাবার ছক, স্বস্তিক এগুলি জ্যামিতিক মোটিফ।

◆ অর্গানিক মোটিফ :

অনেক সময় বেশ কিছু মোটিফের উৎস প্রকৃতি হলেও তার রূপ এত বদলে যায় যে তা বিমূর্ত মনে হয়। যেমন— মঙ্গলঘটের ওপর অঙ্কিত মনুষ্য মোটিফটি।

◆ প্রাকৃতিক মোটিফ :

এখানে শিল্পীরা প্রাকৃতিক বস্তুগুলিকে আদর্শায়িত করে, আরও সৌন্দর্যায়িত করে নক্সায় পর্যবসিত করেন। এখানে অলঙ্করণের মোটিফ বা নকশা তার উৎস হতে সরে গেলেও তার মূল স্বরূপটি বদলায় না।

◆ পুষ্প মোটিফ :

সারা পৃথিবীতে নানা ধরনের ফুল অলংকরণের নকশায় স্থান পেয়েছে। বিশেষত, সহস্র দল পদ্ম মোটিফকে ভাররতবর্ষে পবিত্রস্থান করা হয়েছে। কারণ পদ্ম পঙ্কে জন্মগ্রহণ করে জল বিকশিত হয়ে সূর্যের দিকে প্রস্ফূটিত হয়। পদ্ম পবিত্র ফুল বলে দেবদেবীর আসন হিসেবে স্থান পেয়েছে।

◆ ফল মোটিফ :

ফল মোটিফের একটি বিশিষ্ট উদাহরণ হল কল্কা যা আমফলের থেকে উদ্ভূত। অজন্তায় বিভিন্ন ধরনের ফলের মোটিফ দিয়ে একাধিক প্যানেল অলংকরণ পরিদৃষ্ট হয়।

◆ উদ্ভিদ মোটিফ :

লতা, বৃক্ষ, ফুলন্ত, ফলন্ত উদ্ভিদ সমস্ত প্রাচীন সভ্যতার অলংকরণের সিংহভাগ জুঁড়ে আছে। বাংলার ব্রত্যের আল্পনায় দানের ছড়া, খুস্তিলতা, কলমীলতা, শঙ্খলতা স্থান পেয়েছে। মিশরীয় স্তম্ভের উপরিভাগে প্যারিরাসের নকশা খেদিত। গ্রীক করিণথিয়ান স্তম্ভের ওপরিভাগের অলংকরণের নকশা অ্যাকান্থাস পত্রগুচ্ছ থেকে নেওয়া হয়েছে। কুম্ভ হতে উৎসাহিত উদ্ভিদকে ভারতবর্ষে সমৃদ্ধির প্রতীক বলে গণ্য করা হয়েছে।

◆ প্রাণী মোটিফ :

সিংহ, ঘোড়া, বাঘ প্রভৃতি শক্তিশালী পশুগুলি মোটিফ হিসেবে সারা পৃথিবীর প্রাচীন সভ্যতার অলংকরণে স্থান পেয়েছে। এছাড়া প্রাণীর মিশ্রিত রূপ যেমন স্ফিংস, মকর, লিওগ্রিফ, গ্রিফিন, গন্ধর্ব tigure দেখা যায়। অজন্তা গুহাচিত্রে, বাংলার টেরাকোটা মন্দিরের মিশ্রিত পশুর বহু অলংকরণ দেখা যায়।

Scanned with CamScanner

◆ **অন্যান্য প্রাকৃতিক বস্তুর মোটিফ :**

জলের ঢেউ, পর্বত, আগুনের কুন্ডলী, হাওয়ার তরঙ্গ এ সবই অলংকরণের নকশায় পর্যবসিত হয়েছে।

◆ **অলংকরণ শিল্পের চরিত্র :**

(১) **আদর্শ সৌন্দর্য্যায়িত আকার :** প্রাকৃতিক রূপগুলি অনেক সময় নিখুঁত সৌন্দর্য্যময় হয় না। অলংকারিক শিল্পে সমস্তরূপ নিখুঁত সৌন্দর্য্যময় করে তোলার জন্য তাকে নকশায় রূপান্তরিত করা হয়। যেমন একটি শঙ্খকে আলংকারিক শিল্পে অঙ্কনের সময় তার চক্রাকার দাগ ও বর্তুলাকার গড়নকে সৌন্দর্য্যময় নকসায় পর্যবাসিত করা হয়।

(২) **আকারগুলির মধ্যে পারস্পরিক ঐক্য :** একটি আলংকারিক মোটিফ নানা আকারের বক্র ও সরলরেখার সমাহারে নির্মিত। আলঙ্কারিক শিল্পে মোটিফের প্রতিটি অংশের মধ্যে পারস্পরিক ঐক্য আবশ্যিক না হলে নকশাটির সৌন্দর্য্যহানি ঘটে।

(৩) **আকারের ছন্দময়তা :** প্রকৃতিতে প্রাপ্ত রূপের ও বিমূর্ত রূপের নিজস্ব একটি ছন্দময়তা আছে। আলংকারিক নকশায় এই ছন্দগুলিকেই পরিবর্তিত করে তোলা হয়। এই ছন্দময় রূপগুলি আবার নকশায় সামগ্রিক ছন্দ গড়ে তোলে।

(৪) **আকারের বা মোটিফের পুনরাবৃত্তি ও ব্যবহার :** আলংকারিক নকশায় একটি মোটিফকে unit ধরে নিয়ে পরপর বসিয়ে পূর্ণাঙ্গ নকশায় রূপ দেওয়া হয়। তাছাড়া একটি নকশায় কোনো একটি আকারকে পাশাপাশি বসিয়েও একটি মোটিফ তৈরি করা হয়। আলঙ্কারিক নকশায় পুনরাবৃত্তি তার সৌন্দর্য্যকে বর্দ্ধিত করে ও ঐক্য তৈরি করে।

(৫) **ভারসাম্য :** সাধারণতঃ একটি নকশায় প্রতিসাম্যমূলক ভারসাম্য পরিলক্ষিত হয়। এই ক্ষেত্রে নকশাটিকে মাঝখান দিয়ে কাটলে দুই দিকেই সমান হয়। তবে অনেকক্ষেত্রে অপ্রতিসাম্যমূলক অ্যারেঞ্জমেন্ট পরিলক্ষিত হয়। যেমন— কল্কা নকশাটিই অপ্রতিসাম্যমূলক।

(৬) **বৈচিত্র্যময় আকার :** একটি নকশায় অনেকগুলি আকার বা মোটিফ থাকে। এই মোটিফগুলির বৈচিত্র্যময়তা ও পুনরাবৃত্তি একটি আলংকারিক নকশার বিশেষ বৈশিষ্ট্য। আকারের বৈচিত্র্য একটি নকশাকে সৌন্দর্য্যময় করে তোলে।

(৭) **সামঞ্জস্যময়তা :** আলংকারিক নকশায় বৈচিত্র্যময় মেটিফের সমাবেশ ঘটে। শিল্পীকে নকশা অঙ্কনের সময় খেয়াল রাখতে হয় যাতে এতগুলি মোটিফের সমাবেশ পারস্পরিক সম্বন্ধযুক্ত য্য সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়।

◆ **আলঙ্কারিক শিল্পের উপকরণ :**

আলঙ্কারিক শিল্প কোনো বস্তুকে আশ্রয় করে বিকশিত হয়। যেমন— আল্পনা গৃহ প্রাঙ্গনকে সুসজ্জিত করে। তাই অলংঙ্করণ শিল্পের উপকরণ বিবিধ। কাপড় ছাপা নকশীকরণের উপকরণ হল কাঠের ব্লক ও কাপড় ছাপানোর রঙ, গৃহ প্রাঙ্গনের আল্পনা বা দেওয়ালচিত্রের মূল উপকরণ হল চালের গুঁড়ো। তাই এইভাবে আলঙ্কারিক নকশার উপকরণ নির্দিষ্ট করা সম্ভব নয়।

■ শিক্ষার্থীদের সৃজনশীল বিকাশে ও উৎসাহিত হবার জন্য। বিদ্যালয় পাঠ্যদানের সময় অলংকরণধর্মী ও প্রদর্শিত শিল্পকলার প্রতিযোগীতা আয়োজন করা যেতে পারে।

অলঙ্করণধর্মী প্রতিযোগীতার ক্ষেত্রে প্রথমে বিচারক মন্ডলীর শ্রেণিভিত্তিক বিষয় নির্বাচন করতে হবে। বিষয় নির্বাচন করার ক্ষেত্রে কাঁচামাল, স্থায়িত্ব, মাধ্যম উপরে নির্ভর করবে। প্রত্যেক শ্রেণির জন্য আলাদা আলাদা বিষয় নির্বাচন করা উচিত। প্রতিযোগীতা মাধ্যম হিসেবে পেন লোকশিল্পকে অনুকরণ করলে শিক্ষার্থীদের সেই লোকশিল্পের সম্বন্ধে স্বচ্ছ ধারণা লাভ করবে।

◆ **পঞ্চম শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের জন্য প্রোজেক্ট : বুকমার্ক**

উপকরণ : একটি ১$^{১}/_{২}$ ইঞ্চি × ৪ ইঞ্চি মাপের সাদা কার্টিজ পেপারের টুকরো, কালো স্কেচপেন, গোলাপী, নীল ও সবুজ পোস্টার কালার, ২নং তুলি, কাঁচি, পেনসিল।

প্রক্রিয়া : এই কাগজের লম্বাটে দিকে মধুবনী চিত্রকলার যে কোন মোটিফ পেনসিলে এঁকে নিতে হবে। এরপর মোটিফটির ভেতরে রঙ ভরে কালো স্কেচপেন দিয়ে বর্ডার দিতে হবে। কালো রঙের দ্বিত (ডবল) বর্ডার লাইন ও তার ভিতরে সমান্তরাল রেখার সারি মধুবনী চিত্রের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। এইবার ইচ্ছা হতে মোটিফটির চারপাশ দিয়ে বাড়তি কাগজ কেটে নিলেই বুকমার্ক তৈরি, যদি কেউ আয়তকার লম্বাটে আকারের বুকমার্ক পছন্দ করে তাহলে মোটিফের চারপাশের অংশটি কাটা হবে না।

◆ **ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের জন্য প্রোজেক্ট : পেপার ব্যাগ**

উপকরণ : বাজার থেকে কেনা রঙীন মাপের পেপার ব্যাগ (ছাত্রছাত্রীরা চাইলে নিজেরাও পেপার ব্যাগ করতে পারে।) কালো স্কেচপেন, গোলাপী, হলুদ, নীল ও সবুজ রঙ, পেনসিল, মাপের আর্টপেপার।

Scanned with CamScanner

প্রক্রিয়া : সাদা আর্টপেপারটির চারপাশে অর্ধইঞ্চি বর্ডারের দাগ টেনে নিতে হবে। এই অংশে যে কোন একটি মধুবনী পাড়ের নকশা এঁকে নিতে হবে। এবার ভিতরে আয়তকার ক্ষেত্রটিতে একটি মধুবনী চিত্রকলার অবয়ব আঁকতে হবে। এবার অবয়বটিতে রঙ ভরা হয়ে গেলে কালো জল বর্ডার লাইন স্কেচপেন দিয়ে আঁকলেই ছবি আঁকা সমাপ্ত হবে। পশ্চাৎপটটি সাদা রাখাই ভালো। এবার মধুবনী চিত্র অঙ্কিত এই কাগজটি সুন্দর করে পেপার ব্যাগের ওপর আটকে দিতে হবে। রঙীন পেপার ব্যাগের বিপরীতে সাদা কাগজের রঙের ওপর আঁকা মধুবনী চিত্রটি ঝকঝকে হয়ে ফুটে উঠবে। কেউ চাইলে পেপার ব্যাগের ওপর সরাসরিও অকতে পারে। তবে লক্ষ্য রাখতে হবে পেপার ব্যাগটির কাগজ যেন আকার জন্য উপযুক্ত হয় কারণ অনেক সময় পেপার ব্যাগের কাগজে রঙ ধেবড়ে যেতে পারে। যে-কোন উপহার দ্রব্য এই অলংকৃত পেপার ব্যাগের ভিতরে পুরে উপহার দিলে তা অভিনব হয়ে উঠবে।

❖ **সপ্তম শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের জন্য প্রোজেক্ট : ব্যাগের ওপর চিত্র অঙ্কন**

উপকরণ : যে-কোনো রঙের, যে-কোনো আকারের কাপড়ের ব্যাগ, ফেব্রিক পেন, ফেব্রিক রঙ, তুলি, কার্বন পেপার, পেন্সিল, এমব্রয়ডারী ফ্রেম।

প্রক্রিয়া : একটি মধুবনী চিত্র নির্বাচন করে তা কাপড়ের ব্যাগটির ওপর কার্বন পেপারের সাহায্যে ট্রেস করে নিতে হবে। ব্যাগের মাঝখানে একটি প্লাস্টিক রাখতে হবে যাতে (ওপরের) কাপড়ের ভেজা রঙ নিচের কাপড়ে লেগে না যায়। প্রয়োজন হলে আঁকটিকে এমব্রয়ডারী ফ্রেমে আটকে নেওয়া যেতে পারে। এবার ফেব্রিক রঙ দিয়ে চিত্রটি ভরাট করতে হবে। তবে অতিরিক্তটুকু ফেব্রিক পেন দিয়ে আঁকলে ফিনিশিং ভালো আসবে। নিজের তৈরী করা মধুবনী চিত্র সম্বলিত ব্যাগ ব্যবহার করে ছাত্রছাত্রীরা অনায়াসে অন্যদের নজর কেড়ে নেবে।

অলংকরণধর্মী প্রতিযোগিতার বিবরণী প্রস্তুতকরণ

- **প্রতিযোগিতার নাম :** মধুবনী চিত্রের দ্বারা ওয়াল হ্যাঙ্গিং
- **শ্রেণি :** অষ্টম শ্রেণি
- **সময় :** ৩-৪ পিরিয়ড বা দুই ঘন্টা

উদ্দেশ্য	**প্রত্যক্ষ :** ● মধুবনী শৈলীর সম্পর্কে ধারণা তৈরি ● অঙ্কনে দক্ষতা বৃদ্ধি ● ব্যবহৃত শিল্প সামগ্রী সম্পর্কে ধারণার বিকাশ **পরোক্ষ :**

❖ **মধুবনী :** মিথিলার একটি গ্রাম মধুবনে যে বিশেষ ধরনের চিত্র গড়ে উঠেছিল তাই মধুবনী চিত্র নামে পরিচিত। মধুবনী গ্রামের মহিলারা গ্রামের বাড়ির দেয়ালে বিশেষ উৎসব, বিবাহ, নতুন শিশুর আগমন উপলক্ষে ছবি আঁকেন। মধুবনী চিত্রকলা সম্পূর্ণরূপে গ্রামীন ও লোকশিল্প, লোকশিল্পের বলিষ্ঠতা, সাবলীলতা ও সারল্য মধুবনী শিল্পের বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

- **উপকরণ :**

কাপড়	১০ ইঞ্চি/১৪০ ইঞ্চি মাপের সাদা বা ঘিয়া রঙের মোটা কাপড়। কাপড়টি ওয়াল হ্যাঙ্গিং এ ব্যবহার করা হবে।
পাটকাঠি	২ টি ১৪ ইঞ্চি মাপের পাটকাঠি। পাটকাঠ হ্যাঙ্গিং এর কাজে ব্যবহৃত হয়।

Scanned with CamScanner

কার্বন পেপার	ট্রেস করতে কার্বন পেপার ব্যবহার করা হয়।
এমব্রয়ডারী	কাপড়টিকে এমব্রয়ডারী ফ্রেমে আটকে ছবি আঁকতে হবে।
ফেব্রিক পেন্ট	ফেব্রিক পেন্ট দিয়ে ছবিটি আঁকতে হবে।
উল	২৩ ইঞ্চি মাপের রঙীন উল যাহা পাটকাঠি দুপাশে ঝুলাতে সাহায্য করবে।

- **প্রতিযোগিতার আয়োজন :**

আয়োজন	পদ্ধতি
অষ্টম শ্রেণীর জন্য মধুবনী অলংকরণের মাধ্যমে ওয়াল হ্যাঙ্গিং প্রতিযোগিতা ঠিক করা হল। শিক্ষার্থীদের সমস্ত উপকরণ নিয়ে আসতে বলা হল। প্রতিযোগিতার জন্য ৩-৪ পিরিয়ড সময় রাখা হল।	প্রথমে কাপড়টির দুটি পাশ এমনভাবে মুড়তে হবে যাতে কাপড়ের মধ্য দিয়ে পাটকাঠি ঢুকে যায়। মোড়ার পর কাপড়টির মাপ দাঁড়াবে ১০ ইঞ্চি/১২ ইঞ্চি। এবার কাপড়টির চারপাশ ঘিরে মধুবনী শৈলীতে ১ ইঞ্চি মাপের একটি পটি আঁকতে হবে। এবার পটির মাঝের আয়তক্ষেত্রটিতে নির্বাচিত মধুবনী চিত্রটি কার্বন পেপারের সাহায্যে ট্রেস করে নিতে হবে। এবার কাপড়টিকে এমব্রয়ডারী ফ্রেমে আটকে ফেব্রিক পেন্ট দিয়ে ছবিটি আঁকতে হবে। ফেব্রিক পেন দিয়ে ডবল বর্ডার লাইন সাবধানে আঁকতে হবে। ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে যারা অঙ্কনে দক্ষ তারা ফেব্রিক পেনের বদলে লাইনার ব্যবহার করতে পারে। পুরো অঙ্কনটি শুখিয়ে যাওয়ার পর কাঠিদুটি ওয়ার হ্যাঙ্গিং এর ওপরে ও নিচে ঢুকিয়ে দিতে হবে। অনেকে পাটকাঠির নিজস্ব রঙটি রাখতে ভালোবাসে। তা না হলে কাঠিটি ওয়ালহ্যাঙ্গিং এর রঙ এর সাথে মিলিয়ে রঙ করা করা যেতে পারে এবার একটি ২০ ইঞ্চি মাপের রঙীন উল বা কার্জ নিয়ে উপরের কাঠিটির দুপাশে ঝুলিয়ে দিলেই ওয়ালহ্যাঙ্গিং দেওয়ালে টাঙানোর জন্য প্রস্তুত।

- **মূল্যায়ন** : শিক্ষার্থীদের অলংকৃত ওয়াল হ্যাঙ্গিং ক্রমিক সংখ্যা অনুগামী সাজিয়ে মেলাতে হবে। প্রত্যেকটি কাজ বিচারক মন্ডলি ভালো করে দেখে মূল্যায়ন করতে পারে। বিচারক মন্ডলীর মূল্যায়ন এর উপর নির্ভর করে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় স্থান নির্ণয় করতে হবে।

Scanning Copy Right By DAS Coaching

Thank You

Visit Our Educational Website

Regularly For More Update:

https://www.dascoaching.in/

Our Free Service

Free B.Ed EBook

Online Class

Edu Blogs

Contact Us On:

Facebook: fb/dascoaching.in

YouTube: DAS Coaching

Mail: contact.dascoaching@gmail.com

Scanned with CamScanner

(11) বিদ্যালয়ে আভ্যাসিক পাঠদানের সময় একটি সৃজনশীল কর্মশালার আয়োজন ও তার বিবরণ প্রস্তুতকরণ (Organize a workshop on some selected Creative Art forms in the school during your School Internship programme and prepare a report on it) :

✪ কর্মশালা বা Workshop

শিক্ষা প্রক্রিয়ার দু'টি দিক—তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক। পরিশিক্ষণ কৌশল শিক্ষার্থীদের শিক্ষার তাত্ত্বিক দিককে বিকশিত করে। কনফারেন্স ও সেমিনার সংগঠিত করা হয় শিক্ষার্থীর উচ্চস্তরের প্রজ্ঞামূলক ও অনুভূতিমূলক উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য। কিন্তু মানস সঞ্চালনগত দিকের বিকাশ হয়ে থাকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে। শিক্ষণ একটি অক্ষ যার একদিকে অনুবর্তন হতে শুরু, অন্য দিকে ধারণায় দীক্ষিত করা এবং প্রশিক্ষণ এই অক্ষের অন্তর্গত। শিক্ষার নতুন আবিষ্কার ও অনুশীলন কাজ চালু করা হয়েছে কর্মশালা (Workshop) সংগঠিত করে। এখানে শিক্ষার্থীরা নতুন অনুশীলন কৌশলগুলি ব্যবহার করার প্রশিক্ষণ পায়। শিক্ষার মানস সঞ্চালনগত ক্ষমতাগুলি নতুন কৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে বিকশিত হয়। শিক্ষার্থীরা এই প্রশিক্ষণকালে কিছু নির্দেশদানমূলক, শিক্ষণমূলক এবং অভীক্ষা তৈরির ব্যবহারিক কাজকর্ম করার প্রশিক্ষণ নেয় :

◆ কর্মশালার সংজ্ঞা (Definition of Workshop) :

কর্মশালা হল 10 থেকে 20 জন ব্যক্তির সম্মিলিত একটি দল। প্রত্যেকে একটি সাধারণ সমস্যাকে এক সঙ্গে সাধারণ লক্ষ্যে সমাধান করে। সকলে মিলে গভীর পড়াশোনা, গবেষণা, অনুশীলন ও আলোচনা করে কোনো বিষয়ে নিজেদের ব্যক্তিগত ও দলের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি করে।

◆ কর্মশালার উৎস (Sources of Workshop) :

কর্মশালা কথাটি ইঞ্জিনিয়ারিং শাখা হতে নেওয়া হয়েছে। এই কর্মশালায় নিজেকে হাতেনাতে কাজ করতে হয়, উৎপাদন করতে হয়, রিপেয়ার করতে হয়।

একইরকম ভাবে 'প্রশ্ন ব্যাংক' কর্মশালাতে শিক্ষার্থীদের হাতেনাতে কোনো বিষয়ের কোনো অধ্যায়ের প্রশ্ন তৈরি করতে হয়। অংশগ্রহণকারীরা নিয়ম অনুযায়ী প্রশ্নপত্র তৈরি করে। কর্মশালাতে প্রশ্ন ব্যাংক কী, কীভাবে প্রশ্ন তৈরি করতে হয়, কীভাবে তা প্রয়োগ করতে হয়, প্রয়োগ করার পর কী ভাবে F.V. (Facility Value) ও D.I. (Discrimination Index) নির্ণয় করতে হয়, সব হাতেকলমে শেখানো হয়।

◆ কর্মশালার উদ্দেশ্য (Objectives Workshop) :

প্রজ্ঞামূলক ও মানস সঞ্চালনগত উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য কর্মশালা আহূত হয় :

(A) **প্রজ্ঞামূলক উদ্দেশ্যাবলি** (Cognitive Objectives) :

(1) শিক্ষণ পেশার সমস্যার সমাধান করতে পারা,

(2) পরিশিক্ষণমূলক ও শিক্ষণ পরিস্থিতির জন্য দার্শনিক ও সমাজবিদ্যার পশ্চাৎপট সরবরাহ করা,

(3) বর্তমান প্রাসঙ্গিক শিক্ষাগত উদ্দেশ্য শনাক্ত করা,

(4) কোনো থিম বা সমস্যাকে ব্যবহার করা সংক্রান্ত বোধগম্যতার বিকাশ হয়।

(B) **মানস সঞ্চালনগত উদ্দেশ্যাবলি** (Psychomotor Objectives) :

(1) শিক্ষণমূলক ও পরিশিক্ষণমূলক কাজের পরিকল্পনা রচনা করা ও সংগঠন করার ক্ষমতার বিকাশ করা।

(2) কোনো কাজ স্বাধীনভাবে করার ক্ষমতার বিকাশ।

(3) শিক্ষণ স্ট্র্যাটেজিকে কার্যকরীভাবে সম্পাদন করার ক্ষমতার বিকাশ।

(4) শিক্ষণের বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি ব্যবহার করতে প্রশিক্ষণ দেওয়া।

(5) সমস্যার সমাধান খোঁজা, অভিযান করা ও শনাক্ত করা।

(6) কোনো পরিস্থিতি, তার পশ্চাৎপট, এর সামাজিক ও দার্শনিক তাৎপর্য গভীরভাবে অনুসন্ধান ও গবেষণা করা।

(7) শিক্ষার্থী ও শিক্ষকরা যাতে নতুন কৌশলগুলি সম্পর্কে সচেতনতা এবং প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হন সেই ক্ষমতার বিকাশ।

(8) বিশেষ পেশাগত, বৃত্তিগত, যৌথসমাজ—চাকুরি বা সেবাগত কাজকর্মগুলির জন্য প্রস্তুতি গ্রহণের সুযোগ সরবরাহ করা।

(9) উচ্চ স্তরের ব্যক্তিগত অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করা ও উৎসাহ দান।

(10) দলগত লক্ষ্য ও পদ্ধতি নির্ধারণ করা।

◆ কর্মশালা পদ্ধতির বিভিন্ন স্তর (Different Stages of Workshop Procedure) :

সাধারণত কর্মশালা 3 থেকে 10 দিনের করা হয়। কখনো কখনো 40 দিনেরও হয়ে থাকে, তা নির্ভর করে শিক্ষণীয় টাস্কের প্রকৃতি কীরকম তার উপর।

Scanned with CamScanner

(1) **প্রস্তুতি** (Preparation) : সম্পদ ব্যক্তি বা বিশেষজ্ঞরা বিষয়টি সম্পর্কে সচেতনতা এবং একটি সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে দেন। এটি প্রায় সেমিনারের মতো। বক্তব্য (Paper) পাঠ করা হয় থিমটি নিয়ে, তরপর আলোচনা হয় থিম/প্রসঙ্গটির নানান দিক নিয়ে। শিক্ষার্থী বা অংশগ্রহণকারীদের বিশদ ব্যাখ্যা দেওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়। বিশেষজ্ঞরা বিভিন্ন উপযুক্ত ইলাসট্রেশন করেন, শ্রেণি শিক্ষণে স্তরগুলি দেখিয়ে দেন। প্রথম দুদিন এই নির্ঘণ্ট পালিত হয়।

(2) **দলে মিলে কাজ** (Work in Groups) : এবার সবাইকে ছোটো ছোটো দলে ভাগ করা হয়। যেমন পাঠটীকার কর্মশালা বা প্রশ্ন ব্যাংকের কর্মশালাতে আগে আচরণমূলক উদ্দেশ্য অনুযায়ী লিখতে বলা হয়, আবার বিষয় অনুযায়ী দল ভাগ হবে— বাংলা, বিজ্ঞান, অঙ্ক ইত্যাদি। যে কাজটি করতে হবে বিশেষজ্ঞ তার গাইডলাইন দেখিয়ে দেন। তিনি পথ প্রদর্শন করেন এবং প্রত্যেক শিক্ষার্থী ঠিকমতো করছে কি না বা কোথায় কী ভুল করছে তা তত্ত্বাবধায়ন করেন।

প্রত্যেক অংশগ্রহণকারীকে ব্যক্তিগতভাবে এবং স্বাধীনভাবে কাজ করে যেতে হয়। প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে তার নিজের কাজ সম্পূর্ণ করতে হয়। শেষে প্রত্যেকে নিজ নিজ দলের সঙ্গে মিশে আলোচনা করে এবং তার সম্পূর্ণ করা কাজ উপস্থাপন করে।

(3) **রিপোর্ট করা** (Reporting) : এই স্তরে সব দলগুলি এক জায়গায় মিলিত হয় এবং দ্বিতীয় স্তরে তারা যে কাজ সম্পন্ন করেছে তার রিপোর্ট করে। অংশগ্রহণকারীদের সুযোগ দেওয়া হয় পরস্পরের কাজের উপর মন্তব্য করতে এবং কাজটির আরও উন্নতির জন্য সুপারিশ করতে। বিশেষজ্ঞরাও রিপোর্টগুলির বিভিন্ন দিক নিয়ে মতামত দেন। কর্মশালার শেষে প্রথাগত পালনীয় শিষ্টাচার মানা হয়ে থাকে।

(4) **অনুসরণ পর্ব** (Follow-Up) : শিক্ষার্থী তার কাজের প্রতিষ্ঠানে ফিরে গিয়ে নিজের কাজ করতে থাকে। তাদের প্রতিষ্ঠানে এই কাজ কত ভালোভাবে করতে পারা যায় ও কীভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে তা পরীক্ষা করেন। অংশগ্রহণকারীদের আবার আমন্ত্রণ জানানো হয় আসতে এবং তাদের অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করতে। এই প্রসঙ্গে তাদের এবারে আরও প্রাসঙ্গিক ব্যবহারিক দিক অনুযায়ী সুপারিশ করা হয় এবং কর্মশালার একটি রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়।

◆ কর্মশালাতে পালনীয় বিভিন্ন ভূমিকা (Roles in Workshop) :

(1) **কর্মশালা কৌশলের সংগঠক** (Organiser of the Workshop Technique) : সংগঠকই সমগ্র প্রোগ্রাম এবং নির্ঘণ্ট (Schedule) প্রস্তুত করেন। তাঁকে অংশগ্রহণকারী ও বিশেষজ্ঞদের থাকার ও খাবার ব্যবস্থা করতে হয়। কর্মশালার

দিন, তারিখ, সময়, জায়গা সব তাঁকে ঠিক করতে হবে। NCERT-র মতো বিভিন্ন সংস্থা কর্মশালা সংগঠিত করতে পারে।

(2) **প্রথম স্তরে আহ্বায়ক** (Convenor in First Stage) : প্রাথমিক স্তরে কর্মশালাতে থিম/প্রসঙ্গ নিয়ে, তার তাত্ত্বিক দিক নিয়ে বিশেষজ্ঞরা আলোচনা করেন। কর্মশালার থিম নিয়ে যাঁরা অত্যন্ত অভিজ্ঞ তাঁদের থেকে বিশেষজ্ঞ নির্বাচন বা আমন্ত্রণ করা হয়। আহ্বায়ককে প্রাথমিক স্তরের সমস্ত শিষ্টাচার এবং Key Note রচনা ঠিকঠাক হচ্ছে কি না তা পর্যবেক্ষণ করতে হয়।

(3) **বিশেষজ্ঞ বা সম্পদ ব্যক্তি** (Experts of Resource Person) : কর্মশালা সংগঠন করতে বিশেষজ্ঞদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। কর্মশালার তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক দিকগুলি তিনি দেখাশোনা করেন। তাঁরা প্রতিটি স্তরে পথ প্রদর্শন করেন। শিক্ষার্থীদের প্রতিটি টাস্ক খুব ভালোভাবে করতে প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকেন।

(4) **অংশগ্রহণকারীর ভূমিকা** (Role of Participants or Trainees) : অংশগ্রহণকারীরা কর্মশালার থিম সম্পর্কে অত্যন্ত অনুরাগী হবে। প্রথম স্তরে তাঁরা থিমটি পুরো উপলব্ধি করবেন। দ্বিতীয় স্তরে তাঁরা গভীর অনুরাগের সঙ্গে টাস্কগুলি অনুশীলন ও সম্পাদন করবেন এবং বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে উপযুক্ত পথনির্দেশ গ্রহণ করবেন। সত্যিকার বাস্তব পরিস্থিতি অনুযায়ী শ্রেণিকক্ষে এই নির্ধারিত টাস্কগুলি কতদূর কার্যকরী, কতখানি বাস্তবসম্মত তা প্রয়োগ করার পর মূল্যায়ন করা হয়। তাঁরা কোনো সংশোধন বা পরিমার্জনের কথা সুপারিশ করতে পারেন। কর্মশালা কৌশল কতখানি কার্যকরী তা নির্ভর করে শিক্ষার্থীরা এই টাস্কটির সঙ্গে কতখানি একাত্ম হয়েছে তার উপর।

◆ কর্মশালা কৌশলের সুবিধা (Advantages of Workshop Technique) :

কর্মশালা কৌশল হল একটি পরিশিক্ষণমূলক পরিস্থিতি যা নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়—

(1) উচ্চ স্তরের প্রজ্ঞামূলক এবং মানস সঞ্চালনমূলক উদ্দেশ্যাবলি অর্জন করতে সহায়তা করে।

(2) শিক্ষার উপযুক্ত বোধগম্যতা, কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করতে ও অনুশীলন চর্চা নিয়মিত করার জন্য কর্মশালা কৌশল কার্যকরীভাবে প্রয়োগ করা হয়।

(3) পেশাগত কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করতে ও বিকাশ করতে এই কৌশল ভালো।

(4) কর্মরত শিক্ষকদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি হবে।

(5) শিক্ষকের ব্যক্তিগত দক্ষতা ও ক্ষমতা বিকাশ করতে উপযুক্ত সুযোগ ও পরিস্থিতি সরবরাহ করা হয়।

Scanned with CamScanner

(6) সহযোগিতা ও দলগত কাজের অনুভূতি বিকশিত করে।
(7) বৃত্তিমূলক সমস্যাগুলির পরস্থিতিসমূহ স্টাডি করার সুযোগ পাওয়া যায়।
(8) শিক্ষাক্ষেত্রে নতুন অনুশীলন ও আবিষ্কারগুলিকে শিক্ষার্থীরা জানতে পারে ও কাজে লাগাতে পারে।

◆ **কর্মশালার সীমাবদ্ধতা (Limitations of Workshop)** : কর্মশালায় এইসব সীমাবদ্ধতা রয়েছে—

(1) শিক্ষাবিজ্ঞানের যে-কোনো কর্মশালা হল সেমিনার-যুক্ত কর্মশালা (Seminar cum Workshop) , তা যে-কোনো থিম বা কোনো সমস্যা নিয়েই হোক না কেন।
(2) কর্মরত শিক্ষকরা নতুন জিনিস সহজে বুঝতে বা গ্রহণ করতে চান-না।
(3) বড়ো দলের জন্যও কর্মশালা করা যেতে পারে, তাতে অনেক ব্যক্তি একসঙ্গে প্রশিক্ষণ পেতে পারে।
(4) শিক্ষকরা ব্যবহারিক কাজে বা কোনো রকম উৎপাদনমূলক কাজে সাধারণত কিছুতেই যুক্ত হতে চান না।
(5) কর্মশালার সাফল্য নির্ভর করে কর্মশালার পরবর্তী অনুসরণমূলক (Follow-up) প্রোগ্রামগুলি ঠিকমতো করার উপর। অংশগ্রহণকারী ও স্টাফদের প্রচুর সময় দেওয়া প্রয়োজন। অনেক সভ্যকে একসঙ্গে হাত লাগাতে হবে। কর্মশালার জন্য বিশেষ সুযোগসুবিধার বস্তুসামগ্রী দেওয়া দরকার। অংশগ্রহণকারীরা স্বাধীনভাবে এবং দলগতভাবে সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে কাজ করবেন।

❖ পঞ্চম শ্রেণির ছাত্রছাত্রী দ্বারা ওয়ারলি চিত্রকর্ম দ্বারা নির্মিত প্রোজেক্ট

উপকরণ : মাটির ফুলদানি বা মাটির গ্লাস, সাদা ও কালো ফুলদানি অঙ্কন ও অন্যান্য রঙের পোস্টার কালার, পেনসিল, কাগজ, ইরেজার, তুলি।

প্রক্রিয়া : প্রথমে মাটির ফুলদানিটি মিহি সিরিষ কাগজ দিয়ে ঘষে নিতে হবে। এর ফলে ফুলদানিটির উপরিতলে কোনো দানা বা উঁচুনীচু অংশ থাকলে তা মসৃণ হয়ে যাবে। ফুলদানিটি এবার কয়েক ঘন্টা জলে ভিজিয়ে রাখতে হবে। মাটির পাত্র অঙ্কনের পূর্বে ভিজিয়ে রাখলে তার উপর সুন্দরভাবে রং ধরে। এরপর ফুলদানীটিতে কী রঙ হবে তা ঠিক করে নিতে হবে। সাধারণত মাটির বাড়ির দেয়ালের ওপর ওয়ারলি আঁকা হয় বলে পাত্রের রঙ মাটির দেয়ালের মতো করা যেতে পারে। এছাড়া ছাত্রাছাত্রীরা তাদের খুশিমতো পাত্রের রঙ বাছতে পারে। চালের গুঁড়ো দিয়ে ওয়ারলি দেয়াল চিত্র অঙ্কন করা হয় বলে ওয়ারলি

চিত্র অঙ্কনের জন্য সাদা রঙ নির্বাচন করাই শ্রেয়। এবার পুরো ফুলদানিটি পছন্দমতো রঙ দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। লক্ষ রাখতে হবে সব জায়গায় যেন সমান করে রঙ লাগানো হয়। কোথাও যেন রঙের দাগ বা তুলির দাগ না পড়ে। এই কারণে খুব সাবধানে, ধৈর্য সহকারে রঙ করা প্রয়োজন। যতক্ষণ রঙ পুরো না শুখায় ততক্ষণ ফুলদানিটি রেখে দিতে হবে। এই সময় ছাত্রাছাত্রীরা যেন তাড়াহুড়ো না করে, কারণ রঙ ভেজা থাকলে তার ওপর অঙ্কন করলে তলার রঙ ধেবড়ে গিয়ে অঙ্কনটি নষ্ট হয়ে যাবে।

ছাত্রাছাত্রীরা ফুলদানির ওপর কী আঁকা হবে তা খসড়া করে নিয়ে ফুলদানির ওপর আঁকাটি পেনসিল দিয়ে হাল্কা হাতে আঁকতে হবে। ওয়ারলি চিত্রের অবয়ব আঁকা যেহেতু অত্যন্ত সহজ তাই ছাত্রছাত্রীরা অনায়াসে বিভিন্ন ভঙ্গীমায় অবয়ব আঁকতে পারবে। এরপর সরু তুলি দিয়ে ফাইনাল আঁকাটি ধৈর্য ধরে আঁকতে হবে। আঁকা শেষ হয়ে যাবার পর একটি পাত্রে ফেভিকল জল দিয়ে পাতলা করে গুলে পুরো ফুলদানীটির ওপর প্রলেপ দিয়ে দিলে ফুলদানীটি উজ্জ্বল দেখায় এবং রঙগুলিও অপেক্ষাকৃত বেশি স্থায়ী হয়।

❖ ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্রছাত্রী দ্বারা ওয়ারলি চিত্রকর্মের মাধ্যমে নির্মিত প্রোজেক্ট

○ সরা অঙ্কন

উপকরণ : মাটির সরা, পছন্দমতো পোস্টার রং, কাগজ, পেনসিল, ইরেজার, তুলি

প্রক্রিয়া : যেভাবে মাটির ফুলদানিটি আঁকা হয়েছে সেই ভাবেই মাটির সরা আঁকতে হবে।

❖ সপ্তম শ্রেণির ছাত্রছাত্রী দ্বারা ওয়ারলি চিত্রকর্মের মাধ্যমে নির্মিত প্রোজেক্ট

○ কার্ড তৈরি

উপকরণ : সাদা খাম, কার্ড, পেনসিল, ইরেজার, সরু-তুলি ও কালো পোস্টার রঙ, কালো স্কেচ পেন।

প্রক্রিয়া : বাজারে খাম শুদ্ধ সাদা কার্ড কিনতে পাওয়া যায়। সেই রকমই কার্ড কিনে নিতে হবে। কার্ড ও খাম ধবধবে সাদা হয় বলে ছাত্রাছাত্রীরা যেন সাবধানে কার্ড ও খাম নিয়ে কাজ করে। যাতে তাতে কোনোরকম ময়লা বা রঙ না

Scanned with CamScanner

লাগে। কার্ডের চারপাশে একটি এমবস করা বর্ডার থাকে। সেই বর্ডার ধরে একটি সুন্দর পরিষ্কার কালো বর্ডার এঁকে দিতে হবে। এবার বর্ডারের ভেতরের অংশটির মাপ ধরে ওয়ারলির ছবি পেনসিলে এঁকে নিতে হবে। পেনসিলে আঁকার সময় কার্ড ময়লা হয়ে গেলে ইরেজার দিয়ে পরিষ্কার করে মুছে নিতে হবে। এরপর পেনসিলের খসড়া ধরে সরু তুলি দিয়ে কালো রঙ করতে হবে। লক্ষ রাখতে হবে আঁকা থেকে যেন রঙ বেরিয়ে না যায়। সাদা কার্ডের ওপর কালো দিয়ে আঁকা ওয়ারলি চিত্র অত্যন্ত সুন্দরভাবে ঝকঝকে হয়ে ফুটে উঠবে। কার্ড আঁকা শেষ হয়ে গেলে খামের পালা। খামের কোণে একটি ওয়ারলি অবয়ব আঁকতে হবে। খামের কাগজ পাতলা বলে এখানে রঙ দিয়ে আঁকলে খামটি নষ্ট হয়ে যেতে পারে তাই খামের ওপর কালো স্কেচপেন দিয়ে আঁকাটাই শ্রেয়।

❖ অষ্টম শ্রেণির ছাত্রছাত্রী দ্বারা ওয়ারলি চিত্রকলার মাধ্যমে নির্মিত প্রোজেক্ট :

○ ক্যালেন্ডার

উপকরণ : আঁকার জন্য মোটা কার্টিজ পেপার, পোস্টার, রঙ, তুলি, পেনসিল, ইরেজার

★ প্রক্রিয়া বা পর্যায় :

১ম পর্যায় : ছাত্রছত্রীরা বছরের প্রথম সপ্তাহে তাদের শ্রেণিকক্ষকে সুশোভিত করার জন্য ক্যালেন্ডার বানানোর প্রকল্প গ্রহণ করতে পারে। তারা প্রত্যেক মাসের জন্য একটি করে চিত্রসহ মাসের ক্যালেন্ডার অঙ্কন করবে। অর্থাৎ একটি ক্যালেন্ডারে বারো খানি চিত্রশোভিত পাতা থাকবে। তাহলে শ্রেণিকক্ষের অনেক ছাত্রছাত্রী ক্যালেন্ডার অঙ্কনে অংশগ্রহণ করতে পারে। একটি মাসের ক্যালেন্ডার বানাতে কমপক্ষে দুজন ছাত্রছাত্রী প্রয়োজন। একজন ক্যালেন্ডারের ওপরের চিত্র শোভিত অংশটি অঙ্কন করবে ও অন্যজন তলার তারিখের অংশটি অঙ্কন করবে।

২য় পর্যায় : ক্যালেন্ডারের একটি মাসের পাতার জন্য কার্টিস পেপার মাপে কেটে নিতে হবে। এইবার কার্টিস পেপারটিকে দুটি অংশে ভাগ করে নিতে হবে। উপরের অংশের অর্থাৎ চিত্রশোভিত অংশের মাপ হবে ও নীচের তারিখ লেখা অংশের মাপ হবে।

৩য় পর্যায় : কার্টিস পেপারটি ক্যালেন্ডারের মাপে কেটে নেওয়ার পর পুরো পাতাটির চারপাশ ধরে ১" মাপে বর্ডার চিহ্নিত করে তার ভেতরে ওয়ারলি চিত্রশৈলী ধরনের বর্ডার আঁকতে হবে। ওপরে ও নীচের অংশটিকে পৃথক করে নেওয়ার জন্য এখানেও বর্ডারের নকশাটি আঁকলে সুন্দর দেখাবে।

৪র্থ পর্যায় : এবার ক্যালেন্ডারের পাতায় দুটি স্পষ্ট প্যানেল তৈরি হয়ে যায়। ওপরের অংশে ওয়ারলি চিত্রকলা অঙ্কন করে সুন্দরভাবে রঙ করতে হবে। পৃষ্ঠভূমির রঙ গাঢ় করলে অবয়বগুলিকে হাল্কা রঙ করলে ফুটে উঠবে। ঠিক একইভাবে পটভূমিকা হাল্কা রঙের হলে অবয়বগুলিকে গাঢ় রঙ আঁকলে ভালো লাগবে।

৫ম পর্যায় : সাধারণত ক্যালেন্ডারে লাল ও কালো দিয়ে তারিখ লেখা হয়। যে তারিখ লিখবে সে মাসের নাম, দিনের নামগুলি সঠিকভাবে চিহ্নিত করবে। ছুটির দিনগুলি লাল দিয়ে লিখতে হবে। লক্ষ রাখতে হবে প্রতিটি সংখ্যা যেন সমান মাপের হয়। ছাত্রছাত্রীরা যদি চায় তাহলে সংখ্যাগুলি নিখুঁতভাবে আঁকার জন্য পুরোনো কোনো ক্যালেন্ডার থেকে সংখ্যাগুলি ট্রেস করে নিতে পারে। একটি মাসের তারিখ লেখা শেষ হওয়ার পর প্রথমে ও শেষে কতকগুলি খোপ খালি থাকে। এই ফাঁকা স্থানে ওপরে আঁকা ওয়ারলি চিত্রের কোনো মোটিফ বেছে নিয়ে আঁকলে ভালো লাগবে।

৬ষ্ঠ পর্যায় : ক্যালেন্ডারের প্রতিটি পাতা আলাদা করে তৈরি করলে প্রতিটি মাসে একটি করে ক্যালেন্ডারে পাতা শ্রেণিকক্ষে ঝোলানো যাবে, ক্যালেন্ডারের অন্য পাতাগুলি ধুলো পড়ে নষ্ট হবে না। প্রতিটি ক্যালেন্ডারের পাতার পেছনে একটি পাতলা কার্ডবোর্ড আটকে তাতে একটি দড়ির লুপ দিলে ক্যালেন্ডারটি ঝোলানোর জন্য তৈরি হয়ে যাবে। ক্যালেন্ডার ঝোলার পর একটি বড়ো সমস্যা হল হাওয়া দিলে ক্যালেন্ডার উড়তে থাকে, তাতে ক্যালেন্ডারটি নষ্ট হয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে। তাই ক্যালেন্ডারের তলাতেও একটি পাতলা পিচবোর্ডের ফালি আটকে দিলে আর ক্যালেন্ডারটি ওড়ে না।

❖ নবম শ্রেণির ছাত্রছাত্রী দ্বারা ওয়ারলি চিত্রকলার মাধ্যমে নির্মিত প্রোজেক্ট :

○ পোশাকে ফেব্রিক অঙ্কন

উপকরণ : সাদা গেঞ্জি, বা সাদা পাঞ্জাবী বা সাদা ওড়না বা যে কোনো সাদা রঙের পোষাক। (পোষাক সুতির হওয়াই বাঞ্ছনীয়), কার্বন পেপার, পেনসিল, কালো ফেব্রিক, পেন।

Scanned with CamScanner

● **প্রক্রিয়া বা পর্যায় :**

১ম পর্যায় : সাদা পোশাকটি কেচে তা থেকে মাড় ও ময়লা তুলে ফেলতে হবে। শুখিয়ে যাবার পর ইস্ত্রি করে পোশাকের কুঞ্চনগুলি অপসারিত করে মসৃণ করে নিতে হবে।

২য় পর্যায় : এরপর পোশাকের ওপর ওয়ারলি চিত্রকলা কার্বন পেপার দিয়ে ট্রেস করে নিতে হবে। লক্ষ রাখতে হবে যাতে কার্বন পেপারের দাগ পোশাকের ওপর না লাগে।

৩য় পর্যায় : এরপর কাপড়ের ওপর এমব্রয়ডারি ফ্রেমে আটকে আঁকাটি টানটান করে রাখতে হবে। কাপড়ের তলায় একটি প্লাস্টিক রাখতে হবে, না হলে ওপরের রঙ নীচের কাপড়ে লেগে যেতে পারে।

৪র্থ পর্যায় : এরপর ফেবিক পেন দিয়ে ছবিটি আঁকতে হবে। ফেব্রিক পেন দিয়ে আঁকার সুবিধা হল-এটি চালনা করা অত্যন্ত সুবিধাজনক ও ফেব্রিক পেস্ট এর মতো ধেবড়ে যায় না। আর তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যায়।

৫ম পর্যায় : এরপর ফ্রেম খুলে নিলেই ওয়ারলি ছবি অঙ্কিত পোশাক তৈরি হয়। সাদা পোশাকের ওপর কালো রঙে অঙ্কিত ওয়ারলি চিত্র অত্যন্ত সুন্দর লাগবে। নিজের সাধারণ পোশাককে এইরকম ওয়ারলি চিত্র অঙ্কন করে ছাত্রছাত্রীরা সুন্দর ও অভিনব করে তুলে অন্যদের তাক লাগিয়ে দিতে পারবে। পোশাকের ওপর ফেব্রিক পেন দিয়ে ওয়ারলি চিত্র অঙ্কন ছাত্রছাত্রীদের কাছে অত্যন্ত উৎসাহব্যঞ্জক হয়ে উঠবে ও তাদের অন্যান্য পোশাকগুলিকেও নতুনভাবে সাজিয়ে তুলতে পারবে।

কর্মশালার বিবরণী প্রস্তুতকরণ— ১

সৃজনশীল শিল্পকর্ম : ওয়ারলি চিত্রকলা
শ্রেণি : দশম শ্রেণি
কাজের নাম : বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে প্রাচীর অঙ্কন
ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা : ৫০ জন
উপদল : ১০ টি
সময়কাল : ১০ দিন

ebook.dascoaching.in

কাম্য শিখন সামর্থ্য	
জ্ঞানমূলক	● শিক্ষার্থীরা ওয়ারলি চিত্রকলা তৈরীর উপকরণগুলি সম্পর্কে বলতে পারবে ● ওয়ারলি তৈরীর ধাপগুলি সম্পর্কে জানতে পারবে। ● প্রত্যেকটি উপকরণের কাজের প্রকৃতি সম্পর্কে বলতে পারবে।
বোধমূলক	● ওয়ারলি তৈরির পদ্ধতি সম্পর্কে জানবে। ● ওয়ারলি শ্রেণিবিভাগ করতে পারবে।
প্রয়োগমূলক	● বিদ্যালয় সৌন্দর্য্য বৃদ্ধিতে সাহায্য করবে। ● ওয়ারলি ব্যবহার কোন কোন ক্ষেত্রে করা যায় তা প্রয়োজনে ব্যবহার করবে।
দক্ষতামূলক	● দলগতভাবে প্রকল্পটি সম্পাদন করার ফলে পারস্পরিক বোঝাপড়া ও সহযোগিতা বাড়বে। ● একটি দলগত প্রকল্পের পরিকল্পনা কিভাবে সম্পাদন করতে হয় সেই জ্ঞানটিও অর্জন করবে। ● ওয়ারলি ড্রইং ঠিকভাবে করতে পারবে।

Scanned with CamScanner

ওয়ারলি

মহারাষ্ট্রে পশ্চিমঘাট পর্বতমালায় নাসিক ও ধুলে অঞ্চলে এই ওয়ারলি উপজাতিদের বাস। এছাড়া গোয়া, দমন, দিউতে এদের দেখা মেলে। ওয়ারলি শব্দটি এসেছে ওয়ারল থেকে, যার অর্থ জমির একটি টুকরো বা ক্ষেত্র। ওয়ারলি আদিবাসীরা নিজস্ব ধর্মবিশ্বাস ও সংস্কৃতি পালন করে। যদিও বর্তমানে তার মধ্যে আধুনিকতার ছোঁয়া লেগেছে।

সাধারণত বাড়ির দেয়ালের ওপর বা আঙিনায় বাড়ির মহিলারা চালের গুড়ো জলে মিশিয়ে সাদা তরল রঙ তৈরি করে ছবি আঁকেন। সরু বাঁশের কাঠি, নরম বাহারু গাছের ডাল, খড়ের কাঠিকে তাঁরা তুলি হিসাবে ব্যবহার করেন। সাধারণত বাড়ির আঙিনা বা দেয়াল গোবর মাটি দিয়ে মসৃণ করে লেপে তার ওপর ছবি আঁকা হলেও কখনও কখনও স্থানীয়ভাবে প্রাপ্ত কালচে লাল রঙের মাটি বা গেরু মাটির ওপর সাদা রঙ আরো সুন্দরভাবে ফুটে ওঠে। ওয়ারলি আদিবাসীরা মনে করেন এই চিত্র রচনার মধ্যে একটি শুভ মাঙ্গলিক ক্ষমতা আছে যা অশুভ শক্তিকে বিতাড়ন করে।

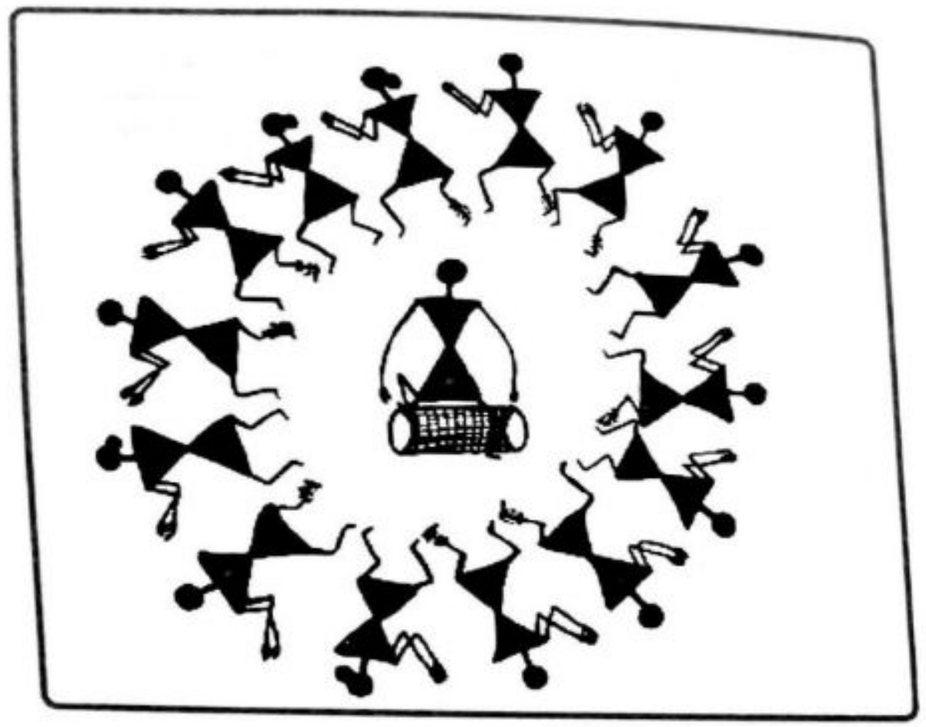

ঐতিহ্যবাহী ওয়ারলি চিত্রের কেন্দ্রে একটি চতুষ্কোণ ক্ষেত্র অঙ্কিত হয়, যাকে দেবচক বলা হয়। 'চক' শব্দটির অর্থ চৌকো। দেবচকের মধ্যে অঙ্কিত হয় ভূমিদেবী পালঘাট। তার সঙ্গে আঁকা হয় চাঁদ, সূর্য, চিরুনি, সিড়ি, তোরপা (বীন জাতীয় বাদ্যযন্ত্র যা ওয়ারলি আদিবাসীরা বানায় ও বাজায়) ও জঙ্গালি (তারের বাদ্যযন্ত্র), এছাড়াও দেবচকে আঁকা হয় অশ্বারোহী এক দেবতা যার পাঁচটি মাথা।

উপকরণ : দেওয়াল রং করার এনামেল পেন্ট, দেয়াল রং করার তুলি, রং, ট্রেসিং পেপার, সিরিজ কাগজ।

★ **কর্মপদ্ধতি :**

★ **প্রাক্ পরিকল্পনা :** প্রথমে ওয়ারলি নিয়ে আলোচনা করা হল অর্থাৎ কাকে বলে, ইতিহাস। এরপর বোর্ডে বিভিন্ন ধরনের ওয়ারলি ড্রইং করা হল। এরপর উপকরণ অর্থাৎ কী কী সরঞ্জাম আনবে তা শিক্ষার্থীরা খাতায় লিখে নেবে।

১ম পর্যায় : এর আগে পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীরা ব্যক্তিগত উদ্যোগে প্রকল্পগুলি সম্পাদন করেছে কিন্তু দশম শ্রেণির ছাত্রছাত্রীরা এই প্রকল্পটি দলগতভাবে সম্পাদন করবে। এর ফলে তাদের পারস্পরিক বোঝাপড়া ও সহাযোগিতা বাড়বে এবং একটি দলগত প্রকল্পের পরিকল্পনা কীভাবে সম্পাদন করতে হয়, সেই জ্ঞানটিও অর্জন করবে। এই প্রকল্পটিতে দশম শ্রেণির সমস্ত ছাত্রছাত্রীরাই যোগদান করবে। প্রথমেই একজন দলপতি নির্বাচন করতে হবে, যার মধ্যে নেতৃত্ব দেওয়ার ও পরিচালনা করার ক্ষমতা আছে। শ্রেণিশিক্ষিকা এই দলপতি কে হবে তা নির্বাচন করে দেবেন অথবা ছাত্ররা নিজেরাও তাদের দলপতি নির্বাচন করতে পারে।

২য় পর্যায় : দলপতি পুরো কথাটির পরিকল্পনা করে কে কোন কাজ করবে বা কাজের অংশ করবে তা ঠিক করে দেবে। প্রথমে দেয়ালের কোন অংশটিতে আঁকা হবে তা চিহ্নিত করতে হবে। এই দেয়ালটির পুরোনো রঙ মোটা দানার সিরিশ কাগজ দিয়ে ঘসে তুলে ফেলতে হবে। পুরোনো রঙ উঠে গেলে তা ভালোভাবে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিতে হবে। এই পরিষ্কার দেয়াল এবার অঙ্কনের জন্য প্রস্তুত।

৩য় পর্যায় : ওয়ারলির দেয়াল চিত্রের পটভূমিকা হয় সাধারণ মাটির দেয়াল বা স্থানীয় কালচে লাল মাটির প্রলেপযুক্ত মাটির দেয়াল। এই কালচে লাল রঙটিকে পটভূমিকার রঙ হিসেবে বেছে নেওয়া যেতে পারে। চিত্রের পটভূমিকা হিসেবে কালচে লাল রঙের এনামেল রঙ দিয়ে দেয়ালটি রঞ্জিত করতে হবে। পটভূমিকার রঙ একেবারে সমতলীয় ফ্ল্যাট হবে। চালের গুঁড়ো থেকে প্রস্তুত সাদা রঙ দিয়ে ওয়ারলি চিত্র অঙ্কিত হয় বলে সাদা রঙেই ওয়ারলি চিত্রটি অঙ্কন করা শ্রেয়।

Scanned with CamScanner

৪র্থ পর্যায় : এইবার দেয়ালের মাপ অনুযায়ী ওয়ারলি চিত্রের খসড়া কাগজে এঁকে নিতে হবে। এই খসড়া চিত্রটি মোটা ট্রেসিং পেপারে আঁকতে হবে। এবার আসনের বহিরেখা ধরে আলপিন দিয়ে ফুটো ফুটো করতে হবে। ফুটো করার সময় সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে যাতে ট্রেসিং পেপারটি ছিঁড়ে না যায়। এবার নীলরঙের গুঁড়ো দিয়ে একটি কাপড়ের পুটলি করে তা নারকেল তেলে সিক্ত করতে হবে। ট্রেসিং পেপারটি দেওয়ালের নির্দিষ্ট স্থানে টেপ দিয়ে ভালোভাবে আটকে দিতে হবে।

৫ম পর্যায় : এরপর ট্রেসিং পেপারের ওপর তেলে ভেজা রঙের পুটলিটি ঘসলে ট্রেসিং পেপারে করা ফুটো দিয়ে রঙ দেয়ালে লেগে গিয়ে আঁকাটি দেওয়ালে ট্রেস হয়ে যাবে। এরপর সাদা রঙ দিয়ে ছবিটি এঁকে নিতে হবে। আঁকা হয়ে যাবার পর আঁকাটি ঘিরে বর্ডারের মতো পটি আঁকলে আঁকা সম্পূর্ণ হয়ে যাবে।

৬ষ্ঠ পর্যায় : এবার ছবির পাশে কোন কাজটি কে সম্পাদন করেছে তা লিখে রাখতে হবে। এর ফলে প্রত্যেক ছাত্রছাত্রী এই প্রকল্প সম্পাদনে সমান গুরুত্ব পাবে এবং দলগত কাজ সম্পাদনে উৎসাহিত হবে।

মূল্যায়ন : প্রত্যেকটি ওয়ারলি ভালোভাবে দেখে মূল্যায়ন করে নিতে হবে।

This E-Book Download From>>

www.ebook.dascoaching.in

Follow Our B.Ed Related Website>>

www.dascoaching.in

(12) সৃজনশীল সিডি কভার বা বইয়ের প্রচ্ছদ তৈরি (Develop a creative design based on your choice for CD Cover or Book cover) :

◎ সিডি কভার তৈরি (Macking CD Cover) :

বিদ্যালয়ে থিম Song, কোন প্রোজেক্ট (Project) কোনো Document প্রভৃতির জন্য CD ব্যবহার করা হয়। এই সকল CD-র কভার ছাত্রছাত্রীরা নিজেরাই তৈরি করতে পারে।

উপকরণ : আইভরি পেপার অথবা হ্যান্ডমেড পেপার, ছুরি, ওয়াটার কালার (জল রঙ), তুলি, পেনসিল, রবার, স্কেল।

পদ্ধতি :

- প্রথমে CDটির মাপ নিতে হবে। এরপরে কাগজের উপর তার থেকে বড়ো মাপের Front, Back ও Spine সহ মাপ নিতে হবে।
- বিষয়ের ওপর নির্ভর করে একটা সুন্দর ছবি পেনসিলের সাহায্যে Front-এ এঁকে ফেলতে হবে।
- জল রঙ ও তুলির সাহায্যে সুন্দর করে অঙ্কন করে চিত্রটিকে রঙ করে ফেলতে হবে।
- CD-এর বিষয়টিকে সুন্দর ক্যালিগ্রাফির সাহায্যে দৃষ্টিগোচর সৃষ্টি করতে হবে।
- পশ্চাদ ভাগে একটি সুন্দর রঙ ব্যবহার করতে হবে। এই অংশেই Logo হিসেবে বিদ্যালয়ের নাম এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ব্যবহৃত হয়।
- সম্মুখে, পশ্চাদে এবং পুটটিকে ভাল করে ভাঁজ করে আঠা ব্যবহার করে মোড়কটি নির্মাণ করতে হবে।

Scanned with CamScanner

✪ বুক কভার তৈরি (Macking Book Cover) :

বুক কভার তৈরি করার পদ্ধতি : বিদ্যালয়ে বার্ষিক পত্রিকা, সম্মানীয় কোনো কবির লেখা বই কোনো লোকশিল্পের ওপর নির্মিত তথ্যকেন্দ্রীক কোনো বই প্রভৃতির প্রচ্ছদ নির্মাণ শিক্ষার্থীদের দ্বারা করানো যেতে পারে।

উপকরণ : শর্টিস পেপার, পোস্টার কালার (Poster Colour) নানা মাপের দুলি, প্যালেট, পেনসিল, রবার, স্কেল, ছুড়ি।

পদ্ধতি :

- বইয়ের পৃষ্ঠার মাপ অনুযায়ী কার্টিস পেপারকে সম্মুখ ও পশ্চাদ্ এই দুই অংশকে স্কেল পেন্সিলের সাহায্যে পরিমাপ করে নিতে হবে।
- পৃষ্ঠার সংখ্যার ওপরে Spine এর মাপ নির্ভর করে।
- বইয়ের বিষয়ের ওপর নির্ভর করে কয়েকটি Layout তৈরি করে ফেলতে হবে। এরপর Layout-গুলো থেকে একটি সুন্দর Layout বেছে নিয়ে মূল নক্সাটি অঙ্কন করে ফেলতে হবে।
- প্রচ্ছদে অঙ্কন হয়ে যাওয়ার পর পোস্টার বা অস্বচ্ছ জল রঙের সাহায্যে সম্পূর্ণ ছবিটিকে রঙিন করে তুলতে হবে।
- অলংকরণ করার সময় মাথায় রাখতে হবে বেশি অলংকৃত না হয়ে যায় তাতে নান্দনীকতা কমে যায়।
- অলংকরণ হয়ে যাওয়ার পর প্রচ্ছদের নামটি সুন্দর ক্যালিগ্রাফির সাহায্যে বড় করে সম্মুখভাগে লিখে ফেলতে হবে। এর নীচেই লেখকের নাম তার শেষে ছোটো হাতের সুন্দর ক্যালিগ্রাফির সাহায্যে তৈরি করতে হবে।
- সম্পূর্ণ কাজটা হয়ে যাওয়ার পর নির্দিষ্ট মাপ অনুযায়ী প্রচ্ছদটিকে কেটে ফেলতে হবে।

(13) নকশা বা ছবির উপর কোলাজের কাজ (Develop a design or picture based on collage work) :

কোলাজ শব্দটি ফরাসী শব্দ বা coller বা কোলে থেকে এসেছে। কোলে শব্দটির অর্থ সাঁটা বা আটকানো যার বিশেষ্য হল কোলাজ। অর্থাৎ কোলাজ হল এমন একটি শিল্পবস্তু যা অনেক ধরনের বস্তু সেঁটে নির্মিত হয়েছে। সাধারণ চিত্র বলতে বোঝায় কাপড়, কাগজ বা যে কোন দ্বিতলীয় সমতল ক্ষেত্রের ওপর রঙ ও তুলি দ্বারা নির্মাণ করা। কিন্তু কোলাজের ক্ষেত্রে পট বা সার্পোটের ওপর বিভিন্ন বস্তু সেঁটে, আটকে, এঁকে চিত্র নির্মাণ করা হয়। যদিও ২০০ খ্রিস্টাব্দে চীনে কাগজ আবিষ্কার হওয়ার পর কোলাজের কারন কৌশল চীনে ব্যবহৃত হয়েছিল, কিন্তু আধুনিক শিল্প বিশেষজ্ঞদের মতে কোলাজ একান্তভাবে আধুনিক যুগের শিল্প উপাদান। ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে মে মাসে পিকাসো একটি কোলাজ করেন, যার মাধ্যমে সিন্থেটিক কিউবিজনের সূত্রপাত হয়। এর মাধ্যমে তিনি ইউরোপীয় শিল্পকলার প্রথম ভিন্ন মাধ্যমকে সমন্বিত করে কোলাজের সূত্রপাত করেন। 'কোলাজ' শব্দটিও পিকাসোর অবদান। এই ক্ষুদ্র অথচ যুগান্তকারী শিল্পকর্মটির নাম 'স্টিল লাইফ লাইফ উইথ চেয়ার কেনিং'। এই ছবিতে পিকাসো চেয়ারের বুনোট বুনোট ছাপা একটি ওয়েল ক্লথের টুকরোকে ডিম্বাকৃতিতে কেটে নিয়ে তার পাশে মোটা দড়ি দিয়ে বর্ডার দিলেন এবং অয়েল ক্লথের ওপর তিনি কিছু অংশ তেল রঙে আকলেন। এখানে তিনি আঁকলেন jou শব্দটি, যার অর্থ খেলা। এখানে পিকাসো একমই অপ্রচলিত বস্তু, যাকে বাস্তব জীবনে অন্য কাজে ব্যবহার করা হয়, কিন্তু চিত্রে ব্যবহৃত হয় না, সেগুলিকে চিত্র নির্মাণের উপকরণ হিসাবে ব্যবহার করলেন এবং তার প্রচলিত অর্থটি বদলে দিলেন। বলা যেতে পারে এটি একটি যুগান্তকারী উদ্ভাবন, যা আধুনিক যুগের শিল্পকলার ওপর সুদুর প্রভাব বিস্তার করেছিল। পিকাসো এই নতুন শিল্পকর্মে চিত্রে অপ্রচলিত বস্তুগুলিকে তাদের প্রচলিত ব্যবহার থেকে মুক্ত করে নতুন অর্থে একত্রিভূত করলেন এবং সৃষ্টি করলেন এক নতুন শিল্পভাষা যা ভাস্কর্য ও চিত্রের মধ্যেকার সীমারেখাকে ঝাপসা করেছিল।

বিভিন্ন ধরনের বস্তুকে সমন্বিত করে সৃষ্টি শিল্প বস্তুকে কোলাজ বলা হয়। যখন কেবলমাত্র বিভিন্ন ধরনের বিভিন্ন টেক্সচারের কাগজকে ব্যবহার করা হয় তখন তাকে পাপিয়ে কোলে (Papier Colle) বা পেপার কোলাজ বলা হয়। ১৯১২ সালে সেপ্টেম্বর মাসে ব্রাক প্রথম পেপার কোলাজ নির্মাণ করেন যার নাম Fruit disk and glass এখানে ব্রাক কাঠের আঁশ সম্বলিত ছাপ ওয়াল পেপারের টুকরো কাগজের ওপর আটকে ছিলেন এবং এর ওপর চারকোল দিয়ে স্টীল লাইফের ছবি এঁকেছিলেন। এরপর পিকাসো 'গিটার, সিট মিউজিক এবং ওয়াইন গ্লাস' নামক পেপার কোলাজটি করেন। এই শিল্পকর্মটির বাঁ দিকের তলায়

Scanned with CamScanner

খবরের কাগজের টুকরো সাঁটা যাতে লেখা ''The battle is joined'' পিকাসো যেন শিল্পের প্রচলিত ধারাগুলির বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু হয়েছে সেই বার্তাটি দর্শকের কাছে পৌঁছে দিলেন। এখানেও তিনি Journal শব্দটিকে টুকরো কেটে নিয়ে jou শব্দটি রেখেছিলেন। তিনি এই কোলাজটির উপকরণ হিসাবে বহুদিনের ডেকরিটিভ ওয়াল পেপারের ব্যবহার করেন। খবরের কাগজ, শিট মিউজিকের টুকরো যোগ করে টেক্সচারের বৈচিত্য আনেন। এইভাবে পিকাসো ও ব্রাক কিউবিস্ট কোলাজের মাধ্যমে চিত্রকে দৃষ্টি সত্য করে ধারনাসত্যে উত্তীর্ণ করেন এবং তাকে craftsmanship থেকে মুক্ত করেন যা বর্তমান আধুনিক শিল্পের ভিত্তিভূমি।

কোলাজ করার জন্য উপকরণ : বিভিন্ন ধরনের রঙীন কাগজ, বিভিন্ন ধরনের ম্যাগাজিন ও খবরের কাগজে ছাপা ছবি, বিভিন্ন টেক্সচারের কাগজ (টিস্যু কাগজ, করোডোটেড কাগজ পিচবোর্ড, হ্যান্ডবোর্ড পেপার), খুঁজে পাওয়া বিভিন্ন বস্তু যেমন শুখনো ফুল, ঘাস, ঝিনুক, শুখনো ফলের বীজ, বালি, কাঠের ছাল, দেশলাই কাঠি প্রভৃতি। তবে পেপার কোলাজে কেবল মাত্র কাগজই ব্যবহার করা হয়। কোলাজ চিত্রের সর্বাপেক্ষা বড় সুবিধা হল হাতের কাছে পাওয়া ফেলা ছেঁড়া যে কোন কিছু দিয়েই কোলাজ করা যেতে পারে।

❖ পঞ্চম শ্রেণির জন্য কোলাজ নির্মাণের প্রকল্প :

✪ ছবি

উপকরণ : বিভিন্ন রঙের রঙ্গীন মার্বেল পেপার, কাঁচি, ফেভিস্টিক ও মোটা কার্টিজ পেপারের $^{১}/_{৪}$ অংশ.

● **প্রক্রিয়া :** কার্টিজ পেপারটিকে ভালোভাবে বোর্ডের সাথে আটকে নিতে হবে। যে ছবিটি কোলাজ করা হবে তা খসড়া করে নিতে হবে। এবার ছবি অনুযায়ী কাগজগুলিকে কাঁচি দিয়ে সুন্দর করে কেটে নিতে হবে। যে আকারটি কাটা হবে তা রঙীন কাগজের ওপর ট্রেস করে নেওয়া যেতে পারে। তাতে কাগজটি নিখুঁত হবে। এবারে খসড়া ছবিটির ওপর কাটা রঙীন কাগজের টুকরো গুলো বসিয়ে দেখে নিতে হবে কোথাও কোন ভুল হয়েছে কিনা। কোন পরিবর্তন করতে হলে এই সময় করে নেওয়া উচিত কারণ কাগজ আটকানোর পর ভুল ধরা পড়লে সেই কাগজিটি াার তুলে ফেলা যায় না। আর তুললেও বিচ্ছিরি দাগ পড়ে যায়। তাই কাটিজ পেপারের ওপর কাগজ আটকানোর আগে কাটটি ঠিক হয়েছে কিনা দেখে নেওয়া উচিত। এবার আস্তে আস্তে খসড়া চিত্রানুযায়ী মূল কার্টিজ কাগজের ওপর কাগজগুলি সুন্দর করে আঠা দিয়ে

আটকাতে হবে। তরল আঠা ব্যবহার না করাই শ্রেয় কারন তরল আঠা ছড়িয়ে গেলে তা ছবিকে নোংরা করে দেয়। খুব সাবধানে আস্তে আস্তে কাগজগুলি আটকালেই কোলাজ সমাপ্ত। ছবির চারপাশ ধরে কাগজের সর পটি আটকে দিলে পুরো ছবিটিতে সুন্দর ফিনিশ আসবে।

❖ ষষ্ঠ শ্রেণির জন্য কোলাজ নির্মাণের প্রকল্প :

✪ কার্ড

উপকরণ : দোকান থেকে সাদা বোর্ড, রঙীন মার্বেল পেপার, টিস্যু পেপার ছোট কালো বোতাম, কাঁচি, ফেভিকুইক, ফেভিস্টিক।

● **প্রক্রিয়া :** কার্ডটিতে 3D সূর্যমুখী ফুলের কোলাজ করা হবে। প্রথমে একটি খসড়া কাগজে সূর্যমুখী ফুল এঁকে নিতে হবে। খসড়া চিত্র অনুযায়ী হলুদ কাগজে সূর্যমুখীর পাপড়িগুলি কেটে নিতে হবে। কিছু পাপড়ি বড় কাটতে হবে, কিছু পাপড়ি তার থেকে একটু ছোট আকারের কাটতে হবে। মূল কার্ডে সূর্যমুখী ফুলের বৃত্তাকার কেন্দ্রের চারপাশ ঘিরে বড় পাপড়িগুলি সাজিয়ে সাজিয়ে কেবল তলার অংশটি ফেভিস্টিক নিয়ে আটকে নিতে হবে। পাপড়িগুলি আটকানোর আগে মধ্যিখানের শিরা ধরে ভাঁজ করে নিলে আটকানোর পর তা কার্ড থেকে উচু হয়ে থাকবে। একইভাবে ছোট আকারের পাপড়িগুলিও বড় পাপড়ির ওপর রেখে কেবল তলার অংশটি বৃত্তাকার কেন্দ্রের চারপাশে আটকে দিতে হবে। খেয়াল রাখতে হবে বড় পাপড়ির ভাঁজ করা শিরের ওপর ছোট পাপড়ির ভাঁজ করা শিরটি মিলিয়ে বসবে। তা হলে সূর্যমুখী ফুলের পাপড়িগুলির স্তরদুটি সুন্দরভাবে ফুটে উঠবে। পাপড়িগুলি সাজানো হয়ে গেলে ফুলের মধ্যিখানে কালো বোতামটি ফেভিকুইক দিয়ে আটকে দিতে হবে। ফুল করা শেষ হয়ে গেলে কার্ডের চারপাশে কালো রঙের কাগজের পটি আটকে দিলে তা বর্ডারের মত সুন্দর লাগবে। সূর্যমুখী ফুলের বদলে ছাত্রছাত্রীরা অন্য কোন ফুলও বেছে নিতে পারে। এই ধরনের কোলাজে পপআপ ফেব্রিক পেন্টও প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবহার করা যেতে পারে, বিশেষত উচু হয়ে থাকবে এইরকম design এর ক্ষেত্রে।

Scanned with CamScanner

❖ সপ্তম শ্রেণির জন্য কোলাজ :

✪ শোপিস

উপকরণ : রঙীন ম্যাগাজিনের কাগজ, নানা রঙের ছাপা রঙীন কাপড়ের টুকরো (সুতির হলে ভালো হয়) ফেভিকলের টিউব ও ফেভিকলের কৌটো, ব্রাশ, যে-কোনো ধরনের কাগজের বাক্স বা কার্ডবোর্ডের মিষ্টির বাক্স।

● **প্রক্রিয়া :** সাদারণত উপহার দেওয়ার সামগ্রী আমরা রঙীন কাগজে মুড়ে সুদৃশ্য করে তুলি। কিন্তু আমরা যদি উপহার সামগ্রীর প্যাকিং বাক্সটিকে কোলাজের মাধ্যমে অলংকৃত করে তুলি তাহলে তা অভিনব হয়ে উঠবে। এই ধরনের গিফ্টবক্স অত্যন্ত সুন্দর দেখতে হলেও তা বানানো অত্যন্ত সহজসাধ্য। প্রথমে ম্যাগাজিনের পছন্দসই রঙীন কাগজের ছোট ছোট টুকরোয় ছিঁড়ে নিতে হবে। একইভাবে কাপড়ের টুকরোগুলিকে ছোট ছোট বিভিন্ন আকারে কেটে নিতে হবে। এবার ফেভিকলের টিউব দিয়ে বাক্সের ওপর আঠা লাগিয়ে টুকরো কাগজ ও কাপড়গুলি নানাবাবে সেঁটে দিতে হবে। এমন ভাবে কাগজ ও কাপড় লাগাতে হবে যাতে পুরো বাক্সটির উপরিতল ঢেকে যায়। কোথাও কোন ফাঁক না থাকে। লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে প্রতিটি কাগজ বা কাপড় সুন্দরভাবে আটকানো হয়, কোথাও কোন আলগা অংশ বা কোচকানো না থাকে। কাগজগুলি কোন নিয়ম মেনে না আটকালেই ভালো। বরং এলোমেলো ভাবে আটকানোর ফলে যে অক্সিডেন্টাল এফেক্ট তৈরি হবে সেটি এই ধরনের কোলাজের সৌন্দর্য্য। একটি ছোট বাটিতে ফেভিকল দুধের মত তরল করে গুলে মোটা ব্রাশের সাহায্যে পুরো বাক্সটির গায়ে লাগাতে হবে। এই প্রলেপটি শুকিয়ে গিয়ে পুরো বাক্সটিতে চকচকে প্রলেপ তৈরি করে যা বাক্সটির ওপর সুরক্ষাকারী আবরণ হিসাবেও কাজ করে। এই ধরনের গিফ্ট বাক্স তৈরি করা অত্যন্ত সহজসাধ্য প্রক্রিয়া হলেও এটির finishing ঠিক করে করা অত্যন্ত আবশ্যক, বিশেষত ধার ও কোনাগুলির ক্ষেত্রে। ধারের দিকে বাড়তি কাগজগুলিকে সুন্দর করে কাঁচি দিয়ে কেটে মিলিয়ে দিতে হবে বা ভিতরের দিকে মুড়ে দিতে হবে। বিশেষত গিফ্ট বাক্সের ঢাকনার ধারগুলি সুন্দরভাবে ফিনিশ করতে হয়। ছাত্রছাত্রীরা যদি নিজেরা করতে না পারে তা হলে শ্রেণীকক্ষের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক শিক্ষিকার সাহায্য নেওয়া উচিত।

❖ অষ্টম শ্রেণির জন্য কোলাজ :

✪ নিসর্গচিত্র

উপকরণ : নানা ধরনের নানা রঙের না টেক্সচারের কাগজ বা কাগজের টুকরো, কাঁচি, রঙীন ম্যাগাজিন, মোটা কার্টিজ পেপারের ১/৪ ফেভিকল টিউব প্রভৃতি।

প্রক্রিয়া : প্রথমে নিসর্গচিত্রটি একটি খসড়া করে নিতে হবে এবার নিসর্গচিত্রানুযায়ী রঙীন কাগজগুলি বেছে নিতে হবে। পুরো চিত্রটি খসড়া চিত্র থেকে ট্রেসিং পেপারে ট্রেস করে নিতে হবে। মূল কার্টিজ পেপারে ট্রেসিং পেপারে আঁকা চিত্রটি ট্রেস করে তুলে নিতে হবে। এইভাবে নিসর্গচিত্রের সমস্ত form গুলিকে নির্দিষ্ট কাগজে ট্রেস করে নিতে হবে। এইবার সমস্ত form গুলি রঙীন কাগজ থেকে কাঁচি দিয়ে কেটে নিয়ে খসড়া চিত্রের ওপর বসিয়ে ঠিক হয়েছে কিনা দেখে নিতে হবে। কোন ভুল হলে তখনই সংশোধন করে নিতে হবে। মূল কাগজের ওপর আটকানোর পর আর সংশোধন করা যায় না। নিসর্গ চিত্র নির্মাণের সময় বিভিন্ন টেক্সচারের কাগজ ব্যবহার করা যেতে পারে যেমন নদী বা জলের ঢেউ বোঝানোর জন্য যেখানে নীল ক্রেশ পেপার, বাড়ীর চাল বোঝানোর জন্য করোবোটেড বোর্ড, মেঘ বোঝানোর জন্য সাদা টিস্যু পেপার, বালি বোঝানোর জন্য সিরিস কাগজ প্রভৃতি। এইভাবে বৈচিত্রময় টেক্সচারের কাগজ ব্যবহার করে কোলাজ নির্মাণ করতে হবে। এই ধরনের কোলাজে সঠিক টেক্সচারের ও রঙের কাগজ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

❖ নবম ও দশম শ্রেণির জন্য কোলাজ :

✪ পূর্ণাঙ্গ বড় চিত্র

উপকরণ : নানা টেক্সচারের কাগজ, বোর্ড, হ্যান্ডমেড পেপার, নানা রঙীন ম্যাগাজিনের কাগজ, গ্রিটিংস কার্ড, নানা ধরনের বিজ্ঞাপনের পোস্টার, খবরের কাগজ ও নানাবিধ জিনিষ যেমন ঝিনুক, বালি, শুকনো ঘাস, পাতা, ফুল, নুড়ি পাথর, উল, দড়ি প্রভৃতি, ফেভিকলের আঠা, ব্রাশ মোটা কার্টিজ পেপার ১/২ সিট।

Scanned with CamScanner

● প্রক্রিয়া বা পর্যায় :

১ম পর্যায় : কোলাজের বিষয় হিসাবে যে কোন কিছু নির্বাচন করা যায়-নিসর্গচিত্র, প্রতিকৃতি বা স্টিল লাইফ বা কোন অবয়ব, পশু, পাখি, ফুল।

২য় পর্যায় : একটি কাগজের চিত্রটি রঙ দিয়ে বিস্তারিত ভাবে এঁকে নিতে হবে যা কোলাজ করার সময় গাইড হিসাবে কাজ করবে। কোন ফোটোগ্রাফ বা ছবি দেখেও কোলাজ করা যেতে পারে।

৩য় পর্যায় : এরপর মূল কাগজে ছবিটির একটি আউটলাইন করতে হবে। এরপর মূল চিত্রটির রঙ অনুযায়ী রঙীন কাগজগুলিকে বেছে নিতে হবে।

৪র্থ পর্যায় : এখানে কাঁচি দিয়ে আর কাটা হবে না। হাত দিয়ে কাগজ গুলি ছিঁড়ে ছিঁড়ে আটকাতে হবে। হাতে কাগজ ছেঁড়ার ফলে কাগজের ধারে একটি সাদা দাগ তৈরী হয় যা কোলাজেরই অংশ হয়ে ওঠে। কাঁচি দিয়ে কাটলে এই সাদা দাগটি আসে না। ছোট ছোট কাগজের টুকরো দিয়ে অবজেক্ট গুলিকেও আটকানো যেতে পারে। যেহেতু বড় ক্লাসের ছাত্রছাত্রীদের কোলাজ সম্বন্ধে পূর্বেই ধারনা হয়ে গেছে তাই তারা বড় ধরনের কোলাজচিত্র বানাতে অসুবিধাবোধ করবে না।

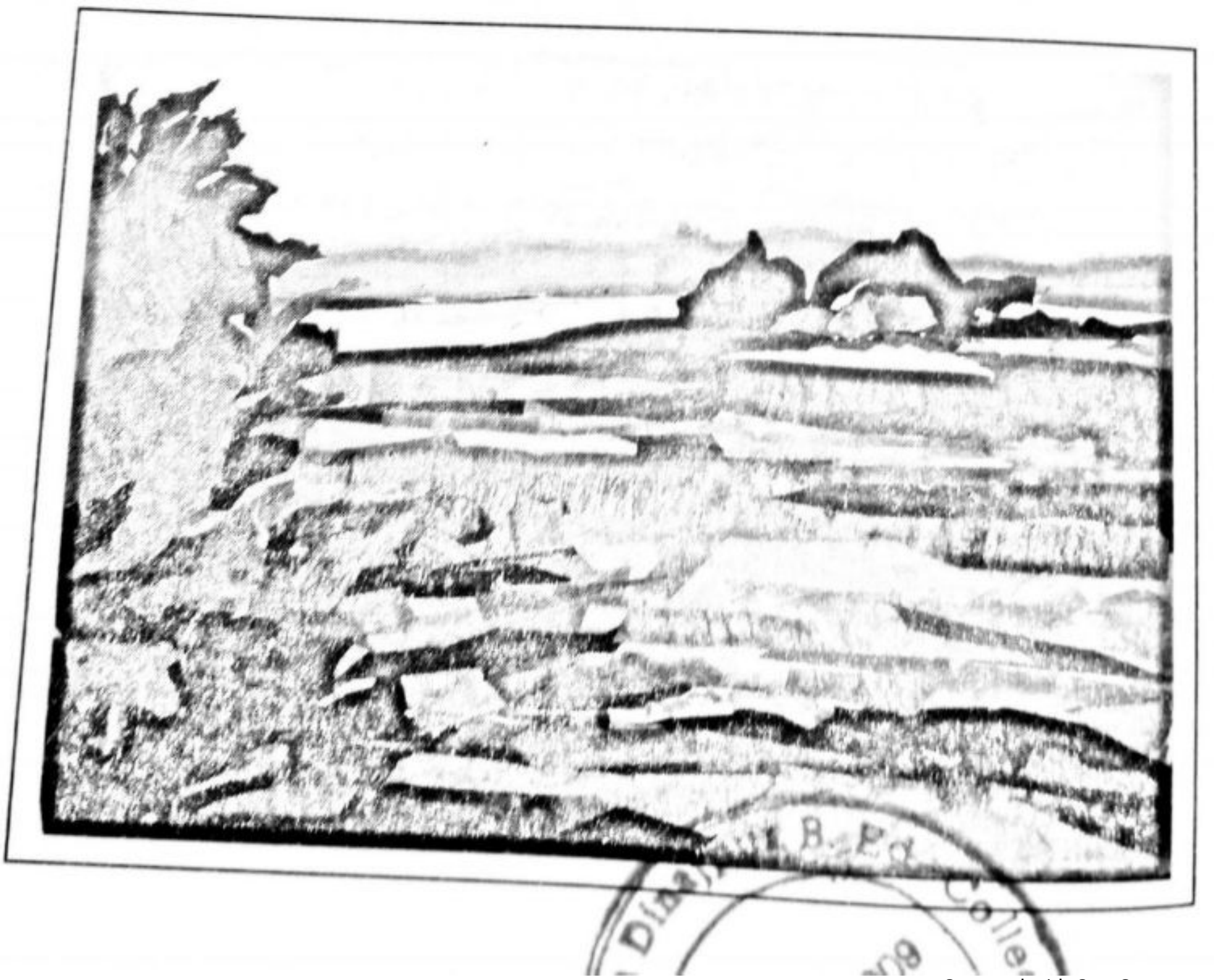

Scanned with CamScanner

আমাদের প্রকাশনায় B.Ed. (2 Years)-এর অন্যান্য বই

SEMESTER-I

- শিশু ও বিকাশ
  ড. বিজন সরকার
- সমকালীন ভারতবর্ষ ও শিক্ষা
  অধ্যাপক (ড.) দুলাল মুখোপাধ্যায়
  তারিণী হালদার ◆ বিনায়ক চন্দ
- পাঠক্রমে ভাষার বিকৃতি
  ড. বীরবল সাহা ◆ শম্ভুনাথ মাজি
- বিষয়বস্তুর ধারণা ও সম্পর্ক
  অধ্যাপক (ড.) দুলাল মুখোপাধ্যায়
  ড. উদয়শঙ্কর কবিরাজ
- শৈশব ও বিকাশ : পর্যায় ও প্রকৃতি
  ড. ঊর্মি চক্রবর্তী ◆ ড. সুতপা ঠাকুর
  সম্পাদনা : প্রণবকুমার চক্রবর্তী
- Childhood and Growing up
  Dr. P.K. Chand ◆ Dr. sujit Pal
  Rakibrita Biswas
- পঠন প্রণালীর পাঠ্যপুস্তকে প্রতিফলন
  ড. বীরবল সাহা ◆ শম্ভুনাথ মাজি
- পাঠ্যপুস্তক : পঠন ও প্রতিফলন
  মহুয়া বসু (চ্যাটার্জী) ◆ সন্দীপ শর্মা

SEMESTER-II

- শিখন ও শিক্ষণ
  ড. বিজন সরকার
- প্রজ্ঞা ও পাঠক্রম (প্রথম ভাগ) তারিণী হালদার
- শিক্ষায় নাটক ও চারুকলা ড. মান্না ◆ ড. দত্ত ◆ পাল
- Assessment for Learning
  Dr. Parsuram Pradhan ◆ Dr. Mitali Panda
- Learning & Teaching
  Dr. Rajib Mukhopadhyay
  Dr. Mitali Panda
- শিখনের মূল্যমান
  অধ্যাপক (ড.) কমলকৃষ্ণ দে ◆ ড. সুভাষচন্দ্র ভাট
  ড. খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

SEMESTER-III (Semester II + III-এর জন্য মোট ৬ পেপারগুলি একত্রে)

Pedagogy of Language Teaching

- বাংলা শিখণ পরিক্রমা
  ড. সুজাতা রাহা ◆ বৈশালী বসু
- Thoughts & Practice in Teaching English
  Sudhakar Sardar
- নবরূপে সংস্কৃত শিক্ষণ পদ্ধতি
  গীতা দাস ◆ নিবেদিতা চৌধুরী

Pedagogy of Social Science Teaching

- ইতিহাস শিক্ষণের নীতি পদ্ধতি ও কৌশল
  তারিণী হালদার ◆ গৌতম কুমার বিশ্বাস
- আধুনিক ভূগোল শিক্ষণ পদ্ধতি
  ড. জয়ারতি দাশগুপ্ত ◆ সম্পাদনা : ড. জয়ন্ত মেটে
- শিক্ষা প্রসঙ্গে দর্শন ও তর্কবিদ্যা
  কাকলি মুখোপাধ্যায়

Pedagogy of Science Teaching

- জীবনবিজ্ঞান শিক্ষণের তত্ত্ব ও প্রয়োগ
  ড. দেবী প্রসাদ নাগ চৌধুরী ◆ ড. সুজিত পাল অম্লান গাঙ্গুলি ◆ ড. মিতা হাওলাদার
- ভৌতবিজ্ঞান শিক্ষণ ড. প্রতাপ কুমার জানা ◆ ড. সুভাষচন্দ্র ভাট ◆ সম্পাদনা : ড. কমলকৃষ্ণ দে

Pedagogy of Mathematics Teaching

- আধুনিক গণিত শিখন ও শিক্ষণ ড. সুরপতি প্রামানিক

ebook.dascoaching.in

SEMESTER-IV

- লিঙ্গবৈশিষ্ট্য বিদ্যালয় ও সমাজ
  অধ্যাপক (ড.) দুলাল মুখোপাধ্যায় ◆ উদয়শঙ্কর কবিরাজ
- বিদ্যালয়, জেন্ডার ও সমাজ
  ড. বীরবল সাহা ◆ শম্ভুনাথ মাজি
- প্রজ্ঞা ও পাঠক্রম (দ্বিতীয় ভাগ)
  তারিণী হালদার ◆ ড. বিমান মিত্র
- অন্তর্ভুক্তিমূলক বিদ্যালয় সংগঠন
  ড. ঊর্মি চক্রবর্তী
- বৃত্তিমূলক কর্মশিক্ষা
  ড. জয়ন্ত চৌধুরী ◆ অরুণাভ সামন্ত
- স্বাস্থ্য ও শারীর শিক্ষা
  ড. দীপন চক্রবর্তী ◆ অরুণাভ সামন্ত
- স্ব ধারণা ড. পি. কে. চক্রবর্তী ◆ ড. বিজন সরকার
- শান্তির জন্য শিক্ষা
  তারিণী হালদার
- নির্দেশনা ও পরামর্শদান
  অধ্যাপক (ড.) দুলাল মুখোপাধ্যায়
  ড. উদয়শঙ্কর কবিরাজ
- নির্দেশনা ও পরামর্শদান
  মহুয়া বসু (চ্যাটার্জী)
- পরিবেশ শিক্ষা ও জনশিক্ষা
  ড. দেবীপ্রসাদ নাগ চৌধুরী ◆ ড. সুজিত পাল
  ড. মধুমালা সেনগুপ্ত
- যোগ শিক্ষা ড. আকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়
- বিজ্ঞান ও শিল্পকলার ধারণা
  ড. অমিতাভ রায় ◆ অরুণাভ সামন্ত

ISBN 81-89169-30-0
9788189169497

Scanned with CamScanner